দুই বাংলার

১ম খণ্ড

পরকীয়া

BanglaBook.org

দুই বাংলার পরকীয়া

১ম খণ্ড

সম্পাদনা

নয়ন রায়

অভয়া অনন্যা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আকাশ

প্রকাশকাল
বাংলা নববর্ষ
১ বৈশাখ-১৪২৬ বঙ্গাব্দ
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক
আলমগীর সিকদার লোটন
সুর জাহান পুনম
প্রচ্ছদ
সজিব খান

আকাশ
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বিক্রয়কেন্দ্র
চন্দ্রবিন্দু ডটকম
৩৪ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০
কম্পোজ: জন্মভূমি কালার স্পট
মুদ্রণ ও অফিস
সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য: ৫০০ টাকা
প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহ্‌ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

The Ahsania Mission Cancer Hospital will get Tk.5 (Five) as grant-in-aid against the sale of each copy of this book

Dhui Banglar Porokiya
Edited By
Nayon Roy
Avoya Anonna
Published by Alamgir Sikder Loton and Sur Jahan Punam
Akash (A House of Literary Publications)
38 Banglabazar, Dhaka 1100
Phone: +8801711526970, 01676532850
e-mail: info@akashbooks.com, www.akashbooks.com
USA Distributor: Muktodhara, Jackson Heights, New York
UK Distributor: Sangeeta Ltd. 22 Brick Lane, London
Price: 500 Taka US$ 15 only
ISBN 978-984-8057-95-7

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিচারক	৭
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনুপমার প্রেম	১১
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ভালোবাসা একটি আর্ট	২৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বেদেনী	৩২
বনফুল	ছুঁড়িটা	৪১
জীবনানন্দ দাশ	মেয়েমানুষ	৪৩
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	আমাদের অনন্ত	৫৫
মনীশ ঘটক	কালনেমি	৬৩
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নুরবানু	৬৬
প্রবোধকুমার সান্যাল	অঙ্গার	৭২
বুদ্ধদেব বসু	রজনী হল উতলা	৮৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	সরীসৃপ	৯৩
লীলা মজুমদার	পাড়ার মধ্যে	১১৩
আশাপূর্ণা দেবী	চরিত্রহীন	১১৭
বিমল মিত্র	জেনানা সংবাদ	১২৩
প্রতিভা বসু	রিফিউজি মেয়ে	১৩৭
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ছলনাময়ী	১৪৩
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	তৃতীয় পক্ষ	১৫১
সন্তোষকুমার ঘোষ	করুণ শঙ্খের মতো	১৫৫
সমরেশ বসু	সহযাত্রী	১৬০
মহাশ্বেতা দেবী	যশবন্তী	১৬৮
অরবিন্দ গুহ	মিথ্যে কথা	১৭৭
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	ঘর-সংসার	১৮৭
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	গুপ্তধন	১৯২
পূর্ণেন্দু পত্রী	অন্ধকারে নিশিকান্ত	১৯৮
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়	ভালোবাসার শেষটা	২০৭
প্রফুল্ল রায়	একটি শব্দের মানে	২১১
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	ছাপোষা মানুষ	২১৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	এক কম্বলের নিচে	২২৫
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	মাংস	২৩০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	দূরত্ব	২৩২
বুদ্ধদেব গুহ	স্বামী হওয়া	২৪১
হাসান আজিজুল হক	একজন চরিত্রহীনের সপক্ষে	২৫৪
বাণী বসু	সুন্দর সুন্দর মেয়ে	২৬২
দিব্যেন্দু পালিত	পেট	২৬৯
রমানাথ রায়	ভগবানের দান	২৭৭
শেখর বসু	অন্য রকম খেলা	২৮৭
সমরেশ মজুমদার	যে-নাটকের রিহার্সাল হয় না	২৯২
সুব্রত সেনগুপ্ত	জন্মরোধ কেন	২৯৬
শৈবাল মিত্র	চোখের কাজল ধেবড়ে গেলে	৩০২
হীরেন চট্টোপাধ্যায়	শঙ্খচূড় ও তুলসী	৩০৯
কণা বসু মিশ্র	কেষ্ট আর ভোমরা	৩১৬
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য	১০ মিন্টো লেন	৩২১
ভগীরথ মিশ্র	সম্পর্কপুরাণ	৩২৭
সুচিত্রা ভট্টাচার্য	উজান	৩৩৫
আবুল বাশার	জরিনা	৩৫৩
কিন্নর রায়	রতিলেখ	৩৫৭
ড. নজরুল ইসলাম	দ্বিতীয় বিয়ে	৩৬৪
জয় গোস্বামী	সংশোধন বা কাটাকুটি	৩৭৪
দেবল দেববর্মা	সীমামাসিকে ভুলিনি	৩৯৩
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	ফাঁকি	৪১৭
আবদুল জব্বার	হীরেমন পাখি	৪২৪

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিচারক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে-পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে-ও তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। তত দিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা এক প্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালো-মন্দ, অনেক সুখ-দুঃখ জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরো প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তর-প্রকৃতি বহু কালের সহবাসক্রমে মুখে-চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে-কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসের নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয় — তখনও যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই, সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যে-দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই, যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরের সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে, তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল, সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষের মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে এক জন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া ক্ষীরো ক্ষীরো শব্দে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল; রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

BanglaBoi.org

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নিচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাট্যুটরি সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। এক দিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এ-রূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে-কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুণ্ডিত মুখে প্রতি দিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ কার্তিকাটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরো দুটো-একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়া ছিল, সেই দূরত্বের বিচ্ছেদ-বশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদভবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন — সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহার হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছিল।

BanglaBook.org

ঘরে তার বাপ-মা এবং দু'টি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দু'টি সকাল সকাল খাইয়া স্কুলে যাইত, আবার স্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-স্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জন ঘরে আসিয়া বসিত। এক দৃষ্টে রাজপথের লোক-চলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওয়ালারা যে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে, উহারা যেন এই লোক-চলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশ-ধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ওই উন্নতমস্তক সুবেশসুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনিতে মুখরিত। সে-দিন সে ভিত্তিস্থিতচঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃদ্‌পিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাতে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ছায়া ও সঙ্গীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন সুখ-দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না, তাহার সম্মুখবর্তী ওই হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ওই তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ওই বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে-ব্যক্তি এত দিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সে-ও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে বিনোদচন্দ্র নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারাংবার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক উৎকণ্ঠিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ পূর্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছু দিন ঘাত-প্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সম্ভ্রমে আশায়-আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পর প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার বিধবার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন এক দিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে-সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

BanglaBook.org

এক দিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল; বলিল, ওগো পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো। মোহিত শশ্যবস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি স্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসিত; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পান সাজা, চুল বাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনের মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা — এ সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল; বুঝিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন সুখের আবশ্যক আছে।

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোনখানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সে নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে, তখন সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে — কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল; সকরুণ অনুনয়-সহকারে বলিতে লাগিল, এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দু'টি ভাই এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস। কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন, রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে একঘেয়ে হইয়া উঠে সেই জন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে-সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আকে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিকতর্পণ করেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছেটো ছেটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদ্‌গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

BanglaBook.org

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতেই মনোমতো তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট, তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশ দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়!

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল, দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন, কই আংটি দেখি। প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে — বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে-মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল॥

BanglaBook.org

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অনুপমার প্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিরহ

একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে অনুপমা নবেল পড়িয়া মাথাটা একেবারে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে মনে করিল, মনুষ্য-হৃদয়ে যত প্রেম, যত মাধুরী, যত শোভা, যত সৌন্দর্য, যত তৃষ্ণা আছে, সব খুঁটিয়া বাছিয়া একত্রিত করিয়া নিজের মস্তিষ্কের ভিতর জমা করিয়া ফেলিয়াছে; মনুষ্য-স্বভাব, মনুষ্য-চরিত্র তাহার নখদর্পণ হইয়াছে। জগতের শিখিবার পদার্থ আর তাহার কিছুই নাই; সব জানিয়া ফেলিয়াছে,

সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সতীত্বের জ্যোতি সে যেমন দেখিতে পায়, প্রণয়ের মহিমা সে যেমন বুঝিতে পারে, জগতে আর যে কেহ তেমন সমঝদার আছে, অনুপমা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না।

অনু ভাবিল, সে একটি মাধবীলতা; সম্প্রতি মঞ্জরিয়া উঠিতেছে, এ অবস্থায় আশু সহকার-শাখা-বেষ্টিতা না হইলে ফোট ফোট কুঁড়িগুলি কিছুতেই পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিবে না। তাই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি নবীনকান্তি-সহকার মনোনীত করিয়া লইল এবং দুই-চারি দিবসেই তাহাকে মন-প্রাণ জীবন-যৌবন সব দিয়া ফেলিল। মনে মনে মন দিবার বা নিবার সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু জড়াইয়া ধরিবার পূর্বে সহকারটার মতামতেরও ঈষৎ প্রয়োজন হয়। এইখানেই মাধবীলতা কিছু বিপদে পড়িয়া গেল। নবীন নীরোদকান্তকে সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে তাহার মাধবীলতা — স্ফুটনোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে আশ্রয় না দিলে এখনই কুঁড়ির ফুল লইয়া মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে প্রাণত্যাগ করিবে।

কিন্তু সহকার এত জানিতে পারিল না। না জানুক, অনুপমার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতে গরল, সুখে দুঃখ, প্রণয়ে বিচ্ছেদ চিরপ্রসিদ্ধ। দুই-চারি দিবসে অনুপমা বিরহ-ব্যথায় জর্জরিত-তনু হইয়া মনে মনে বলিল, স্বামিন্ তুমি আমাকে লও বা না লও, ফিরিয়া চাহ বা না চাহ, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ জন্মে না পাই, আর জন্মে নিশ্চয়ই পাইব; তখন দেখিবে সতী-সাধ্বীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল!

অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, বাটীসংলগ্ন উদ্যানও আছে, মনোরম সরোবরও আছে; সেথা চাঁদও উঠে, পদ্মও ফুটে, কোকিলও গান গায়, মধুপও ঝঙ্কার করে; এইখানে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। এলোচুল করিয়া অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, গাত্রে ধূলি মাখিয়া, প্রেমের যোগিনী সাজিয়া, সরসীর জলে কখনও মুখ দেখিতে লাগিল; কখনও নয়ন-জলে ভাসাইয়া গোলাপ-পুষ্প চুম্বন করিতে লাগিল; কখনও অঞ্চল পাতিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল; আহারে রুচি নাই, শয়নে ইচ্ছা নাই, সাজসজ্জায় বিষম বিরাগ, গল্প-গুজবে রীতিমত বিরক্তি — অনুপমা দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া অনুর জননী মনে মনে প্রামাদ গণিলেন — এক বৈ মেয়ে নয়, তার আবার এ কী হইল? জিজ্ঞাসা করিলে সে কী যে বলে, কেহ বুঝিতে পারে না; ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া যায়। অনুর জননী এক দিবস জগবন্ধুবাবুকে বলিলেন, ওগো, একবার কি চেয়ে দেখবে না? তোমার একটি বৈ মেয়ে নয়, সে যে বিনি চিকিৎসায় মরে যায়।

জগবন্ধুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কী হল ওর?

তা জানিনে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, অসুখ-বিসুখ কিছু নাই।

তবে এমন হয়ে যায় কেন?

জগবন্ধুবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা কেমন করে জানব?

তবে মেয়ে মরে যাক?

এ তো বড় মুশকিলেন কথা! জ্বর নেই, বালাই নেই, শুধু শুধু যদি মরে যায় তো আমি কি ধরে রাখব?

গৃহিণী শুষ্কমুখে বড়বধূমাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বউমা, অনু আমার এমন করে বেড়ায় কেন?

কেমন করে জানব মা?

তোমাদের কাছে কি কিছু বলে না?

কিছু না।

BanglaBook.org

গৃহিণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন, তবে কী হবে? না খেয়ে না শুয়ে এমন করে সমস্ত দিন বাগানে ঘুরে বেড়ালে ক'দিন আর বাঁচবে? তোরা বাছা যা হোক একটা বিহিত করে দে, না হলে বাগানের পুকুরে এক দিন ডুবে মরব।

বড় বউ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, দেখেশুনে একটা বিয়ে দাও; সংসারের ভার পড়লে আপনি সব সেরে যাবে।

বেশ কথা, তবে আজই এ-কথা আমি কর্তাকে জানাব।

কর্তা এ-কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, কলিকাল! দাও — বিয়ে দিয়েই দেখো, যদি ভালো হয়।

পরদিন ঘটক আসিল। অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, তাহাতে রূপবতী, পাত্রের জন্য ভাবিতে হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটকঠাকুর পাত্র স্থির করিয়া জগবন্ধুবাবুকে সংবাদ দিলেন। কর্তা এ-কথা গৃহিণীকে জানাইলেন; গৃহিণী বড় বউকে জানাইলেন; ক্রমে অনুপমাও শুনিল।

দুই-এক দিন পরে, এক দিন দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে মিলিয়া অনুপমার বিবাহের গল্প করিতেছিল, এমন সময়ে সে এলোচুলে, আলুথালু-বসনে একটা শুষ্ক গোলাপ ফুল হাতে করিয়া ছবিটির মতো আসিয়া দাঁড়াইল। অনুর জননী কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা যেন আমার যোগিনী সেজেছেন!

বড় বউঠাকরুনও একটু হাসিয়া বলিল, বিয়ে হলে কোথায় সব চলে যাবে। দুটো-একটা ছেলে-মেয়ে হলে তো কথাই নেই।

অনুপমা চিত্রার্পিতার ন্যায় সকল কথা শুনিতে লাগিল। বউ আবার বলিল, মা, ঠাকুরঝির বিয়ের কবে দিন ঠিক হল?

দিন এখনও কিছু ঠিক করা হয়নি।

ঠাকুরজামাই কী পড়েন?

এইবার বিএ দেবেন।

তবে তো বেশ ভালো বর। তাহার পর একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, দেখতে কিন্তু খুব ভালো না হলে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।

কেন পছন্দ হবে না? জামাই আমার বেশ দেখতে।

এইবার অনুপমা একটু গ্রীবা বক্র করিল; ঈষৎ হেলিয়া পদনখ দিয়া মৃত্তিকা খনন করিবার মতো করিয়া নখ খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল, বিবাহ আমি করব না।

জননী ভালো শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী মা?

বড় বউ অনুপমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাকুরঝি বলছে, ও কখনও বিয়ে করবে না।

বিয়ে করবে না?

না।

না করুক গে! অনুর জননী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী চলিয়া গেলে বড়বধূ বলিল, তুই বিয়ে করবি নে?

অনুপমা পূর্বমতো গম্ভীরমুখে বলিল, কিছুতেই না।

কেন?

যাকে তাকে গছিয়ে দেওয়ার নামই বিবাহ নয়। মনের মিল না হলে বিবাহ করাই ভুল।

BanglaBook.org

বড় বউ বিস্মিত হইয়া অনুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, গছিয়ে দেওয়া আবার কী লো? গছিয়ে দেবে না তো কি মেয়েমানুষে দেখেশুনে পছন্দ করে বিয়ে করবে?

নিশ্চয়!

তবে তোর মতে আমার বিয়েটাও ভুল হয়ে গেছে? বিয়ের আগে তো তোর দাদার নাম পর্যন্ত আমি শুনিনি।

সবাই কি তোমার মতো?

বউ আর একবার হাসিয়া বলিল, তোর কি তবে মনের মানুষ কেউ জুটেছে না কি?

অনুপমা বধূঠাকুরানীর সহাস্য বিদ্রূপে মুখখানি পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ গম্ভীর করিয়া বলিল, বউ, ঠাট্টা করছ নাকি? এখন কি বিদ্রূপের সময়?

কেন লো, হয়েছে কী?

হয়েচে কী? তবে শোনো, অনুপমার মনে হইল, তাহার সম্মুখে তাহার স্বামীকে বধ করা হইতেছে, সহসা কতলু খাঁর দুর্গে বধমঞ্চ-সম্মুখে বিমলা ও বীরেন্দ্র সিংহের দৃশ্য তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। অনুপমা ভাবিল, তাহারা যাহা পারে, সে কি তাহা পারে না? সতী স্ত্রী জগতে কাহাকে ভয় করে? দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অনৈসর্গিক প্রভায় ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে অঞ্চলখানা কোমরে জড়াইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া বড়বধূ তিন হাত পিছাইয়া গেল। নিমেষে অনুপমা পার্শ্ববর্তী খাটের খুরো বেশ জড়াইয়া ধরিয়া ঊর্ধ্বনেত্রে চিৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, প্রভু, স্বামী, প্রাণনাথ, জগৎসমীপে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, তুমিই আমার প্রাণনাথ; প্রভু, তুমি আমার, আমি তোমার! এ খাটের খুরো নয়, এ তোমার পদযুগল, আমি ধর্ম সাক্ষী করে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি, এখনও তোমার চরণ স্পর্শ করে বলছি, এ জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না; কার সাধ্য প্রাণ থাকতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে! মা গো, জগৎজননী —।

বড় বধূ চিৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, ওগো দেখো গো, ঠাকুরঝি কেমন ধারা কচ্ছে।

দেখিতে দেখিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। বউঠাকরুনের চিৎকার বাহির পর্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, কী হয়েচে, হল কী?

কর্তা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন। কর্তা-গিন্নীতে, পুত্র-পুত্রবধূতে, দাস-দাসীতে মুহূর্তে ঘরে ভিড় হইয়া গেল। অনুপমা মূর্ছিত হইয়া খাটের কাছে পড়িয়া আছে। গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, অনুর আমার কী হল? ডাক্তার ডাক! বাতাস কর। ইত্যাদি চিৎকারে পাড়ার অর্ধেক প্রতিবাসী বাড়িতে জমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, আমি কোথায়?

তাহার জননী মুখের নিকট মুখ আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ।

অনুপমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃদু মৃদু কহিল, ওঃ, তোমার কোলে! ভাবছিলাম আমি আর কোথাও কোন স্বপ্নরাজ্যে তাঁর সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি। দরবিগলিত অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। জননী তাহা মুছাইয়া কাতর হইয়া বলিলেন, কেন কাঁদচ মা? কার কথা বলচ?

অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বড় বধূ চন্দ্রবাবুকে এক পাশে ডাকিয়া বলিল, সবাইকে যেতে বলো, আর কোনও ভয় নেই; ঠাকুরঝি ভালো হয়েচে।

BanglaBook.org

ক্রমশ সকলে প্রস্থান করিলে রাত্রে বড় বউ অনুপমার কাছে বসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হোস?

অনুপমা চক্ষু মুদিত করিয়া কহিল, সুখ-দুঃখ আমার কিছুই নেই; সেই আমার স্বামী।

তা তো বুঝি, কিন্তু কে সে?

সুরেশ। সুরেশই আমার —।

সুরেশ? রাখাল মজুমদারের ছেলে?

হ্যাঁ, সে-ই।

রাত্রে গৃহিণী এ-কথা শুনিলেন। পরদিন অমনি মজুমদারের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুরেশের জননীকে বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও।

সুরেশের জননী হাসিয়া বলিলেন, মন্দ কী!

ভালো-মন্দর কথা নয়, দিতেই হবে।

তবে সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। সে বাড়িতেই আছে; তার মত হলে কর্তার অমত হবে না।

সুরেশ বাড়ি থাকিয়া তখন বিএ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এক মুহূর্ত তাহার এক বৎসর। তাহার মা বিবাহের কথা বলিলে, সে কানেই তুলিল না। গৃহিণী আবার বলিলেন, সুরো, তোকে বিয়ে করতে হবে।

সুরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, তা তো হবেই, কিন্তু এখন কেন? পড়ার সময় ও-সব কথা ভালো লাগে না।

গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না না, পড়ার সময় কেন? এগজামিন হয়ে গেলে বিয়ে হবে।

কোথায়?

এই গাঁয়ে জগবন্ধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে।

কী? চন্দ্রর বোনের সঙ্গে? যেটাকে খুকি বলে ডাকত?

খুকি বলে ডাকবে কেন, তার নাম অনুপমা।

সুরেশ অল্প হাসিয়া বলিল, হাঁ অনুপমা! দূর, সেটা ভারি কুৎসিত।

কুচ্ছিত হবে কেন? সে বেশ দেখতে।

তা হোক বেশ দেখতে; এক জায়গায় শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি আমার ভালো লাগে না।

কেন, তাতে আর দোষ কী?

দোষের কথায় কাজ নেই, তুমি এখন যাও মা, আমি একটু পড়ি; কিছুই এখনও হয়নি।

সুরেশের জননী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সুরো তো এক গাঁয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।

কেন?

তা তো জানিনে।

অনুর জননী মজুমদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া কাতর ভাবে বলিলেন, তা হবে না ভাই। এ বিয়ে তোমাকে দিতে হবে।

ছেলের অমত, আমি কী করব বলো?

না হলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

তবে আজ থাক। কাল আর একবার বুঝিয়ে দেখব, যদি মত করতে পারি।

অনুর জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জগবন্ধুকে বলিলেন, ওদের সুরেশের সঙ্গে যাতে অনুর আমার বিয়ে হয়, তা করো।

BanglaBook.org

কেন বলো দেখি? রায়গ্রামে তো এক রকম সব ঠিক হয়েছে। সে সম্বন্ধ আবার ভেঙে কী হবে?

কারণ আছে।

কী কারণ?

কারণ কিছু নয়; কিন্তু সুরেশের মতো অমন রূপে-গুণে ছেলে কি পাওয়া যাবে? আর ও আমার একটিমাত্র মেয়ে, তার দূরে বিয়ে দেব না। সুরেশের সঙ্গে হলে যখন খুশি দেখতে পাব।

আচ্ছা, চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়, নিশ্চিত দিতে হবে।

কর্তা নথ নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, তাই হবে গো।

সন্ধ্যার পর কর্তা মজুমদার-বাটী হইতে ফিরিয়া অসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, বিয়ে হবে না।

সে কী কথা!

কী করব বলো? ওরা না দিলে তো আমি জোর করে ওদের বাড়িতে মেয়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনে।

দেবে না কেন?

এক গাঁয়ে বিয়ে হয়, ওদের মত নয়।

গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আমার কপালের দোষ! পরদিন তিনি পুনারায় সুরেশের জননীর নিকট আসিয়া বলিলেন, দিদি, বিয়ে দাও!

আমার তো ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলের মত হয় কৈ?

আমি লুকিয়ে সুরেশকে আরো পাঁচ হাজার টাকা দেব।

টাকার লোভ বড় লোভ। সুরেশের জননী এ-কথা সুরেশের পিতাকে জানাইলেন। কর্তা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, সুরেশ, তোমাকে এ বিবাহ করতেই হবে।

কেন?

কেন আবার কী? এ বিবাহে তোমার গর্ভধারিণীর মত, আমারও মত; সঙ্গে সঙ্গে একটু কারণও হয়ে পড়েছে।

সুরেশ নতমুখে বলিল, এখন পড়াশোনার সময়, পরীক্ষার ক্ষতি হবে।

তা আমি জানি বাপু, পড়াশোনার ক্ষতি করতে তোমাকে বলছি না। পরীক্ষা শেষ হলে বিবাহ কোরো।

যে আজ্ঞে।

অনুর জননীর আনন্দের সীমা নাই। এ-কথা তিনি কর্তাকে বলিলেন, দাসদাসী সকলকেই মনের আনন্দে এ-কথা জানাইয়া দিলেন।

বড় বউ অনুপমাকে ডাকিয়া বলিল, ওলো! বর যে ধরা দিয়েছে।

অনু সলজ্জে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা আমি জানতাম।

কেমন করে জানলি? চিঠিপত্র চলত নাকি?

প্রেম অন্তর্যামী! আমাদের অন্তরে চলত।

ধন্যি মেয়ে তুই!

অনুপমা চলিয়া গেলে বড়বধূঠাকুরানী মৃদু মৃদু বলিল, পাকামি শুনলে গা জ্বালা করে! আমি তিন ছেলের মা, উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন!

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভালোবাসার ফল

দুর্লভ বসু বিস্তর অর্থ রাখিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার বিংশতিবর্ষীয় একমাত্র পুত্র ললিতমোহন শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্তি করিয়া এক দিন স্কুলে যাইয়া মাস্টারকে বলিল, মাস্টারমশায় আমার নামটা কেটে দিন।

কেন বাপু?

মিথ্যে পড়ে-শুনে কী হবে? যে-জন্য পড়াশোনা, আমার বিস্তর আছে। বাবা আমার জন্য অনেক পড়ে রেখে গিয়েছেন।

মাস্টার চক্ষু টিপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, তবে আর ভাবনা কী? এইবার চলে খাওয় গে।

এইখানেই ললিতমোহনের বিদ্যাভাস ইতি হইল।

ললিতমোহনের কাঁচা বয়স, তাহাতে বিস্তর অর্থ, কাজেই স্কুল ছাড়িবামাত্র বিস্তর বন্ধুও জুটিয়া গেল। ক্রমে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, গায়ক, গায়িকা ইত্যাদি একটির পর একটি করিয়া ললিতমোহনের বৈঠকখানা পূর্ণ করিল। এ-দিকে পিতৃসঞ্চিত অর্থরাশিও জলবৎ ঢেউ খেলিয়া তর তর করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার জননী কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক বুঝাইলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। এক দিন ঘূর্ণিত-লোচনে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিল, মা, এখনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও।

মা বলিলেন, একটি পয়সাও আমার নেই।

ললিতমোহন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একটা কুড়ুল লইয়া জননীর হাতবাক্স চিরিয়া ফেলিয়া পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

পরদিন পুত্রের হস্তে লোহার সিন্দুকের চাবি দিয়া বলিলেন, বাবা, এই লোহার সিন্দুকের চাবি নাও; তোমার বাপের টাকা, যেমন ইচ্ছা খরচ করো, আর আমি বাধা দিতে আসব না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি গেলে তোমার চোখ ফোটে।

ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় যাবে?

তা জানিনে। আত্মঘাতী হলে কোথায় যেতে হয় তা কেউ জানে না, তবে শুনেছি সদগতি হয় না। তা কী করব বলো, আমার যেমন কপাল!

আত্মঘাতী হবে?

না হলে আর উপায় কী? তোমাকে পেটে ধরে আমার সব সুখই হল। এখন নিত্যি নিত্যি তোমার লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে যমদূতের আগুনকুণ্ড ভালো।

ললিতমোহন জনীকে চিনিত। সে বিলক্ষণ জানিত যে, তাহার জননী মিথ্যা ভয় দেখাইবার লোক নহেন; তখন কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা, তুমি আমাকে মাপ করো, এমন কাজ আর কখনও করব না। তুমি থাকো, তুমি যেও না।

জননী রুক্ষভাবে বলিলেন, তাও কি হয়? তোমার বন্ধুবান্ধব, তারা সব যাবে কোথায়?

আমি কাউকে চাইনে। আমি টাকাকড়ি, বন্ধুবান্ধব কিছুই চাইনে, শুধু তুমি থাকো।

তোমার কথায় বিশ্বাস কী?

কেন মা, আমি তোমার মন্দ সন্তান, তা বলে অবিশ্বাসের কাজ কি কখনও করেচি? তুমি এখন থেকে ইচ্ছা-সুখে যা দেবে, তার অধিক এক পয়সাও চাব না।

ইচ্ছা-সুখে তোমাকে এক পয়সাও দিতে ইচ্ছা হয় না, কেননা, এই এক বৎসর দেড় বৎসরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েছ, তার অর্ধেকও কখনও তোমার জীবনে উপার্জন করতে পারবে না।

BanglaBook.org

তুমি আমাকে কিছুই দিও না।

জননী কোমল হইলেন, না, অতটা তোমার সবে না, আমিও তা ইচ্ছে করিনে। মাসে একশো টাকা পেলে তোমার চলবে কি?

স্বচ্ছন্দে।

তবে তাই হোক।

দুই-এক দিনের মধ্যেই তার বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন দুই-এক জনের বাটীতে ডাকিতে গেল; কেহ বলিল, কাল যাব; কেহ বলিল, আজ কাজ আছে। ফলত কেহই আর আসিল না। এখন সে সম্পূর্ণ একা। একা মদ খায়, একা ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার মনে করিল, আর মদ খাইবে না; কিন্তু সময় কী-রূপে কাটিবে? কাজেই মদ ছাড়া হইল না। একটা পথে সে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত; এ পথটা জগবন্ধুবাবুর বাগানের পার্শ্ব দিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন বলিয়া মদ খাইয়া এখানেই বেড়াইবার অধিক সুবিধা হইত। মাতাল বলিয়া তাহার গ্রামময় অখ্যাতি; কাহারও বাটীতে যাওয়া ভালো দেখায় না, কাজেই মদ খাইয়া নিজের সঙ্গে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইত।

আজকাল তাহার আর এক জন সঙ্গী জুটিয়াছে, সে অনুপমা। আসিতে যাইতে সে প্রায়ই দেখে, তাহারই মতো অনুপমাও বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। অনুপমাকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজকাল তাহাতে যেন একটু নতুনত্ব দেখিতে পায়। জগবন্ধুবাবুর বাগানের প্রাচীরের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেইখানে একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দেখে, অনুপমা উদ্যানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও-বা তরুতলে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, কখনও-বা ফুল তুলিতেছে, এক-এক সময়-বা সরসীর জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া বালিকা-সুলভ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে তাহার বেশ লাগে; ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত চুলগুলি, অযত্নরক্ষিত দেহলতা, আলুথালু বসন-ভূষণ ও সকলের উপর মুখখানি তাহার মদের চোখে একটি পদ্মফুলের মতো বোধ হইত। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, জগতে সে অনুপমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে। রাত্রি হইলে বাড়িতে গিয়া শয়ন করে, যতক্ষণ নিদ্রা না হয় ততক্ষণ অনুপমার মুখই মনে পড়ে। স্বপ্নেও কখনও কখনও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এমনই করিয়া কত দিন যায়। জগবন্ধুবাবুর উদ্যানের সেই ভগ্ন অংশটিতে বৈকাল হইতে বসিয়া থাকা আজকাল তাহার নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক নহে, অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল যে, অনুপমাকে বাস্তবিকই অতিশয় অধিক রকম ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এ-রূপ ভালোবাসায় লাভ নাই — সে জানিত, সে মাতাল; সে অপদার্থ মূর্খ; সে সকলের ঘৃণিত জীব, অনুপমার কিছুতেই যোগ্য পাত্র নহে। শত চেষ্টাতেও তাহাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে আর এমন করিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ কী? কাল হইতে আর আসিবে না। কিন্তু থাকিতে পারিত না, সূর্য অস্তগত হইলে সে মদটুকু খাইয়া সেই ভাঙা পাঁচিলটির উপর আসিয়া বসিত। তবে ভিতরে একটা কথা আছে, কাহাকেও ভালোবাসিলে মনে হয়, সে-ও বুঝি আমাকে ভালোবাসে; আমাকে কেন বাসিবে না? অবশ্য এ-কথা প্রতিপন্ন করা যায় না।

এক দিন ললিতমোহন প্রাচীরে উঠিয়াছে। এমন সময় চন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল।

চন্দ্রবাবু দ্বারবানকে হাঁকিয়া বলিলেন, কো পাকড়ো।

দ্বারবান প্রথমে বুঝিতে পারিল না কাহাকে ধরিতে হইবে, পরে যখন বুঝিল, ললিতবাবুকে তখন সেলাম করিয়া তিন হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রবাবু পুনরায় চিৎকার করিয়া বলিলেন, কো পাকড়কে থানামে দেও।

BanglaBook.org

দ্বারবান আধা বাঙলা আধা হিন্দিতে বলিল, হামি নেহি পারবে বাবু।

ললিতমোহন ততক্ষণে ধীরে ধীরে প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া গেলে চন্দ্রবাবু বলিলেন, কাহে নেহি পাক্‌ড়া?

দ্বারবান চুপ করিয়া রহিল। এক জন মালী ললিতকে বিলক্ষণ চিনিত, সে বলিল, ও বেটা ভোজপুরীর সাধ্য কী ললিতবাবুকে ধরে? ওর মতো চারটে দরোয়ানের মাথা ওর এক ঘুঁষিতে ভেঙে যায়।

দ্বারবানও তাহা অস্বীকার করিল না, বলিল, বাবু, নোক্‌রি করনে আয়া, না জান দেনে আয়া?

চন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ললিতের উপর পূর্ব হইতেই বিলক্ষণ চটা ছিলেন, এখন সময় পাইয়া, সাক্ষী জুটাইয়া অনধিকার-প্রবেশ এবং আরও কত কী অপরাধে আদালতে নালিশ করিলেন। জগবন্ধুবাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই এই মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই শুনিলেন না। বিশেষ মর্মপীড়িতা অনুপমা জিদ করিয়া বলিল যে, পাপীকে শাস্তি না দিলে তাহার মন কিছুতেই সুস্থির হইবে না।

ইন্‌স্পেক্টর বাটীতে আসিয়া অনুপমার এজাহার লইল। অনুপমা সমস্তই ঠিকঠাক বলিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, ললিতের জননী বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াও পুত্রকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তিন বৎসর ললিতমোহনের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল।

বিএ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার একেবারে প্রথম হইয়াছে। গ্রামময় সুখ্যাতির একটা রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনুপমার জননীর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে সুরেশের জননীকে গিয়া বলিলেন, নিজের কথা নিজে বলতে নেই, কিন্তু দেখ দেখি আমার মেয়ের পয়।

সুরেশের মা সাহায্য বলিলেন, তা তো দেখছি।

একবার বিয়ে হোক, তারপর দেখিস তোর ছেলে রাজা হবে। অনু যখন জন্মায় তখন একজন গণৎকার এসে গুণে বলেছিল যে, এ মেয়ে রানি হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকেনি, থাকবে না; যত সুখ তোমার মেয়ের হবে।

কে বলেছিল?

এক জন সন্ন্যাসী।

কিন্তু তুমি তোমার জামাইকে একখানা বাড়ি কিনে দিও।

তা দেব না? চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলে বলেই জানি, কিন্তু অনুরও তো কর্তার অর্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত, আমি বেঁচে থাকলে তা পাবেও।

তাই হোক, ওরা রাজা-রানি হয়ে সুখে থাক, আমরা যেন দেখে মরি।

দুইদিন পরে রাখাল মজুমদার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, এই বৈশাখে তোমার বিবাহের দিন স্থির করলাম।

এখন বিবাহ হয়, আমার একেবারে ইচ্ছে নয়।

কেন?

আমি Gilchrist Scholarship পেয়েচি, তাতে আমি ইচ্ছা করলে বিলাতে গিয়ে পড়তে পারি।

তুমি বিলাত যাবে?

ইচ্ছা আছে।

পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অমন কথা আর মুখে এনো না।

বিনা পয়সায় যখন এ সুবিধা পেয়েচি, তখন দোষ কী?

রাখালবাবু এ-কথায় একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, নাস্তিক বেটা! দোষ কী? পরের পয়সায় যদি বিষ পাওয়া যায় তো কি খেতে হবে?

BanglaBook.org

সে-কথায় এ-কথায় অনেক প্রভেদ।

প্রভেদ আর কোথায়? এক দিকে জাত খোয়ান, ম্লেচ্ছ হওয়া, আর অপর দিকে বিষভোজন, ঠিক এক নয় কি? চুল চুল মিলে গেল না কি?

সুরেশ আর কোনও প্রতিবাদ না করিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া গেলে রাখালবাবু আপনা-আপনি হাসিয়া বলিলেন, বেটা পাতা-দুই ইংরেজি পড়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসে। কেমন কথাটা বললাম — পরের পয়সায় বিষ পেলে কি খেতে হবে? বাছাধন আর দ্বিতীয় কথাটি বলতে পারলে না। এ অকাট্য যুক্তি কি ও কাটাতে পারে?

বিবাহের সমস্ত পাকা-রকম স্থির হইয়া গেলে বড় বধূ এক দিন অনুপমাকে বলিলেন, কী লো! বরের সুখ্যাতি যে গ্রামে ধরে না।

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলিল, যার সতীসাধ্বী স্ত্রী, জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুখ থাকে।

তবু তো এখনও বিয়ে হয়নি লো!

বিবাহ আমাদের অনেক দিন হয়েছে, জগৎ জানে না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বহু দিন আমাদের পূর্ণমিলন হয়ে গিয়েছে।

বড়বধূ অল্প হাসিল, ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, এ কথা আর কোথাও বলিস নে, আমরা বুড়ো মাগী, আমাদের তো বলা দূরে থাক — এমনধারা শুনলেও লজ্জা করে; সব কথায় তুই যেন থিয়েটারে অ্যাক্ট করতে থাকিস। এমন করলে লোকে পাগল বলবে যে!

আমি প্রেমে পাগল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিবাহ

আজ ৫ই বৈশাখ। অনুপমার বিবাহ-উৎসবে আজ গ্রামটা তোলপাড় হইতেছে। জগবন্ধুবাবুর বাটীতে আজ ভিড় ধরে না। কত লোক যাইতেছে, কত লোক হাঁকাহাঁকি করিতেছে। কত খাওয়ান দাওয়ানের ঘটা, কত বাজানা-বাদ্যের ধুম। যত সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, ধুমধাম তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; সন্ধ্যা-লগ্নেই বিবাহ, এখনই বর আসিবে — সকলেই উৎসাহে আগ্রহে উন্মুখ হইয়া আছে।

কিন্তু বর কোথায়? রাখালবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কলরব বাধিয়া উঠিয়াছে, সুরেশ গেল কোথায়? এখানে খোঁজ, ওখানে খোঁজ, এ-দিকে দেখ, ও-দিকে দেখ। কিন্তু কেহই সুরেশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কুসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, বজ্রাগ্নির মতো এ-কথা জগবন্ধুবাবুর বাটীতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। বাড়িসুদ্ধ লোক সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; সে কী কথা!

আটটার সময় বিবাহের লগ্ন, কিন্তু নয়টা বাজিতে চলিল, কোথাও বরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জগবন্ধুবাবু মাথা চাপড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহিণী কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে পড়িলেন, কী হবে গো?

কর্তার তখন অর্ধক্ষিপ্তাবস্থা। তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হবে আমার শ্রাদ্ধ, আর কী হবে? এই হতভাগা মেয়ের জন্য বৃদ্ধবয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল, এখন এক ঘরে হয়ে থাকতে হবে। কেন মরতে বুড়ো বয়সে তোমাকে আবার বিয়ে করেছিলাম, তোমারই জন্য আজ এই অপমান। শাস্ত্রেই আছে, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী। তোমার কথা শুনে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেচি। যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে আমার সামনে থেকে দূরে হয়ে যাও।

BanglaBook.org

আহা! গৃহিণীর দুঃখের কথা বলিয়া কাজ নাই। এ-দিকে এই, আর ও-দিকে আর এক বিপদ। অনুপমা ঘন ঘন মূর্ছা যাইতেছে।

এই দিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে — দশটা, এগারোটা, বারোটা করিয়া ক্রমশ একটা দুইটা বাজিয়া গেল; কিন্তু কোথাও সুরেশের সন্ধান হইল না।

সুরেশকে পাওয়া যাক আর না যাক, অনুপমার বিবাহ কিন্তু দিতেই হইবে। কেননা আজ রাত্রে বিবাহ না হইলে জগবন্ধুবাবুর জাতি যাইবে।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় পঞ্চাশদ্বর্ষীয় কাসরোগী রামদুলাল দত্তকে পাড়ার পাঁচ জন — জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।

অনুপমা যখন শুনিল এমনি করিয়া তাহার মাথা খাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মূর্ছা ছাড়িয়া দিয়া জননীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল, ও মা! আমাকে রক্ষা করো, এমন করে আমার গলায় ছুরি দিও না। এ বিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হব।

মা কাঁদিয়া বলিলেন, আমি কী করব মা!

মুখে যাহাই বলুন না, কন্যার দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই কাঁদিয়া কাটিয়া আবার স্বামীর কাছে আসিলেন, ওগো, একবার শেষটা ভেবে দেখো, এ বিয়ে দিলে মেয়ে আমার বিষ খাবে।

কর্তা কোনও কথা না কহিয়া একেবারে অনুপমার নিকটে আসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ওঠো, ভোর হয়ে যায়।

কোথায় যাব বাবা?

এখনই সম্প্রদান করব।

অনুপমা কাঁদিয়া ফেলিল, বাবা, আমাকে মেরে ফেলো, আমি বিষ খাব।

যা ইচ্ছে হয় কাল খেয়ো মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তারপর যেমন খুশি কোরো — বিষ খেও, জলে ডুবে মোরো, আমি একবারও বারণ করব না।

কী নিদারুণ কথা! এইবার যথার্থই অনুপমার ভিতর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, বাবা! আমাকে রক্ষা করো।

কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোনও কথাই খাটিল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জগবন্ধুবাবু সেই রাত্রেই বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হস্তে অনুপমাকে সম্প্রদান করিলেন।

বহুকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ নাই। দুইখানি পুরাতন ইষ্টকনির্মিত ঘর, একটু শাক-সবজির বাগান — ইহাই দত্তজীর সাংসারিক সম্পত্তি। বহুক্লেশে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বিবাহ করিয়া পরদিন অনুপমাকে বাড়ি আনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিল; অনেক দাসদাসী আসিল — কোনও ক্লেশ নাই, ছয়-সাত দিন তাঁহার পরম সুখে অতিবাহিত হইল। বড়লোক শ্বশুর, আর তাঁহার কোনও ভাবনা নাই; বিবাহ করিয়া কপাল ফিরিয়াছে। কিন্তু অনুপমার স্বতন্ত্র কথা; আর দিন-দুই থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া দাসদাসীরাও গোপনে চক্ষু মুছিল।

বাড়ি গিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এ পরামর্শ অনুপমা স্বামীভবন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার যথার্থ মরিবার বাসনা হইয়াছে। অনেক রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে সে নিঃশব্দে খিড়কির দ্বার খুলিয়া বাগানের পুষ্করিণীর সোপানে আসিয়া বসিল। আজ তাহাকে মরিতে হইবে, মুখের মরা নয়, কাজের মরা মরিতে হইবে। অনুপমার মনে পড়িল, আর এক দিন সে এইখানে মরিতে গিয়াছিল, সে-ও অধিক দিন নয়, কিন্তু তখন মরিতে পারে নাই; কেননা এক জন ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আজ সে

BanglaBook.org

কোথায়? জেলখানায় কয়েদ খাটিতেছে। কোন অপরাধে? শুধু বলিতে আসিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালোবাসে। কে জেলে দিল? চন্দ্রবাবু। কেন? তাহাকে দেখিতে পারিত না বলিয়া, সে মাতাল বলিয়া, সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু অনুপমা কি বাঁচাইতে পারিত না? পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই, বরং জেলে দিতে সহায়তাই করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, ললিত কি যথার্থই ভালোবাসিত? হয়তো বাসিত, হয়তো বাসিত না। না বাসুক, কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার কি ইষ্ট-সিদ্ধি হইয়াছে? জেলে পাথর ভাঙিতেছে, ঘানি টানিতেছে, আরও কত কী নিচ কর্ম করিতে হইতেছে; ইহাতে হয়তো চন্দ্রবাবুর লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি? সে দণ্ডিত না হইলে কি তাহাকে পাইতে পারিত? যিনি এখন মনের আনন্দে নিজের উন্নতির জন্য জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছেন? অনুপমা সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, তাহার পর জলে নামিল। এক হাঁটু, এক বুক, গলা করিয়া ক্রমশ ডুবন-জলে আসিয়া পড়িল। আধ মিনিট কাল জলতলে থাকিয়া অনেক জল খাইয়া সে আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল; আবার ডুব দিল, আবার ভাসিয়া উঠিল। সে সাঁতার দিতে জানিত, তাই সমস্ত পুষ্করিণীটা তন্ন তন্ন করিয়াও কোথাও ডুবন-জল মিলিল না। অনেক বার ডুব দিল, অনেক জলও খাইল, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না। সে দেখিল, মরিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও ডুব দিয়া, নিশ্বাস আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইলেই নিশ্বাস লইতে উপরে ভাসিয়া উঠিতে হয়। এইরূপে পুষ্করিণীটা সাঁতার কাটিয়া প্রায় নিশাশেষে যখন সে তাহার ক্লান্ত অবসন্ন নির্জীব দেহখানা কোনও রূপে টানিয়া আনিয়া সোপানের উপর ফেলিল, দেখিল, যে-কোনও অবস্থায় যে-কোনও কারণেই হোক এমন করিয়া একটু একটু করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে।

পূর্বে সে বিরহ-ব্যথায় জর্জরিততনু হইয়া দিনে শতবার করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত, প্রাণটা রাখা না-রাখা নায়ক-নায়িকার একেবারে মুঠার ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধস্তাধস্তি করিযাও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ সে বিলক্ষণ বুঝিল তাহাকে জন্মের মতো বিদায় দেওয়া তাহার একাদশবর্ষীয় বিরহব্যথায় কুলাইয়া উঠে না।

ভোরবেলায় যখন সে বাটী আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপিতেছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনু, এত ভোরেই নেয়ে এলি মা? অনু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

এ-দিকে দত্তমহাশয় একরূপ চিরস্থায়ীরূপে শ্বশুর-ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম জামাই-আদর তাহার কতকটা মিলিত, কিন্তু ক্রমশ তাহাও কম পড়িয়া আসিল। বাড়িসুদ্ধ কেহই প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পারে না; চন্দ্রনাথবাবু প্রতি কথায় তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপদস্থ, লাঞ্ছিত করেন। তাহার একটু কারণও হইয়াছিল; একে তো চন্দ্রবাবুর হিংসাপরবশ অন্তঃকরণ, তাহাতে আবার অকর্মণ্য জামাতা বলিয়া জগবন্ধুবাবু কিছু বিষয়-আশয় দিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। অনুপমা কখনও আসে না; শাশুড়িঠাকুরানীও কখনও সে বিষয়ে তত্ত্ব লন না; তথাপি রামদুলালের মনের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যত্ন-আত্মীয়তার তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার উপর দু'বেলা পরিতোষজনক আহার ঘটিতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় দত্তমহাশয় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার সুখ ভোগ করিবার অধিক দিনও আর বাকি ছিল না। একে জীর্ণ-শীর্ণ শরীর, তাহার উপর পুরাতন সখা কাসরোগ অনেক দিন হইতে তাঁহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসরই শীতকালে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিত; এবারও শীতকালে বিষম টানাটানি করিতে লাগিল। জগবন্ধুবাবু দেখিলেন, যক্ষ্মা রামদুলালের অস্থিমজ্জায় প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সুচিকিৎসা হইবে না জানিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কিছু দিন সুচিকিৎসার পর সতী-সাধ্বী অনুপমার কল্যাণে দু'টি বৎসর ঘুরিতে না-ঘুরিতে সদানন্দ রামদুলার সংসার-ত্যাগ করিলেন।

BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বৈধব্য

তথাপি অনুপমা একটু কাঁদিল। স্বামী মরিলে বাঙালির মেয়েকে কাঁদিতে হয়, তাই কাঁদিল। তাহার পর স্ব-ইচ্ছায় সাদা পরিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, অনু, তোর এ বেশ তো আমি চোখে দেখতে পারি না, অন্তত হাতে একজোড়া বালাও রাখ।

তা হয় না, বিধবার অলঙ্কার পরতে নেই।

কিন্তু তুই কচি মেয়ে।

তাহা হোক, বাঙালির মেয়ে বিধবা হইলে কচি বুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়।

জননী আর কী বলিবেন? শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমার বৈধব্যে লোকে নূতন করিয়া শোক করিল না। দুই-এক বৎসরেই সে যে বিধবা হইবে তাহা সকলেই জানিত। কেহ বলিল, মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে কি আর সধবা থাকে? কর্তাও এ কথা জানিতেন, গৃহিণীও বুঝিতেন, তাই শোকটা নূতন করিয়া হইল না। যাহা হইবার তাহা বিবাহরাত্রেই হইয়া গিয়াছে — স্বামীকে ভালোবাসিত না, জানিল না, শুনিল না, তথাপি অনুপমা কঠোর বৈধব্য-ব্রত পালন করিতে লাগিল। রাত্রে জলস্পর্শ করে না, দিনে একমুষ্টি স্বহস্তে সিদ্ধ করিয়া লয়, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে। আজ পূর্ণিমা, কাল অমাবস্যা, পরশু শিবরাত্রি, এমনি করিয়া মাসের পনেরো দিন সে কিছু খায় না। কেহ কোনও কথা বলিলে বলে, আমার ইহকাল গিয়াছে, এখন পরকালের কাজ করিতে দাও। এত সহিবে কেন? উপবাসে অনিয়মে অনুপমা শুকাইয়া অর্ধেক হইয়া গেল। দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার সে মরিয়া যাইবে। কর্তাও ভাবিলেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই এক দিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, অনুর আবার বিয়ে দিই।

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি হয়? ধর্ম যাবে যে!

অনেক ভেবে দেখলুম, দু'বার বিবাহ দিলেই ধর্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে এ বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করে খুন করলেই ধর্মহানির সম্ভাবনা।

তবে দাও।

অনুপমা কিন্তু এ-কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, তা হয় না।

কর্তা তখন নিজে অনুকে ডাকিয়া বলিলেন, খুব হয় মা।

তা হলে আমার ইহকাল পরকাল দুই কালই গেল।

কিছুই যায় নাই, যাবে না, বরং না হলেই যাবার সম্ভাবনা। মনে করো, তুমি যদি গুণবান পতিলাভ করো, তা হলে দুই কালেরই কাজ করতে পারবে।

একা কি হয় না?

না মা, হয় না। অন্তত বাঙালির ঘরের মেয়ের দ্বারা হয় না। ধর্মকর্মের কথা ছেড়ে দিয়ে সামান্য কোনও একটা কর্ম করতে হলেই অন্যের সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়; স্বামী ভিন্ন তেমন সাহায্য আর কে করতে পারে বলো? আরও, কী দোষে তোমার এত শাস্তি?

অনুপমা আনত মুখে বলিল, আমার পূর্বজন্মের ফল।

গোঁড়া হিন্দু জগবন্ধুবাবুর কর্ণে এ-কথাটা খট্ করিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তাই যদি হয়, তবুও তোমার এক জন অভিভাবকের প্রয়োজন; আমাদের অবর্তমানে কে তোমাকে দেখবে?

দাদা দেখবেন।

ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি না দেখে? সে তোমার মা'র পেটের ভাই নয়; বিশেষ, আমি যত দূর জানি, তার মনও ভালো নয়।

BanglaBook.org

অনুপমা মনে মনে বলিল, তখন বিষ খাব।

আরও একটা কথা আছে অনু, পিতা হলেও সে-কথা আমার বলা উচিত — মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক এক রকমই থাকবে, তা কেউ বলতে পারে না; বিশেষ যৌবনকালে প্রবৃত্তিগুলি সর্বদা বশ রাখতে মুনি-ঋষিরাও সমর্থ হন না।

কিছু কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুপমা কহিল, জাত যাবে যে।

না মা, জাত যাবে না। এখন আমার সময় হয়ে আসছে, চোখও ফুটছে।

অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল, তখন জাত গেল, আর এখন যাবে না! যখন চক্ষুকর্ণ বন্ধ করে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ-কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারও চক্ষু ফুটেছে, আমিও ভালোরূপ প্রতিশোধ দেব।

কোনও রূপে তাহাকে টলাইতে না পারিয়া জগবন্ধুবাবু বলিলেন, তবে মা, তাই ভালো; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে চাই না। তোমার খাবার-পরবার ক্লেশ না হয়, তা আমি করে যাব। তারপর ধর্মে মন রেখে যাতে সুখী হতে পারো, কোরো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
চন্দ্রবাবুর সংসার

তিন বৎসর পরে খালাস হইয়াও ললিতমোহন বাড়ি ফিরিল না। কেহ বলিল, লজ্জায় আসিতেছে না। কেহ বলিল, সে গ্রামে কি আর মুখ দেখাতে পারে? ললিতেমোহন নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে সহসা এক দিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী আনন্দে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, বাবা, এবার বিবাহ করে সংসারী হও, যা কপালে ছিল তা তো ঘটে গিয়েছে, এখন সে-জন্য আর মনে দুঃখ কোরো না। ললিতও যাহা হয় একটা করিবে স্থির করিল।

পাঁচ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া ললিত গ্রামে অনেক পরিবর্তন দেখিল, বিশেষ দেখিল জগবন্ধুবাবুর বাটীতে। কর্তা-গিন্নী কেহ জীবিত নাই। চন্দ্রনাথবাবু এখন সংসারের কর্তা, অনুপমা বিধবা হইয়া এইখানেই আছে, কারণ তাহার অন্যত্র স্থান নাই। পূর্বেই জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, পরে পিতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাবিয়াছিল, পিতা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কোনও তীর্থস্থানে থাকিবে এবং সেই টাকায় পুণ্যধর্ম, নিয়মব্রত করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইবে দিবে। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি হইলে উইল দেখিয়া সে মর্মাহত হইল, পিতা কেবল তাহার নামে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহারা বড়লোক, এ সামান্য টাকা তাহাদিগের নিকট টাকাই নহে; বাস্তবিক এই অর্থে কাহারও চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহিত হইতে পারে না। গ্রামে অনেকেই কানাঘুষা করিল, এ উইল জগবন্ধুবাবুর নহে, ভিতরে কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে-কথায় ফল কী! নিরুপায় হইয়া অনুপমা চন্দ্রবাবুর বাটীতেই রহিল।

লোকে বলে, পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সৎমাকে চিনিতে পারা যায় না; সৎভাইকেও সেইরূপ পিতার জীবিতকাল পর্যন্ত চিনিতে পারা কঠিন। এত দিন পরে অনুপমা জানিতে পারিল, তাহার দাদা চন্দ্রনাথবাবু কী চরিত্রের মানুষ! যত প্রকার অধমশ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রনাথবাবু তাহাদের সর্বনিকৃষ্ট। হৃদয়ে এক তিল দয়ামায়া নাই, চক্ষে এক বিন্দু চামড়া পর্যন্ত নাই। অনুপমার এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতি কথায়, এমনকী উঠিতে বসিতে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিতেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনুপমাকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু আজকাল তো অধিক না দেখিতে পারিবার কারণ তিনিই ভালো জানেন। বড়বধূ পূর্বে তাহাকে ভালোবাসিতেন, কিন্তু এখন তিনিও দেখিতে পারেন না। যখন অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল, যখন তাহার বাপ-মা বাঁচিয়া ছিল, যখন তাহার একটা কথায় পাঁচ জন

ছুটিয়া আসিত, তখন তিনিও ভালোবাসিতেন। এখন সে দুঃখিনী, আপানার বলিতে কেহ নাই, টাকাকড়ি নাই, পরের অন্ন না খাইলে দিন কাটে না, তাহাকে কে এখন ভালোবাসিবে? কে এখন যত্ন করিবে? বড়বধুর তিন-চারিটি ছেলেমেয়ের ভার অনুর উপর; তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, স্নান করাইতে হয়, পরাইতে হয়, কাছে করিয়া শুইতে হয়, তথাপি কোনও বিষয়ে একটু ত্রুটি হইলেই অমনি বড় বধূঠাকুরানী রাগ করিয়া রীতিমতো পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেন। ইহা ভিন্ন অনুপমাকে নিত্য দু'বেলা চন্দ্রবাবুর জন্য দুই-চারিটা ভালো তরকারি বাঁধিতে হয়; পাচক ব্রাহ্মণ তেমন প্রস্তুত করিতে পারে না। আর না হইলে চন্দ্রবাবুরও কিছু খাওয়া হয় না। একাদশীই হোক, আর দ্বাদশীই হোক, আর উপবাসই হোক, সে-রান্না তাহাকে রাঁধিতেই হইবে। বিধবা হইয়া অনুপমা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিত; এখন তাহাকে সে-সময়টুকুও দেওয়া হয় না। একটু বিলম্ব হইলেই বড়বধূঠাকুরানী বলিয়া উঠেন, ঠাকুরঝি, একটু হাত চালিয়ে নাও, ছেলেরা কাঁদছে, এখনও পর্যন্ত কিছু খেতে পায়নি। অনুপমা যা-তা করিয়া উঠিয়া আসে, একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। একাদশীর দীর্ঘ উপবাস করিয়াও তাহাকে রাত্রে রন্ধন করিতে যাইতে হয়; তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে মাথা টিপ টিপ করিতে থাকে, গা ঝিম ঝিম করে, তবু কথা কহে না। অবস্থার পরিবর্তনে সহ্য করিবার ক্ষমতাও হয়। কেননা জগদীশ্বর তাহা শিখাইয়া দেন, না হইলে অনুপমা এত দিন মরিয়া যাইত।

এ সংসারে তাহার অপেক্ষা দাসদাসীরা শ্রেষ্ঠ; জোর করিয়া তাহাদের দুটো কথা বলিলে তাহারাও দুটো জোরের কথা বলিতে পারে, অন্তত আমার মাহিনাপত্র চুকাইয়া দিন, বাড়ি যাই — এ-কথাও বলিতে পারে কিন্তু অনু তাহাও বলিতে পারে না। সে বিনামূল্যে ক্রীতদাসী, মারো, কাটো, তাহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর কোথাও যাইবার জো নাই, সে বিধবা, সে বড়লোকের কন্যা। অনুপমার অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না, বুঝিতে হয়; বাঙালির ঘরে পরান্নপ্রত্যাশিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে না বুঝিতেই পারে।

আজ দ্বাদশী। সকাল সকাল স্নান করিয়া অনুপমা পূজা করিতে বসিল। তখনও পনেরো মিনিট হয় নাই; বড়বধূ ঘরের বাহির হইতেই একটু বড় গলায় বলিলেন, ঠাকুরঝি, তোমার কি আজ সমস্ত দিনে হবে না? এমন করে চলবে না বাপু। অনুপমা শিবের মাথায় জল দিতেছিল, কথা কহিল না; বড়বধূ দশ মিনিট পরে পুনর্বার ঘুরিয়া আসিয়া সেইখান হইতেই চিৎকার করিলেন, অত পুণ্যি ছালায় আঁটবে না গো, অত পুণ্যি কোরো না। আর অত পুণ্যি-ধর্মের শখ থাকে তো বনে-জঙ্গলে গিয়ে করো গে, সংসারে থেকে অত বাড়াবাড়ি সইতে পারা যায় না।

তথাপি অনুপমা কথা কহিল না।

বড় বউ দ্বিগুণ চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলি, কেউ খাবে দাবে না — না?

অনুপমা হস্তস্থিত বিল্বপত্র নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আমার অসুখ হয়েছে, আজ আমি কিছুই পারব না।

পারবে না? তবে সবাই উপোস করুক?

কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই? ঠাকুরের কী হল?

তার জ্বর হয়েচে, আর উনি ঠাকুরের রান্না খেতে পারেন?

না পারেন, তুমি রেঁধে দাও গে।

আমি রাঁধব? মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, একটা কবিরাজ চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছে, আর আমি আগুনের তাতে যাব?

অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, তবে সবাইকে উপোস করতে বলো গে।

তাই যাই, তোমার দাদাকে এ-কথা জানাই গে। আর তোমার অসুখ হবে কেন? এই নেয়ে ধুয়ে এলে, এখনি গিলবে কুটবে, আর বড়ভাইকে একটু রেঁধে খাওয়াতে পারো না?

BanglaBook.org

না, পারিনে। বড় বউ, আমি তোমাদের কেনা বাঁদী নই যে, যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি এ-সব কথা দাদাকে জানাব।

বড় বউ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, তাই জানাও গে, তোমার দাদা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক!

অনুপমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, তা জানি, দাদা ভালো হলে আর তোমার এত সাহস!

কেন, তিনি করেছেন কী? খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন, আবার কী করবেন! সত্যি সত্যি তো আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমার মাথায় করে রাখতে পারেন না। এ-জন্য আর মিছে রাগ করলে চলবে কেন?

সমস্ত বস্তুরই সীমা আছে। অনুপমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে।

সে এত দিন যাহা বলে নাই, আজ তাহা বলিয়া ফেলিল; বলিল, দাদা আমাকে খাওয়াবেন পরাবেন কী, যে-বাপের টাকায় তিনি খান, আমি সেই বাপের টাকায় খাই।

বড় বউ ক্রুদ্ধ হইল, তাই যদি হত, তাহলে বাপ আর পথের কাঙাল করে রেখে যেত না।

পথের কাঙাল তিনি করে যাননি, তোমরাই করেছ। গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসম্বল রেখে যাননি। সে-টাকা দাদা চুরি না করলে আজ আমাকে তোমার মুখনাড়া খেতে হত না।

বড়বধূর মুখ প্রথমে শুকাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল, গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে উনি চোর? তবে এ-কথা ওঁকে জানাব?

জানিও। আরও বোলো যে, পাপের ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সে-দিন এমনই গেল। অবশ্য এ-কথা চন্দ্রবাবু শুনিতে পাইলেন; কিন্তু কোনও রূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

চন্দ্রবাবুর সংসারে ভোলা বলিয়া এক জন ছোঁড়া মতো ভৃত্য ছিল। পাঁচ-ছয় দিন পরে চন্দ্রবাবু এক দিন তাহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। চিৎকার-শব্দে অন্যান্য দাসদাসীরা ছুটিয়া আসিল, তখনও অসম্ভব মার চলিতেছে। অনুপমা ঘরের ভিতর পূজা করিতেছিল, পূজা ফেলিয়া সে-ও ছুটিয়া আসিল। ভোলার নাক-মুখ দিয়া তখনও রক্ত ছুটিতেছিল। অনুপমা চিৎকার করিয়া উঠিল, দাদা করো কী, মরে গেল যে!

চন্দ্রবাবু খিঁচাইয়া উঠিলেন, আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেলব। তোকেও সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতাম, কিন্তু শুধু মেয়েমানুষ বলে তুই বেঁচে গেলি। আমার সংসারে এত পাপ আমি বরদাস্ত করব না। বাবা তোকে পাঁচশো টাকা দিয়ে গেছেন, তাই নিয়ে তুই আজই আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

অনুপমা কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু বলিল, সে কী!

কিছুই নয়। আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূর হয়ে যাও। বাইরে গিয়ে যা খুশি করো গে।

অনুপমা সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া গেল। দাসদাসীরা সকলেই এ-কথা শুনিল। কেউ মুখে কাপড় দিয়া হাসিল, কেহ হাসি চাপিয়া ভালো মানুষের মতো সরিয়া গেল, কেহ-বা ছুটিয়া অনুপমাকে তুলিতে আসিল। চন্দ্রবাবু মৃতপ্রায় ভোলার মুখে আর একটা পদাঘাত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
শেষ দিন

আজ অনুপমার শেষ দিন। এ সংসারে সে আর থাকিবে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে সুখ পায় নাই। ছেলেবেলায় ভালোবাসিয়াছিল বলিয়া নিজের শান্তি নিজে ঘুচাইয়াছিল; অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল

BanglaBook.org

বলিয়া বিধাতা তাহাকে এক তিলও সুখ দেন নাই। যাহাকে ভালোবাসিত মনে করিত, তাহাকে পাইল না; যে ভালোবাসিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। পিতা নাই, মাতা নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন সতীত্বের সুযশ, তাহাও ঈশ্বর কাড়িয়া লইতে বসিয়াছেন। তাই আর সে সংসারে থাকিবে না। বড় অভিমানে তাহার হৃদয় ফাটিয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ নিদ্রিত কৌমুদী-রজনীতে খিড়কির দ্বার খুলিয়া, আবার — বার বার তিনবার পুষ্করিণীর সেই পুরাতন সোপানে আসিয়া উপবেশন করিল। এবার অনুপমা চালাক হইয়াছে। আরবার সন্তরণ-শিক্ষাটা তাহাকে মরিতে দেয় নাই, এবার তাহা বিফল করিবার জন্য কাঁকে কলসী লইয়া আসিয়াছে। এবার পুষ্করিণীর কোথায় ডুবন-জল আছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে, এবার নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে।

মরিবার পূর্বে পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখায়। ঘরবাড়ি, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, তারা, জল, ফুল, লতা, বৃক্ষ — সব সুন্দর হইয়া উঠে; যে-দিকে চাও সেই দিকেই মনোরম বোধ হয়। সব যেন অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে থাকে, মরিও না, দেখো আমরা কত সুখে আছি, তুমিও সহ্য করিয়া থাকো, এক দিন সুখী হইবে। না হয় আমাদের কাছে এসো, আমরা তোমাকে সুখী করিব; অনর্থক বিধাতৃদত্ত আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না। মরিতে আসিয়াও মানুষ তাই অনেক সময় ফিরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া দেখে, জগতে তাহার এক তিলও সুখ নাই, অসীম সংসারে দাঁড়াইবার এক বিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে এক জনও নাই, তখন আবার মরিতে চাহে, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ভিতর হইতে বলিতে থাকে, ছি ছি! ফিরিয়া যাও, এমন কাজ করিও না। মরিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হইল? কেমন করিয়া জানিলে ইহা অপেক্ষা আরও গভীর দুঃখে পতিত হইবে না? মানুষ অমনি সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়ায়। অনুপমার কি এ-সব কথা মনে হইতেছিল না? কিন্তু অনুপমা তবুও মরিবে, কিছুতেই আর বাঁচিবে না।

পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনের কথা মনে হইল। যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত। যাহারা তাকে ভালোবাসিত, তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে। শুধু এক জন এখনও জীবিত আছে। সে ভালোবাসিয়াছিল, ভালোবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে-পূজা গ্রহণ করে নাই এবং অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। শুধু কি তাই? জেলে পর্যন্ত দিয়াছিল। ললিত সেখানে কত ক্লেশ পাইয়াছিল, হয়তো অনুপমাকে কত অভিসম্পাত করিয়াছিল, তাহার মনে হইল, নিশ্চিত সেই পাপেই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা। সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভালো হইয়াছে, মদ ছাড়িয়াছে, দেশের উপকার করিয়া আবার যশ কিনিতেছে। সে কি আজও তাহাকে মনে করে? হয়তো করে না, হয়তো-বা করে — কিন্তু তাহাতে কী? তাহার যে-কলঙ্ক রটিয়াছে তিনি কি তাহা শুনিয়াছেন? যখন গ্রামময় রটিবে যে, আমি কলঙ্কিনী হইয়া ডুবিয়াছি, কাল যখন আমার দেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, ছি ছি! কত ঘৃণায় তার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে।

অনুপমা অঞ্চল দিয়া গলদেশে কলসী বাঁধিল। এমন সময়ে কে এক জন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, অনুপমা!

অনুপমা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, এক জন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক আবার ডাকিল। অনুপমার মনে হইল, এ স্বর আর কোথাও শুনিয়াছে, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

অনুপমা আত্মহত্যা কোরো না।

অনুপমা কোনও কালেই ব্রীড়ানত লজ্জাবতী লতা নহে; সে সাহস করিয়া বলিল, আমি আত্মহত্যা করব, আপনি কী করে জানলেন?

BanglaBook.org

তবে গলায় কলসী বেঁধেচ কেন ?

অনুপমা মৌন হইয়া রহিল। আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আত্মঘাতী হলে কী হয় জানো ?

কী ?

অনন্ত নরক।

অনুপমা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কলসী খুলিয়া রাখিয়া বলিল, এ সংসারে স্থান নাই।

ভুলে গিয়েচ ! অমি মনে করে দিচ্ছি। প্রায় ছ'বছর পূর্বে ঠিক এইস্থানে এক জন তোমাকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে চেয়েছিল — স্মরণ হয় ?

অনুপমা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া বলিল, হয়।

এ সঙ্কল্প ত্যাগ করো।

আমার কলঙ্ক রটেছে, আমার বাঁচা হয় না।

মরলেই কি কলঙ্ক যায় ?

যাক না যাক, আমি তা শুনতে যাব না।

ভুল বুঝেছ অনুপমা ! মরলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মতো তোমার নামের পাশে ঘুরে বেড়াবে। বেঁচে দেখো, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হবে না।

কিন্তু কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকব ?

আমার সঙ্গে চলো !

অনুপমার একবার মনে হইল তাহাই করিবে। চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে, আমাকে ক্ষমা করো। বলিবে, তোমার অনেক অর্থ, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও, আমি গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি। পরে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, আমি যাব না।

কথা শেষ হইতে না-হইতে অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অনুপমা জ্ঞান হইলে দেখিল সুসজ্জিত হর্ম্যে পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে, পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতরস্বরে বলিল, কেন আমাকে বাঁচালে ?

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
ভালোবাসা একটি আর্ট

মেয়ে একই শহরের, যদিও একই পাড়ার নয়। তেমনি আবার শরীরটিও ছোট, পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ দূরত্ব নেই। কাজেই দেখাশোনা, মেলামেশা হয়েছিল বেশ খানিকটা শৈশবে, কৈশোরে। অবশ্য দু'টি পরিবারের মধ্যে পূর্বে থেকেই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই, পাড়া ডিঙিয়ে দু'বাড়ির মধ্যে যাতায়াত ছিল বলেই।

তারপর যেমন হয়, আবহমান কাল থেকে যেমন হয়ে আসছে — তোমার সুবাকে আমাকে দিতে হবে দিদি, আমার বিজুর জন্য বলছি। ও মেয়ে আর আমি অন্যত্র যেতে দিচ্ছিনে !

সে তো ওর ভাগ্যি ভাই। অত ভাগ্যির কথা ভাবতে পারা যায় না বলেই, নৈলে দু'টিতে ওই রকম যখন খেলা করে জামরুলতলাটিতে, দৃষ্টি গিয়ে পড়ে, আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না তো চোখ। তবে বলব যে, বলবার ভরসা পাব তবে তো...।

BanglaBook.org

এইভাবেই এক দিন শুরু হয়ে, এইভাবেই চলে কথা। এ-দিকে এঁদের গল্পের আসর, আরও পাঁচ জনকে নিয়ে, ও-দিকে ওদের খেলাঘর, পাড়ার আরও পাঁচটি জোটে — কর্তা-গিন্নী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেলাঘর, কিংবা পাঠশালা, কিংবা চণ্ডীমণ্ডপের দুর্গাপূজার মিটিং; যে-দিন যেমন মনের হাওয়া বয়। গল্পের আসরেও নানা রকম শাখাপ্রশাখা বেরোয় গল্পের, তবে যতই না কেন বেরুক, শেষ সেই দু-তিনটি কথায়, কী সুন্দর! কী চমৎকার মানায় দু'টিতে।

সবারই যে অন্তরের কথা এমন বলা যায় না; তবে বসু-গিন্নীর মনটি বড় ভালো, পান-জর্দাও বড় মিষ্টি, সবাই এ-দু'টির খাতির রাখবার চেষ্টা করে একটু। আর দুটো মুখের কথা বের করে দিতে লাগেই-বা কার কী?

খুব যে আহামরি মানানসই এমন নয়ও তো। তাই কথাগুলো আরও লাগে ভালোই। আগে সুবার কথাই ধরা যাক। ওর পুরো নাম সুবর্ণা। সুবর্ণা যে সুন্দরী, এ-কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি।

প্রথমে রঙের কথাই ধরা যাক। ওর বাপ-মা পর্যন্ত না মেনে পারেন না যে ওখানে ওঁদের নামের আন্দাজে ভুল হয়ে গেছে। তারপর নাক, মুখ, চোখ। কোনও বিশেষত্ব নেই, নাকটি বরং মাঝখানে একটু চাপাই। হয়তো কিছু থাকলেও এক-একটা মুখে যেমন একটু মিষ্টতা লেগে থাকে, সেটুকু আছে; হয়তো তেমন চোখে দেখলে সেটা আরও একটু স্পষ্টও হয়ে ওঠে, কিন্তু সে তো এমন কিছু নয়।

অপর পক্ষে দ্বিজেন রীতিমতো সুন্দর, যৌবনে এসে সে এখন সুপুরুষ।

বঙ্কিম যে বলেছেন, ছেলেবেলার ভালোবাসায় একটা অভিশাপ আছে, সেটা খুবই সত্য, বরং আরও ব্যাপকভাবে সত্য, শুধু প্রতাপা-শৈবলিনীর অর্থেই নয়।

যে-সময় চোখে নূতন রং লাগে, খাঁদা-কালোর প্রভেদ বুঝতে দেয় না, শৈশব-কিশোরের সেই মাহেন্দ্রলগ্নে দ্বিজেনও ভালোবেসেছিল সুবর্ণাকে। দু-বাড়ির আলোচনায় খানিকটা করে রসনা দিয়েও তো যাচ্ছিল। বেশ ভালো লাগত ওকে দেখতে, ওর কথা ভাবতে। তারপর স্কুল যুগের খানিকটা পর্যন্ত এগিয়ে অভিশাপটা আস্তে আস্তে এসে পড়তে লাগল।

এরপর দ্বিজেন যখন ভালো করে বুঝল সে এক জন তেইশ বৎসরের সুন্দর যুবক, কলকাতায় কোন এক কলেজের ওপরতলার ছাত্র, তখন তার ভালোবাসার অভিশাপ সম্পূর্ণ।

ছেলেবেলার ভালোবাসারই কথা বলছি। এমনি বয়সের যে-ভালোবাসা তা একের জায়গায় পাঁচ দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কলকাতা জায়গা বলেই, মফস্বলের এক ছোট শহরে এত ব্যাপক বিস্তৃত ভালোবাসার সুযোগ বা অবসরই-বা কোথায়? ও ভালোবাসে ওর কলেজের ছাত্রী সরমা হালদারকে। দু'জনে একই ইয়ারে পড়ে, যদিও একই শ্রেণীতে নয়। দ্বিজেন হল গণিতের ছাত্র, সরমা ইতিহাসের। কিন্তু ইতিহাস গণিতের দূরত্ব অন্য দিক দিয়ে যতই দূরতিক্রম্য হোক, ভালোবাসার পক্ষে তো কিছুই নয়, খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে ওর সঙ্গে।

সরমার বাবা ভারত সরকারের দপ্তরে কাজ করেন। বড় কাজ, তবে বদলি হয়ে বেড়াতে হয়। পুণাতে ছিলেন, বছর খানেক হল কলকাতায় বদলি হয়ে পার্ক-সার্কাসের দিকে সাহেব পাড়ায় বাড়ি নিয়ে রয়েছেন। নিজের গাড়ি আছে, সরমা তাতেই কলেজে যাওয়া-আসা করে।

কোনও কোনও দিন সরমাদের গাড়ি করেই দ্বিজেন যায় ওদের বাড়ি, নয়তো ট্রামে-বাসেই! পরিবারটি দিল্লি-বোম্বাই-লক্ষ্ণৌ-পুণা ঘুরে একটু সাহেবী ভাবাপন্ন। এ-দিকে মাঝারি গোছের পরিবার, সরমার বাবা, মা, দুই ভাই, তিনটি বোন, বড় ভাজ, তাঁর দু'টি ছেলে-মেয়ে। সরমার দাদা লক্ষ্ণৌ হাসপতালের ডাক্তার, কিছু দিন হল বিলাত থেকে বড় খেতাব নিয়ে আসতে গেছে।

BanglaBook.org

স্মার্ট ছেলে, কলেজেও ভালো, চেহারাটাও রয়েছে, দ্বিজেন বেশ ভালো করেই মিশে গেছে পরিবারটির সঙ্গে।

এমন অবস্থায় এ-সব পরিবার যেমন হয়ে থাকে, সরমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধের সূত্রটুকু স্বীকৃত হয়ে গেছে। দ্বিজেনের বাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। মফস্বল শহরের পরিবার বলে যে-ক্রটিটুকু রয়েছে, ছেলেকে একবার বিদেশে ঘুরিয়ে আনলে সেটুকু যাবে চলে। এটাও ওঁদের ভবিষ্যৎ প্ল্যানের মধ্যে এসেও গেছে।

সবই ঠিক, বেশ এগিয়েও চলেছে দ্বিজেন, তবু মাঝে মাঝে পা যাচ্ছে রুখে।

এটা শুরু হয়েছে যে-দিন সরমার দাদা বিলাত যাওয়ার আগে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় নিয়ে এল, তারপর থেকেই। ভাজ সরোজিনীর সঙ্গে এল তার ছোট বোন মৃণাল। দ্বিজেনের মনে হল সে এত দিন থেকে যা খুঁজছিল যেন এইবার পেল। প্রকৃত ভালোবাসার, প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবেসে ফেলার, না বেসে উপায় না থাকার যা লক্ষণ আর কী।

অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। সরমার চেয়ে বয়সেও কম। তারপর সরমার রূপের যেমন একটা তীব্রতা আছে, মৃণালের তা একেবারেই নেই। নরম, একটু লাজুক, এক নজরেই ভালোবেসে ফেলার ঝোঁকে যে-পদ্যটা লিখে ফেলল দ্বিজেন (সরমাকে নিয়েও লিখেছিল), তাতে মৃণালকে গলা পর্যন্ত সমস্ত পদ্মের ডাঁটা মৃণাল এবং তার ওপরের বাকিটুকু ফুটন্ত শতদল বলে কমপ্লিমেন্ট দিল। অবশ্য কবিতাটি হাতে দিল না, নিজের মনের ভাবটা গুপ্তই রাখল, কিন্তু কয়েক দিন ধরে অবস্থা নিতান্ত সঙ্গীন হয়ে গেল।

তবে মৃণাল এসেছিল ওর জীবনে যেন ক্ষণ-বসন্ত রূপে। গোণা ঠিক সতেরোটি দিন ছিল বোনের বাড়িতে। যে-দিন চলে গেল, বিকালের গাড়িতে যায়, সে-হিসাবে পুরো সতেরোও নয়, তারই মধ্যে বর্ণে-গন্ধে-সঙ্গীতে ওর মনে একটা বিলম্ব বাধিয়ে পরদিন কতকের জন্য মনটাকে একেবারে বর্ণ-গন্ধ-সঙ্গীতহীন মরুভূমি করে দিয়ে চলে গেল।

আবার মনটা এসে সরমার আগেকার মতো বসাতে কিছু দেরি হল। তবে একবার যখন বসল, একটানা ভাবেই চলল। কৃষ্টিসম্পন্ন অভিজাত পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের যাওয়া আসা আছে, নূতন নূতন রূপের ঢেউয়ের ধাক্কা লাগছে, সরমার ওপর ভালোবাসাটা টলেও যাচ্ছে একটু-আধটু করে, তবে স্থায়ী কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না। এই করে বছরখানেক কেটে গেল।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সরমা ইতিমধ্যে করছে কী? উত্তরটা এক কথাতেই দেওয়া যায়। ভালোবেসেই যাচ্ছে সরমা তার নিজের পদ্ধতিতে। কথাটা হচ্ছে, ভালোবাসার আবার প্রকারভেদ আছে। এক ভালোবাসা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট, সরমার তাই। দ্বিজেন এ-দিকে ক্রমাগত নিত্য নূতনের মধ্যে দিয়েই ভালোবাসাটাকে রীতিমতো একটা আর্টের পর্যায়ে তুলে ধরেছে। যে-ভালোবাসা আর্টের স্তরে উঠে গেছে তার একটা শক্তি হচ্ছে, সে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ আর আত্মগোপন দুটোতেই সমর্থ। দ্বিজেন এ-শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠায় এই যে এতগুলি মুখ এল গেল ওর মনে, এর বার্তা গোপনই রইল সরমার কাছে। সে দেখল ভালোবাসার প্রদীপটি নির্বাত-নিষ্কম্পই রয়েছে দ্বিজেনের বুকে; নিশ্চিন্তই রইল! আর্ট হল জয়ী।

এই সময় ওর জীবনে একটা দিক্ পরিবর্তনের অবসর এল। ওরা দু'জনেই পাশ করে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল এবং সরমার পিতা ওদের বিবাহের প্রস্তাবটা তুললেন, তার সঙ্গে দ্বিজেনকে বিদেশে পাঠাবারও। দ্বিজেন প্রায় রাজিও ছিল। আর্টের পেছনে পড়ে থাকার একটা ক্লান্তিও তো আছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত, কিন্তু এই সময় লিসা এসে উপস্থিত হল।

BanglaBook.org

লিসার সঙ্গে পরিচয় হল সরমাদের বাড়িতেই। বাঙালির মেয়েই, ওর নাম শীলা। সেইটেই উলটে লিসা হয়ে গেছে। শোনা যায় নাকি একটা কারণও আছে, ওর ঠোঁটের হাসি নাকি মোনালিসার হাসি। সরমাদের সঙ্গে লিসাদের পরিচয় এখানেই এবং এই ক'দিনের মাত্র। ওর পিতা বিরাট ডাক্তার, কলকাতার লোক, এই দিকেই ফিরিঙ্গী পাড়াতে একটা বাসাবাড়িতে থেকে প্র্যাকটিস করছিলেন, তারপর একটা বাড়ি কিনে সরমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন।

মোনালিসার রহস্য শুধু তার ঠোঁটের হাসিটুকুতেই। লিসা কিন্তু সর্বাংশেই রহস্যময়ী। বাহ্যত ও যাকে ইংরেজিতে বলা যায় গ্ল্যামোরস্, তাই। রূপে-ভঙ্গিতেও যেন চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে নিজেকে। কিন্তু তার পাশেই এমন আত্ম-সংহত, এমন নির্লিপ্ত যে মনে হয়, ও দেহ-মনের মাঝখানটিতে একটা খুব শক্তিশালী চুম্বক আছে এবং তা লিসার সত্তাটিকে নিজের চারিধারে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

চুম্বক যখন, আকৃষ্ট করেছে দ্বিজেনকেও, তবে মৃণালঘটিত ব্যাপারটুকু হয়ে যাওয়ার পর থেকে দ্বিজেনের ভালোবাসা অনেকটা হল। এ-ক্ষেত্রেও আবার যদি সরমাতেই ফিরে আসতে হয় তো সে-সব বিশ্রী হবে। একবার দিল ধূলা সরমার চোখে। বার বার না-ও পারতে পারে।

তবু দুর্বার লিসার আর্কষণ, বড় নিরুপায় করছে দ্বিজেন তার সামনে। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে, দু'দিকের ভালোবাসার সঙ্গে আপাতত একটা রফা করে মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে ফেলল দ্বিজেন। সরমার কাছে সময় চাইল। জানাল, রিসার্চের কাজটা নূতন পেয়েছে, এর মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটা এনে ফেললে একটু আঘাত হয়ে যেতে পারে; একনিষ্ঠ মনোযোগ তো দরকার প্রথমটা।

কিন্তু এই উভয়নিষ্ঠ ভালোবাসা নিয়ে একনিষ্ঠ গবেষণার অজুহাতটা টিকল না। অবশ্য সরমার কাছে নয়, সে বেচারি আর্ট-দক্ষ ভালোবাসিয়ে নয়, সুতরাং চোখ-কান বুজে শুধু ভালোবেসেই যাচ্ছে। তবে তার বাবার তো আর দ্বিজেনকে ভালোবেসে ফেলা নয়, দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছই আছে, সন্দিগ্ধই হয়ে পড়েছেন। হয়তো এ-কথাও ঠিক যে পুরুষ মানুষই তো, এক সময় নিজেও ভালোবাসাটাকে আর্ট হিসেবেই চর্চা করেছিলেন, চেনেন, তার স্বরূপ ধরে ফেলেছেন।

রাজি হলেন না সময় দিতে। তাড়াতাড়ি ভালোবাসা-নেই এমন একটি পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলেন।

সরমার বাড়ি বন্ধ হয়ে গেল দ্বিজেনের কাছে। সরমা গেল তো লিসাও গেল। হয়তো এক বাড়ির সংশয় অন্য বাড়িতেও সংক্রামিত হয়ে গিয়ে থাকবে।

সরমা যাক, লিসা যাক, মৃণাল যাক, কিন্তু আর্ট তো যেতে পারে না, যার সাধনায় লোক সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েও ক্ষান্ত হতে পারছে না, মনে করেছে পরজীবন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে তার সাধনা। দ্বিজেনও লেগে রইল। কিন্তু হিসাবে ভুল হয়ে গেল।

সব সাধানাই জীবনভোর চলে, জীবনের ও-দিকে যদি থাকেই কিছু তো সেখানেও টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এ-সাধানায় যে তা চলে না, সে-কথাটা বুঝল না দ্বিজেন। সরমা-মৃণাল-লিসারা বুঝতে দেয়নি। ও-পর্ব শেষ হলে দ্বিজেন এক দিন হঠাৎ উপলব্ধি করল, প্রায় চারটে বছর টেনে নিয়েছে ওরা, সে এখন সাতাশ-আটাশ বছরের — যদি যুবকই বলতে হয়তো, যৌবনের প্রান্ত সীমায়।

এবার কাহিনিধারাকে সংক্ষিপ্ত করা যায়, যদিও সময়ের দীর্ঘতায় প্রায় দশ বৎসরের কাহিনি।

তবে এক রকম বৈচিত্র্যহীনই। ওই বছর চার ধরে যা হল তারই পুনরাবৃত্তি বলতে পারা যায়। এবার যা সাধনা সেটাকে যদি অভ্যাস-যোগও বলা যায় তো নিতান্ত ভুল হয় না।

রিসার্চ শেষ করে ভালো অফিসে ঢুকেছে দ্বিজেন এবং ধাপে ধাপে করে সে এখন একটা ডিপার্টমেন্টের হর্তাকর্তা। তার অধীনে এখন এক জন মেয়ে টাইপিস্টও রয়েছে — রীতা সেন।

BanglaBook.org

এই দশটা বৎসরের প্রতিটি দিন ভালোবাসার একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, শুধু মনস্থির করে উঠতে পারেনি দ্বিজেন। সেই সরমাদের পরে মৃণালরা আছে, মৃণালদের পরে লিসারা। যখন মনে হয় এর ভালোবাসায় আকণ্ঠ ডুবে আছি, দেখা যায় একেবারে তলিয়ে যাওয়ার মতোই পাত্রী আছে।

কত দূর চলত বলা যায় না, এক দিন হঠাৎ দেখল উলটো দিক থেকেও ঠিক এই ব্যাপারটা চলতে পারে। ওর শেষ পরীক্ষা চলছিল রীতা সেনকে নিয়ে। এক দিন সে এল না। এল তার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চিঠি। শুনল রীতা অন্য ডিপার্টমেন্টের যুবক টাইপিস্ট হিল্লোল গুপ্তর সঙ্গে বিবাহ করতে যাচ্ছে।

চেম্বারটা বন্ধ করে দিয়ে দ্বিজেন আপিসের গোল আয়নাটার সামনে দাঁড়াল, লক্ষ্য করল, সাধনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে যা চোখে পড়েনি এত দিন — রগের কাছে চুলগুলোয় অল্প অল্প পাক ধরেছে, কপালে গালে অল্প অল্প বলিরেখা। সাধনার অবসাদ আছে তো, এ-দিকেও তো বয়স প্রায় চল্লিশ।

সুবর্ণার কাছে ফিরে গেল দ্বিজেন।

দুটো পাশ দিয়ে সুবর্ণা এখন ওদের ছোট মফস্বলে শহরেই মাস্টারি করছে। গরিবের মেয়ে, বিবাহ হয়নি। কিংবা করেইনি বিবাহ।

দ্বিজেন যে ভালোবাসা নিয়েই এসেছে একথা শপথ করে বলা যায় না। কোথায় সরমা-মৃণাল-লিসা-রীতা, কোথায় সুবর্ণা! ভালোবাসা নয়, নিতান্ত প্রয়োজন একটা! তবু দক্ষ আর্টিস্টই তো, বলল, তোমার জন্য এই প্রতীক্ষা করে বসে আছি এত দিন সুবা। সুবর্ণাও ওই কথাটাই বলতে পারত, কিন্তু সে তো আর্টচর্চা করবার অবসর পায়নি জীবনে, অল্প একটু হেসে মুখটা ঘুরিয়ে শুধু একটু নিচু করে নিল॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বেদেনী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বছর আসে। তার বসিবার স্থানটা মা-কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি ; কিন্তু শম্ভু বলে, ভোজবাজি — ছারকাছ। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই ঝাপড়ে আঁকা একটা বাঘের ছবি, অন্য পাশে একটা মানুষ, তাহার হাতে এক রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে গোলক-বামের খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু লেন্স লাগাইয়া দেয়। পল্লীবাসীদের বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখে আংরেজ লোকের যুদ্ধ, দিল্লীকা বাদশা, কাবুলকে পাহাড়, তাজবিবিকা কবর। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষ একটি পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দি একটি চিতাবাঘ! বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে। বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটি ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘটাকে চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটি পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়; দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া

আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাক পিটিতে থাকে — দুম দুম দুম! জয় ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল বাজায় — ঝন ঝন ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বাঘ! ওই বড় বা-ঘ!

বেদেনী প্রশ্ন করে, বড় বাঘ কী করে?

পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল কম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার কাছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকতক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটি বাজির তাঁবু আসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটি ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির ওপর একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে।

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণার হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রূর নিষ্ঠুরতা পরিব্যঞ্জক এক ধরনের উগ্র তামাটে রঙ আছে। শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে, আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নিচেই একটা খাঁজ, সাপের মতো ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর জন্তুর সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন, বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসার ক্রোধে ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল; সে বলিল, দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কে বটে, মালিক কে বটে?

কী চাই? তাঁবুর ভিতরের আর একটি পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হালকা দেহ, তেজী ঘোড়ার যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে, লোকটির হালকা সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রঙ কালোই, নাকটি লম্বা টিকালো, চোখ সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মতো একজোড়া গোঁফ সূচাগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় কারে ঝুলানো একটি সোনার ছোট চাকা তক্তি — সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দু'জনেই দু'জনকে দেখিতেছিল।

কী চাই? নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নিচের বায়ুস্তর ভুর ভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাঁহার বাঁ-হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

BanglaBook.org

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ-হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ টুকচা —।

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, বলিল, ক'টি বোতল আছে তুমার নাগর — মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল। কালো সর্পিনীর মতো ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতোর মতো সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধনিমিলিত ভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুইটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে — সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলে গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনি চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকাই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাগতিক রূপবৈশিষ্ট্য! এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের মধ্যে একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মতো ধারের ইঙ্গিত, চারিদিকে হিংস্র তীক্ষ্ণউগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাবে।

রাধিকার খিল খিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময় বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল, বাক হর‍্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল, বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে অভাব। এসো।

কথা সত্য, এই জাতিটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, জেলেও যায়; কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এই অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা —। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে বলিল, তুই আইলি কেনে এখানে?

রাধিকা এবারও খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার। আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও এক রাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস আর একটায় কতকগুলা মুড়ি পেঁয়াজ লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিবস্ত্রবসনা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া ঊর্ধ্ববাহুর ভঙ্গিতে মাটিতে লুণ্ঠিত, মুখেও তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মতো লাগিয়া রহিয়াছে শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটির।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুমার বেদেনী। ই যে কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যে গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়া রাধিকা বলিল, কী নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে ?

BanglaBook.org

নাম বটে, কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কী বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, কই, কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল। কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কাল কেউটের বাচ্চা! আহত সর্পশিশু হিস্ হিস্ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চিৎকার করিয়া উঠিল, আ-কামা অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ-হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাক হইতে ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল; এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই-ই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও ক্ষিপ্রগতিতে সাপটিকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে সে মুহূর্তপূর্বের ওই সাপটার মতোই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে।

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বলল্যা গো দমন করতে। বলিয়া সে এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনার ছোট তাঁবুটার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্র ভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আর একটু দূরে একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কেষ্টা। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্ম ইসলাম। আচারে পুরো হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু-পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেদের বলে পটুয়া, চিত্রকরের জাত। বিবাহ আদান-প্রদান সমগ্র ভাবে ইসলাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামি পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকার বাজিকরেরা সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়, কিন্তু এই নূতন তাঁবুর মতো সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিয়াছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া সে বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম, মুখে হাসির মতো ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটার স্থবির শিথিল দেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। কতবার সে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কী যে মমতা বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তুর ওই বুড়ো বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধ শম্ভু বলিল, তু জানিস সব।

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, জানি না আমি! তুই জানছিস সব!

BanglaBook.org

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্তে চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল, ওরে মড়া, বুড়োর নাচন দেখতে কার কবে ভালো লাগে রে! আমারে বলে তু জানছিস সব।

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণ ভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মতো ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মতো গর্জন করিয়া উঠিল, কী বললি বেইমান?

শম্ভু আর কোনও কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মতো ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এত বড় কথাটা বলিয়া গেল? সে সব ভুলিয়া গিয়াছে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া। রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই তো বুড়ো ছাড়া আর কী? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে-চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর, ছাগল এ-সবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ — ধামা বুনিত, চেয়ার-পালিশের কাজ করিত, ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ার করিত, তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস, রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশি। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশি বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদের আর একটা মস্ত বড় গুণ ছিল। তাহাদের সামাজিক মজলিশে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল। এই জন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার। আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মতো। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কালো রঙে জমির উপর সাদা সূতার ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালোবাসিত। শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকিবার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু, আর বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যে-দিন শম্ভুকে দেখিল, সে-দিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ দেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভু তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত; সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল, এ-ই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন?

রাধিকার কী যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, শখ দেখি যে খুব। পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না; তু সাপ দেখাইলে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কী অদ্ভুত কথা বলে — বাঘ দেখাইবে। সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্য বুলছ?

BanglaBook.org

বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। সবিস্ময়ে সে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, হ, বাঘ নিয়া তুমি কী করো?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হাঁ?

হাঁ দেখবি তু, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইবার সাপ দেখা আমাকে।

রাধিকা সে-কথার উত্তর দেয় নাই। বলিয়াছিল, উটা তুমার পোষ মেনেছে?

হি-হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি-হি, বাঘিনী পোষ মানাতেই আমি ওস্তাদ আছি।

কী যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদের বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা -বাপ গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা তাহা গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার জন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে-অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। দুখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ও-দিকে নতুন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে। দোসরা দফার খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথ রাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ-পোশাক, চোখ রাঙা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে, ইথে দোষটা কী হল? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হচ্ছে? খেলা দেখাবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কী হল?

শম্ভু চিৎকার করিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার। অপমান করতে আসছিস তু।

কিষ্টো কী বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মতো লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে-ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার ইট কুড়াইয়া লইল। শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ও-দিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাত, ফেলে দে খুল্যে!

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাত খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে।

BanglaBook.org

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরৎ দেখাইতেছিল। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার করো তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আম্‌মাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, পুলিশে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব।

ও-দিকে টিয়াপাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ — একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা!

রাধিকা আপনাদের খেলায় দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশে ও ফুলিতেছিল। তাঁবুটা আগুন ধরিয়া ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই; সে বোধহয় দুই-চার জন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে এক জন দারোগা বসিয়া আছেন, এ কী? সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাকো সব, আমরা তাঁবু দেখব!

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল, কী কসুর করলাম হুজুর?

মদ আছে কি না দেখব আমরা। ডাকো বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাকো।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন; কিন্তু সে আর তাঁহার ভুল ভাঙাইল না। সে বলিল, ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে হুজুর।

আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পারো তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটা আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটে বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিস আইছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে কম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তনদানরত মাতার মতো শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন, এ তাঁবু তোমার?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল, জী হুজুর।

তাঁবু দেখব আমরা, মদ আছে কি না দেখব।

মেলার ভীড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মতো মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়া ছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মম ভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিশকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখ।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল। রাধিকার সে-দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাবা, ছেলে খাবা?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মম ভাবে প্রহার করিয়া বলিল, সব মাটি করে দিছিস তু; উয়াকে আমি জেলে দিবার লাগি পুলিশে বলে আলাম, আর তু করলি এ কাণ্ড।

BanglaBook.org

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা। সত্যিই, এ-কথা তো সে বলিয়াছিল! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণ হইতে এই তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোশাকটি বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙের মতো সরু প্যান্টালুন, আর একটা কালো রঙেরই খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে বেণী বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞার ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মতো গাল মোটা স্থবিরার মতো স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মতো টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সার্টিনের একটা জাঙিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস। কুৎসিত মেয়েটাকে যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মতো একটা রেষ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আর এই কত কালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক। ছি!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও-ই ব-ড় বা-ঘ।

রাধিকা রুদ্ধ স্বর কোনও মতে গলা সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কী করে?

শম্ভু খুব উৎসাহভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্র আর্তনাদের মতো গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে। রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল, ফিন একবার।

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয় বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবল গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মতো কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কীসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কী উটা?

কেরাচিন। আগুন লাগায়ে দিব উহাদের তাঁবুতে। পুরা পেলাম নাই, দু'সের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল, দাউ দাউ করে জলবেক যখন।

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

BanglaBook.org

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখন লয়, সেই সেই — নিযুত রাতে। তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে। বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই।

বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থম থম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এ-দিক হইতে ও-দিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ও-দিকটা সমস্ত পুড়িয়া তবে এ-দিকে মেলাটার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে! ক্রূর হিংস্র সর্পিনীর মতোই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া সন সন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাতিয়া মাথাটা গলাই দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মতো পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকার তর কাঠিটা জ্বলিতেই লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কী সাহস। উঃ বুকখানা কী চওড়া, হাতের পেশীগুলো কী নিটোল। তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে। ওই যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা, ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্ত বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি?

তাহার মুখ চাপিয়া রাধিকা বলিল, হ্যাঁ, চুপ।

কিষ্টো চুমোয় চুমোয় তাহার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়াও মদ আনি।

না। চলো, উঠি, এখুনই ইখান থেক্যে পালাই চলো।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল, কুথা?

হু-ই, দেশান্তরে।

দেশান্তরে? ই তাঁবু-টাবু — ?

থাক্ পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকা লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

সে নিম্নস্বরে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদেনী, তাহার উপর দুরন্ত যৌবন — কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চলো।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।

BanglaBook.org

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চলো।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা॥

বনফুল
ছুঁড়িটা

হাওড়া স্টেশনের সামনে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে ছুঁড়িটা। এক মাথা রুক্ষ চুল। চোখের কোণে পিঁচুটি। পরনের শাড়িটা ছেঁড়া, ময়লা। গায়ে জামা নেই। যৌবনও শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তার জন্যই তার পিছু নেয় এখনও অনেক লোক। হ্যাংলার মতো ঘোরে ছোঁড়াগুলো। দু'একটা বুড়োও। যারা ধনী, যারা মোটরে চড়ে যাওয়া-আসা করে তারা ওর দিকে ফিরে চায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ভিক্ষে দেয়। তার খদ্দের গরিব কুলীরা, পকেট-খালি ছোঁড়ারা, দু'একটা ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরানী। কুলীদের কৃপায় সে গুড্‌স শেডের এক ধারে শুয়ে থাকে রাত্তিরে, আর ভোর থেকে উঠে সে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এলেই ছুটে যায় প্ল্যাটফর্মের গেটের পাশে। গেট দিয়ে পিল্ পিল্ করে কত লোক বেরোয় তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। স্টেশনের টিকিট কালেক্টারবাবুরা চেনেন তাকে। তাঁরাই তার নামকরণ করেছেন ছুঁড়িটা। ছুঁড়িটাকে অনুগ্রহ করেন তাঁরা। কেউ কেউ হাসি-মস্করাও করেন। তার ছেলে-মেয়ে নেই। নিরোধের যুগে ছেলে-মেয়ে হয় না। সে তার ভাঙা যৌবনকে জোড়াতালি লাগিয়ে ফেরি করে বেড়ায় খালি। কোনও শিশুর স্পর্শ পাবার যোগ্যতা নেই তার। অর্থনীতির কড়া আইনে সে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। তার স্নেহ কিন্তু আঁকড়ে ধরেছে সোনাকে। সোনা একটা লোম-ওঠা খোঁড়া কুকুরের বাচ্চা। মোটরের ধাক্কায় তার একটা পা জখম হয়েছিল। ছুঁড়িটা আশ্রয় দিয়েছিল তাকে। গুড্‌স শেডের এক ধারে যেখানে সে শোয় সেখানে সোনাও থাকে। রামলগিন্ কুলী একটা ছেঁড়া কাঁথা দিয়েছে তাকে। মসুদন দিয়েছে একটা বালিশ। খলা দিয়েছে ছেঁড়া চাদর একটা। শিবলাল দিয়েছিল ছোট একটা হাত-আয়না আর শস্তা একটা চিরুনি। এ দুটো জিনিস সে ব্যবহার করে না বড় একটা। নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। চুল আঁচড়েই-বা কী করবে? এমনিতেই তো লোক জোটে। তার থালা-বাটি কিছু নেই। আছে একটা টিনের বড় কৌটো শুধু। সে রান্না করে না। যে-দিন যেমন পয়সা জোটে, দোকান থেকে কিনে খায়। সোনাকেও খাওয়ায়। সোনাই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন। আর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রত্যেক ট্রেনের প্যাসেঞ্জার দেখা। গেটের পাশে সে রোজ চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুড্‌স শেডের একটা পাশ দুপুরের সময় নির্জন হয়ে যায়। একটু ছায়াও পড়ে। সেই ছায়াতেই মাটির উপর শুয়ে থাকে ছুঁড়িটা। গুড্‌স শেডের ভিতর ভয়ঙ্কর গরম। শুয়ে অনেক সময় ঘুমোয়। মুখে-চোখের কোণে মাছি বসে বলে মুখটা ঢেকে শোয়। যখন ঘুমোয় না, তখন দিবাস্বপ্ন দেখে। তার সমস্ত অতীতটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তার মানসপটে।

মনে হয় তার নাম যে অপ্সরী ছিল এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে আজকাল? স্কুলে কিন্তু তার ওই নামই লেখা আছে এখনও। সে স্কুলে ভালো মেয়ে ছিল, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর

BanglaBook.org

হঠাৎ এক দিন হেডমিস্ট্রেস তার নামটা কেটে দিলেন। বললেন, তুমি বাড়ি যাও, এ স্কুলে তোমাকে পড়তে হবে না। সে বাড়ি চলে গেল, মাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল। মা উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কী হবে স্কুলে পড়ে? তোমার পড়ার খরচ আমি টানতে পারব না। আর পড়েই-বা হবে কী? শেষকালে গতর বেচেই তো খেতে হবে।

তার বাবার কথা মনে পড়ে তখন। তারা বাবা এক দিন দিল্লি চলে গেল। বলে গেল সেখানে নাকি ভালো একটা কাজ পেয়েছে। দিনকতক পরে ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাবা আর ফেরেনি। মাকে চিঠি লিখেছিল একটা। পঞ্চাশটা টাকাও পাঠিয়েছিল মনি অর্ডার করে। মা সে-টাকা ফেরত দিয়েছিল।

তার মা ঝি-গিরি করে বেড়াত। অনেকদিন রাত্রে ফিরত না। কোনও কোনও দিন মদ খেয়ে ফিরত মাতাল হয়ে। ক্রমে ক্রমে সে সব বুঝতে পারল। বুঝতে পারল মা বেশ্যাবৃত্তি করে। পাড়ার এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক দিন তাকে বললেন, তোর বাবা তোর মাকে বিয়ে করেনি, রাখনি রেখেছিল। দিল্লীতে তার বউ ছেলে সব আছে। সে এখন মস্ত লোক। তুই যদি আমার বাড়িতে কাজ করিস, তোকে মাসে একশো টাকা করে দেব। আমার বউ মরে গেছে। আমার ঘরে একেশ্বরী হয়ে থাক তুই। তোর কোনও অভাব রাখব না।

সে তখন প্রত্যাখান করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। পারা যায় না। এক দিকে অভাব আর এক দিকে প্রলোভন। না, নিজেকে সে ঠিক রাখতে পারেনি। তারপর সব কেমন যেন অবছা হয়ে যায়, মনে পড়ে একটি পশুত্বের হুল্লোড়ের মধ্যে দিনগুলো কেটে গেছে খালি। মাঝে মাঝে ভালো যে লাগেনি তা নয়, কিন্তু সব সময় ভালো লাগত না। ভালো না লাগলেও ভালো লাগার ভান করতে হত। তার কাছে এক জন কবি আসতেন, মদ খেয়ে বড় বড় কবিতা আওড়াতেন। কী জঘন্য পশু ছিল লোকটা! একটা কুটেও আসত তার কাছে। বড় লোক, কিন্তু কুটে অনেক টাকা দিত। মদ খেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদত। কত রকম লোকই যে আসত। এক দিন কিন্তু ও-পাড়া ছাড়তে হল, তার মাকে কে খুন করে গেল এক দিন। সে সে-দিন বাড়ি ছিল না, এক বাবুর বাগানবাড়িতে গিয়েছিল। সকালে ফিরে এসে দেখে তার মায়ের গলাটা কাটা। বুকের মাঝখানেও একটা ছুরি বসানো।

সেই দিনই সে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। পালিয়েও নিস্তার পায়নি। পুলিশের কবলে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। তার যা কিছু সম্বল ছিল ওই পুলিশের গর্ভেই গিয়েছে। কেউ তাকে বাঁচায়নি, সবাই তাকে লুট করবার চেষ্টা করেছে। সবাই মিলে তাকে চুষে, চিবিয়ে, ছিবড়ের মতো ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। এখন তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। যারা তাকায় তারাও ছিবড়ে। দেশ? আমাদের দেশ নাকি অনেক ভালো, কিন্তু কই সে তো কোনও প্রমাণ পায়নি। একটাও লোকও সে দেখতে পায়নি। সত্যি কি ভালো লোক নেই তাহলে? সবাই লোলুপ পশু?

গুড্‌স শেডিঙের পাশের জায়গাটায় দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে মুখে ময়লা কাপড় চাপা দিয়ে এই সব কথাই রোজ ভাবে ছুঁড়িটা। তার মনে কিন্তু একটা আশা এখনও আছে। তার মনে হয় তার বাবা এক দিন ফিরে আসবে। কেন এ-কথা মনে হয় তা সে জানে না, কিন্তু মনে হয় তার বাবা নিশ্চয় আসবে এক দিন। তাই সে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়ায়। ট্রেন এলেই গেটের সামনে দাঁড়ায়, প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জারকে নিরীক্ষণ করে দেখে। কিন্তু বাবার দেখা পায়নি আজও। বাবার ঠিকানাও জানে না, জানলে চিঠি লিখত। তবু সে আশা করে, বাবা এক দিন আসবেই। প্রতিটি ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের ভীড়ের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে বাবা ওদের মধ্যে আছে কি না। না, নেই। রোজই হতাশ হতে হয় তাকে।

যদিও দুপুরে শুয়েছিল সে মুখ ঢোকে, হঠাৎ একটা কাগজ উড়তে উড়তে এসে তার মুখের উপর পড়ল। ছাপা হ্যান্ডবিল একটা। কাগজটা পড়েই উঠে বসল সে তড়াক করে। কাগজে বড় বড়

BanglaBook.org

অক্ষরে তার বাবার নাম ছাপা। তিনি নাকি আগামী কাল এসে মহাজাতি সদনে একটা বক্তৃতা দেবেন। তার বাবা বক্তৃতা দেবেন? কীসের বক্তৃতা?

পরদিন সে সকালে উঠে দেখল স্টেশনে বেশ ভীড় হয়েছে। অনেকের হাতে মালা। টিকিট কালেক্টারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল হ্যান্ডবিলে যার নাম ছাপা তাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্য এসেছেন এঁরা। তার বাবাকে? কী আশ্চর্য!

ট্রেন এল। গেটের বাইরে সে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখল অনেক লোকের সঙ্গে তার বাবাই তো আসছেন। গলায় ফুলের মালা। মাথার চুল পেকে গেছে। কিন্তু গালের কালো জড়ুলটা তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, তার বাবাই তো। সে বাবা বলে চিৎকার করে উঠল।

সরো সরো সরো এখান থেকে!

এক দল লোক এসে তাকে সরিয়ে দিল। তবু সে ভীড়ের পিছু পিছু গেল। দেখল তার বাবা প্রকাণ্ড একটা মোটরে চড়ে চলে গেল। তার দিকে ফিরেও চাইল না।

তার পরদিন সে মহাজাতি সদনে গিয়েছিল। লোকে লোকারণ্য। দেখল তার বাবা গলায় মালা পরে বসে আছেন মঞ্চের উপর। এক জন এগিয়ে এসে বললেন, এঁর পরিচয় আপনারা সবাই জানেন। দেশের এ দুর্দিনে এঁর অমূল্য উপদেশ আমাদের পথ নির্দেশ করবে। বাবা বাবা বাবা, তারস্বরে চিৎকার করে সে মঞ্চের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু পারল না। পুলিশের লোক টেনে বার করে দিল তাকে। পুলিশের ব্যাটনের আঘাতে সে অজ্ঞানও হয়ে গেল।

পরদিন কাগজে তার বাবার বক্তৃতা ছাপা হল। তিনি বলেছেন, আমাদের সকলকে চরিত্রবান হতে হবে, চরিত্রই আমাদের মূলধন॥

জীবনানন্দ দাশ
মেয়েমানুষ

বৈশাখের দুপুর বেলা।

চপলা আধ ঘণ্টা না ঘুমোতেই জেগে গেল। জানলার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো দেখা যায়। ফুল ঝরছে।

পাশের রুমে কড়া চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। স্বামী অফিস থেকে ফিরে এসেছে তাহলে? চপলা উঠে দাঁড়ায়। চুরুট হাতে হেমেন্দ্র ঢুকল; চপলার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, মোটর ফিট করতে বলে দিয়েছি।

চপলা আড়মোড়া দিয়ে বলল, থাক, আজ আর যাব না।

বাঃ তুমিই তো বলেছিলে আজ শনিবার আছে।

বলেছিলাম তো, কিন্তু কোথায় যাব? সিনেমায়? কী আছে আজ? হেমেন বলল, দেখি কাগজটা নিয়ে আসি।

কাগজ নিয়ে হেমেন ঘরে ঢুকতেই চপলা বলল, থাক সিনেমা, ভালো লাগে না।

হেমেন ঈষৎ হতাশ হয়ে বলল, মনসুনের আগে রেস তো আর শুরু হবে না।

থাক, রেস-ফেসে আর দরকার নেই, অনেক টাকা খুইয়ে — দেখি কাগজটা।

BanglaBook.org

হেমেন কাগজটা স্ত্রীর দিকে ঠেলে দিয়ে অবসন্ন হয়ে একটা কুশনের ওপর বসে চুরুটটা হাতে করে হাঁপাতে লাগল। একটা কোলা ব্যাঙ যেন টাই বেঁধে ছিটের কোট ঝুলিয়ে বসেছে।

চপলার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, হেমেনের ঊনপঞ্চাশ। দু'জনেরই শরীর মোটা হয়ে চলেছে, মাথায় চুল পাতলা হয়ে আসছে।

হেমেনের প্যান্টের বেল্টতার ভুঁড়িটাকে যেন আর সামলাতে পারে না; হেমেনের মুখও যেন তার ভুঁড়ির মতোই; চপলার মুখও হেমেনের মতোই যেন — কল্পনা বা স্বপ্নের কোনো চিহ্ন যেন এদের মুখাবয়বের ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন ছিল না। হেমেনের নিজের অফিস। কয়েকখানা মাঝারি গোছের ট্রাক ইট সুরকি ও সিমেন্ট নিয়ে কলকাতার শহরে ছোটাছুটি করছে দশ বছর ধরে। আরো নানা রকম ব্রাঞ্চ বিজনেস আছে। সামান্য কনট্রাক্টর হয়ে চব্বিশ পরগণায় সে জীবন শুরু করেছিল। এখন তার মস্ত ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায়, দু'তিন লাখ টাকা খাটছে।

চপলা কাগজখানা দেখছিল।

ঢনঢনিয়া মাড়োয়াড়ি মস্তবড় এক ভোজ দিয়েছে; নিমন্ত্রিত লোকজনের ভিতর প্রায় শতখানেক নাম উঠেছে; চপলা অত্যন্ত গভীর অভিনিবিষ্ট হয়ে একটি একটি করে নাম দেখছিল, সমস্তটুকু দেখতে তার আধ ঘণ্টা লাগল। হেমেনের চুরুট ফুরিয়ে গেল; চপলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাগজটা রেখে দিল। না, এখন তারা এত বড়লোক হয়নি যে, ও-সব কলমে তাদের নাম উঠবে। কিন্তু ঢনঢননিয়ার বাড়ি ভোজে তার স্বামীও তো গিয়েছিল, চপলা নিজেও তো গিয়েছিল না, নিজেদের যতটা তারা মনে করে ততটা নয়, এখনো তারা ঢের পেছনে; একশোটা নামের লিস্টের ভিতর তাদের নাম কোথাও নেই, আজও নেই — এখন তাদের বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল।

চপলা ঈষৎ অস্থির হয়ে উঠল। চুপচাপ বসে থাকলে মানুষদের ওপর, পৃথিবীর ওপর, নিজেদের জীবনের অকৃতকার্যতার ওপর মনটা কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

চপলা নড়ে-চড়ে উঠে বসে বলল, চলো, নীলাদের বাড়ি যাই।

বেশ, টয়লেট করে এসো।

আধ ঘণ্টার ভেতর টয়লেট সেরে সাজসজ্জা করে চপলা এসে বলল, চা খেয়েছিলে? হেমেন মাথা নেড়ে বলল, না।

তাহলে ইয়াসিনকে বলি, একটু করে দিক।

থাক, আমি আর একটা চুরুট জ্বালাই তার চেয়ে, কোথায় যাবে?

চলো লীলাদের ওখানে যাই।

লীলা? দ্বিজেন ওকে নিয়ে চলে যাবে শুনেছিলাম।

কোথায়?

শিলঙে।

কেন?

কলকাতায় এই গরমে আমরাও তো দু-চার দিনের জন্য কোথাও গেলে পারতাম; সবাই তো যাচ্ছে।

একটু চেপে থাকো, কয়েকটা অর্ডার এসেছে। ভালো ছেলেটির মতো এখন একটু চেপে থাকো তো লক্ষ্মীটি। কিন্তু লীলাকে নিয়ে দ্বিজেন যাচ্ছে? সত্যি!

হেমেন একটু হাসল।

চপলা বলল, ওদের দু'জনে তো একদম বলেন না, জানো?

দ্বিজেনের জন্য দুঃখ করতে লাগল চপলা। হেমেনেরও দুঃখ, দ্বিজেনের জন্য।

BanglaBook.org

মোটরকারটা কেমন বিগড়ে গেছে; হেমেন হতাশ হয়ে কারটার দিকে একবার তাকাল, মোটরকারের কী হয়েছে যেন!

চপলা বলল, এই যা, তাহলে আর — চলো ওপরে চলে যাই।

হেমেন যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করে ঘাঁটিয়ে দেখল, মোটরকারটার দিকে হাঁ করে একবার তাকাল। পাঁচ মিনিটের মতো সে নটখাট করলে, কিন্তু গাড়ি এক চুলও নড়ল না।

ড্রাইভারের হাতে গাড়িটা ফেলে দিয়ে হেমেন বলল, চলো, বাসে যাই। বাসেই গেল তারা।

হেমেন বাসা করেছে বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউতে, দ্বিজেন এখনো সেই সাবেকি শ্যামবাজারে থাকে। অনেক বলে-কয়েও তাকে অ্যাভিনিউর দিকে টেনে আনা গেল না; সে কেবল বলে, আচ্ছা আসছি আসছি, কিন্তু আসে না, এই দশ বছরের ভিতরেও সে আসতে পারল না। টাকা দ্বিজেনের কম কী? কঞ্জুস সে একেবারেই না, লীলাও না; কিন্তু আসলে এদের বনে না, কেন যে পরস্পরের ভিতর এ-রকম বনে না স্বামী-স্ত্রীতে, হেমেন বুঝে উঠতে পারছিল না। কেন যে এরা পরস্পরকে আঘাত করে শুধু?

বাস ভরতি, চপলাকে দেখে কেউ উঠে দাঁড়াল না। পরের স্ট্যান্ডে এক জন উঠে গেল, হেমেন চপলাকে সেই দিকেই পাঠিয়ে দিল। দু-এক মিনিট পরে যখন তার বোধ হল যে, একটা কুলি না কী চপলার পাশে বসে আছে, তখন তাড়াতাড়ি স্ত্রীর হাত ধরে তাকে বাস থেকে নামিয়ে ছাড়ল হেমেন।

এরপর এরা ট্যাক্সি করল।

তেতলায় না পৌঁছতেই লীলার গলা, হয়তো চাকরবাকর ধমকাচ্ছে। খুব বেয়াড়া বেয়াদব চাকরই বটে, লীলার আওয়াজও তেমনি খনখনে। হেমেনের মনে হল এই হচ্ছে জাঁদরেল আওয়াজ, তার স্ত্রীর যা নেই। এ না হলে ঘরের চাকরবাকরগুলোই লাই পেয়ে যায়, বন্ধুর কামিন দাবড়ে রাখতে পারা যায় না। কিন্তু তার নিজের এ-রকম গলা নেই। পদে পদে কত ব্যবসার কাজ জলের মতো হাসিল হয়ে গেছে। এ-রকম ভাবতে ভাবতে হেমেন তৃপ্তির সঙ্গে দো-তলায় পাপোশে নিজের বুটজোড়া ভালো করে ঘষে নিল। চপলা হাই হিল ঘষল।

চপলাকে বলল, লীলার সঙ্গে খবরদার লেগো না কিন্তু। ফর্ম ঠিক রেখো কিন্তু, বুঝলে?

চুরুটটা জ্বালাবে কি না সে বুঝতে পারলে না; পকেট থেকে বের করবে অন্তত; কিন্তু তেতলায় উঠতে না-উঠতেই সেটা পকেটের ভিতর ফেলে দিল।

লীলার গলার আওয়াজ ডাইনিং রুমের দিক থেকে আসছে, হয়তো চাকরবাকর নিয়ে কী না-কী। হেমেনরা সে-দিকে গেল না। দ্বিজেনটা হয়তো ড্রয়িংরুমে আছে। চপলাকে নিয়ে ড্রইংরুমের ভিতর ঢুকল হেমেন। কিন্তু কই, কেউ তো এখানে নেই।

দ্বিজেন —।

কোনো শব্দ নেই।

ঘড়িতে পৌনে তিনটে।

বেডরুমেও কেই নেই। অগত্যা ডাইনিংরুমের দিকে গেল তারা; ঢুকে দেখল ডিনার টেবিলের ওপর লীলা বসে। এ কী দারণ রণচণ্ডী; হাতে তার দুখানা রুটিকাটা ছুরি নাচছে। দ্বিজেন এক পাশে একটা চেয়ারে বসে এক স্লাইস পাউরুটি হাতে করে চুপ করে রয়েছে।

দ্বিজেন —।

দ্বিজেনবাবু।

লীলা আগ বাড়িয়ে বলল, হয়েছে হয়েছে, ওকে আর আশকারা দিতে হবে না।

একটা রুটিকাটা ছুরি ডিসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লীলা; আর একখানা নিজের হাতের ভিতর রেখে বলল, এই আমাদের চা খাওয়া শেষ হল। চপলা বলল, ভালোই।

BanglaBook.org

হেমেন একটা চেয়ার টেনে এনে দ্বিজেনের গলায় হাত জড়িয়ে ফিস ফিস করছিল। লীলা বলল, ওকে আর আশকারা দিও না ঠাকুরপো।

চপলা বলল, আহা, বেচারা সারা দিন খেটেখুটে আসে!

আমি বলছিলাম, দ্বিজেনবাবু —।

দ্বিজেনবাবু বেচারা, আর আমি?

চপলা কোনো কথা বলল না।

বেচারা সারা দিন খেটেখুটে আসে। তারপর চপলা চুপ করে রইল।

লীলা বলল, সারা দিন খেটেখুটে আসে বলে তাকে নিয়ে কী করতে হবে?

চপলা বলল, তোমরা নাকি বেড়াতে যাচ্ছ?

ছুরিটা নিয়ে নখ কাটতে কাটতে লীলা বলল। কে বলেছে? কোথায়?

দ্বিজেনের গলার থেকে হাত তুলে নিয়ে অত্যন্ত দাক্ষিণ্যের সঙ্গে সে লীলার দিকে তাকাল।

দ্বিজেন বলল, এটা রুটিকাটা ছুরি নয়? ভুলে যাও কেন?

হেমেন দ্বিজেনের কাঁধ আস্তে চাপড়ে দিয়ে বলল, আহা থাক না।

থাকবে? কেমন থাকবে দেখাচ্ছি আমি! দ্বিজেনের কপাল লক্ষ্য করে লীলা হঠাৎ ছুরিটা মারল। ছুরিটা ফসকে দেওয়ালে গিয়ে লাগল।

কয়েক মিনিট সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

আরো একটা ছুরি ছিল টেবিলে, কিন্তু লীলা সেটা আর তুলল না। দ্বিজেন চশমাটা চোখ থেকে খসিয়ে নিয়ে মুছতে মুছতে বলল, ভোঁতা একটা রুটি কাটা ছুরি কপালে লাগলেও-বা কী হত?

লীলা বলল, কিন্তু চোখে লাগত যদি!

তাহলে কী হত?

কী হত, ডিম বেরিয়ে যেত আর কী হত।

হেমেন বলল, ছি!

চপলা বলল, তোমার স্বামীর ওরকম হলে তোমার ভালো লাগত না কী?

লীলা বলল, স্বামী আমার! বড্ড স্বামী!

হেমেন আশ্চর্য হয়ে বলল, বলে কী?

চপলা হেমেনকে চোখ ইশারা করে বলল, চুপ।

দ্বিজেন মাথা নিচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। লীলা খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বলল, সকলে মিলে ছোটছেলের মতো তুইয়ে-বুইয়ে নজর দিয়ে মাথা একেবারে খেয়ে ফেলেছে।

হেমেন বলল, কার মাথা? দ্বিজেনের?

আর কার!

কে খেয়েছে?

কে, তুমি আর তোমার স্ত্রী।

হেমেন রক্তাক্ত জমাট মুখে লীলার দিকে তাকাল। সে-ও হয়তো একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, চপলা সভয়ে হেমেনের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্বিজেন হেমেনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, চা খাবে নাকি?

চপলা বলল, দ্বিজেনবাবুর ভালো খাওয়া হয়নি বুঝি? আচ্ছা আমি তৈরি করছি।

লীলা আগুন হয়ে বলল, কেনস, তুমি তৈরি করে দিলে ভালো খাওয়া হবে আর আমি তৈরি করে দিলে হবে না?

BanglaBook.org

চপলা সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে স্টোভ জ্বালাতে গেল।

লীলা চপলার কব্জি চেপে ধরে বলল, জ্বালাও তো দেখি স্টোভ। জ্বালাবে! হ্যাঁ?

দারুণ মোচড় খেয়ে চপলা টপকাতে টপকাতে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল, সমস্ত শরীর তার রিমঝিম করে উঠেছে যেন।

দ্বিজেন ফ্যানটা খুলে দিয়ে চেয়ারসুদ্ধ চপলাকে তুলে নিয়ে ফ্যানের নিচে বসাল। তারপর আস্তে আস্তে চপলার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। লীলা বলল, জানিনে আবার! এই সবই তো করো তুমি। সাধে কি আমি চটি তোমার ওপর? যেই একটু নজর দিতে ভুলেছি —।

লীলা উঠে দাঁড়াল।

দ্বিজেন আস্তে আস্তে সরে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

লীলা বলল, তোমার লজ্জা করে না? চপলার সঙ্গে তোমার রক্তের কোনো সম্বন্ধ নেই, কী করে চেয়ারসুদ্ধ তুমি তাকে নিলে? তার গায়ে হাতই-বা দিলে কী করে।

হেমেন নড়েচড়ে উঠল; চপলা চোখ ইশারা করে তাকে থামতে বলল।

লীলা বলল, আর যদিও-বা কোনো আত্মীয়তা থাকত, সে তো তোমার স্ত্রী নয়, বোনও নয়, কী করে তার গায়ে হাত দিলে তুমি? আমার চোখের সানেই এত! চব্বিশ ঘণ্টা হাইকোর্টের নাম করে তুমি কি করো জানি না?

হেমেন বলল, কী করে?

লীলা বলল, এর ওপর আবার বিজিনেস ফেঁদেছে।

হেমেন বলল, কীসের বিজিনেস দ্বিজেনবাবুর?

কেন, জে বি অ্যান্ড কোং। তুমি জানো না?

এতক্ষণ পরে কথাবার্তা ব্যবসার দিকে মোড় নিয়েছে দেখে হেমেন যথেষ্ট শান্তি বোধ করল। চুরুটটা এতক্ষণ পরে বের করল; জ্বালিয়ে নিয়ে একটা টান দিয়ে অত্যন্ত আয়েসের সঙ্গে বলল, জে বি অ্যান্ড কোং কোম্পানি হচ্ছে —।

লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে চপলা বলল, থাক।

হেমেন বলল, বাঙালি ফার্ম; এর ভেতর এক জনও বিলেতি মানুষ নেই, না ইউরোপের, আমেরিকার, এমনকী মাড়োয়াড়ি অবধি নেই।

হেমেনের মনে হল সকলকে সে কোম্পানির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে স্তম্ভিত করেছে; কিন্তু কেউই স্তম্ভিত হয়নি; কেউ তার কথা শুনছিল না।

হেমেন বলে চলল, মাড়োয়াড়ি নেই, ভাটিয়া নেই, পশ্চিমা মুসলমান নেই — শুধু বাঙালি হিন্দু, ব্যাস!

হেমেন বলল, ওয়ারের সময় এই কোম্পানি স্টার্ট করা হয়; প্রথম হয় রেঙ্গুনে, তখন অনেক কিছুই বুজরুকি হয়েছিল বটে, কিন্তু এটা বুজরুকি নয়, একেবারে কৌশলে, তখন দ্বিজেনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

দু-মিনিট গভীর আনন্দের সঙ্গে চরুট টেনে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে হেমেন বলল, দ্বিজেন তো গুডউইল কিনেছে তিন বছর আগে। লীলার দিকে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকাল হেমেন। বললে, প্র্যাকটিস শিগ্‌গিরই ছেড়ে দেবে।

চপলা বলল, কেন?

হেমেন জ্বলন্ত চুরুটটার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বলল, এই বিজিনেসের কাছে প্র্যাকটিস আবার কী?

BanglaBook.org

লীলা বলল, বিজিনেস করে টাকা জমিয়ে হবে কী?

হেমেন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে লীলার দিকে তাকাল।

লীলা বলল, এই তো চোখের সানে দেখলাম চপলার সঙ্গে কী-রকম ব্যবহার করল। চপলা তার কেউ না। মাথায় হাত রেখে পিঠ বুলিয়ে ফিস ফিস করে কানে কানে কথা বলে কা নোংরামির পরিচয় দিল বলো তো ঠাকুরপো?

দেখেছি এগারো-বারো ঘণ্টা বাইরে থাকে।

হেমেনের মন গজ গজ করে উঠছিল, লীলার কথা ফুরোতে না-ফুরোতেই ফিক ফিক করে হেসে উঠল।

চপলা বলল, উনি তো আঠারো ঘণ্টা বাইরে থাকেন।

লীলা বলল, হ্যাঁ উনি — তোমার ওঁর টেকো মাথা বোঁদা চেহারা দেখে কোনো মেয়ে ওর সঙ্গে গাঁট বাঁধতে আসবে?

হেমেনের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে লীলা বলল, ঠাকুরপো, তোমার নাক যেন বুড়ো আঙুলের মতো উঁচিয়ে আছে। বাপ রে বাপ!

লীলা হো-হো করে হেসে গড়াতে লাগল। ট্যাবা ট্যাবা মুখ, নাক টেবু টেবু, চোখ দুটো প্যাঁট প্যাঁট করছে। কোনো মেয়ে এ-সব দেখে এগোয়?

হেমেন লাফিয়ে উঠে বলল, বটে! খুব দমফাই হচ্ছে বুঝি? আজও যদি চোখ মারি তো কুড়ি পঁচিশটা মেয়ে এমন ফ্যা-ফ্যা করে আমার পায়ের কাছে এসে গড়াবে।

লীলা হেসে কুটি কুটি হয়ে বলল, চোখ মারি! ঠাকুরপো মারবে আবার চোখ, তাহলেই হয়েছে!

চপলা বলল, ছি! চোখ মারা-টারা আবার কী? তুমি কক্ষনো যা করো না সেই সব নিয়ে আবার বড়াই করে বলো কেন?

লীলাকে বলল, না, কক্ষনো না। বুঝলে দিদি, এই কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ওঁর সঙ্গে আছি, এক দিনের জন্যও কোনো মেয়েমানুষের দিকে উনি ফিরেও তাকাননি। ওঁর ব্যবসার সমস্ত লোক জানে যে, ওঁর কী-রকম অকলঙ্ক চরিত্র, কলকাতা শহরের সমস্ত লোক জানে।

হেমেন অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ছিল, চপলার কোনো কথা তার কানেও গেল না।

লীলা তার পুরুষত্বকে কী কঠিন ভাবেই না আঘাত করেছে! আপাদমস্তক গা জ্বলে যাচ্ছিল তার। রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর দড়াম দড়াম করে ঘুষি মারতে মারতে হেমেন ক্রোধান্ধ হয়ে বলল, চুলোয় যাক চরিত্র! মেয়েরা আবার আমার ফোঁপর দালাল আছে না, আমার সমস্ত বাড়ির খবর আমি বের করে দিচ্ছি।

চপলা বলল, তুমি পাগল হলে নাকি?

হেমেন হুঙ্কার দিয়ে বলল, কলকাতার সমস্ত বড় ঘরের মেয়েকে আমি পথে দাঁড় করাতে পারি, জানো লীলা?

চপলা বলল, দ্বিজেনবাবু —।

দ্বিজেন বলল, তোমাদের মোটরে দিয়ে আসি।

হেমেন এক ঝটকায় দ্বিজেনকে ঠেলে দিয়ে বলল, ভেবেছ একেবারে চরিত্র হাতে ধরে বসে আছি। হেমেন খুব সচ্চরিত্র ছেলেস, মেয়েরা তাকে একটা বুদ্ধুরাম বলে ভাবে। কলকাতার শহরে তিনদিন পরে সাঁওতাল পরগনা বানিয়ে দিতে পারি। কাঁপতে কাঁপতে বলল, কলকাতা তো কলকাতা। লীলার মতো যত সব প্যাঁচাপেঁচি, চপলার তো যত সব প্যাঁচা-পেঁচি। সেবার যখন জয়পুরে গেলাম পাথরের বাড়ি দেখতে, ফিরছি এমন সময় —।

BanglaBook.org

কিন্তু রাজপুতবাঘিনী দেবলা দেবী চঞ্চলকুমারীদের সঙ্গে রোমান্সের কথা শেষ করল না আর হেমেন; শুরুই শুধু করে রাখল; কেউ কোনো জবাবও দিচ্ছে না দেখে, লীলাকেও যথেষ্ট প্যাঁদানি দেওয়া হয়েছে বলে মনটা তার নিরস্ত হয়ে আসছিল।

নতুন একটা চুরুট বার করে হেমেন শান্তি পাচ্ছে; চুরুটটা জ্বালিয়ে, টেনে মনটা তার ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। চপলার প্রতি, দ্বিজেনের প্রতি, এমনকী লীলার প্রতিও অনুকম্পায়, মমতায় তার সমস্ত প্রাণ ভরে উঠল। বলল, চল লিলি, বায়োস্কোপ দেখতে যাই।

কিন্তু ঘড়িতে তখন চারটে বেজে গেছে, প্রথম শোতে গিয়ে আর লাভ নেই। ছ'টার পারফরমেন্সের জন্য এদের সবাইকে সে তৈরি হতে বলল। তারপর নিজেই স্টোভ টেনে নিল। লীলা বলল, কেন?

গরম জল করব।

কেন?

বাঃ,দেখো না? তোমারা মেয়েরা তো আর করবে না, এখন পুরুষদেরই মশলা পিষতে হবে, রাঁধতে হবে, দেখো, কী-রকম খাসা চা করি।

কিন্তু লীলার কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা আশ্বাস পেলে না হেমেন।

চপলা বলল, এখন আর চা খাবে কে? কারু খাবার দরকার নেই।

হেমেন বলল, আলবাৎ খাবে।

চপলা বলল, কেউ খাবে না, তুমি স্টোভ নিবিয়ে ফেলো।

হেমেন একটু চোখ টিপে মুচকি হেসে বলল, দিদিমারা খাবে।

চপলা বলল, কারা?

স্বামীর দিকে সে তাকিয়ে দেখল, বাস্তবিকই হেমেনকে সুন্দর দেখাচ্ছে না মোটেই, টেবু টেবু নাক, ট্যাক ট্যাক মুখ, চোখ প্যাট প্যাট করছে।

হেমেন বলল, তুমি আর লীলা।

লীলা বলল, আমরা দিদিমা?

হেমেন বলল, জানলে দ্বিজেন, এরা আবার আমাদের চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করে, কে বলবে এরা আধবয়সী মেয়েমানুষ? একটু হ্যাঁচকা দেখলেই মনে হবে বাপ রে বাপ, ঠানদিদিঠাকমা এল আবার, মনে হয় না দ্বিজেন?

কিন্তু দ্বিজেন কিছু বলবার আগেই লীলা এক ঝটকায় স্টোভসুদ্ধ প্যান উলটে ফেলে দিল। জলটা হুস করে চারদিকে ছিটকে পড়ল। হেমেন পুড়তে পুড়তে বেঁচে গেল। স্টোভটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। দ্বিজেন আর প্যানট্রির থেকে ননকু এসে সমস্ত নিভিয়ে নিভিয়ে নিস্তব্ধ করে দিল।

সিনেমা আর যাওয়া হল না।

দিন তিনেক কেটে গিয়েছে।

টি বি আর্মস্ট্রং কোম্পানির পাশ দিয়ে হেমেনের মোটর আস্তে আস্তে চলছিল; একবার ভিতরে ঢুকে শ্রীমানকে দেখে যাবে নাকি ভাবছিল হেমেন। বড় রাস্তায় একটা গলির কাছে মোটর থামিয়ে আর্মস্ট্রং কোম্পানির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল হেমেন। ব্যবসায়ের যে-কোনো পত্তনের দিকে তাকাতে গিয়েই সে কোমল সবুজ হয়ে ওঠে। তার জীবনের সমস্ত কল্পনা ও কুহক পৃথিবীর সমস্ত সওদাগরের রাজ্যের ভিতরে শুধু।

হেমেনের মনে হল আর্মস্ট্রঙের ফ্ল্যাট এমন বড় না কিছু। স্টিফেন হাউসের কিংবা একশো নম্বর ক্লাইভ স্ট্রিটের একটা কামরার মতো শুধু যেন।

BanglaBook.org

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল হেমেন। তার নিজের অফিসটাই কতটুকু? কিন্তু চুনকাম করে নিয়েছে। সে হুইটলির আর্মস্ট্রঙের মতো একটা বাঙালি কোম্পানি এসে কাজ করে দিয়ে গেছে। কিন্তু আর্মস্ট্রং এখনো তেমনি বিবর্ণ, জায়গায় জায়গায় চুন-বালি খসে পড়ছে। মোটর থেকে নামল হেমেন।

হাঁটতে হাঁটতে মনে হল সমস্ত ব্যবসাই আজকাল বসে যেতে বসেছে। গত দেড় বছর ধরে সে ক্রমাগত ক্ষতি দিয়ে আসছে। আর কিছু কাল এ-রকম চললে সে ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। ব্যাঙ্কে এখনো যা টাকা আছে তার সুদ দিয়ে তাদের দু'জনার এখনো বেশ চলবে। কোনো ছেলেপিলে হয়নি তাদের। একটা অপরিসীম শান্তিতে চুরুটটাকে জ্বালাল।

দ্বিজেন উঠে পড়বে ভাবছিল।

হ্যালো খাস্তগির। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সে হেমেনের দিকে তাকাল।

আজ শুধু ব্যবসায়ের কথাই হল, তিন দিন আগের ঝক্কি ঝকমারির বেদনার নিরশার কেউ কোনো উল্লেখ করল না। ব্যবসায়ের দুর্গতিই দু'জনকে সব চেয়ে বেশি বিষণ্ণ করে দিয়েছে, ব্যর্থ করে ফেলেছে।

চার-পাঁচ দিন পরে হেমেনের অফিস থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল দ্বিজেন। সাহেবপাড়ার এক গ্রিল ফিলের দিকে মোটর ঘুরিয়ে চলল দু'জনে।

নাঃ, ঢুকেই পড়া যাক।

গিয়ে বসল। শুয়োর ভেড়া মুরগির মাংসের নানা রকম জিনিস, কফি, কিছু পুডিং ফল আইসক্রিম একে একে আসছিল। হেমেন বলল, ব্যাপারটা কী জানলে দ্বিজেন? ব্যাঙ্কে এখনো লাখ দেড়েক রয়েছে।

দ্বিজেন বলল, লাখ দেড়েক!

হেমেন বলল, এখনো ট্রাকগুলো দস্তুর মতো অর্ডার নিয়ে কলকাতা শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে।

হেমেন বলল, এই দেড় লাখ টাকার ইনটারেস্টে আমি আর চপলা দু'জন মানুষ তো শুধু এলাহি চালে থেকে যেতে পারি। বালিগঞ্জের বাড়ি তো রয়েইছে। একটু থেমে, করবও তাই। ব্যবসা — কী হবে ব্যবসা করে আর।

ভালো লাগে না কিছু, সত্যি।

দ্বিজেন জিজ্ঞেস করতে গেল না, কেন ভালো লাগে না। ব্যাঙ্কে দ্বিজেনেরও লাখ খানেক রয়েছে। বালিগঞ্জে না হোক শ্যামবাজারে তারও বাড়ি রয়েছে। বেশ ভালো বাড়িই। কিন্তু তবুও কেমন একটা বিমর্ষতা নিরর্থকতা পেয়ে বসেছে তাকে। অনেক দিন ধরে। হেমেনের এই সদ্যোজাত ভালো না লাগার চেয়ে সে ঢের আলাদা জিনিস।

হেমেন বলল, সত্যি কিছু ভালো লাগে না কেন বলো তো দ্বিজু?

কেন ভালো লাগে না বলো তো হেমেন?

কী যেন, মনটা কেমন টসকে গেছে।

কেন?

বাস্তবিক, টাকাই কি সব দ্বিজু?

দ্বিজেনের কাছ থেকে কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই হেমেন বলল, বাস্তবিক, লীলা যা বলেছিল ঠিকই, আমাকে একটা খটকা লাগিয়ে দিয়েছে।

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট করে খাচ্ছে

হেমেন বলল, এই ভুঁড়ি, টাক মাথা, ট্যাবা ট্যাবা মুখ, টেবু টেবু নাক, চোখ দুটো প্যাঁট প্যাঁট করছে — বাস্তবিক আমি কী হয়েছি বলো তো?

দ্বিজেন বলল, একটু হালকা হয়ে নাও না।

BanglaBook.org

হালকা হয়ে কী হবে, চেহারাই অত্যন্ত বদ নজরের। সে-দিন এক জন মেয়ের পিছনে লেগেছিলাম।

সে কী!

মেয়েদের ফেরে-ফেরে আমি না থাকি যে তা নয়। কিন্তু চপলা তা জানে না; কিন্তু এদ্দিন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়িদের এনে বায়স্কোপ দেখিয়ে ভাবতাম সব সাধ মিটল বুঝি। কিন্তু তাতে শুধু হয় না।

কেন, চপলাই তো রয়েছে।

কিছু না।

রোস্ট খেতে খেতে ছুরিটার দিকে একবার তাকাল।

হেমেন বলল, না, চপলা তো রয়েইছে; এমন চমৎকার গিন্নি, ও না থাকলে কি আর চলত? এ-সব মেয়ের নামে কোনো নালিশ চলতে পারে না। একটু থেমে, কিন্তু আমি চাই কী জানো?

দ্বিজেন মুখ তুলল, এটা ভালো ছুরি বেছে নিলে।

হেমেন বলল, মেয়েরা আমাকে দেখে ভুলে যায়, আমার কাছে এসে নিজেদের নিবেদন করে। এ-সব কোন পুরুষ না চায় দ্বিজেন?

এরপর দু-তিন মিনিট স্তব্ধ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে কাঁটা ছুরি চালিয়ে নিতে লাগল হেমেন।

হেমেন তারপর বলল, কিন্তু লীলা যা বলেছে, ঠিকই। সে-পুরুষ আমি নই যার পেছনে মেয়েরা পই পই করে ঘুরবে। কেন ঘুরবে। আমার পেছনে? আমি কী?

দ্বিজেন বলল, আমিই-বা কী?

নাও নাও, তোমার সুন্দর চেহারা আছে। আমি আমার গুডউইল দিয়ে দিতে রাজি, তোমার চেহারা যদি পাই।

হেমেন বলল, তুমি তো বরাবরই মেয়ে পটকে এসেছ, আমি জানি না নাকি। বিলেতে, ইন্ডিয়ান বড়লোকের ছেলে, নিজে রোজগার করেছ, তার উপর এই এমন চেহারাখানা। সে আমি জানি, তুমি ঢের মেয়ে পটকে এসেছ।

হেমেন কিছুতেই এই ব্যথা উতরে উঠতে পারছিল না, আর ওই বেদনা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

দ্বিজেন বলল, মেয়ে পটকানোই কি সব?

এসেছ তো পটকে, অনেক মেয়ে!

মেয়ে পটকে আর কী হয় হেমেন?

ও অনেক হয়, জীবনে অনেক ফুর্তি করেছ। এখন তুমি চোখ বুজে তৃপ্তিতে মরতে পারো, পারো নাকি?

হেমেন বলল, পারো না কি! কোনো জবাবের প্রতীক্ষা না করেই বলল, পারা উচিত তোমার; আমি হলে তো পরম শান্তিতে চোখ বুজতে পারতাম।

গভীর ক্ষোভে হেমেন কফির পেয়ালা ধরল। বলল, এই যে এখনো আধবুড়ো হয়ে গেছ, চার-পাঁচ জন ব্যারিস্টার গিন্নির সঙ্গে এখনো তোমার ইয়ার্কি চলে, আমি দেখেছি না নিজের চোখে?

দ্বিজেন বলল, ইয়ার্কি শুধু, আর কিছু না হেমেন?

কিন্তু ইয়ার্কিটাই ঢের মিষ্টি, আমি তো নিজেই চেয়ে চেয়ে কতবার দেখলাম। আমাদের সঙ্গে ও-রকম ইয়ার্কিই-বা কে করতে আসে।

কেন, চপলা?

ঠাট্টা কোরো না দ্বিজেন।

দ্বিজেন বলল, নিজের বধূর সঙ্গে হাসি-তামাসাই তো সব চেয়ে বেশি ভালো লাগে।

BanglaBook.org

হেমেন একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, অবিশ্যি সেখানে তুমি ঠকেছ।

দ্বিজেন কোনো এক জায়গায় খানিকটা ঠকে গেছে বলে কয়েক মুহূর্ত যেন তৃপ্তির সঙ্গে হেমেন চুরুট টেনে নিল। কিন্তু তার পরেই দ্বিজেনের সুন্দর মুখ, চমৎকার টাই ও সুন্দর সুন্দর ব্যারিস্টার বধূদের সঙ্গে এর ছেনালির কথা ভেবে হেমেনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। মনের ভিতর একটা আঘাত পুষে খানিকটা চুরুট টেনে গেল। তারপর বলল, তোমার ব্যবসা গেলেই-বা তোমার কী হয় দ্বিজেন? মানুষের জীবনের আসল জিনিসটাই তো তুমি পেয়েছ; মেয়েরা তোমাকে ভালোবাসে। নিজের সেন্টিমেন্টালিজম তুমি কত জায়গায় গিয়ে মেটাতে পারো।

দ্বিজেন সিগারেট কেস বের করল।

হেমেন বলল, তোমার বেশ মজা, লীলা তোমার মনটাকে দিয়েছে খিচড়ে। ও-দিকে তাই তোমার জমে ভালো। লীলা যদি ভলো গিন্নি হত তাহলে মেয়েদের সঙ্গে ছেনালি করে বেড়াবার তাগিদও থাকত না তোমার। সেটা তেমন ভালোও লাগত না হয়তো। লাগত? একটু পরে বলল, অবিশ্যি ছেনালিপনা সব সময়ই ভালো লাগে, বিশেষত যে-রকম বাগিয়ে নিয়েছ চারিদিকে; কিন্তু এখন যেমন লীলার ওপর বিমুখ বৈরাগ্য করে মোটরখানা নিয়ে বিরহীর মতো ঘুরে ঘুরে উচ্ছ্বাস করবার সুবিধে পাও লীলা অন্যরকম হলে কি পেতে?

ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষায় হেমেনের মন ভরে উঠল। দ্বিজেনের এক দিনের জীবনও যদি সে পেত! হলই-বা দ্বিজেনের স্ত্রী ফটফটে, পরের স্ত্রীদের এমন হাতে-পায়ে গুছিয়ে রাখতে ওর মতো কে পেরেছে?

হেমেন বলল, সেন্টিমেন্টালিজম শুধু? ওদের সঙ্গে তুমি কী করো না-করো — আজীবন তুমি পথেঘাটে কত বাড়ি ভেঙে এসেছ কেই কি তার খবর রাখে? একটু থেমে বলল, আমি যদি সমস্ত জীবনও ক্ষয় করি তবু একটি মেয়ের সাচ্চা খাঁটি ভালোবাসা পাব না। আর তোমাকে কত মেয়ে যেচে ভালোবাসতে আসে। একটু পরে বলল, কেন এমন হয় দ্বিজু?

হেমেন বলল, অবিশ্যি আমার চেহারাটা? এ নিয়ে মেয়ে পটকানো যায় না দ্বিজেন।

নিরাশার অতল অন্ধকূপের ভিতর ডুবে গিয়ে হেমেন স্তব্ধ হয়ে চুরুট টানতে লাগল। জীবনে প্রেম হল না, প্রণয় হল না, ছেনালি অবধি হল না। এক জন পরের স্ত্রীকে আটকে রেখে মোকদ্দমায় যদি সে পড়ত তাহলেও যে একটা ক্ষোভ মিটত। এখন যেন রক্ত মাংস বিবেচনা বুদ্ধি বিবেক সমস্ত কামড়াচ্ছে তাকে, হালুহলু করে কামড়াচ্ছে। কেন এমন হল। সারা জীব, জীবন বলে জীবন, সে এমন গয়ারাম সেজে গেল কেন? মেয়ে পটকানোর একটা সময় থাকে। ত্রিশের পর ও-সব কথা আর না।

হেমেনের সমস্ত মুখ মাথা টাক টস টস করে ঘামতে লাগল।

ভুল করে চুরুটের জ্বলন্ত দিকটা একবার কামড়ে ধরে হেমেন শরীরের যন্ত্রণাও যথেষ্ট পেল। সব রকম যাতনার একশেষ হল তার।

দ্বিজেন বলল, বলাই ভালো আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। ও-সব দিয়ে আমাদের আর কী হবে।

বুড়ো? তুমিও না, আমিও না।

পঁচিশের পর সকলের বুড়ো — মেয়ে মানুষ নিয়ে খেলা করার দিক দিয়ে সতেরো-আঠারো, কুড়ি-বাইশ এই হচ্ছে বয়স।

হেমেন হাঁ করে তাকাল।

দ্বিজেন বলল, আমারও যা হয়েছে — এই বয়সেই।

কেন, এখনো তো —।

BanglaBook.org

কিছু না, কিছু না। আমি তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি, আমি এখন শুধু একটু শান্তি চাই। মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে নয় হেমেন, কিন্তু নিজেরই ঘরে, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে। জানো না তুমি, কিন্তু কেউ আমাকে ভালোবাসে না।

কেউ না?

না

হেমেন হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

দ্বিজেন বলল, কুড়ি বছরের মেয়েরা আমাকে ভালোবাসবে কেন? আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে চলল। সে ভদ্রলোকের মেয়েরাই হোক বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানই হোক! আঠারো-কুড়ি-বিশ-বাইশ বছরের মেয়েদের হৃদয়ের ওপর কোনো রকম কিছু দাবি আমরা অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের তারা জ্যাঠামশাই ভাবে; হয়তো ঠাকুরদাও।

হেমেন আমোদ পেয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল। দ্বিজেনর এই সব সাফ কথা শুনে মনের ভারটা যেন তার অনেকখানি কমে গেছে। বাস্তবিক দ্বিজেন যা বলে তাই। না হলেও ব্যারিস্টার তো, এমন মিঠে করে জিনিসের আঁশটি বার করে নিয়ে আসে।

একটু পরে হেমেন খুব অভিনিবিষ্ট হয়ে বলল, কুড়ি না হোক, পঁচিশ না-হোক অন্তত ত্রিশ বছরের মেয়েরা।

তা-ও না। তাদের ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরের ছোকরারা রয়েছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্যের অভাব নেই। আমি ঢের দেখেছি। এমনকী কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছোকরাদের সঙ্গেও তারা প্রেম করবে — প্রেম হবে একেবারে মরীয়া হয়ে। আমি ঢের দেখেছি।

দ্বিজেন বলল, এক জন চল্লিশ পঁচাল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের গিন্নি হয়তো এক-আধ মুহূর্তের জন্য আমার প্রতি একটু নরম হতে পারে, তুমিও যেমন একটু গদ গদ হয়ে উঠতে পারো তাকে দেখে। কিন্তু ভালোবাসা নয়, কিছুই নয়, একেবারে রাবিশ।

দ্বিজেন মাথা তুলে বলল, ভেবে দেখো, হয়তো মোটরে চড়ে চলেছি, একটি বিশ আর একটি ত্রিশ বছরের ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে। আঠারো বছরের, চল্লিশ বছরের, পঞ্চাশ বছরের তিনটি মেয়েমানুষ দেখলাম পাশের মোটরে, ধরো তিন জনেই বেশ দেখতে। কিন্তু তবুও হয়তো আঠারো বছরের দিকেই আমার মন যাবে।

হেমেন বলল, তা যাবে।

কিন্তু সেই মেয়েটির মন কি এই পঞ্চাশ বছরের বুড়ার দিকে আকৃষ্ট হবে, সমস্ত পৃথিবী বিকিয়ে গেলেও?

হেমেন হাঁ করে তাকাল। তারপর হি-হি করে হাসতে লাগল।

দ্বিজেন বলল, আমার ভাইপোকেই সে ভালোবাসবে, না হয় আমার ছেলেকে। আমাকে কিছুতেই নয়।

ঠিক।

ভালোবাসা, রোমান্স, এমনকী কামনার কথাও আর বোলো না হেমেন। ও-সব ভাবতে গেলেও ঢের ব্যথা।

পকেটের থেকে দেশলাই বের করে দ্বিজেন বলল, আমাদের এই পড়ন্ত বয়সে সৌন্দর্য আর ভালোবাসার কথা চিন্তা করতে গেলেই জীবনকে এমন খুঁতকুড়ি মনে হয়।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে দ্বিজেন বলল, আমাদের পকেটে এমন আর কিছু উঠবে না, শুধু ঘরের বধূ ছাড়া। আমাদের জন্য আর কিছু নেই।

BanglaBook.org

দ্বিজেনের সেই ঘরের বধূ যে লীলা এবং নিজের চপলা — এই ভেবে হেমেন ঢের পরিতৃপ্তি পেল।

বিল সেই নিজেই মিটিয়ে দিল।

দ্বিজেন বলল, খোকা তুমি, আহা তোমার মা নেই, বোন নেই, তোমার জন্য ভারি কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হেমেন বলল, দ্বিজু, চলো আমরা টালিগঞ্জ, আলিপুর, চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসি।

সত্যি এত সব জায়গা ঘুরবে তুমি?

নিশ্চয়ই। হেমেন সজোরে মাথা নেড়ে বলল।

কেন?

এমনিই।

কোনো ব্যবসা-ট্যাবসার সুবিধের জন্য।

না।

এমনিই?

অনেক বদভ্যাস বসেছিল মনে ভিতরে।

ফিরতে যে অনেক রাত হয়ে যাবে।

হোক।

দ্বিজেন বলল, তুমি যাও, আজ আমার দরকার আছে।

বিজনেস! তাহলে সে দ্বিজেনকে ছেড়ে দিতে পারে। হেমেনের সমস্ত মন এখন প্রেমকামনা ও মেয়েমানুষের থেকে উঠে এসে আবার ব্যবসার গদিতে পরম আরামে ও নিবিড় শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে। জীবনটা তার কাছে ব্যর্থ নয় আর, প্রাণের ভেতর কোনো খোঁচ নেই; সমস্ত পৃথিবী অসীম অর্থে ভরা।

হেমেন আকাশটার দিকে তাকাল, আতার বিচির মতো অন্ধকারে সমস্ত কলকাতার আকাশটা ভরে গেছে; মেঘের অন্ধকার — টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তার এখন ভালো লাগল, চপলার কথা মনে হল। বধূর মমতা ও ভালোবাসায় তার সমস্ত মনটা ভরে উঠল। হেমেনের মতো এমন নিবিড় পরিতৃপ্ত মানুষ কলকাতার রাস্তায় আজ আর একটিও নেই যেন। আজ সমস্ত রাত সে চপলাকে ভালোবাসবে। আজ সমস্ত বাদলের রাত ভরে এমন একটা অপরিসীম শান্তি পাবে।

কিন্তু তবুও সে এখনই চপলার কাছে যাবে না।

বিজনেস ইস বিজনেস। সে বিজনেসের মানুষ। সে সঙ্কল্প করেছে, দ্বিজেনের কাছে, স্বীকার করেছে যে টালিগঞ্জে আলিপুর চেতলা বেহালা বেড়িয়ে আসবে। বেড়ানোটা এমনিই, কোনো ব্যবসার উপলক্ষ নিয়ে না, হোক তাই। ফিরতে ফিরতে এগারোটা বাজবে; বাজুক। কিন্তু দ্বিজেনকে বলেছে সে যে, টালিগঞ্জ আলিপুর চেতলা বেড়াবে, বলেছেই নড়চড় নেই, সেটা দুর্বলতা। এক জন ব্যবসায়ীর পক্ষে সে-রকম ঢিলেমি ব্যবসা পথটাই পরিষ্কার করে দেয়।

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয় হেমেন চলল।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে দ্বিজেন পিছু পিছু চলল।

বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউয়ের দিকে দ্বিজেন যখন মোড় নিল, হেমেন তার ঢের আগেই টালিগঞ্জের দিকে ছুলে চলেছে। দ্বিজেন এ গোঁয়ারকে খুব ভালো করেই চেনে; রাত বারোটার আগে ও আর ফিরবে না।

দ্বিজেন তেতলায় উঠে দেখল চপলা গড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

এই বিরাট মেদকে দেখে প্রথমটা তার মন কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল; কিন্তু তবুও এই মেদের নিচে যে হৃদয় রয়েছে তা এমন চমৎকার, এত নমনীয়। এই মেয়েটিকে নিয়ে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা কাটল দ্বিজেনের। কিন্তু তারপর —। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে, বুকটা কেমন ঢিব ঢিব করতে লাগল দ্বিজেনের। হেমেন যে-কোনো মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে খট খট করে। একটা বেতো টাটুর মতো।

এখন বিরক্তি লাগতে লাগল তার।

তবু কিন্তু ওর বেরিয়ে যেতে হবে। ড্রয়িংরুম থেকে ড্রয়িংরুমে সে অনেক ঘোরে বটে, কিন্তু তবুও তারপর বেরিয়ে যেতে হয়। গিন্নিরাও চায় যে তার স্বামী আসুক, এ অতিথি বেরিয়ে যাক বেরিয়ে যাক। বেরিয়ে সে গেলই॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের অনন্ত

অনন্ত লায়েককে নিয়ে গল্প লেখা যায় তা আমি নিজেই জানতাম না। নায়ক তার উপাধি। গ্রামের লোক বলে লায়েক।

অনেক কালের পুরোনো দিনের গ্রাম। অনন্ত লায়েক ছিল সেই গ্রামের লোক।

অনন্তকে কেউ গ্রাহ্যই করত না। বলত, ওটা আবার মানুষ!

আমার কিন্তু তা মনে হত না। আমি প্রায়ই যেতাম তার কাছে। ভারি মজার মজার কথা বলত। শুনতাম আর হাসতাম।

গ্রামের এক টেরে ছোট্ট একখানি মাটির বাড়ি।

গরিব বেচারা, একাই থাকে। নিজেই রান্না করে খায়। সংসারের যাবতীয় কাজ তাকে একাই করতে হয়। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন কেই কোথাও নেই। বছর পঞ্চাশেক বয়স। হাঁপানির রোগী। সাদা ধপধপ করছে গায়ের রঙ।

হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে বাড়ির উঠোনে বসে থাকে আর হাঁপাতে হাঁপাতে অনর্গল বক্ বক্ করে।

এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লায়েক, তুমি বিয়ে করোনি?

লায়েক বলেছিল, করেছিলাম বৈ কী! আমার তখন পনেরো বছর বয়স। বারো বছরের বউ, মনে হত যেন বাইশ বছরের বুড়ি। পাঁচ বছর ছিল আমার কাছে। সেই পাঁচ বছরেই আমাকে ত্রিভুবন দেখিয়ে দিয়েছিল।

বলেই খানিকটা দম ছেড়ে দিয়ে বলল, ফু!

আবার দম টেনে কিছুটা সামলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল, ভীমরুল দেখেছিস? মৌমাছি নয়, বোলতা নয় — একেবারে ইয়া মোটা ভীমরুল। যেমন গাব্দা-ভূতুম চেহারা, তেমনি ছুঁচের মতো হুল। আমার বউটা ছিল সেই ভীমরুল-জাতীয় মেয়ে। আমি কিছু বলেছি কী, অমনি দিত হুল ফুটিয়ে! আর আমিও তেমনি — এই দেখেছিস লাঠি!

হাতের লাঠিটা মাটিতে একবার ঠুকে লায়েক বলল, আমিও দিতাম ভাল্লুক-নাচ নাচিয়ে।

BanglaBook.org

এই বলে সে তার বউ কেমন করে তাকে গালাগালি দিতে দিতে 'ওরে বাপ্ রে — ওরে মা রে' বলে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাত, অঙ্গভঙ্গী করে দেখাতে লাগল।

সেই বিচিত্র ভঙ্গী দেখে আমি তো হেসেই অস্থির!

বললাম, তাহলে তুমি খুব আনন্দেই ছিলে বলো?

হ্যাঁ, তা ছিলাম। পাঁচটি বছর। তার পরেই সে পালাল।

পালিয়ে গেল? কোথায়?

হাতের লাঠিটা উপরের দিতে তুলে বলল, সগ্গে। না না, সগ্গে তার জায়গা হবে না। তার কথার চোটে দেবতারা পাগল হয়ে যাবে। সে গেছে ঠিক নরকে। আমাদের গাঁয়ের কেউ যদি যায় তো তার সঙ্গে দেখা হবে। তাকে বলে দোব, কথাটা অসমাপ্ত রেখেই লায়েক আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল — আমাদের গাঁয়ের কে নরকে যাবে বলতে পারিস?

বড় কঠিন প্রশ্ন। এর জবাব আমি দেব কেমন করে?

চুপ করে রইলাম।

লায়েক ভাবল আমি কিছু ভাবছি।

আমরা বসেছিলাম লায়েকের বাড়ির উঠানে। সুমুখে ভাঙা মাটির প্রাচীর। তার ও-পারে একটা পুকুর। এই পুকুরে এক কালে প্রচুর কলমী শাক হত। তাই এই পুকুরটার নাম কলমী-সাড়া। সেই কলমী-সাড়ার ঘাটে বসে কামিনী বাসন মাজছিল। সে অনন্ত লায়েকের প্রতিবেশিনী। যেমন রোগা, তেমনি মুখরা।

লায়েক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, অত ভাবছিস কী? ভাবতে হবে না। এই দেখ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বলেই হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে কামিনীকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, এই কামিনী-মাগী যাবে নরকে।

ভাঙা দেয়ালের ফাঁকে সবই দেখা যায়। কামিনী দেখতে পেল। দেখতে পেলে অনন্ত তারই দিকে তাকিয়ে লাঠি দেখিয়ে কী যেন বলছে।

কামিনী চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। তক্ষুনি বলে উঠল, এই হেঁপো, কী বলছিস আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে?

অনন্ত বলল, বলছি — এই কামিনী মরবার পর ওকে নিয়ে যাবার জন্যে সগ্গ থেকে রথ আসবে।

কথটা বিশ্বাস করল না কামিনী। বলল, তো মুখ থেকে তো ভাল কথা বেরোয় না অনন্ত, তুই এই কথা বললি?

বিশ্বস হচ্ছে না?

না।

অনন্ত বলল, বেশ তবে বলিনি। বলেছি মরলে তুই নরকে যাবি। হল?

কামিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আ মর মুখপোড়া, তুই নরকে যা, তোর চোদ্দপুরুষ যাক।

চোদ্দপুরুষ পাব কোথায় কামিনী? আমার সেই দজ্জাল বউটাকে পাঠিয়েছি। তোর জন্য সেখানে একটা জায়গা রাখতে বলে দিয়েছি।

আর যায় কোথায়? কামিনীর হাতের বাসন হাতেই রইল। ঘাটের জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এমন সব কথা বলতে লাগল যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

অনন্তও কথা বলতে জানে। সে-ও কিছু বাকি রাখল না। তবে হাঁপের টানের জন্য খুব বেশি চেঁচাতে পারল না। শুধু বলল, বল তোর যা খুশি তাই বল, আমি তোর এমন একটা কেলেঙ্কারির কথা জানি যা শুনলে তোর ওই ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে।

BanglaBook.org

সেটা কী এমন কথা — শোনবার জন্য কামিনী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। বলল, বল তুই ড্যাকরা পোড়ারমুখো, তোকে এক্ষুনি বলতে হবে। কামিনী-বামনি কাউকেডরায় না।

অনন্ত বলল, আমার যখন খুশি তখন বলব। এখন আমার হাঁপের টান উঠেছে, এখন বলতে পারব না।

কামিনী বলল, বলবি কেমন করে রে মুখপোড়া, বলবার কিছু নেই যে।

আছে কি নেই পরে বুঝবি। তখন তোকে আমার পায়ে ধরতে হবে।

কোনো রকমে টেনে টেনে এই পর্যন্ত বলে অনন্ত আর কিছু বলতে পারল না।

কিন্তু কামিনী থামল না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে বলে যেতে লাগল, মর মর, মরে যা না তুই। অমনি হাঁপাতে হাঁপাতে দম বন্ধ হয়ে মরে যা। আমার হাড় জুড়োক, গাঁয়ের লোক নিশ্চিন্তি হোক।

অনন্ত কথা বলতে পারছে না। তখনো সে হাঁপাচ্ছে আর আমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বলছে, শুনলি? শুনলি?

অনেকক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে বলল, এই মাগীর সব্বনাশ আমি করব, করব, করব। তুই দেখে নিস।

কামিনীর সর্বনাশ সে করেছিল। আমরা তা দেখেও নিয়েছিলাম।

কেমন করে করেছিল সে-কথা পরে বলছি।

কলমী-সাড়াতে সে-দিন মাছ ধরানো হচ্ছিল। জেলে জাল ফেলেছে পুকুরে। জাল-ভর্তি ছোট ছোট মাছ উঠেছে। রুপোর পাতের মতো চিক চিক করছে মাছগুলো। জেলে সেগুলো একটি একটি করে দেখছে আর জলের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বলছে, এত ছোট মাছ এখন ধরব না। আর একটু বড় হোক।

পুকুরের পাঁচ জন অংশীদার পুকুরের পাড়ের উপর বসে আছে।

শম্ভু ছিল ঘাটের কাছে বটগাছটার শেকড়ের ওপর বসে। সে বলে উঠল, মাছ তোর বড় হবে কখন বাবা? বেলা যে দুপুর গড়িয়ে গেল। খাব কখন?

পাশেই অনন্তর বাড়ি। তার ভাঙা প্রাচীর টপকে ঝুপ করে অনন্ত এ-পারে এসে নামল। হাঁপানিটা তার বেড়েছে বোধহয়। বাঁশের লাঠিটা হাত থেকে নামিয়ে সে বসে বসে হাঁপাতে লাগল। বুকের পাঁজরগুলো দপ দপ করে ওঠা-নামা করছে। দেখলে মনে হয় এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

খানিক পরে ফু-ফু করে নাকে-মুখে নিশ্বাস ফেলে একটুখানি সুস্থ হল। তারপর তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি তুলে অংশীদারদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, তোমাদের এই কলমী-সাড়া আগলাবার ভার আমার। ধরতে গেলে আমি জিম্মাদার। এই পুকুর থেকে কই একটি চুনোপুঁটি যাক দেখি চুরি। সব ব্যাটা জানে যে এই অনন্ত শম্মা বসে বসে ধুঁকছে সারা রাত। যাব আর অমনি তেড়ে রে রে রে। তার চেয়ে কাজ নেই বাবা —।

রতন বলল, তুমি সারা রাত জেগে থাকো?

লায়েক বলল, হ্যাঁ ভাই, এই শালা পাজি ব্যারাম আমাকে ঘুমোতে দেয় নাকি? মাঝে মাঝে এই চটকা করে খুমিয়ে নিই, তারপর সেই কুঁকড়ো-ডাকা রাত পর্যন্ত হাঁপের টানি — ফু।

আবার দম উঠতে লাগল।

একটুখানি সুস্থ হয়ে বলল, তোমরা পাঁচ ভাগীতে একটি মাছ যদি দাও তো আমার হল গিয়ে পাঁচটি। আজ কাল দু'দিন চলে যাবে। আজ বেলা হয়ে গেছে। অন্ন আমার পিস্তুত। আজ শুধু হাতা-চড়চড়ি। কালকে বসে বসে কালিয়া রাঁধব।

BanglaBook.org

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। নাঃ, রোদে বসি। শালা বাতাসের চোটে একবারে হাওয়া গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

গাছের তলা থেকে সরে অনন্ত একটু দূরে গিয়ে বসল।

পাশেই ছিল নিশু ভট্‌চাজ। অনন্তর হাঁপানীর কষ্ট দেখে বলল, তুমি ময়নাবুনির ওষুধ খেলে না কেন অনন্ত? ধম্মরাজের মাদুলি?

ওষুধ-মাদুলির নাম শুনে দপ করে যেন জ্বলে উঠল অনন্ত। বলল, ধেৎতেরি ওষুধ কাঁহাকা। ওষুধের নাম করিস না আমার কাছে।

তারপর তার হাতের ঠ্যাঙাটা বারকতক মাটিতে ঠুকে ঠুকে বলতে লাগল, ঠাকুর-দেবতায় ইয়ে করি আমি, জানিস? সব ব্যাটা-বেটিকে চেনা আছে আমার। পঁচিশ গণ্ডা মাদুলি নিয়েছিলাম, আর না হবে তো হাজারো রকমের ওষুধ। কিন্তু বেয়ারামের কই এতটুকু টল-বেটল হল? সেই যে-কে-সেই। শেষকালে রেগেমেগে দিলাম ছিঁড়ে এক দিন মাদুলিগুলো সব। পটাপচট ছিঁড়েছি আর ফেলেছি এই কলমী-সাড়ার জলে। ব্যাস, এই বার এক দিন শিঙে ফুঁকে দিলেই খালাস। শিঙের আওয়াজ পেলে আসিস যেন তোরা। ফু!

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে অনন্ত আবার দম টানতে লাগল।

সামনে দিয়ে একটা কালো কুকুর পেরিয়ে যাচ্ছিল, অনন্ত তার পিঠের উপর দিল এক লাঠি বসিয়ে। কুকুরটা কাঁই কাঁই করে ছুটে পালাল।

আর একটু হলেই বাছাধন চণ্ডীচরণ। সে-বছর তখন সেই মোটা লাঠিটা থাকত আমার হাতে। রাখুর ছেলেটা ভেংচি কেটে দেখাচ্ছিল আমি কেমন করে হাঁপাই। সেই ছেলেটাকে ঠ্যাঙাতে গিয়ে এমন এক বাড়ি মেরে ফেললাম ওদের মেজবউয়ের হাতে যে একেবারে চেড়েক-ডেডেং। আঙুলের গিটগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠল। ব্যাস, সেই থেকে এই ছোট লাঠি। ফু!

অনন্ত তার হাতের লাঠিটা তুলে একবার দেখাল।

কিন্তু তার নজর ছিল জেলের দিকে। জালটা তখন সে পুকুরের পাড়ে তুলে ঝাড়তে আরম্ভ করেছে।

অনন্ত উঠল। কোমরে-কাঁকালে হাত দিয়ে চলতে চলতে দু'বার বসে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বিড়ালের মতো ছোঁ মেরে দাঁড়াল।

ফেলিস নে, ফেলিস নে বাবা। ওটা তো রুই-কাৎলার বাচ্চা নয় তারু, ওটা সরল পুঁটি। টপ করে অনন্ত তার জাল থেকে মাছটাকে এক রকম জোর করেই টেনে ছাড়িয়ে নিলে।

জেলে তো রেগে আগুন!

জান দিয়ে দিতে পারি ঠাকুর, মাছ দিতে পারি না।

মাছটি সে অনন্তর কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল।

অনন্ত মরি বাঁচি করে তাড়াতাড়ি তার বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, বেশ বাপু বেশ, দিসনে তুই। ভারি তো একটা আঙুলের মতো পুঁটি মাছ।

অংশীদারদের ভেতর শিবু বসেছিল জেলের কাছাকাছি। সে বলে উঠল, পারলি না কেড়ে নিতে? দিতে হত তোর হাতের ওই জালটা দিয়ে এক সাপটি মেরে। বাছাধনের মাছ কেড়ে নেওয়া বেরিয়ে যেত। জীবনে আর কখনো জেলের পাশ মাড়াতে না হেঁপো।

কথাটা অনন্ত শুনতে পেল।

শুধু কানে গিয়ে বাজল না কথাটা। তার বুকে গিয়েও বাজল।

মরণাপন্ন রোগীর বড় বাজে।

BanglaBook.org

অনন্ত ফিরে এল। শিবুর কাছে গিয়ে সে তার কোঁচড় থেকে মাছটি বের করে তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলল, নে তোর মাছ!

বলেই সে হাঁপানির টানে সেইখানে বসে পড়ল।

পাশেই বসেছিল নিশু ভট্চাজ। ব্যাপারটা ভাল হয়নি দেখে সে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। আধ-মরা মাছের বাচ্চাটি সে মাটি থেকে তুলে নিয়ে অনন্তর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, না না অনন্ত, রাগ করিসনি। ছিঃ! আমার ভাগ থেকে আমি তোকে একটা মাছ দেব। যা বাড়ি যা।

অনন্ত গেল না। হাঁপের টানটা তখন সে সামলে নিয়েছে। নিজে সামলেছে না নিশুর এই সহানুভূতি তার বুকের এই রোগ যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে হৃদয়কে স্পর্শ করেছে তাই-বা কে জানে!

মাছটি নেবার ইচ্ছা তার ছিল না, কিন্তু নিশুর কথাটা সে অগ্রাহ্য করতে পারল না। ছোট্ট মাছটি আবার সে তার আঁচলে গুঁজে নিয়ে শিবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, আমি না হয় গরিব হাঁপানীর রোগী, ছোট্ট একটি পুঁটি মাছ নিয়েছি, তা-ও সে-মাছ তোর একার নয় — পাঁচ জন অংশীদারের। আর তুই কিনা বসে বসে হুকুম দিলি। ওকে মারলি না কেন? আমি ওই তারু জেলের মার খাব?

খুব জোরে জোরে কথাগুলো বলতে গিয়ে অনন্তর বুকের পাঁজরগুলো হাপরের মতো আবার ওঠা-নামা করতে লাগল। বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় হয়ে উঠল, আর সেই চোখের কোণে দেখা গেল দু'ফোটা জল টল্ টল্ করছে।

মুখের চেহারা দেখে মনে হল দম নিতে আর খুব কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ এতখানি উত্তেজিত হওয়া তার উচিত হয়নি।

তবু সে কথা না বলে থাকতে পারল না। বলল, এই কলমী-সাড়ার সব মাছ আমি যদি চুরি করে খাই তো তোরা কেউ টেরই পাবি না। আমার ওই ঘরের ভেতর থেকে সারা রাত আমি জলের দিকে তাকিয়ে থাকি আর হাঁপাই। কলমী-সাড়াকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কত লোক চুরি করে ছিপ্ ফেলে মাছ ধরতে এসেছিল। কাউকে আমি একটা চুনোপুঁটিও ধরতে দিইনি। গালাগালি দিয়ে মন্দ কথা বলে তাদের সবাইকে আমি তাড়িয়েছি। আমার ভয়ে এখন আর কেউ আসে না। আমি মন্দ কথা বলতে পারি। মুখ আমার খুব খারাপ কিন্তু মন্দ কাজ আমি করতে পারি না। চুরি আমি কখনো করব না, কাউকে করতেও দেব না। ভাল কাজ আমি করতে জানি।

শিবুর লজ্জা হল কি না জানি না। একটি কথাও সে বলল না। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

নিশু তার কাছে গিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, বোস্ এইখানে। একটু জিরিয়ে নে।

অনন্ত বসল।

জেলে তখন মাছ ভাগ করছিল পাঁচ ভাগ পাঁচ জন অংশীদারের, আর এক ভাগ তার নিজের। নিশু ভট্চাজকে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াতে হল।

অনন্ত সেইখান থেকে দেখতে পেল হরিমাস্টার পুকুরের পাড় দিয়ে কামিনীর বাড়ি যেতে যেতে মাছ ভাগ করার জায়গায় থম্‌কে দাঁড়াল।

গ্রামে একটি মাইনর স্কুল আছে, হরিমাস্টার সেখানকার এক জন টিচার। ভিন্ন গ্রামে বাড়ি। স্কুলের একটা ঘরে থাকে, আর কামিনীর বাড়িতে দু'বেলা খায়। তখন ছিল সস্তাগণ্ডার বাজার। কামিনীকে মাসে পনেরোটি করে টাকা দেয়।

এখন দুপুরবেলা। রবিবার। ছুটির দিন। স্নান করে কামিনীর বাড়িতে খেতে যাচ্ছিল। অনন্ত ডাকল, হরিমাস্টার শোনো!

BanglaBook.org

হরিমাস্টার তার কাছে এসে দাঁড়াতেই অনন্ত বলল, এসো তুমি আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অনন্ত উঠে দাঁড়াতেই তার কাছে ছুটে এল নিশু ভট্‌চাজ।

বড় একটা মাছ তার হাতে দিয়ে নিশু বলল, এইটে নিয়ে যা তুই।

অনন্ত অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কী যে বলবে বুঝতে পারল না।

অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বাড়ি যা।

অনন্তর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। বলল, তোর নিজের ভাগের এই বড় মাছটা কেন দিলি নিশু?

নিশু বলল, আমার খুশি। বলেই সে চলে গেল। সেখানে দাঁড়াল না।

অনন্ত হরিমাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে এল।

অনন্তর বাড়ি থেকে কামিনীর বাড়ির ভেতর পর্যন্ত সব কিছু দেখা যায়। কামিনীর আঠারো-উনিশ বছরের যুবতী মেয়ের নাম নিরুপমা। ডাকনাম নরি।

নরি রান্নাবান্না করে। হরিমাস্টার দু'বেলা খায় তাদের বাড়িতে। নরি তাকে খেতে দেয়। অনন্ত বসে বসে সব দেখে।

নরি আর হরি। দু'জনের খুব ভাব। কথা যেন তাদের আর ফুরোতে চায় না। দু'জনে অনর্গল কথা বলে আর হাসাহাসি করে।

সে-দিন রাত্রি তখন অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ। কলমী-সাড়ায় একটানা ব্যাঙের ডাক ছোড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। দিনের মতো জ্যোৎস্নার আলো।

অনন্তর ঘুম নেই। বসে বসে হাঁপাচ্ছে, আর বাইরের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কামিনীর সদর দরজার কাছে হুট্ করে একটা আওয়াজ হল। অনন্ত দেখল, নরি দরজা খুলল। এ-দিক থেকে হরিমাস্টার এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনে ঘরে ঢুকল।

সর্বনাশ! অনন্ত দেখল, এরা অনেক দূর এগিয়েছে।

এমনি এক দিন নয়, দিনের পর দিন।

অনন্ত ভাবল, কথাটা এক দিন হেডমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করবে।

কামিনীও অনন্তর দু'চক্ষের বিষ।

অনন্ত প্রায়ই ভাবে কামিনীর এই মেয়ের কেলেঙ্কারীর কথাটা দেবে গাঁয়ের ভেতর প্রচার করে। তাহলেই কামিনী জব্দ হবে।

মাস খানেক পরে হরিমাস্টার এক দিন নিজেই এল অনন্তর কাছে।

অনন্ত বলল, কী খবর হরিমাস্টার?

হরিমাস্টার কিন্তু কোনো জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে।

নরির সঙ্গে নট-ঘটির কথাটা জিজ্ঞাসা করবার এই উপযুক্ত সুযোগ। কিন্তু কিছুই তাকে জিজ্ঞাসা করতে হল না। হরিমাস্টার নিজেই ধরা দিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বিষণ্ণ মুখে হরিমাস্টার বলল, আচ্ছা লায়েক, তুমি তো তোমার এই ব্যারামটার জন্য অনেক ডাক্তার-কোবরেজের কাছে যাওয়া-আসা করছ, অনেকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, কোনো ভাল ডাক্তারের খবর দিতে পারো যে সব রকম রোগের ওষুধ জানে?

সব রকম রোগ কী-রকম? তার নাম বলবে তো?

নাম কিছু নেই। এই ধরো —।

BanglaBook.org

শেষে আমতা আমতা করে বলল, কোনো মেয়ে যদি ভাবে তার পেটের ছেলেটাকে নষ্ট করে দেবে — এই রকম আর কী। তারই ওষুধ দিতে পারে সেই রকম ডাক্তার।

অনন্ত মনে মনে হাসল। হেসে বলল, বুঝেছি।

না না, কিছু বোঝনি। কী বুঝেছ তুমি?

অনন্ত বলল, সবই বুঝেছি। আমি নিজের চোখে দেখেছি তোমার আর নরির কাণ্ড কারখানা।

হরিমাস্টারের মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল।

চট্ করে সে হেঁট হয়ে অনন্তর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, আমি তোমার পায়ে ধরছি লায়েক, কথাটা তুমি কাউকে বোলো না।

বলব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী করবে তুমি?

হরিমাস্টার বলল, তবে আর তোমার কাছে ডাক্তারের কথা বললাম কেন?

অনন্ত কী যেন ভেবে বলল, তিন দিন পরে তুমি আসবে আমার কাছে। কী করতে হবে আমি বলব।

কিন্তু এই তিন দিনের ভেতরই — মানে তার পরের দিনই কলমী-সাড়ার ঘাটে কামিনীর সঙ্গে অনন্তর ঝগড়া হয়ে গেছে।

সেই জন্যই অনন্ত বলেছিল, আমি তোর এমন একটা কেলেঙ্কারীর কথা জানি যা শুনলে তোর ওই ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে।

এর জন্য কামিনীও তাকে বলতে কিছু বাকি রাখেনি। গালাগালি দিয়ে বলেছিল, তুই আমার কিচ্ছু করতে পারবি না মুখপোড়া।

অনন্ত সে-দিন তিন সত্যি করে বলেছিল, তোর সব্বনাশ আমি করব — করব, করব।

আজ তার সুযোগ পেয়ে গেল অনন্ত।

তিন দিন পরে হরিমাস্টার তার কাছে আসতেই অনন্ত বলল, তুমি কিছু ভেবেছ মাস্টার?

মাস্টার বললে, ভাববে তো তুমি লায়েক।

অনন্ত বলল, আমি যা বলব তা তুমি শুনবে?

হ্যাঁ, শুনব।

নরির মা কিছু জানে?

না।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাড়িতে কে আছে?

আমার বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই।

তোমার বাড়ির অবস্থা কেমন?

মাস্টার বলল, খুব খারাপ নয়। জমিজমা যা আছে তা দিয়ে চলে যায়।

অনন্ত বলল, এখানকার এই চাকরিটা যদি ছেড়ে দাও তাহলে কেমন হয়?

তাহলে শোনো লায়েক।

এই বলে হরিমাস্টার বসল তার পাশে। বলল, নরির যখন ওই রকম হয়ে গেল তখন আমি একবার ভেবেছিলাম —।

বলেই চুপ করে রইল মাস্টার। মনে হল কথাটা সে বলতে পারছে না।

অনন্ত বলল, চুপ করে রইলে কেন? কি ভেবেছিলে বল।

হরিমাস্টার বললে, ভেবেছিলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাই। তারপর ভাবছিলাম, নরির কী হবে? তাই যেতে পারিনি। ভেবে কিছু করতে না পেরে তোমার কাছে এসেছি।

BanglaBook.org

কামিনীর উপর রাগ তখনো পড়েনি অনন্তর।

অনন্ত বলল, এ ছাড়া তোমার আর কোনো পথ নেই মাস্টার। তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাও। নইলে এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে গ্রামের লোক তোমাকে মেরে ফেলবে।

কথাটা শুনে হরিমাস্টারের মুখখানি শুকিয়ে গেল। শুধু বলল, আপনি যেতে বলছেন আমাকে?

হ্যাঁ বলছি।

নরির কী হবে?

অনন্ত বলল, সে আমরা দেখে নেব। তুমি তো বাঁচবে।

মাস্টার বলল, তবে তাই হোক, মাইনেটা পেলেই আমি চলে যাব।

সেই কথাই ঠিক ছিল।

মাইনে পেলে হরিমাস্টার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে।

কামিনী বিপদে পড়বে।

অনন্ত তাতেই খুশি।

কমিনীকে তখন সব কথা খুলে বলতেও হবে না। মাস্টার চলে গেলে তার মেয়ে নরিই কেঁদে কেঁদে মাকে বলবে।

এমন সময় কলমী-সাড়ায় সামান্য একটি মাছ আনতে গিয়ে কী ঘটনা যে ঘটে গেল, যার জন্য অনন্ত একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

হরিমাস্টারকে পুকুরের পাড় থেকে বাড়িতে ডেকে এনে অনন্ত বলল, মাস্টার, তোমার বাড়ি যাওয়া হবে না।

হরিমাস্টার বলল, বাড়ি যেতে তো আমি চাইনি। লায়েক, নরির জন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, নরিকে তুমি ভালবাসো, না ফুর্তি করেছ?

হরিমাস্টার বলল, না লায়েক, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, নরিকে আমি সত্যি ভালোবাসি। বাড়ি যেতে আমি চাই না।

অনন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ব্যাস্, তাহলে নরিকে তুমি বিয়ে করো।

সে-কথা আমি ভেবেছিলাম লায়েক, কিন্তু নরির মায়ের ভয়ে আমি কিছু বলতে পারিনি।

একটু সামলে নিয়ে অনন্ত বলল, সে-ভার আমার।

কিন্তু তোমার সঙ্গে নরির মায়ের তো সদ্ভাব নেই লায়েক। সে-দিন কলমী-সাড়ার ঘাটে তোমার সঙ্গে তার কী হয়েছে জানি না, তবে সারা দিন ধরে তোমাকে সে গালাগালি দিয়েছে আমি শুনেছি। এরপর তুমি তাকে এ-কথা বলবে কেমন করে?

ধেৎতেরি, তুমি মাস্টার না ঘোড়ার ডিম!

তুমি নরিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো মাস্টার।

নরি এল। এসেই কাঁদতে লাগল। নরির কান্না আর থামে না।

লায়েক বলল, আমার কাছে কেঁদে কী হবে? যা তোর মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদগে যা।

নরি কিন্তু এক পা-ও নড়ল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

অনন্ত শেষে নিজেই গেল কামিনীর কাছে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল হরিমাস্টারকে আর নরিকে।

শোন এইবার আমি তোর সব্বনাশ করে দিতে পারি কি না।

সব কিছু শুনে কামিনী তো অবাক।

অনন্তর সাজানো ব্যাপার নয় তো। কামিনী ভাবল। কিন্তু নরির কথা শুনে বিশ্বাস হল।

BanglaBook.org

তারপর আবার ঝগড়া।

অনন্ত বলে, বিয়ে আমার বাড়িতে হবে।

কামিনী বলে, তোর বাড়িতে হবে কেন রে মুখপোড়া? আমার বাড়ি নেই?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল বিয়ে কামিনীর বাড়িতেই হবে। কিন্তু বউভাত হবে অনন্তের বাড়িতে। যেহেতু হরিমাস্টারের কেউ কোথাও নেই।

তার যে মা আছেন, কামিনীর কাছে গোপন করে গেল। অনন্ত বলল, আমারও কেউ কোথাও নেই। আমার জমি-জমা যা কিছু আছে সবই দিয়ে যাব হরিকে আর নরিকে। তুই দেখ মুখপুড়ি আমি ভাল কাজ করতে জানি।

কামিনী বলল, তোকে ভালো কাজ করতে আমি দেব কেন রে মুখপোড়া? আমার জমিজমা নেই? তুই নরির চৌদ্দপুরুষের কে রে?

শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হয়ে গেল। বিয়ে অনন্তের বাড়িতেই হবে। কামিনী শুধু দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।

তুই কন্যা সম্প্রদান করবি, আর আমি হব বরকর্তা।

কামিনীকে শেষ পর্যন্ত সব কথাতেই রাজি হতে হল।

গ্রামের লোক নেমন্তন্ন খেতে এসে কামিনী ও লায়েকের ভাব দেখে তো অবাক। মনে হচ্ছে যে অনন্তর হাঁপের ব্যারাম কখনো ছিল না।

কামিনী কথা বলতে জানে না॥

মণীশ ঘটক
কালনেমি

জোয়ান মরদ ডাকু যখন রেলে কাটা পড়ে কাজের বার হয়ে গেল, তখন এই এত বড় দুনিয়া তাকে বেঁচে থাকবার কোনো পথই বাতলাতে পারল না।

অনেক ঘোরাফেরার পর শেষকালে সে সোমত্ত স্ত্রীকে নিয়ে পটলডাঙায় ভিখিরিপাড়ায় এসে খুঁটি গাড়ল। সেখানকার বাসিন্দারা তাকে স্থান দিতে কোনো আপত্তিই করল না, কিন্তু ওই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা বরদাস্ত করতে আদপেই রাজি হল না। বলল, থাকবি থাক। কিন্তু ইস্তিরি-ফিস্তিরি কেন বাবা! এখন ও-সব চলবে না, মুড়িমিছরির এক দর হেতায়।

শুনে ডাকুর মন এই শেষ আশ্রয়ের ওপরও বিমুখ হয়ে উঠল। বলল, শুনেছিস তো ময়না? এরপর —।

ময়না বলল, আর কোথায় যাবি তবে? আজ দু'মাস তো সমস্ত পিরতিমি ঘুরে বেড়ালি, ঠাঁই পেলি কোথাও? মাথা গোঁজবার কুঁড়ে যখন মিলচে একটা, তখন আর তোকে টো-টো করে বেড়াতে দিচ্ছিনে। আমার কতা? কী করবে ওরা আমার। সে-জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

ডাকু বলল, সব বুঝলাম। কিন্তু শুনলি তো। একে ওরা দলে ভারি, তার ওপর —।

থাম তুই। দলে ভারি! আমার কাটারি থাকতে ওই মড়ার দলকে ভয় করি আমি?

BanglaBook.org

স্ত্রীর শ্রান্ত, অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে দো-মনা ভাবে ডাকু বলল, থাক তবে। কিন্তু —।

আর কিন্তু করিসনে তুই।

কিন্তু তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটুকু অটুট রেখে তারাও তেমনি দলের সঙ্গে মিশে উঠতে পারল না।

মেশবার জন্য ব্যস্ততাও তাদের বিশেষ ছিল না। ময়না ভোরে উঠে ডাকুকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে আসত। তারপর দলের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ত। দুপুরে স্বামীকে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে সন্ধের আগেই আবার রেখে আসত। রাত বারোটা-একটায় তাকে নিয়ে এসে দু'জনে শুয়ে পড়ত। রোজকার রোজ এমনি কাটত। কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার সুবিধেও তাদের হত না, ইচ্ছেও করত না। নিজেরটা নিয়েই নিজেরা থাকত।

হরিমিতির ঘরের রতন এক দিন সন্ধের সময় অনেকের সামনেই ময়নাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ও পাড়ায় এসব নতুন ব্যাপার নয়, হামেশা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক দু'সেকেন্ড পরে যা ঘটল। তার সঙ্গে পরিচয় কারোরই ছিল না, দু'হাতে নাক চেপে ধরে ভুঁয়ে পড়ে রতন গোঙাতে শুরু করল। ময়না কাপড়-চোপড় ঠিক করে গম্ভীর ভাবে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

রসিকতার জের স্বরূপ নাক দিয়ে পোয়াটাক রক্ত বেরিয়ে যাবার পর রতন উঠে বসল।

পটলা বলল, হয়েছিল কী রে? একটা মাগীর হাতে ম্যাড়া বনে গেলি?

কাৎরাতে কাৎরাতে রতন বলল, এমন আচম্কা ঘুষি চালাল মাইরি, তাল রাখতে পারলুম না। একেবারে নাকের ঠিক ডগাটায় — উঃ!

একটা বছর আটেক মেয়ে বলল, থাক থাক — আর কতা কোস না। অমন ষাঁড়ের মতো মরদ — লজ্জা করে না!

তার দিকে একবার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রতন বলল, আচ্চা বাবা, এক মাগে শীত পালায় না, আমিও দেখে নেব। ও শালীর ড্যামাক না ভাঙতে পারি তো —।

পটলা বলল, থাক, হয়েচে। একন ঘরে যা তো। নাক যে রক্তারক্তি হয়ে গেচে।

তীব্রদৃষ্টিতে ময়নার ঘরের দিকে তাকিয়ে রতন টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকল।

যে যার গর্তে ডুব মারল।

এর মধ্যে ময়নার এক ছেলে হল। সে এমন মেতে উঠল যে, সবারই কাছে বেজায় বেখাপ্পা ঠেকতে লাগল। দিনরাত যত্ন-আত্তি, নাওয়ানো-খাওয়ানো, কত কী! স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রোজগারে বেরোনো ছেড়ে দিল। পুঁজিপাটা যা ছিল, তাই ভেঙে খাওয়া চলতে লাগল।

খেঁদি-পিসির দলে যে এটা খাপ খাবে না, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা কোনো সম্পর্কেরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি সোমত্ত মেয়েরই ফি বছর ছেলে হত, একটি বছরও কামাই পড়ত না। কিন্তু ওই হওয়া পর্যন্তই। তারপর সে-সব শিশুকে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হত, দেখবার শোনবার কেউই থাকত না। বেশির ভাগই মরত, যারা হঠাৎ বেঁচে যেত তারা আর দশ জনের মতো বন্ধনহীন ভাবে বেড়ে উঠত। বাপ-মা'র ঠিক-ঠিকানা কেউ জানত না। তারা জানত, দলের প্রত্যেকেই যেমন একা, তারাও তেমনি।

মেয়েগুলোকে বয়স হবামাত্র নেবুতলার মতো সব জায়গায় চালান করা হত। দলের ও একটা মস্ত আয়। ছেলেগুলো পকেটকাটা থেকে হাতে খড়ি পেত।

এই সেখানকার নিয়ম।

এ হেন জায়গায় ময়না যখন তার ছেলে নিয়ে ঢলাঢলি শুরু করল, তখন সবার কাছেই সেটা বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা বলে মনে হল।

BanglaBook.org

খেঁদি বলল, ঘেন্না ধরালে! এ কি ভদ্দরলোকের ঘর নাকি লা? সোমত্ত মাগী, কোতায় দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেকবি, তা না, সোয়ামি সোয়ামি করেই গেল। আবার একটা কাঁটা খসেছে ত কি নাগিয়েচে দেকো না! বলি, তু মরলে ও কি তোর ছেরাদ্দ করবে?

ময়না শুনত সবই, কিন্তু গায়ে মাখত না।

ছেলে মাস দু'আড়াইয়ের হলে তারা আবার রোজগারে বেরোতে শুরু করল। বুড়ি হরিমতির ময়নার ওপর একটু টান ছিল, সে-ই থাকত ছেলের পাহারায়।

এক দিন সন্ধেবেলায় সে রাস্তার মোড়ে ডাকুকে রেখে ফিরে আসছে। আস্তানার ভেতরে পা দিতেই রতন এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

কী বাবা, বড় তেজ ফলিয়েছিলে সে-দিন!

তাড়ির গন্ধে চারিদিক ভরে গেল।

ময়না বলল, পথ ছাড়।

ফোঁস কেউটের ছা, কম নয় তার হাঁ — মাইরি, ছুবলে দিয়ো না যেন! আজও কি ঘুষি চালাবে নাকি? বলে ডাকল, পটলা —।

ময়না তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরটা থেকে আরো দু'জন নেমে এল। তার ভয় হল। কিন্তু সে ভাব চেপে সে বলল, তোর কী চাস শুনি?

হুঁ বাবা, পতে এসো! গুটি গুটি ওই ঘরটিতে ঢুকে পড়ো তো জাদু, না বেইজ্জৎ হবার শক আচে?

তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে ময়না বলল, আচ্চা, একটু সবুর কর না তোরা! ছেলেটাকে ছেড়ে এইচি ঢের'খন, এক পাক দেকেই আমি চলে আসব।

পটলা বলল, ছেলে দিয়ে কী হবে? ছেলে আর দেকতে হবে না! বেঁচে থাকলে অমন কত ছেলে হবে — ছেলের দুঃখু কী বাবা!

রতন জড়িত স্বরে ছড়া কাটল —

আমার সাগর পারের ময়না
শিকলি বাঁধা যায় না!
দেবো চাঁদির গয়না,
যাবার কতা কয় না।

ছিঃ মানিক, অমন কতা কইতে আচে?

ময়না দেখল মহাবিপদ। একমাত্র সম্বল ছুরিখানা, তা-ও ঘরে রয়েছে। খালি হাতে তিনটে পশুর সঙ্গে লড়া তো সম্ভব নয়।

এ-ধার ও-ধার তাকাতে তাকাকে হঠাৎ সে ছুট দিল। পটলা দৌড়ে গিয়ে তার কাপড় চেপে ধরল। কাপড় ছেড়ে দিয়ে সে আবার ছুটতে যেতেই রতন গিয়ে তার ওপর চেপে পড়ল।

ভেল্কি দেখাবার আর ঠাঁই পেল না ধন! চলো দিকি একন সুড় সুড় করে। কত ভেল্কি জানো ওই ভেতরে দেকাবে চলো।

ময়না ঝপটা-ঝাপটি কাকুতি-মিনতি অনেক করল। কিন্তু খিদে আর পশু-লালসা ছাড়া যাদের আর সমস্ত বৃত্তিই মরে গেছেস মিনতিতে তাদের মন ভিজবে কেন?

তিন জন তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে। ডাকু পথের ধারে বসে হয়রান হয়ে উঠেছে। ময়নার আসতে এত দেরি তো কোনো দিনই হয় না?

আরো খানিকক্ষণ বসে অস্থির হয়ে শেষে সে লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়াল। তারপর একাই ঢিকোতে ঢিকোতে আস্তানার দিকে চলল।

BanglaBook.org

সেখানে পৌঁছেই সে দেখল, মহা হৈ-চৈ বেধে গেছে। সামনেই একটা ঘরে অনেক লোক মিলে জটলা করছে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

খেঁদি বলছিল, তা এতে আর দোষের কী হয়েচে বাছা। রতনকে তো ছুঁড়িরা পছন্দই করে। তোমার যেমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব।

ময়না এক কোণে এলিয়ে পড়ে ছিল। মথায় চুল উষ্কখুস্ক, মুখ শুকনো, চোখ দু'ইঞ্চি বসে গেছে।

খেঁদি বলল, একানে পড়ে থেকে আর কী করবে বাছা, ঘরে যাও। ডাকু কিছু অবুঝ নয়, সে এলে বুঝবে। তা-ও বলি, যেকানকার যা নিয়ম, তা মানতে হবে তো? পেট চালাবার জন্য পথেই বেরুতে হচ্ছে যখন, তখন কি আর সোয়ামি ইস্তিরি ও-সব ভড়ং চলে? ভদ্দরনোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।

ঠিক ধরতে না পারলেও ডাকু মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল। সে নিঃশব্দে নেমে নিজের ঘরে চলে গেল।

ময়না বলল, তু একটা বিহিত করবিনে! এমনি করে —।

দু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

ডাকু উঠে তার কাছে এগিয়ে এসে বসল। একটু চুপ করে থেকে তাকে বুকে সাপটে ধরে লালসাজড়িত স্বরে বলল, তা হোকগে। থাকতেই হবে যখন হেতায়, তখন কী হবে ঘাঁটিয়ে! আয় তুই।

ময়না অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

তার মুখে মরমীর দরদের ছাপ একটুও নেই, আছে কেবল তপ্ত ভুখের জ্বালা। মত্ত পশুর মতো দু'চোখ জ্বলছে।

রতন তো? আর কেউ ছেল? বলে ডাকু তাকে কোলর ওপর টানতেই সে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর এক হাতে চোখের জল মুছে আরেক হাতে গায়ের কাপড়টা টেনে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

অস্ফুট শুষ্ক গলায় ডাকু বলল, কোতা চললি ময়না?

রতনার কাছে।

সে চলতে শুরু করল!

যেতে যেতে সে শুনতে পেল ডাকু বলছে, দোহাই তোরে, একটি বার আসিস রেতে॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
নুরবানু

কুরমান হাটে কাচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দেকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালী কিনবে না বেগুনী কিনবে চট করে ঠাওর করতে পারে না। অন্য দিন হাটে এসে তামাক কিনত, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনত, তিত-পুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

BanglaBook.org

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখে কুরমান। জোখা মেলে তো রঙ পছন্দ হয় না, রঙ মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাচের চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর কবুলত নেই, বর্ষায় চাষ করে কুরমান। তা-ও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভালো করে, যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

নুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিবগিন্নির খেজমত করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভালোমন্দ খেতে পায় মাঝে মাঝে। দরমা পায় চার টাকা।

কিন্তু শান্তি নেই। মনিব উকিলদ্দি দফাদার নুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে।

প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নুরবানু, মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।

কেন, কী করে?

খুক খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, আমোদ-সামোদ করে কথা কয়।

তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনো দিন।

না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয়নি। এক দিন নুরবানুর হাত চেপে ধরল। সে-দিনও কাঁদতে কাঁদতে নুরবানু বলল, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে খামচে দিয়েছে।

রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠল কুরমানের। বলল, তুই সামনে গেছিলি কেন?

কে বললে? যাইনি তো সামনে।

সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কী করে?

আমি ছিলাম ঢেঁকিঘরে। ও ঘরে ঢুকে বলল, বীজ আছে ক'কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি, পাছ-দুয়ার দিয়ে ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।

তবু সে-দিনও সে মারেনি নুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য! গরিবের বউয়ের কি একটু ছুরৎ থাকতে পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলায়ও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?

খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমন্ত লোক, থানা-পুলিশ সব ওদের হাতে, ওদের অনেক দূর দিয়ে আমাদের হাঁটা-চলা। কাজ-কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনী পাকানো।

হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে ঝিম মেরে গেল।

এ-সব কোত্থেকে?

মুনিব গিন্নি দিয়াছে।

কিন্তু জিজ্ঞেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পেছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাচের চুড়ি, কাল আংটি-চুটি। নোনা জমি এমনি করেই আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

খুলে ফেল শিগ্‌গিরি। গর্জে উঠল কুরমান।

BanglaBook.org

সাজবার ভারি শখ নুরবানুর। সে হয়তো একটু টালমাটাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। পট পট করে ভেঙ্গে গেল কতকগুলি। হেঁচকা টান মারল খোঁপায়। একটা কুণ্ডলি-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠল।

ডুকরে কেঁদে উঠল নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায় জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনো দিন। বাবা, ভয় করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে, কিষাণের বউ সে, ঠুঁটো পাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তার দরকার কী।

কিন্তু এ কী! হাটের থেকে তার জন্য চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাক টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগল নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ এক সঙ্গে ছুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে টিপে আস্তে আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত, তার গায়ে সে হাত তোলে কী করে?

তুমি কেন মিছি মিছি বাজে খরচ করতে গেলে। এ-দিকে তোমার একটা ভালো গামছা নেই, লুঙ্গি টা ছিঁড়ে গেছে।

যাক সব ছিঁড়ে-ফিড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

তোর চুল বাঁধা দেখিনি কোনো দিন।

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন্ ঠুন্।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম? কম কি এক বেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার?

কিন্তু সে-দিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এল। ফরসা রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

এ শাড়ি এল কোত্থেকে? বর্শার মুখের মতো চোখা হয়ে উঠল কুরমান।

আজ যে ঈদ, খেয়াল নেই তোমার? ঈদের দিনে মুনিবগিন্নী দিয়েছে শাড়িখানা।

ঈদের দিন হলেও নরম পড়ল না কুরমান। ফিরনি-পায়েসের ছিঁটেফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায়?

না, নরম পড়লো না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘষা জিভ। ফাঁই ফাঁই করে সে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। এবার আর সে হাটে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার শখ কেন? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এত সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে? গা বেয়ে বেয়ে শেষকালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপমারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এই নিরিবিলি শান্তির মতোই শাড়িখানা। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্য তার এতটুকু কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনল নুরবানুকে। নিয়ে এল পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র্য লাগুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক। বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

BanglaBook.org

ধান কাটতে মাঠে গিয়েছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে টিপে দুপুরবেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্য ঝুমকো, পায়ের জন্য পঞ্চম, গলার জন্য দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বলল, কই গো বিবিজান। দেখো এসে কী এনেছি।

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু স্থির। রুপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপর বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব, তিন নম্বর দফাদার, চার নম্বর একটা মাংসখেকো জানোয়ার।

চলে যান এখান থেকে। চোখে-মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝপসা গলায় বলল নুরবান।

তোমার জন্য লবেজান হয়ে আছি। এই দেখো, জেওর এনেছি গড়িয়ে।

দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে শোর তুলব এখুনি।

কিন্তু শোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধহয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রুপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুশির ঝলকানি, কত না জানি ঠাট্টা-বটকেরা, কত না জানি হাসির বুজরুকি। রঙ-সঙ আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কত না জানি যোগসাজসের শর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেল কুরমানের, চারপাশে চেয়ে দেখল সে অসহায়ের মতো। দেখল ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

এখানে কেন?

ধানাই-পানাই করতে লাগল উকিলদ্দি। শেষকালে বলল, লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কি না দেখতে এসেছিলাম।

তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?

বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার, আমার যেখানে খুশি আমি যাব-আসব।

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরল। লাগল ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি। উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল, দেখেনি কুরমান। তাছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর জেল্লা নেই শরীরকে সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগোছাটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল নুরবান। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এল সে হন্তদন্ত হয়ে, শিক্‌রে পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল উকিলদ্দির ওপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না। শুধু শুরু হয় লটপাট।

কী চোখে দেখল ব্যাপারটা কে জানে, কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুঁটি ধরে, তুই, তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে। কেন পরপুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি শুরু করে দিয়েছিস? উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেল সে নুরবানুকে।

আর যেমনি এল এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়ল কুরমানের মাথায়। মনে হল, নুরবানুই যেন লাঠি মারল। মনে হল কুমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মতো চেঁচিয়ে উঠল, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক — বাইন।

ব্যাস, উথাল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হয়ে গেল। রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোঠ লাগত না। আঁধার দেখতে লাগল চারদিকে।

নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাঁইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। ফকির ফতুরের মতো তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা সুখে হাসতে লাগল উকিলদ্দি।

লোক জমতে শুরু করল আস্তে আস্তে।

কুরমান গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বলল নুরবানুকে, ও কিছু হয়নি, চলে যা ঘরের মধ্যে।

সত্যিই যেন কিছু হয়নি, এমনি ভাবেই আঁচল গুটিয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউয়ের মতো।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক-দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা-আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে ঘরে তুলতে পারবে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি বরদাস্ত করতে পারে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রি পর হয়ে যাবে? কুরমান কেঁদে উঠল।

পর বলে পর! এ-পার থেকে ও-পার। একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘুড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

মুখের কথাটাই বড়ো হবে? মন দেখবে না কেউ?

মুখের জবানের দাম কি কম? রঙ-তামাশা করে বললেও তালাক তালাক। আর এ তো জল জীওন্ত রাগের কথা, গলা দরাজ করে দিন-দুপুরে তালাক দেওয়া।

আর দস্তুরমতো সাক্ষী রেখে। ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

এখন উপায়? নুরবানুকে আমি ফিরে পাব না?

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসল ফরমান দিতে। ইদ্দতের পর কেউ যদি নুরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর কুরমানের পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিরিয়ে দেবার জন্য কে বিয়ে করবে নুরবানুকে? আর কে? দাড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে উকিলদ্দি বলল, আমি বিয়ে করব।

কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশের হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইনাম, মোল্লা-মুনশী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মানী-গুণী লোক সব। এদের অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেল কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবে না আর নুরবানু। বিরানা পরপুরুষের ঘরে কী করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়েছেলে? পাশ গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল নুরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নিচে।

তাছাড়া আর কী? কুরমানের হাতের নাগালের মধ্য দিয়ে চলে গেল, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে সে ধরে রাখতে পারল না। সামান্য ক'টা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানত! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

দাউল হয়ে কুরমান চলে গেল দক্ষিণে। নুরবানু ছাড়া তার আর ঘরদুয়ার কী! ঘরের উইয়ে খাওয়া পাটঘড়ির বেড়া ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তেমনি ভেঙে ভেঙে পড়ছে তার বুকের পাঁজর। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে ভেসে ভেসে বেড়ায়।

BanglaBook.org

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাঁপ খোলে। কোথায় নুরবানু? চৈতী মাঠের মতো বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে এক দিন আসে নুরবানু। যেন একটা অন্যায় করছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নুরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

নুরবানু বলে, না, এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক। বলে, তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম। বড়ো মন কেমন করে।

বড়ো কাহিল হয়ে গেছে নুরবানু। বড়ো মনমরা। গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জুলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা-ওটা একটু-আধটু গোছগাছ করে দেয় নুরবানু। ঘরের মধ্যে নড়েচড়ে।

তোকে কি আর ফিরে পাব নুর?

নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেওয়া।

আমার কি মনে হয় জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এঁটে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।

ইস! নুরবানু ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল, দশ-সালিশ ওকে ছাড়বে কেন?

না ছাড়লেই-বা কী, ও স্পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়।

ইস, করুক দেখি তো এমন বেইমানি। আবার ফোঁস করে ওঠে নুরবানু, বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।

নুরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

গা-টা তেতো তেতো করছে, জ্বর হবে বোধহয়।

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নুরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নুরবানুর ঘরের দরজায়। নুরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে। বলে, কেন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।

কবে আসবি?

দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্বাবার কলমা পড়বে। তার পরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও। কোথায় তা কে জানে। যেখানে এত প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ, দেদার আসমান।

শিগ্‌গির বাড়ি যাও, কুরমান চোর, কুরমান পরপুরুষ।

জুম্বাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কই, শনিবারে তো তালাক নিয়ে চলে এল না নুরবানু।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবে না নুরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ওই তিন তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মতো নয়, দেনাদারের মতো।

BanglaBook.org

উকিলদ্দি বলল, আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না, ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কী করে?

যত সব ফাঁকিজুঁকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে অষ্টঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসাল। জানাল তার ফরিয়াদ।

ডাকো উকিলদ্দিকে। জবাব কী তার? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে। কেন এজাহার খেলাপ করছে?

উকিলদ্দি বলল, বিয়েই এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকন্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকাপোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না। দরজায় খিল দিয়ে ভেবেছে কলমা পড়ার পরই বুঝি ও তালাকের কাবিল হল। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাঁটান-ছিঁড়েন হতে পারে কী করে?

সত্যিই তো। দশ-সালিশ রায় দিল। স্বামীর সঙ্গে এক রাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কী করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মতো।

ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল নুরবানু।

পরদিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উকিলদ্দি নুরবানুকে তালাক দিল।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই যাই করছে, নুরবানু চলে কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের হুঁকো ধরা, কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে কে জানে। চেয়ে আছে — শুনা মাঠের মতো চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের সব। ভাঙন নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মতো চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকাল নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরঙে নতুন শাড়ি। পরতে পরতে যেন খুশির জলের স্রোত।

সে-জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা-মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মাংসের গন্ধ।

সে-জলে আর স্নান করা যায় না।

ইদ্দত, আমি এখানেই কারবার করব। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি। নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নেবা হুঁকোয় টান মারতে মারতে কুরমান বলল, না, আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে॥

প্রবোধকুমার সান্যাল
অঙ্গার

বছর আষ্টেক হল দিল্লিতে আমি চাকরি করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক-আধবার আসি, ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নইলে ইদানিং আর আসা হয়ে ওঠে না।

BanglaBook.org

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল — ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হতে চলল আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছু দিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম, কিন্তু সেখানেও আর থাকা চলল না। তোমার ভগ্নিপতি এক-আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তা-ও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতো দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন করে হোক মানুষ করে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথাও থকেবে না। এ-দিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। নুটু পাস করে চাকরি খুঁজছে, এখনো কোথাও কিছু সুবিধে হয়নি। মা ভেবে আকুল। স্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কোম্পানির কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া করে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহলে অনেকটা সাহায্য হতে পারে। ইতি —

দিল্লীতে আমার এই চাকরির খোঁজ প্রথম পিসেমশাই আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়ের প্রতি আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠল। সেই দিনই আমি পঁচিশটি টাকা পাঠিয়ে দিলাম এবং শোভনাকে জানালাম, তোর ছেলে যত দিন না উপার্জনক্ষম হয়, তত দিন প্রতি মাসে আমি তোর নামে পনেরো টাকা পাঠাব।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, নুটু, হারু — সকলের সঙ্গেই আমার চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পুজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতাম। তিন বছর এইভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কী প্রকার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কীভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহু লোক মফস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শেভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলাম, ফরিদপুরে জিনিসপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে — ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিতই প্রাপ্তি স্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এ-রকম করে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিন কয়েক বাদে টাকাটা দিল্লিতে ফেরত এল। জানতে পারলাম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তারা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলাম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছু কাল পরে আবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালাম, কিন্তু সে-টাকাও যথাসময়ে ফেরত এল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, টাকার দরকার হলে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা তো আর তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হল এই মাত্র সে-দিন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলাম, এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাব ফরিদপুরে, সোমবারটা নেব ছুটি — দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশোনা করে ফিরব। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোনো আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হল কেন? শুনেছিলাম ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়েছিল, তবে কি তাদের এক জনও বেঁচে নেই? মনে কতটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ কী।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলাম এবং এসে উঠলাম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর এক দিকে হয়ে উঠেছে কাঙালিপ্রধান ও আর এক দিকে চলছে যুদ্ধ-

সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরিব গৃহস্থ ছিল, তারা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ; গর্ভনমেন্ট বলছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু সে-আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহ খানেক ধরে আবার কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আর কোনো দিকে মন দিতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোটপিসির মেজ ছেলে টুনুর সঙ্গে এক দিন শেয়ালদার বাজারে কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলিতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁ-হাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়াল। বললাম, কী রে টুনু?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধহয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্ত কণ্ঠে বলল, কবে এলে ছোড়দা?

তার হাত ধরে বললাম, তোদের খবর কী রে?

খবর? বলে সে পথের দিকে তাকাল। মিলিটারি কসাইখানার মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বলল, খবর আর কী? কিছু না।

হাসি মুখে বললাম, এ কী তোর চেহারা হয়েছে রে! পঁচিশ বছর বয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুনু বলল, বাংলাদেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা।

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষা ছিল, হতাশা ছিল। বললাম, চাল কিনলি বুঝি?

টুনু বলল, না, অফিস থেকে পাই কন্ট্রোলের দামে। চার জন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশি পাইনে। এই তো যাব, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো, দেখতেই তো পাচ্ছি। বেশ আছ। আচ্ছা চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললাম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস? তারা কি ফরিদপুরে নেই?

না — বলে একটু থেমে টুনু পুনরায় বলল, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়ো না ছোড়দা!

কেন রে? তারা থাকে কোথায়?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এফ্ নম্বরে। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কী একবার। আসি তাহলে। এই বলে টুনু আবার চলল নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

টুনুর চোখে-মুখে ও কণ্ঠস্বরে যে-রকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলাম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলির আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও তো কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হল, নটু হয়তো ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠল এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশি মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনের ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কন্ট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠল লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়াখেলায় কেউ কেউ হল সহস্রপতি। হয়তো নটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে কী না সম্ভব?

ওদের খবর নেব কি নেব না এই তোলাপাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ অফিসের সাহেব জানালেন, আগামী কাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

BanglaBook.org

আমারও এখানে থাকতে আর মন টিকছিল না। আমার হোটেলের নীচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙালির কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই ক'টা দিন কোনো মতে কাটিয়েছি, আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁত খুঁত করছিল। বিশেষ করে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া-গেল।

বৌবাজারে ঠিকানা খুঁজে বের করতে আমার বিলম্ব হল না। মনে করেছিলাম তারা যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা চমক দেব। কিন্তু বাড়িটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এ-দিকে মনিহারি দোকান, ভেতরে ভূষিমালের আড়ত। নিচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নিচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোনদড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপরতলাটায় লক্ষ্য করে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে বিলম্ব হল না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে দেখলাম। না, ভুল আমার হয়নি — টুনুর দেওয়া এই নম্বরই ঠিক।

এ-দিক ও-দিক দু-চার জনকে ধরে জিজ্ঞেস পড়া করতে গিয়ে যখন গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বারো-তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপরতলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার-পাঁচটি লোক উপর থেকে নানা রঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলাম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলাম, মিনু?

মিনু ফিরে তাকল। বললাম, চিনতে পারিস আমাকে?

না।

তোর মা কোথায়?

ভেতরে।

বললাম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল দেখি? এ যে একেবারে গোলকধাঁধা। আয় নেমে আয়।

মিনু নেমে এল। বলল, কে আপনি?

পোড়ারমুখি। বলে তার হাত ধরলাম — চল ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বলব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস?

আমাকে দেখে উপরতলাকার লোকগুলি একটু সরে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম, আমার হাতের মধ্যে মিনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তার ভালো লাগেনি। তার দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলাম। মিনু তখন বলল, ওই যে, চৌবাচ্চার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চলে যান, ও-দিকে সবাই আছে।

এই বলে সে উপরে উঠে গেল। চোখে-মুখে তার কেমন যেন বন্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। এই সে-দিনকার মিনু — পরনে একখানা পাতলা সস্তা ডুরে, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা — এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে তার সর্বাঙ্গে। তার অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলে ভিতরের দিকে পা বাড়ালাম।

বিস্ময় চমক দেবার উৎসাহ আমার আর ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, পিসিমা?

কে? ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এল এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়াল। বলল, কাকে চান?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রঙ কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ, পরনে নীল কাচের চুড়ি। এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশি। বললাম, তুমি কে? এই বলে অগ্রসর হলাম।

BanglaBook.org

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এল। দেখেই চিনলাম, সে হারু। হাসি মুখে বললাম, কী হারু, চিনতে পারিস? তোর মা কোথায়?

সে আমাকে চিনল কি না জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বলল, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে। অগ্রসর হয়ে বললাম, তো দিদি কোথায়?

দিদি এখুনি আসবে, বাইরে গেছে। আসুন না আপনি?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ির বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এর আগে এমন করে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দু'খানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এল, এ-পাশে নর্দমা, ও-পাশে কুৎসিত কলতলা। এক ধারে ঝাঁটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোর ভিড়! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন করে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এল।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, এ কী, নলিনাক্ষ যে? কবে এলে?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান আহ্নিক পূজা গঙ্গাস্নান, দান-ধ্যান — এ-সব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান-পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কত দিন মনে মনে প্রণাম করে এসেছি। কিন্তু তিন বছরে তাঁর এ কী পরিবর্তন? আমিষ রান্নাঘরে বসে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি?

বললাম, পিসিমা, প্রণাম করব; পা ছুঁতে দেবেন?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা ক'মাস হল এসেছি। তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কার খবর রাখে বল। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে।

আমি একটু থিতিয়ে বললাম, পিসিমা, আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলাম, কিন্তু আজ ছ'মাস হতে চলল আপনাদের কোনো খোঁজখবর নেই।

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি নলিনাক্ষ।

পিসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ঔদাসীন্য আর অবহেলায় ভরা। এক দিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলাম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আর্বিভাবে খুশি হননি, এ তাঁর মুখ-চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাঁগো, দিদি — ? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীলোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়াল। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনরায় বলল, তুমি বাজারে যাবে গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাটকা তপসে মাছ এসেছে। একেবারে ধড়ফড় করছে!

তার লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে এল। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে সরে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে নলিনাক্ষ?

বিশেষ কিছু না। বলে আমি হাসলাম, আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকব বলেই আমি এসেছিলাম পিসিমা।

BanglaBook.org

তা বেশ তো, বেশ তো — তবে কি জানো বাবা, খাওয়া-দাওয়া কষ্ট কিনা! বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁর দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললাম, শোভনা কোথায় পিসিমা?

সে আসছে এখুনি, বোধহয় ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ করে আমি বললাম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয়?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই? তবে তেলটা, নুনটা মাঝে মধ্যে আনে বৈ কী। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথার দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এল। বললাম, শোভনার ছেলেটি কোথায়? কত বড়টি হয়েছে?

পিসিমা বললেন, তার খুড়ো-জ্যাঠা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখল না নলিনাক্ষ। তাদের ছেলো তারা নিয়ে গেছে।

সে কী পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে? শোভনা পারবে থাকতে?

পারবে না কেন বল? এক টাকায় দু'সের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কী? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কত দিন। অসুখ হলে ওষুধ নেই। শাড়ি জোড়া বারো-চোদ্দ টাকা। চাল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কত দিন চোখ বুজে সহ্য করব নলিনাক্ষ? ভিক্ষে কি করিনি? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি। বলতে বলতে পিসিমা নিশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই, কেউ আমাদের চাল-ডালের খবর নেয়নি নলিনাক্ষ!

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললাম, পিসিমা, টুনুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কারো খবর নিতে পারে না। টুনুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলাম।

পিসিমা এতক্ষণ বসে ছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিও না বাবা।

এমন সময় মীনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়াল। বলল, মা, মা শুনছ? এই নাও একটা আধুলি, হরিশবাবু দিল।

মীনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরনের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীর ভাবে পুনরায় সে বলল, যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সে-ও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরো — বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেব তোর।

মীনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে সরে গিয়ে সে অনুযোগ করে কেবল বলল, তুমি তো বলেছিলে।

হারু ও-পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, ফের মিছে কথা বলছিস মীনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিতে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ বাবা। এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলাম। গলার ভিতর থেকে কী যেন একটা বারম্বার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না। আমি

BanglaBook.org

এই পরিবারে মানুষ, আমি এদেরই এক জন, অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন বলে জেনে এসেছি — এরা তারা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!

মনে ছিল না জানলাটা খোলা। বৌবাজারের পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। যেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা — ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারীর লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতর আর্তরব। জঞ্জালের বালতি ঘিরে বসে গেছে কাঙালিরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে পড়ে রয়েছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এ-দিকে মুখ ফেরাব, এমন সময় শুনি হারু আর মীনুর কান্না। পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছে হল, তাদের কোনো অপরাধ নেই। নিরপরাধীকে অপরাধী করে তোলার জন্য দিকে দিকে যে-সব ষড়যন্ত্র কারখানা তৈরি করা হয়েছে, ওরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই, বাইরে শোনা গেল কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এল।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তাকে ডাকতেই সে যেন সহসা আঁৎকে উঠল। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বলল, এ কী, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন করে?

বললাম, এমনি এলাম সন্ধান করে। কেমন আছিস তোরা শুনি?

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়ল। জড়সড় হয়ে বলল, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললাম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশি হলিনে তো?

শোভনা চুপ করে রইল। পুনরায় বললাম, এত দিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালাম, দিল্লিতে কেমন ছিলাম — এই সব গল্প করার জন্যই এলাম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এ-দিক ও-দিক চেয়ে আমি বললাম, কিন্তু এ বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না।

সবিস্ময়ের বললাম, ভাড়া লাগে না? অমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বলল, যাঁর বাড়ি সে-ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ।

শোভনা বলল, তাঁর কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা, তাই।

বোধহয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়াল, দেখি পাতলা জালের মতো শাড়িখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরুপাড় ধুতি পরে এসেছে।

বললাম, শোভনা, তোর ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস।

ঠিকানা ইচ্ছে করে দিইনি ছোড়দা।

কিন্তু মাসোহারার টাকাটা নেওয়া বন্ধ করলি কেন রে?

একটু থতিয়ে শোভনা বলল, ছেলের জন্যই নিতাম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে তো নেই, ছেলে আমার নয়, তাই নেওয়া বন্ধ করেছি।

BanglaBook.org

প্রশ্ন করলাম, তোদের চলছে কেমন করে?

শোভনা বলল, তুমি আজ এসেছ, আজই চলে যাবে — তুমি সে-কথা শুনতে চাও কেন ছোড়দা?

চুপ করে গেলাম। এ-কথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বললাম, নুটু কোথায়?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবার নেশা করতে শিখেছে, সব দিন বাড়িও আসে না।

বললাম, সে কী, নুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে? হারুর পড়াশুনোও তো বন্ধ। ও কী করে এখন?

শোভনা নত মুখে বলল, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সে-দিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন বসেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়াল শোভনার ওপর। কিন্তু অমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি শোভা। মীনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়িটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস তো।

বাইরে জুতোর মস মস শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলাম, আধময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল। মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, লোকটার বয়স বেশি নয়। চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বলল, কই, বিনোদ কোথা গেলে? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই! নেড়ি কুকুরের মতো পেছনে পেছনে আসে মেয়ে-পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে, দেখে এলাম গো। এই যে, এনেছ জলের ঘটি, দাও। এই দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলাম, বুঝলে বিনোদ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করত, যদি দু'টি চাল পাওয়া যায়। তারপর হল ভাঙা কলাইয়ের থালা, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না — কোথাও কিছু পায় না। আরে পাবে কোত্থেকে, গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই, দু'খানা কচুরি চিবিয়ে পড়ে থাকি। বলতে বলতে লোকটি ভিতরে দিকে চলে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে শোভনা বলল, উনি ছিলেন এখানকার কোন স্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে?

না। ওঁর সবই ছিল, যখন উপার্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তার জন্য আত্মহত্যা করেন। ছেলে দু'টি আছে মামার বাড়ি। ছোড়দা, বলতে পার আর কত দিন এমনি করে বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোনো দিন থামবে না?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলাম শোভনার দিকে। চোখের নিচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দু'খানা শির-ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখে-চোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম। সে-দিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা — আমার ছোট বোন — আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লকলকে হয়ে উঠেছে। আমার কোনো সান্ত্বনা, কোনো উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ করে

BanglaBook.org

থাকতে দিল না। এক সময়ে বললাম, শোভা, এটা তো মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টিকে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে।

মান-সম্ভ্রম? শোভনা যেন আর্তনাদ করে উঠল, কোথায় মান-সম্ভ্রম ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলাম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক্ হয়ে গেলাম! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড়? কোন মিথ্যাবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল করে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বার করে, সে-দিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে? যারা আমাদের বাঁচতে দিল না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারল, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে চুষে খেল, তাদের কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্র সমাজে কোথাও বাড়ল? যাও, খোঁজ নাও ছোড়দা ঘরে ঘরে গিয়ে। কাঙালিদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়িতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ি জ্বলে-পুড়ে গেল দু'টি ভাতের জন্য, কত দিদিমা-পিসিমা-খুড়িমা-বোন-বউদিদি আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্য। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে জানো? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে শুনেছ? মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইল কিছু ছোড়দা?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এত কাল দেখে এসেছি। তার এই মুখের উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এল। আমি বললাম, কিন্তু কন্ট্রোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় পাওয়া যাচ্ছে, তোমরা তার কোনো সুবিধে পাও না?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকাল। দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো এক প্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এল। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেলে উঠল। শোভনা হা-হা করে হাসতে লাগল। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিসিমার কাছে মার খেয়ে মীনু ও হারু এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বলল, কেন, কাঁদছিস কেন শুনি? দূর হয়ে যা সামনে থেকে!

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও-বাড়ির হরিশবাবুর কাছ থেকে মীনু পয়সা এনেছিল কিনা। হারু কী যেন বলে ফেলেছিল, তাই —।

শোভনার মাথায় বোধহয় আগুন ধরে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মা? কেন তুমি ওদের মারলে শুনি?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারব না? কলঙ্কের কথা নিয়ে দু'জনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেরে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে?

পিসিমা চিৎকার করে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কীসের লা? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ? পেটের ছেলে-মেয়েকে আমি মারব, খুন করব, যা খুশি তাই করব — তুই বলাবর কে?

BanglaBook.org

শোভনা গর্জন করে বলল, পেটের ময়েরা যে তোমার পেটে অন্ন জোগাচ্ছে, তার জন্য লজ্জা নেই তোমার? মেরে মেরে মীনুটার গায়ে দাগ করলে, তোমার কী আক্কেল? একেই তো ওর ওই চেহারা, এরপর ঘর-খরচ চলবে কোত্থেকে? লজ্জা নেই তোমার?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙব শোভা, এই বলে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে, তাই চুপ করে ছিলাম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে বসে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় করেছিল? গাড়িভাড়া কার কাছে নিয়েছিলি তুই?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বলল, তাহলে আমিও বলি? মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায়? হরি-যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে? আমাকে কেরানীবাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল? উত্তর দাও? জবাব দাও? হোটেলের পাঁউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে? নটু বাড়ি আসা ছাড়ল কার জন্য?

মুখ সামলে কথা বলিস, শোভা।

এমন সময় বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়াল ঝগড়া মিটাবার জন্য। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর ভাই।

এ-রকম অবস্থার জন্য কার দোষ দিবি বল। তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মীনুর, এমনকী ওই বিনোদবালা, মাস্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোনো দোষ নেই। কিন্তু অপরাধ যাদের, তারা আমাদের নাগালের বাইরে শোভা। যাকগে, আমি এখন যাই, আবার এক সময়ে আসব।

শোভনা কেঁদে বলল, আর তুমি এসো না ছোড়দা।

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলাম। বললাম, পাগল কোথাকার!

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হল না বাবা নলিনাক্ষ। কিছু মনে কোরো না।

বিনোদবালা বলল, চলো, ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে-খেয়ে তৈরি হও দিকি? গলাবাজি করলে তো আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতাম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর, তাহলে এমন ঝক্‌মারি কাজে হাত দিতাম না।

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি করে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্য-কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালাম রাজপথের উপর দিগন্ত জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভলো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, সেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে বসে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা মাতৃরূপিনী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য ফোটা ফুলের মতো কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মতো নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নটু, মীনু — এরা কি সেই তারা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ নীতিভ্রষ্ট হল? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটল এমন করে? কোন দয়াহীন দস্যুতা এর জন্য দায়ী?

এই ক'মাসের মাসোহারার টাকাটা আনি অনায়াসে খরচ করতে পারি বৈ কী। অন্তত দিল্লি যাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ করে চলে যেতে পারিনে। সুতরাং অপরাহ্নকালটা নানা দোকানে ঘুরে ঘুরে

BanglaBook.org

কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকরা দশগুণ বেশি দামে চাল এবং পাঁচগুণ বেশি দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লাগলাম। কিনতে কিনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললাম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্যতায় কোনো গৌরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খাদ্যসামগ্রীকে ঘৃণ্য মনে হচ্ছে। খাদ্য আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে বলেই হয়তো খাদ্যের প্রতি এত ঘৃণা এসেছে। এ-সব পদার্থ আগে ছিল ভদ্রজীবনের নিচের তলাকার লুকানো আশ্রয়, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না, আজ সেটা যেন মাথার ওপর চড়ে বসে আপন জাতিচ্যুতির আক্রোশটা সকলের ওপর মিটিয়ে নিচ্ছে।

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলোকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় করে দু-তিন জন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলাম সেই সরু আনাগোনার পথের এক ধারে। মাস তিনেকের মতো খাদ্যসম্ভার কিনে এনেছিলাম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলাম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার ও-পাশ থেকে শোনা গেল, নারীকণ্ঠের সঙ্গে স্কুলমাস্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তাছাড়া নিচের তলাটা নিঃসাড়, মৃত্যুপুরীর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলাম। ডাকলাম, মীনু? হারু?

কোনো সাড়া নেই। যে-ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলাম, সে-ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আবার আমি ডাকলাম, মীনু, ও হারু?

বোধ করি বাইরে থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বলল, দিনরাত এত আনাগোনা কেন গো তোমার? মীনু ও-বাড়িতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও। হতভাগা, চামার!

আমি বললাম, শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি — ছোড়দা। দরজাটা খোল দেখি?

ছোড়দা? শোভনা তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল। অশ্রুসজল কণ্ঠে বলল, ছোড়দা, পেটের জ্বালায় আমরা নরককুণ্ডে নেমে এসেছি। তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধরে আমি তুললাম। বললাম, কাঁদিসনে, চুপ কর। তোরা তো একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি করে মরতে বসেছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি করেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে হবে শোভা। শোন, কালকেই আমি দিল্লি যাবে, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্য চারটি চাল-ডাল কিনে আনলাম, ওগুলো তুলে রাখ।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠল। যেন ভাবী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগল। রুদ্ধশ্বাসে সে বলল, তুমি বাঁচালে — তুমি বাঁচালে ছোড়দা। তোমার দেনা আমরা কোনো দিন শোধ করতে পারব না। এই বলে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের একটা পুঁটুলি রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্যসামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখল। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকির নিচে রেখে এল। বলল, ছোড়দা, মনে আছে কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে

কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতাম — পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না। মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে।

শোভনা করুণকণ্ঠে বলল, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না?

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ করে রইলাম। কারণ, সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছু জানা ছিল না। শোভনা পুনরায় বলল, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে ছোড়দা? ভাবো তো সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা ঢেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান, সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তারা ঘরে তুলে আনছে! মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দু'টি চোখ হয়তো সেই সোনার বাংলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এল, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। কেবল নিশ্বাস ফেলে বললাম, মনে পড়ে বৈ কী।

কিন্তু এ কী শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকাল। সভয়ে চক্ষু তুলে সে পুনরায় বলল, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালির কান্নায়? বলতে পারো তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, সহসা বাইরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর কম্পিত অধীর কণ্ঠে সে বলল, ছোড়দা এবার তুমি যাও, তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা — আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও ছোড়দা!

এগুলো তুলে রাখ আগে সবাই মিলে?

রাখব, ঠিক রাখব — একটি একটি চাল-ডালের দানা গুনে গুনে রাখব। কিন্তু এবার তুমি যাও ছোড়দা। আলো ধরছি, তুমি যাও। একটুও দেরি কোরো না লক্ষ্মীটি ছোড়দা।

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন এক প্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ে বলল, ওঃ, নতুন লোক দেখছি! চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরনে একটা খাকি শার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললাম, কে তুমি?

আমি কারখানার ভূত, স্যার। এই বলে হঠাৎ শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বলল, এসো, কথা আছে।

কথা কিচ্ছু নেই, ছাড়ো। বলে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে। লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বলল, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বলল, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে।

বাঃ, বেরিয়ে যাব বলে বুঝি এলাম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগলি।

চিৎকার করে শোভনা বলল, বেরোও বলছি শিগগির। চলে যাও, দূর হয়ে যাও ঘর থেকে!

লোকটা বোধহয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বলল, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠল?

শোভন আর্তনাদ করে উঠল, ছোড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই? দাঁড়াও, আজ খুন করব — বঁটিখানা।

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুল, রান্নাঘরের দিকে চলল। লোকটা এবার উঠে বাইরে এল। বলল, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেক বারই খুন করতে এল, বুঝলেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারি

BanglaBook.org

খেয়ালী। তবে কি জানেন স্যার, আমরা হচ্ছি এসেনসিয়াল সার্ভিসের লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা লক্কড় নিয়ে কাজ করি, মেয়েমানুষের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে। এ-সব জানে ওই আই-ই মার্কা লোকগুলো, ওরা নানা রকম ভাঁড়ামি করতে পারে।

এমন সময় উন্মাদিনীর মতো একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এল। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এল। লোকটি শান্তকণ্ঠে বলল, আচ্ছা আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা, এই যাচ্ছি সরে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধরে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের ঘরে রইলাম এ রাত্তিরটার মতো। কিন্তু মাঝরাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নইলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলাম। আচ্ছা বেশ, কাল না হয় আড়াই সের চালই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা স্কুলমাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বলল, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি বলে যাও! তুমি বলে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কত দিন বাকি?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলাম। শোভনার হৃৎপিণ্ড থেকে আবার রক্ত উঠে এল। বলল, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের বোলো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি...।

শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলাম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হল, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙালিরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে॥

বুদ্ধদেব বসু
রজনী হল উতলা

মেঘনার ঘোলা জল চিরে স্টিমার সামনের দিকে চলছে; তার দু-পাশের জল উঠছে, পড়ছে দুলছে, তারপর ফেনা হয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, জলকন্যার নগ্নদেহের মতো শুভ্র, দ্রাক্ষারসের মতো স্বচ্ছ। এক দিকে তরুপল্লবের নিবিড় শ্যামলিমা, অন্য দিকে দূর দিগন্তরেখার অস্পষ্ট নীলিমা।

খুব জোরে বাতাস বইছে কোন দিক থেকে, ঠিক করতে পারছিনে। এখানে-ওখানে ছোটো ছোট নৌকাগুলো তীরবেগে ছুটে চলেছে; ওরা সব পাল তুলে দিয়েছে, বাউলের গাত্রবাসের মতো নানা রঙের তালি দেওয়া পাল। আমাদের স্টিমার এদের মধ্যে পরিচারিকা-বেষ্টিতা রানির মতো চলেছে, সামনের দিকে চলছে।

এইমাত্র সূর্য অস্ত গেল। আমাদের সামনে পূব দিক, সন্ধ্যারানির লাজনম্র রক্তাভ মায়াটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছিনে, আমরা দেখছি খুব মস্ত এক টুকরো আকাশ, কুয়াশার মতো অস্পষ্ট; তার রঙটা ঠিক

BanglaBook.org

চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে, কে যেন তার মুখ থেকে সমস্ত রঙের ছোপ মুছে নিয়েছে। অমন বিবর্ণ, বিশ্রী, ম্লান চেহারা আমাদের দেশে আকাশের বড়ো একটা হয় না।

আমরা দু'জন পাশাপাশি ডেক-চেয়ারে বসে আছি, কারো মুখে কথা নেই। ও-দিকে হয়তো রঙের হোরিখেলা চলছে, কিন্তু আমাদের দিকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে এল নিখিল গগনব্যাপী এক নিষ্ঠুর নিশাচর পাখির ডানার মতো। নদীর ঘোলা রঙ কালো হয়ে উঠল, বিবর্ণ আকাশের বুকে একটি তারার মণিকা ফুটে উঠল।

আনি মুখ ফিরিয়ে ওর চোখের দিকে চাইলাম, আশ্চর্য! ওর চোখের কোনো রঙ আমি আজ অবধি ঠিক করতে পারলাম না। ও যেন ক্ষণে ক্ষণে বদলায়! কখনো সন্ধ্যার এই ছায়াটুকুর মতো ধূসর, কখনো ওই সুদূর তারকার মতো সবুজ, কখনো নদীর জলের মতো কালো, কখনো দিগন্তরেখার অপরূপ ভঙ্গিমার মতো নীল।

নীলিমা ফিক করে হেসে ফেলল, কী দেখছ?

আমি তার মাথাটি কাছে টেনে এনে তার ওই মায়াময় চোখ দু'টির উপর ঠোঁট রেখে নিঃশব্দে জবাব দিলাম। নীলিমার চোখ দুটি অবশেষে মুদিত হয়ে এল। আমি এই অবসরে তার সারা দেহের উপর একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে গেলাম। অপরূপ! বিশ্বশিল্পী তাঁর কত স্নেহ, কত সুধা, কত মমতা দিয়েই না এই নারীদেহ গড়েছেন। এ যেন একটি বীণা তা আপনা-আপনি বাজে না, তাকে কোলে তুলে নিয়ে কোনো সুররসিক সুরসাধনা করবে, এই তার সার্থকতা। আমি আর পারলাম না। সন্তর্পণে ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে তুলে নিয়ে বিপুল আবেগে জড়িয়ে ধরলাম।

নীলিমা আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তার চেয়ারটি আমার কাছে আরো একটু এগিয়ে এনে বলল, তোমার সেই কথাটা বলবে না?

কোন কথাটা?

সেই যে এক দিন বলেছিলে, মনে নেই?

এই উত্তেজনার ফলে তখনো সে একটু একটু কাঁপছিল। ওর বুক তীব্র নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুলছিল। এক-একবার ফুলে ফুলে উঠে ব্লাউজের নির্দিষ্ট সীমা প্রায় অতিক্রম করে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন পাত্র বেয়ে সুরা উছলে পড়তে চাচ্ছে।

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে-দিকে চোখ রেখে বললাম, হুঁ।

নীলিমা ছোটো মেয়ের মতো আবদারের সুরে বলে উঠল, না গো!

হঠাৎ যেন আমার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। আমি গলার সুরটা যথাসম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করে বললাম, আমার একটা অনুরোধ নীলিমা, তুমি এই একটি কথা আমার কাছ থেকে কোনো দিন শুনতে চেয়ো না।

ওর তরল আঁখির করুণা কামনা একসঙ্গে মিনতি ও অভিযোগ জানাল।

আমি পাশের একটা ইজি চেয়ারের দিকে চেয়ে বললাম, আচ্ছা, বলছি। কিন্তু যখন বুঝবে, এ-কথাটা তোমার না-শোনাই উচিত ছিল, তখন কিছু আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

নীলিমা কথাটা একটু পেছন দিকে হেলিয়ে বলল, আহা, তোমাকে আবার দোষ দেব। তুমি যে আমার বর!

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, বর বটে, কিন্তু এখনো তো স্বামী হইনি! আমি এখন যা বলব, তা শোনবার পর বর হবার সম্ভাবনাই লোপ পেতে পারে।

সেই জন্যই তো আরো বেশি করে শুনতে চাচ্ছি।

BanglaBook.org

ছ'বছর আগে আমি যখন প্রথম কলকাতায় যাই, তখনো আমাদের সেখানে বাড়ি হয়নি। কাজে-কাজেই ভবানীপুরের এক ব্যারিস্টারের আতিথ্য স্বীকার করতে হল। বাবার সঙ্গে ওঁদের পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল। নামও কি শোনা দরকার নীলিমা?

নাম না হলে কি গল্প চলে?

অন্য কোনো গল্প না চলতে পারে, কিন্তু আমার এ গল্প চলবে।

আচ্ছা বলে যাও।

তখন গ্রীষ্মের ছুটি। কলেজ থেকে সবে আইএ পরীক্ষা দিয়েছি। তখন আমার বয়স কাঁচা। দেহ-মনে সবে নব যৌবনের রঙ ধরেছে। পৃথিবীর অনেক কিছুই তখন আমার কাছে রহস্যময় আর তার মধ্যে সব চেয়ে রহস্য হল —।

নারী?

হ্যাঁ, নারী। মনে রেখো নীলিমা, তখন আমার সেই বয়স, যে-বয়সে একটুখানি শাড়ির আঁচল দেখলেই বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, একটু চুড়ির রিনিঝিনি শোনবার জন্য মনটা যেন তৃষিত হয়ে থাকে, যে-বয়সে মানুষ অঙ্কশাস্ত্র ছেড়ে কাব্যচর্চা শুরু করে, ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্টের চেয়ে বায়োস্কোপের অভিনয় বেশি পছন্দ করে।

সত্যি কথা বলব নীলিমা? তখন যখনই যেখানে কাঁচা বয়সের মেয়ে দেখতাম, ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে ওকে আমার নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসি, তারপর ওর সঙ্গে কথা কই, ওকে খুব আদর করি। আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে মেয়ে-স্কুলের গাড়ি আসা-যাওয়া করত, কত দিন তাদের কারো সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করবার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করেছি। আমার মগজের মধ্যে তখন অহর্নিশি যে-সব চিন্তা ঘুরে বেড়াত, তা শুনলে এখন নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে না।

আমার সেই সদ্যজাগ্রত প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে আমি সে-বাড়িতে গিয়ে একেবারে অগাধ জলে পড়ে গেলাম। বাবার বন্ধুটির তিন পুরুষ যাবৎ সাহেবি চালে থাকেন। তাঁর বাড়ির সব কায়দাকানুন, রীতি-নীতি আমার জন্মগত সংস্কারে কেমন বিসদৃশ ঠেকলে লাগল। হাজার হোক, খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে তো আমি! প্রথম প্রথম দু-চার দিন চলতে-ফিরতে পদে পদে এমন অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগল, যেন আমি জলের মাছ ডাঙায় উঠে এসেছি। তারপর ক্রমে ক্রমে সবই এমন সয়ে গেল, যেন আমি জন্মাবধি এই আবহাওয়াতেই বেড়ে উঠেছি। সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে, দিনগুলো দিব্যি সুখেই কাটছিল।

আমি হঠাৎ চুপ করে গেলাম। নদীর জল আর দেখা যাচ্ছে না, রাত্রির কালোয় সব কালো হয়ে গেছে। পুবের আকাশে যেখানে ছোটো মণিকাটি জ্বলছিল, সেখানে অনেক তারা দেখা দিয়েছে; ওরা বুঝি অমরাবতীর দুয়ারে জ্যোতির্ময়ী উষার ললাটের শিশিরবিন্দু। ডেকের উপর ইলেকট্রিক আলোগুলো দুলছে। নীলিমার কণ্ঠ শুনতে পেলাম, বলে যাও না! চুপ করে রইলে কেন?

আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না নীলিমা। একটু আলোতে এসো না। অন্ধকারে মুখ ঢেকে আছ কেন?

নীলিমা আমার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কোমল সুরে বলল, এই যে আমি। আমি তো দূরে সরে যাইনি। তুমি হাত বাড়ালেই যে আমাকে ছুঁতে পাও।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল, যেন আমি জলের নিচে ডুবে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ উঠে এসে আবার নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের অমৃত সেবন করছি। চেয়ারের হাতলের উপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আঃ এই যে তুমি নীলিমা! এত কাছে আমি তোমার কেশের সৌরভ পাচ্ছি, তোমার নীল চোখ দু'টির মধ্যে আমার নিজের চোখের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আমার ভয় নেই। আঃ নীলিমা, তুমি কী সুন্দর!

BanglaBook.org

নীলিমা শান্তকণ্ঠে বলল, তারপর কী হল?

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো আমি হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত বলতে লাগলাম, ও-বাড়ি তো বাড়ি নয়, যেন রূপের মেলা! যেন ফুলের বাগান! তাতে কত ফুল ফুটে রয়েছে। তারা রূপের জৌলুসে চাঁদনি রাতকে হার মানিয়ে দেয়, সৌরভের মাদকতায় বাতাসকে মাতাল করে তোলে। বলেইছি তো, আমার সেই সদ্যজাগ্রত অসীম তৃষ্ণা নিয়ে আমি তাদের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। পড়ে হঠাৎ জীবন-সূত্রের খেই হারিয়ে ফেললাম।

গৃহস্বামীর নিজের সাতটি মেয়ে, তার মধ্যে তিনটি বিবাহযোগ্যা। তাছাড়া তাঁর দূর সম্পর্কিতা নবযৌবনা আত্মীয়ার সংখ্যাও কম নয়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে মোট সংখ্যা বোধহয় বারো কি তেরোতে পৌঁছেছিল। তখন রোজই একবার করে শুনতাম, তবু ঠিক সংখ্যাটা এখন আর মনে নেই।

এই মেয়ের দল আমাকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলতে লাগল। অনায়াসে নাচিয়ে বেড়ানোর পক্ষে আমার মতো অমন সুপাত্র বোধহয় তখন পর্যন্ত পায়নি। তাছাড়া আমার বাপের টাকা আছে, নিজের চেহারাটাও নেহাৎ মন্দ নয়। কেউ কেউ যে আমার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ অভিপ্রায় পোষণ না করতেন, এমনও মনে হয় না। মাঝে মাঝে চাউনির বিজলি হেনে তাঁরা সে-কথাটি আমাকে জানিয়ে দিতেও ছাড়তেন না। ওদের লীলাচাতুরী, কলা-ছলা-ছলনাই বা কত ছিল! কথা কইবার সময় মুখটিকে খামকা খুব কাছে এনে হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া, চলতে চলতে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে চাবির গোছা দুলিয়ে আমার গায়ে ছোট্ট চড় মারা, ড্রেসিং রুম থেকে চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ দরজার আড়াল থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে কানে কানে একটা নেহাৎ অর্থহীন কথা বলে চট করে সরে যাওয়া — এ-সব তো ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সন্ধান যে একটিরও ব্যর্থ হয়নি, তা আমি স্বীকার করব। এদের কৌতুকলীলার মধ্যে পড়ে আমি যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম, কী যে হচ্ছে তা ঠিক ভালোমতো বোঝবার চেষ্টাও করলাম না। সেই উদ্দাম বন্যায় নিজেকে একেবারে নিঃসহায় করে ভাসিয়ে দিলাম। কী করব বলো? তখন তো আমার নিজের ওপরে কোনো হাত ছিল না।

গলার স্বর হঠাৎ নামিয়ে ফেলে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, আরো শুনতে চাও?

নীলিমা রুদ্ধস্বরে জবাব দিল, চাই।

আমার কলকাতার আসবার পর দিন কতক কেটে গেছে। এক দিন রাত্রে খুব আস্তে আস্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খুব আস্তে আস্তে, কী-রকম জানো? মধ্য রাতে দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ যেমন ধড়ফড় করে জেগে উঠে খুব জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে, সে-রকম নয়। ভোরবেলা শোবার ঘরে কেউ কথা বললে বা চলাফেরা করলে যেমন তা প্রথম স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়, তারপর ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠে মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে যায়, সে জেগে উঠে চুপি চুপি হেসে নিয়ে আবার চোখ বুজে পাশ ফিরে শোয়, অনেকটা সেই রকম। খুব আস্তে আস্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ মেলে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম, তাকাতেই মনে হল।

মনে হল প্রকৃতি চলতে চলতে যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে, যেন উৎসুক আগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠবার আগমুহূর্তে দর্শকরা যেমন হঠাৎ স্থির, নিঃশব্দ হয়ে যায়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃসাড় হয়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিমিকি খেলছে না, গাছের পাতা আর কাঁপছে না, রাত্রে যে-সমস্ত অদ্ভুত অকারণ শব্দ চারদিক থেকে আসতে থাকে, তা যেন কার ইঙ্গিতে মৌন হয়ে গেছে, নীল আকাশের বুজে জোছনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, এমনকী বাতাসও যেন আর চলতে না পেরে ক্লান্ত পশুর মতো নিস্পন্দ হয়ে গেছে। ওঃ নীলিমা, অমন সুন্দর, অমন মধুর, অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শান্তি আর আমি দেখিনি। আমি নিজের অজানিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলাম, কেউ আসবে বুঝি?

BanglaBook.org

অমনি আমার ঘরের পর্দা সরে গেল। ঘরের বাতাস মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আমার শিয়রের উপর যে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল, তা যেন একটু নড়ে-চড়ে সহসা নিবে গেল। আমার সমস্ত দেহ-মন এক স্নিগ্ধ অবসাদে শ্লথ হয়ে এল। আমি যেন কিচ্ছু দেখছি না, শুনছি না, ভাবছি না। এক তীব্র মাদকতার ঢেউ এসে আমাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর —।

নীলিমা, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? তোমার চুলের ফুলটি যে মাটিতে লুটোচ্ছে! তোমার আঁচল যে ধুলোয় খসে পড়েছে! নীলিমা —।

তারপর?

আজ এত দিন পর সবই কোমল স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। যেন অনেক দিন আগে দেখা স্বপ্ন — হাজার বছর, লক্ষ বছর আগেকার, গত জন্মের স্মৃতি। আমার কি তখন চৈতন্য ছিল? আমি কি তখন পরিষ্কার ভাবে সব বুঝতে পেরেছিলাম? কী জানি! কিন্তু আজকে কিছুই সত্য বলে মনে হচ্ছে। সব আবছায়া, বাসি ফুলের মতো ম্লান, অশ্রুপূর্ণ চোখে দেখা জিনিসের মতো ঝাপসা!

হ্যাঁ, তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কী কতগুলো খসখসে জিনিস এসে পড়ল, তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ ঝিম ঝিম করে উঠল। প্রজাপতির ডানার মতো কোমল দু'টি গাল, গোলাপের পাপড়ির মতো দু'টি ঠোঁট, চিবুকটি কী কমনীয় হয়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কী মনোরম, অশোকগুচ্ছের মতো নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দু'টি বক্ষ— কী সে উত্তেজনা, কী সর্বনাশা সেই সুখ, তা তুমি বুঝবে না নীলিমা।

তারপর ধীরে ধীরে দু-খানি বাহু লতার মতো আমাকে বেষ্টন করে যেন নিজেকে পিষে চূর্ণ করে ফেলতে লাগল। আমার সারা দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল, মনে হল আমার দেহের প্রতি শিরা বিদীর্ণ করে রক্তের স্রোত বুঝি এখুনি ছুটতে থাকবে!

বিপুল উত্তেজনার পর যে-অবসাদ আসে, তার মতো ক্লান্তিকর বোধহয় জগতে আর কিছু নেই। বাহুবন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল।

সত্যি বলছি, তখন আমার মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি যে, এ-ঘটনার মধ্যে কিছু আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক আছে বা থাকতে পারে। আমারও মনের মধ্যে তখন কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল — এ কে? কোনটি? এ ও, না সে? তখন নামগুলো জপমালার মতো মনে মনে আউড়ে গেছলাম, কিন্তু আজ একটি নামও মনে নেই। সুইচ টিপবার জন্য হাত বাড়াতেই আরেকটি হাতের নিষেধ তার উপর এসে পড়ল। আমার কণ্ঠের জড়তা কেটে গিয়েছিল, বেশ সহজ ভাবেই বললাম, তোমার মুখ কি দেখাবে না?

চাপা গলায় উত্তর এল, তার দরকার নেই।

কিন্তু ইচ্ছে করছে যে!

তোমার ইচ্ছে মেটাবার জন্যই তো আমার সৃষ্টি! কিন্তু ওইটি বাদে।

কেন? লজ্জা?

লজ্জা কীসের? আমি তো তোমার কাছে আমার সমস্ত লজ্জা খুইয়ে দিয়েছি।

পরিচয় দিতে চাও না?

না, পরিচয়ের আড়ালে এ রহস্যটুকু ঘন হয়ে উঠুক।

আমার বিছানায় তো চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

আমি জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।

ও, কিন্তু আবার তো খুলে দেওয়া যায়।

তার আগে আমি ছুটে পালাব।

BanglaBook.org

যদি ধরে রাখি?

পারবে না।

জোর?

জোর খাটবে না।

একটু হাসির আওয়াজ এল। শীর্ণ নদীর জল যেন একটুখানি কূলের মাটি ছুঁয়ে গেল।

তুমি যেটুকু পেয়েছ, তা নিয়ে কি তুমি তৃপ্ত নও?

যা চেয়ে নিইনি, অর্জন করিনি, দৈবাৎ আশাতীত রূপে পেয়ে গেছি, তা নিয় তো তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথা ওঠে না।

তবু?

তোমার মুখ দেখতে পাওয়ার আশা কি একেবারেই বৃথা?

নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্য?

না, তা হবে কেন? তা যে অফুরন্ত সুধার আধার।

তবে?

আমি হার মানলাম।

আমি আবার দু'হাত বাড়িয়ে ওর লতায়মান দেহটি সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম। নিঃশব্দে ও আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়ল।

আমাদের মাথার উপরে কোথায় যেন চাঁদ উঠেছে। নদীর কালো বুক হলদে হয়ে উঠেছে — এখানে-ওখানে রুপোর ছিটা। নীলিমা বুকে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ও কি আমার সমস্ত কথা শুনেছে! ওর ঠোঁট দু'টি পাপড়ির মতো শুকিয়ে গেছে। ও আমার পানে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? কী যেন বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভয় করছে। না জানি ও কী বলে বসে! জলেতে জ্যোছনায় মিলে যেখানে ছুটোছুটি করছে সেই দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালাম। ধোঁয়াগুলো উঠছে, নীল, মসৃণ, সরু রেখার মতো। স্টিমারটা কী বিশ্রী শব্দ করছে! ও কি অন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে? কোনোখানেই কি থামবে না? নীলিমার মুখখানা যে মরুভূমির উপরকার আকাশের মতো শুষ্ক হয়ে উঠেছে।

নীলিমা বলল, এইখানেই কি তোমার গল্প শেষ হল?

মাস্টারের কাছে ছাত্রের পড়া বলার মতো করে জবাব দিলাম। না, এইখানে সবে শুরু হল। কিন্তু এর শেষেও কিছু নেই — এই শেষ ধরতে পারো।

নীলিমা আর কিছু বলল না। আমি বলে যেতে লাগলাম, সেইভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে দেখি, বিছানার উপর রোদ এসে পড়েছে। সমস্ত বালিশে, চাদরে — সারা বিছানায় গত রজনীর তার গায়ের সৌরভটুকু প্রিয় স্মৃতির মতো লেগে রয়েছে।

পরদিন সকালে আমার কী লাঞ্ছনাটাই না হল! রোজকার মতো ওরা সব চারদিক দিয়ে আমাকে ঘিরে বসল, রোজকার মতো ওদের কথার স্রোত বইতে লাগল জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি সুরে, ওদের হাসির রোল ঘরের শান্ত হাওয়াকে আকুল করে ছুটতে লাগল, হাত নাড়াবার সময় ওদের বালা চুড়ির মিঠে আওয়াজ রোজকার মতোই বেজে উঠল, সবাকার মুখই ফুলের মতো রূপময়, মধুর মতো লোভনীয়। কিন্তু আমার কণ্ঠ মৌন, হাসির উৎস অবরুদ্ধ। গত রাত্রির পাগলামির চিহ্ন আমার মুখে, আমার চোখের কোণে লেগে রয়েছে মনে করে আমি চোখ তুলে কারো পানে তাকাতেও পারছিলাম না। তবু একবার লুকিয়ে প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম, যদিই-বা ধরা যায়! যখন যাকে দেখি, তখনই মনে হয়, এই বুঝি সেই। যখনই যার গলার স্বর শুনি, তখনই মনে হয় কাল

BanglaBook.org

রাত্রিতে এই কণ্ঠই না ফিস ফিস করে আমাকে কত কী বলেছিল! অথচ কারো মধ্যেই এমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখলাম না, যা দেখে নিশ্চিত রূপে কিছু বলা যায়! সবাই হাসছে, গল্প করছে। কে? কে তাহলে? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? তখন স্বপ্ন বলে সতি সত্যি বিশ্বাস করতে পারতাম, যদি না তখনো আমার সর্বাঙ্গে একটা গভীর অবসাদ অপ্রকাশ্য বেদনার মতো জড়িয়ে থাকত।

আমার অবস্থা দেখে এক জন বলে উঠলেন, আপনার চেহারা যে ভারি শুকনো দেখাচ্ছে!

বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো আমি তাড়াতাড়ি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। এই তো সুযোগ!

এ সময়ে কারো মুখ যদি একটু শুকিয়ে যায় বা একটু লাল হয়ে ওঠে, যদি কেউ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা একটু বিশেষ ভাবে হাসতে থাকে, তাহলেই তো আর বুঝবার কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু সবাই ঠিক একভাবে ঠোঁটের এক কোণে একটু হাসছে, কাউকে আলাদা করে নেবার জো নেই। আমার মনে হল, ওরা সবাই যেন আমার গোপন রহস্য জেনে ফেলেছে, যেন সবাই মিলে পরামর্শ করে আমাকে নিয়ে একটু রসিকতা করছে। কিন্তু এ কোন ধারা রসিকতা? আমি একটা খেলবার পুতুল নাকি? তারপর প্রত্যেকের প্রত্যেকটি চাউনি, প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি আমার এই সন্দেহকে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে তুলল, ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম বোধ হল, আমি অভদ্রের মতো কাউকে কিছু না বলে ছুটে বাগানে চলে গেলাম, একটু খোলা হাওয়ায় থাকবার জন্য।

দুপুর পর্যন্ত আমার সময়টা যে কী-ভাবে কেটে গেল, তা আর মনে করতে ইচ্ছে করছে না। রাস্কলনিকফ বোধহয় খুনী হয়েও এমন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেনি। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আমার গায়ে সর্বদা যেন কাঁটা ফুটতে লাগল। কারো সঙ্গে কথা কইতে পারলাম না, যখনই যে কাছে আসে, মনে হয়, এই বুঝি সে!

প্রত্যেকের সম্বন্ধেই সন্দেহ অন্যের চেয়ে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। আমার ঘরের মধ্যেও থাকতে পরিনে। মেঝের কার্পেট থেকে দেওয়ালের চুনকাম পর্যন্ত সব যেন আমার দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসতে থাকে, অথচ সবাকার দৃষ্টি হতে নিজেকে লুকিয়ে রাখাও তো চাই। কাজের অছিলা করে সারাটা দিন কলকাতার রাস্তাময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

কিন্তু দুপুরের পর থেকে আর এক নতুন সংশয় আরম্ভ হল। আজ রাত্রেও কি সে আসবে? আমার মধ্যে যা-কিছু ভদ্র ও মার্জিত ছিল, সমস্ত একযোগে বলে উঠল, না, আর আসবে না। আঃ, বাঁচা গেল! আমার আহত দর্প বলল, যাক, অপমান থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু আমার পিতৃপুরুষের রক্ত অস্থির হয়ে বলতে লাগল, না, আসবে, আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। যাও ফেরো, বাসায় ফেরো।

আমার মন ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করল, না, যাব না। নীলিমা, তুমি আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করো? সে বহু দূর থেকেও তার প্রিয়তমের আকুল আহ্বান শুনতে পেয়েছিল, এ তুমি সম্ভব মনে করো? এখন অবশ্য আমিও করি না। কিন্তু তখন, তখন আমার বাস্তবিক মনে হয়েছিল, সমস্ত ইট-পাটকেলের বেড়া যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে — আমি তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, কে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাস্তার সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে একটি ক্ষীণ, মধুর আহ্বান আমার কানে ভেসে আসল, কী অদ্ভুত, কী বিপুল, কী ভয়ানক নীলিমা, তা মনে করে এখনো আমার বুক কেঁপে উঠেছে। আমি ছুটে গেলাম, দিনের আলো নিভে যাবার আগে ছুটে ফিরে গেলাম আমার সেই ঘরে। সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না নীলিমা।

আমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এল। নীলিমার মুখের পানে তাকাতে সাহস হচ্ছে না, ইচ্ছে করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। সোজা সামনের দিক থেকে বাতাস আসছে, আমার চুল উড়ে উড়ে কপালে এসে পড়ছে, নীলিমার শাড়িও বোধ হয় নড়ছে; দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি। ও চেয়ারের দুই হাতলে হাত রেখে স্থির হয়ে বসে আছে, নিশ্বাস পড়ছে না, চোখের পলক নড়ছে না।

BanglaBook.org

স্টিমারের গতি বোধহয় ঘুরে গেছে, একাদশীর চাঁদের আধখানা আমার চোখে পড়ছে, কামধেনুর স্বর্ণশৃঙ্গের মতো। ডাইনিং সেলুনে বসে সাহেব-মেমগুলি ডিনার খাচ্ছে। মদের বোতল খোলার শব্দ, সোডার বোতল ভাঙার শব্দ, কাঁটা চামচে প্লেটের শব্দ, ভাঙা ভাঙা কথাবার্তার টুকরো সব ভেসে আসছে। সব কান পেতে শুনচি। নীলিমা স্টিমারে ডিনার খেতে ভারি ভালোবাসে, ওকে জিজ্ঞেস করব? কী জানি! আঘাত যা দেবার, তা তো দিলাম, এখন কি অপমানেরও কিছু বাকি রাখব না? অথচ আজকেই সূর্য অস্ত যাবার আগে ওকে বলছিলাম, নীলিমা, তোমার মতো কাউকে কখনো ভালোবাসিনি।

অনেক দূরে দিগন্তরেখার কোলে কীসের একটা আলো জ্বলে উঠল। আর একটা। আর একটা। পাঁচ নয় তেরো। আর গুনতে পারছি না। কীসের এত আলো! অতলশায়ী বাসুকীদেব কি আজ চিরন্তন শয্যাতল ছেড়ে তাঁর সহস্র মাথায় সহস্র মণি জ্বালিয়ে উঠে এলেন? না, এ বুঝি গোয়ালন্দ স্টিমারঘাটের আলো! স্টিমারের গতিও কমে আসছে, আমরা যে প্রায় এসে পড়লাম। আর তো সময় নেই।

অকস্মাৎ ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠলাম, নীলিমা, এতখানি যখন শুনলে, তখন দয়া করে বাকিটুকুও শুনবে নাকি? এইটুকু দয়া আমাকে করো নীলিমা। বাকিটুকু না বলতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাব।

বলো।

চমকে উঠলাম। এ কণ্ঠস্বর যে একেবারে অপরিচিত। এ কি নীলিমার?

ভেবেছিলাম, সমস্ত রাত জেগে থাকতে হবে। মনে সেই অবস্থায় সচরাচর ঘুম আসে না। কিন্তু অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনার ফলেই হোক বা পায়ে হেঁটে সারা দিন ঘুরে বেড়ানোর দরুন শারীরিক ক্লান্তিবশতই হোক, সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমে আমার সারা দেহ ভেঙে গেল। একেবারে নবজাত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর আবার আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙে গেল, আবার প্রকৃতির সেই স্থির, প্রতীক্ষমাণ, নিষ্কম্প অবস্থা দেখতে পেলাম। আবার আমার ঘরের পর্দা সরে গেল, বাতাস সৌরভে মূৰ্ছিত হয়ে পড়ল, জ্যোছনা নিভে গেল। আবার দেহের অণুতে অণুতে সেই স্পর্শসুখের উন্মাদনা, সেই মধুময় আবেশ, সেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট ক্ষয়ে ফেলা, সেই বুকের উপর বুক ভেঙে দেওয়া; তারপর সেই স্নিগ্ধ অবসাদ, সেই গোপন প্রেমগুঞ্জন — তারপর ভোরবেলার শূন্য বিছানায় জেগে উঠে প্রভাতের আলোর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়!

আবার দুপুর পর্যন্ত এই রহস্যময়ী গোপনচারিণীর পরিচয় জানবার অদম্য লালসা আমাকে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত, তারপর বিকেল হতেই সেই নিষ্ঠুর কামনা, সেই অলঙঘনীয় আহ্বান, সেই অপরাজেয় আকর্ষণ! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটতে লাগল। এর মধ্যে আমার চেহারা এত বদলে গেল যে, আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি চমকে উঠতে লাগলাম। দেহের সেই লাবণ্য শুকিয়ে গেছে, সে স্নিগ্ধ শ্রী ঝরে পড়ে গেছে। কিন্তু তখন আমার স্বভাবত শান্ত চোখ দু'টি নিরন্তর কোনো উৎকট তৃষ্ণায় হিংস্র পশুর মতো ধকধক করে জ্বলত। সেই ভীষণ চাউনি মনে হলে এখনো আমার গা শিউরে ওঠে।

ক্রমে আমার এমন অবস্থা হল যে, আমার সমস্ত সত্তা রাত্রির সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ল। কেবল ওইটুকু সময়ের জন্য আমি প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠতাম, অন্য সব সময় আমার অস্তিত্বের কোনো লক্ষণ আমি নিজে পেতাম না। সেই সময় কে আমার সম্বন্ধে কী ভাবচে, কী বলছে, ও-সব কথা আমার মনে ধার দিয়েও আসত না। আমাকে যেন সারা দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত। আমার মনের সমস্ত চিন্তা, প্রাণের সমস্ত আবেগ, দেহের সমস্ত বৃত্তি ওই একটি বাঞ্ছিত মুহূর্তের প্রতীক্ষায় একেবারে নিশ্চল হয়ে যেত। ওই একটি মুহূর্তের মধ্যে যেন অনন্তকাল বাঁধা পড়েছে, ওরই মধ্যে যেন বিশ্বজগতের ছায়া! ওর বাইরে সময় নেহ, জগত নেই, আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রাণ নেই, সুখ-

BanglaBook.org

দুঃখ কিচ্ছু নেই, শূন্যও নেই। রহস্যময়ীর রহস্য মোচন করবার জন্য মনের যে কৌতূহল একটা স্বাধীন চিন্তার রূপে, অস্তিত্বের একটু ক্ষীণ সাড়ার মতো আমার মধ্যে ঝিলমিল করছিল — তা-ও মিলিয়ে গেল। সেই কৌতূহলও আর রইল না। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে তখন নিশ্চয়ই আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম — এ-ও যদি পাগলামি না হয়, তবে আর পাগলামি কী?

এই উন্মত্ত লীলা কত দিন চলেছিল মনে নেই, কিন্তু কী করে হঠাৎ এক দিন চিরতরে থেকে গেল, তা বলছি। সেই রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকবার সময় চৌকাঠে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল, মধুর অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল। ক্লান্তি নীলিমা, অসম্ভব ক্লান্তি! বিছানায় উঠে যেতেও যেন ক্ষমতায় কুলোল না। সেই কার্পেটের উপর মাথা রেখেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই রাত্রে আর ঘুম ভাঙেনি।

দেশে ফিরে এসে শুনলাম, সেই রাত্রে আমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ে কার্পেট ভিজে গিয়েছিল। ওই অজ্ঞান অবস্থায় দু'দিন ছিলাম, সারাক্ষণ এত দুর্বল ছিলাম যে, ডাক্তাররা আশঙ্কা করছিলেন যে-কোনো সময়ে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমার জ্ঞান হারানোর জন্যও নাকি ভয়ানক শারীরিক দুর্বলতা আংশিক রূপে দায়ী। তাছাড়া মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়বিক দৌর্বল্য মিলে আমার শরীরকে নাকি এমন ভাবে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল যে, আর একটু হলেই একেবারে হাড়গোড় সুদ্ধ চুরমার হয়ে যেতাম।

ধীরে ধীরে সেরে উঠলাম। মনটা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল, তখন সেই অপরিচিতাকে জানবার জন্য সহস্র চেষ্টা করতে গেলাম, কিন্তু সমস্ত ছল, সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হল। কিছুতেই কোনো দিশে করতে পারলাম না। আজ পর্যন্ত পারিনি।

তারপর স্টিমারটা বিকট স্বরে শিঙা বাজিয়ে উঠল। আমার আর বলা হল না।

গোয়ালন্দ এসে পড়েছে। অতি সংকীর্ণ জলপথের মধ্য দিয়ে আমাদের স্টিমারখানা খুব সাবধানে আপনাকে বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে চলছে। একটা বিশাল ফ্ল্যাট সামনে এসে পড়েছে, ঝন ঝন কড় কড় করে নোঙর নেমে যাচ্ছে, ভস ভস করে রাশি রাশি বাষ্প বেরুচ্ছে। এতখানি পথ নিরাপদে অতিক্রম করে এসে স্টিমারটা যেন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু দুলছে, আমাদেরও দোলাচ্ছে। ঘট ঘট করে সিঁড়ি ফেলা হচ্ছে, খালাসিরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে, কুলিরা দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অনিশ্চিত সিঁড়ি ডিঙিয়ে দুড়দাড় করে উপরে উঠে 'ফাস্টো কেলাসে'র মাল নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে, থার্ডক্লাসের যাত্রীরা ব্যাগ হাতে করে প্রতীক্ষা করছে। আমাদেরও নাবতে হবে তো! এখানে অসংখ্য স্টিমার ফ্ল্যাটের ব্যূহ ভেদ করে চাঁদের আলো ঢুকতে পারছে না। গ্যাসের আলোয় নদীর কালো জল আগুনের মতো জ্বলছে, ডাঙায় রেলগাড়ির সিংহনাদ শোনা যাচ্ছে। উঃ, কী ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে চারদিকে থেকে।

এতক্ষণে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। দুটো কুলি ডেকে ওদের মাথায় জিনিসপত্রগুলো চাপিয়ে দিয়ে ওদের আগে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর নীলিমার একটু কাছে সরে এসে বললাম, গাড়ি ছাড়বার আর পনেরো মিনিট বাকি। এ গাড়িতে চাপলে কাল ভোর নাগাদ পৌঁছব। কাল বুধবার। রবিবার তারিখ ফেলা হয়েছে। মাসের তিনটে দিন হাতে থাকে। তুমি আজ ছাড়বার সময় যে-কথা বলেছিলে, এখনো কি সেই কথা বলছ?

নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠল, কিন্তু কী বলল, শুনতে পেলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্টিমারের বাঁশিটা অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠল। নীলিমার মুখের ওপর স্টিমারের চোঙাটার ছায়া পড়েছিল।

আমি নীলিমার হাত ধরে সেই অন্ধকারের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম॥

BanglaBook.org

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সরীসৃপ

চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিন তলা বাড়ি। জমি কিনিয়া বাড়িটি তৈরি করিতে চারুর শ্বশুরের লাখ টাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তাহার টনটনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলিব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোনো দিন কোনো দিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমত আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়ত তাহার আধপাগল স্বামী বিশ বছরের মধ্যে এক দিনও প্রাণত্যাগ করিল না; অথচ এই বিশ বছরে প্রত্যেকটি মুহূর্ত বেশ ভালো মানুষের মতোই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ঙ্কর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়ত বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানা রকম মজা করিতে লাগিল। যে-দিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সে-দিকে সে তাহার অতিসাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আর যে-দিকে সর্বনাশের পথ খোলা রহিল সে-দিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্ত ভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে বাঁচানোই ছিল উচিত, তাহার মতো বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রইল তাহার নাম কিছুই না থাকা।

কোনো লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমীলর সঙ্গে সে লড়াই করিল, কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতেরো বছর বয়সে। বনমালী তখন পনেরো বছরের বালক মাত্র। চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাড়িতে স্ফুর্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোট দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, বউমাকে পাহারা দিস বুনো।

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বউ বলিয়া নয়, স্ত্রী জাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়িতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল! চারুর দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না; মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়িতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময়ে চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত, কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত এবং কর্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ি ছাড়িয়া মার জন্য মন কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত। কিন্তু অবুঝের মতো তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারা দিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া মাঝখানের দরজাটি খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, চুপ চুপ, বাবার হুকুম। এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনি যমের মতো ভয় করিত যে, আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িত।

BanglaBook.org

কয়েক বছর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, শহরের ভিতরে একটা বাড়ি করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোনো সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনি উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে, তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, ভগবান সুবুদ্ধি দিয়াছিলেন, তাই বাগানবাড়ি তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল ভাই। আমার সর্বস্ব গেছে, যাক, কী আর করব, সবই মানুষের কপাল। মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকশে হইয়া আসিয়াছে, কেবল এইটুকু লক্ষ্য করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল, নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধহয় ভালো লাগছে না ভাই?

বেশ লাগছে।

চারুর ছোট বোন পরী এক মাসের ছেলে কোলে কাছে বসিয়া ছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তাহার ভালো লাগিতেছিল না। এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন বনমালীদাদা। ডালনা নিশ্চয় ভালো হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কিছুতেই আমাকে রাঁধতে দিল!

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাপু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না?

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, ঘেন্না হত! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনে দিদি!

চারু একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা নে, না করিস না করিস, একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দে।

আমিও কথা বলছি।

চারু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের সময় সে-কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের মধ্যে খচ খচ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেটিকে শোয়ানোর প্রয়োজনটি এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া নাড়াইয়া বলিল, অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার? বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, দেখলে ভাই? শুনলে মেয়ের কথাবার্তা? আমি যে ওর ইয়ার? আর এই সে-দিনও কেঁদে কেঁদে আমাকে চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শ'পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও দিদি! টাকার বেলা দিদি, দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়।

বনমালী বলিল, ছেলেমানুষ, বোঝে না।

বোঝে না? হুঁ, কচি খুকি কিনা, বোঝে না! বোঝে সব, সব বুঝেও এমনি করে, এ আর আমি টের পাইনে? দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট বলতে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেয়নি।

BanglaBook.org

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ, আজ এক জন প্রৌঢ়া নারী এবং অপর জন মধ্যবয়সি পাটের দালাল।

খানিক পরে চারু বলিল, যা বলছিলাম। ভাগ্যি এই বাড়ি আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়িটা নিয়ে নেবে না, কিন্তু আর কারো কাছে বাঁধা রাখলে কী সর্বনাশ হত বলো তো!

তা বৈ কী। বাগানবাড়ি পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ি তো তুমি বাঁধা রাখোনি চারুদি, বিক্রি করেছিলে।

ওমা, সে কী! বাড়ি আমি বিক্রি করলাম কখন?

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো, তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার পাঁচ বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ি বিক্রি করেছ। বরাবর সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কী বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, তুমি হাসছ, তাই বলো।

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটি অভিজ্ঞতাকে বনমালি খুব দামি মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য সহজে দু'বার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, আমি বলি কী, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ি দিয়ে তুমিই-বা করবে কী? তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে যাও, বাকিটা আমাকে দাও। তোমার ত্রিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটখাটো বাড়ি তুলে বাস করিগে। জমি-জায়গা যা আছে দু-চার বিঘে তার খাজনা পাই না, ফসল পাই না, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোনো কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটি বজ্র পাখি হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া বলিল, তুমি ও-বাড়ি বিক্রি করিতে চাও? খেপেছ।

চারু সভয়ে বলিল, কেন? তোমার টাকা তো তুমি পাবে।

আমার টাকা চুলোয় যাক।

চারু আরো ভয় পাইয়া বলিল, রাগ কোরো না ভাই। মেয়েমানুষ, কিছুই তো বুঝিনে।

বনমালী বলিল, ভুবনের বাড়ি বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে? ও-সব দুর্বুদ্ধি কোরো না। সময়টা, কি জান চারুদি, আমার তেমন সুবিধা যাচ্ছে না। তোমার বাড়িটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, তারপর?

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, কিন্তু তোমার টাকা? তোমার তিরিশ হাজার টাকা?

ভুবনের কাছে জমা থাকবে।

এ-কথা কেহ বিশ্বাস করে! নির্মূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, কেঁদো না চারুদি। আমি তোমার পর? আগে তুমি আমাকে কত ভালোবাসতে।

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্য সত্যই আর কোনো আশা নাই।

BanglaBook.org

আমি যদি তোমার মনে কোনো দিন ব্যথা দিয়া থাকি, জেনো —।

বনমালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন?

চারু চোর বনিয়া গেল, যদির কথা বলছি!

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরো গম্ভীর হইয়া বলিল, ভুবন কোথায় চারুদি?

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, ও ভুবন, ভুবন! একবারটি এ-দিকে শুনে যাও তো বাবা!

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপ থুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দু'টি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভালোবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

মাস খানেক পরে পরী শ্বশুর বাড়ি চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আর আসব না দিদি।

আরও এক মাস পরে বনমালী, তাহার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাস-দাসী ও মোট-বহর লইয়া শহরের ভিতরের বাড়ি ছাড়িয়া চারুর শহরতলীর বাড়িতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে, বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই?

বনমালী বলিল, অসুবিধে হলে এত দিন বাস করলাম কী করে চারুদি? সে-জন্য নয়। মনে করছি, বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দু'খানা ঘর তুলব ছাদে! মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।

চারুকে বলিতে হইল, আহা আসবে বৈ কী, সে কী কথা, বেশ করেছ।

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ি মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ি বনমালী দুই শত দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকার সদরের গেট হইতে পিছনের গলিতে খিড়কির দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তাহার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, অসুবিধে হচ্ছে চারুদি?

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয়।

না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।

কিছু দিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। দেশে-টেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বৈ কী।

দেশে কি বাড়ি ঘরদোর কিছু আছে ভাই, যে যাব?

হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ি হয়। জমি-জায়গা আছে, খাজনা পাওনা, ফসল পাওনা, সব লুটেপুটে নিচ্ছে। নিজে থাকলে লোকসানটা রদ হত।

জমি। জমি কই দেশে! কিছু কি আর আছে ভাই, আমার সর্বস্ব গেছে।

বনমালী তখনকার মতো চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা বলেন, হ্যাঁ রে, ওরা কি যাবে না?

কোথায় যাবে?

যে চুলোয় খুশি, আমাদের তা ভাববার দরকার? ক'দিন দেখ, তার পরে নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।

তাড়িয়ে দিতে পারব না মা। ও-সব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে নাহলে রইল।

BanglaBook.org

কয়েক দিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও? আমাকে বলোনি কেন চারুদি? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্ম-কর্মে আমি বাধা দেব কেন?

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে, ভুবনকে লইয়া এ বাড়ি হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তাহার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে এক পরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, কই, তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি? ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে। মামিকে বলছিলাম, স্বামী-শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার এক পা কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মামিমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই?

বনমালী একটি হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তাহার ভালো লাগে না।

তবু দেশ বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হত।

হায় রে কপাল, ওর আবার দেশ বেড়ানো।

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কী আর হইবে, থাক। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদির ভারটি আর এমন কী গুরু।

কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দু'টি কচি সবুজ ঘাসের শিষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাইয়ের মতো তাহাদের দু'টিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত।

তারপর এক দিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়গড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো! কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে!

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া চারু গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ার সে-চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটি বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, আমাকে নাও ভগবান, এবার আমাকে নাও।

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, অমন করে কাঁদিস নে পরী; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, কঁকিয়ে কঁকিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

ওকে এখন ও-সব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কি একটু কাঁদতেও পেরেছে রে? এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কি অসুখে পড়বে মেয়েটা? খানিক কেঁদে নিক।

পরী আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, দেখো কী নির্মম; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখল না!

ও-দিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে দম লইয়া পরী বলিল, ও মামিমা, দিদি কী করছে দেখুন।

BanglaBook.org

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

ধর তো, দেখেই আসি একবার।

বনমালী হাত বাড়াইল না।

আমি দেখে আসছি।

তুই এখানে বোস। পীরর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে এর রকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে লইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে-ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এ-সব তাঁহার ভালো লাগে না। সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্বদা তাঁহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোনো প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পরের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁজে শেষে কি তাহার তালু জ্বলিবে?

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, দরজা খোলো মা, দরজা খোলো। ও-সব কি করতে আছে? মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

বলিয়া ও-দিকের জানলায় সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মতো চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদর করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিরাজী তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, খোকাকে দিন, হাতটা বোধহয় ওর ভেঙেই গেল।

খোকাকে তাহার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, তোর ছেলেটা তো বেশ হয়েছে রে।

থাক, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সঙ্গত; কিন্তু সে বসিয়া রইল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনো দিন বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তাহার কাছে চিরদিনই চারুর ছোট বোন। আজ বনমালী লক্ষ্য করিল যে, বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তাহার ব্যবহার, তাহার মনোবিকার, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট স্বচ্ছ।

তোর ঘাড়ে কী লেগে আছে রে পরী?

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, কী লেগে থাকবে? কিছু না।

তুই পাউডার মেখেছিস?

পরী জোরে প্রশ্বাস লইয়া বলিল, মেখেছিই তো, একশো বার মেখেছি। আপনি কেন আমাকে কালো বলেন?

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধহয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তাহার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের মধ্যে কোন কারণে তাহার বুক সর্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিকমতো বুঝিবার উপায় রইল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিল। বলে, আমার মতো অবস্থা মাসিমা শত্রুরও যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনো দিকে কূল-কিনারা নেই মাসিমা, আমি অকূলে ডুবেছি।

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখো মা, কী করবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

BanglaBook.org

চারু মাথা ঠান্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটি পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে লইয়া কচি বোনটিও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোন দিক সামলাইবে!

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, কিছু রেখে গেছে?

না।

কিছু না? পোস্টাফিসে, ব্যাঙ্কে, তোর নামে কিছুই রেখে যায়নি?

কী রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি? মাস গেলে হাত-খরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাতত, রেখে যাবে!

আমি যা দিয়েছিলাম?

শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে, খাট পালঙ্ক ছাড়া।

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, তোর গয়নাও দেয়নি নাকি? তোকে যে আমি তেরো-চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে!

কিছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্স খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্যন্ত।

এমন চামার? তা, আর দুটো মাস ধৈর্য ধরে থাকলি না কেন? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।

বড় খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভালো লাগল না।

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, থাকতে ভালো লাগল না? মেয়েমানুষের অত ভালো লাগা মন্দ লাগা কী লো। যা কালকেই ফিরে যা তুই, বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।

পরী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, আছে ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের একটা রোজগার করে? তাদের দিয়ে যেতে হবে না? ও-বাড়ি আমি আর যাচ্ছি না বাপু, হ্যাঁ।

চারু আগুন হইয়া বলিল, ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি? তোকে খাওয়াবে কে শুনি? আমি! আর আমার সে-দিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।

আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না দিদি। ভাবতে হবে না তো আমাদের বাড়িতে এসেছিস কেন লো হারামজাদী?

তিন দিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত-পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

দেখ পরী, এত বাড় ভালো নয়।

নয় তো নয়, কী হবে?

খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি?

সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।

চারু বনমালীর শরণ নিল।

মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করেছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, আহা, যাবে বৈ কী চারুদি, যাবে। দু'দিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কী?

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

BanglaBook.org

পরদিন পরী মুখভার করিয়া বলিল, লেগেছ তো পেছনে? জগতে কারো ভালো করতে নেই।

তুই আবার কবে আমার কী ভালো করলি লো?

এখানে আছ কার জন্য? ভেবে দেখেছ একবার?

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, তোর জন্য না? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস।

তাই।

চট করিয়া ঘুরিয়া দুম দুম পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, ওর জন্য আমি আর কিছু করব না, করব না, করব না, এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।

পরীর ঔদ্ধত্য তাহার কাছে বেশি দিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানি বুঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশি কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা অনেক আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলে, খান, পেট আপনার ভরেনি। কখনো ভরেনি। আমি বুঝি না! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে?

বলে, কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন, বেশ রাঁধি।

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আবদারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছ দিদি? দুধটা এনে দাও। খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভালো হবে?

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকেও বেদখল করিতে চায় না। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু-চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হালকা কথা বলিবার সাধ জাগিল, কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কী করছেন।

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপি চুপি ঘরে আসে।

বলে, কী চাই বলুন।

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, পা কামড়াচ্ছে, কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না।

পরী বলে, কেষ্ট কেন ? আমি কি পা টিপতে জানিনে?

অবশ্য পা টেপে না, অত বোকা পরী নয়; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝি'র কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তনের জন্য কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তাহার পরিধির বাইরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।

ভাবে, কী মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে।

এক দিন একটু বেশি রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎ-চমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল। প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।

BanglaBook.org

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড় ভয় পাইয়াছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজখবর লইলে পরী খুব খুশি হইবে। বনমালীকে ও যেমন বাগ মানাইয়া আনিতেছে, ওকে একটু খুশি রাখা দরকার বৈ কী!

নিষুতি রাত, বাড়িটি এক-একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কী জানি, একটি বজ্র যদি তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে!

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দু-পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘগর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোট বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতো দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটি তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটি ভয়ানক চিৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য সে একটি অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাহাকে সে কী বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন ঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনো বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিড়-খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, এ কী মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সে-দিনকার কচি মেয়ে পরী। এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া লইল যে, তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটি সোনা মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারা জীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে।

হয়তো ভুবনকে না দিয়া এই বাড়িটি সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, ভুবন আর বাড়ি নিয়ে করবে কী চারুদি? পরীকে দিয়ে দিলাম।

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়া আসা টের পাইয়াছে। পাক টের। কাল তাহারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোনো কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দু'টি উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন দুঃখে? কপাল পুড়িয়া যাইবার তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে, বাড়ির ঝিয়ের চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠারো বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়িতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে। যত দিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে প্রশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহার গায়ে লাগিল কি? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক, তাহাতে গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

BanglaBook.org

এই কথাটি বার বার ভাবিয়া এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ লইয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ির গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণী দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে, কত যত্নে তাহাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য এমন ভাবে নিজের সর্বনাশ করিল, ইহার আকস্মিকতা, ইহার অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালোবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাত ছেলেমানুষি খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে-কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিন বছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ও-সব পাগলামি চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারো মধ্যে আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যে-দিকে যে-ভাবেই মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বছর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কী আছে যে, তাহার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে! মানুষটি একটু অদ্ভুত, একটু গম্ভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটি কী কারণে মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তাহার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তাহার মধ্যে সে তো তখনো কোনো আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তাহার নৈকট্যকে, তাহার নির্বাক আবেদনকে, তাহার দু'চোখের গভীর তৃষ্ণাকে সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তাহার হিসাব হয় না।

তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত?

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর একটু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, ইহার চেয়ে সে-ই যদি সেই সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাহাও ভালো ছিল, এ-রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু-তিন যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই শুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। ইহার কোনোটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমন অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন — এ-রকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারা জীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনি ভাবে বলিল, নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া লইয়া বাইরে আসিয়া চারু হাঁপ ছাড়িল।

কিন্তু তখনো আর এক জন বাকি।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

BanglaBook.org

এক মুহূর্তের জন্য তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী এক রকম জোর করিয়াই এক দিন তাহাকে প্রায়-চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সে-দিন যদি সে বাধা না দিত!

গাছের ডাল হইতে টপ টপ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, কী বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল।

বনমালী বলিল, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

হ্যাঁ। ক'দিন গরমে প্রাণটা গেছে। আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।

বনমালী আচমকা বলিল, ক্ষেন্তির মা দুশো টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?

চারু মাথা নাড়িল।

কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মা'র কী? হুট বলতে ও যেখানে খুশি যেতে পারে, আমরা পারিনে। আমাদের মায়া-মমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে —।

চারু একটি নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোনো, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করার কী দরকার কে জানে। কথা কি শুনবে মেয়ে? তোমাকে মানে, ফল-টল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা করে দেখো ভাই।

আগে চারুর সরকার প্রথমে গিয়া একটি আস্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিতে তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রী নিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে, তাহার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই, দেবতাকে এই কথাটি সে খুব ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে! পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিতে গিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বউয়ের কলেরা হইয়াছে। তাহাকে বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বউটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে লইয়াই মরীয়া হইয়া সে ধরনা দিতে আসিয়াছে। বউটির নাম কনক, বয়স অল্প। থুপ থুপ করিয়া পা ফেলিয়া উহার চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মতো।

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বৈ কী।

হ্যাঁ মাসিমা, ক'দিন থাকবেন আপনি?

চারু হিসাব করিয়া বলিল, আজ নিয়ে হল তিন দিন, আরও পাঁচ-ছ'দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায়। কিন্তু দেখি ক'টা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্ন-আত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখানে, পা গুটিয়েই বোসো না, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ ছেলেকে ওরা কী-ভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কী করে জানব? এত কাল একটা জমিদারি চালিয়ে এলাম, আমার কি ও-সব ভুল ভয় বাছা? সে-ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের পদ্মঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমাকে সব বলবে।

BanglaBook.org

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাহিরে থাকিলে ভাষায় একটু সংযম দরকার হয়, কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ি মনে করিবে!

কিন্তু যে যার হৃদয় চর্চা লইয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, আপনি তাহলে আছেন ক'দিন। আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসিমা। বাবার দয়া হতে দু'দিন লাগে কী তিন দিন লাগে ঠিক তো কিছু নেই, একা কী করে থাকবে এখানে ভেবে বড় ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর —।

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, মাসিমাকে প্রণাম কর শিশু।

কাল কনক ধরনা দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাহাদের এই বিপদ!

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছে, যে যাহা বলিতেছে, তাহাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এ-দিকে যাত্রীনিবাসের কর্তা একটি গাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগতই বলিতেছে, যাও না ছেলেছোকরা, হাসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি? আচ্ছা বেয়াক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোনো ভয় নেই — আমি বলছি কোনো ভয় নেই। রোগী হাসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্যন্ত ডিসেনফিট করে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কিছু হয় তো আমাকে বলবেন তখন।

হলে আর তোমার বলে কী হবে বাপু? এই ধরনের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্তা চোখ লাল করিয়া একবার তাহার দিকে তাকাইয়াছে, কিন্তু কোনো জবাব দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ি আনিতে পাঠাইয়াছিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহার দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

চারু বলিল, তা যাও না বাছা, হাসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয়? তারপর ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, এখানে এক জন ডাক্তার ডাকোনি, করেছ কী? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপর অন্য কথা। বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ি লইয়া চাকর ফিরিয়া আসিলে।

শিশুকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, আমার পাথরের বাটিটা?

বাটিটা বউদি নোংরা করে ফেলেছে মাসিমা।

চারু বিক্ত হইয়া বলিল, কেন নোংরা করেছে? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাপু। আচ্ছা, যা করেছে, বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও।

একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ি ফেল করব নাকি? যেমন আছে তেমনি এনে দাও।

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তাহার একখানি পরনের কাপড় মাটিতে বিছাইয়া বলিল, এইতে দাও। অনেক পরত কাপড়ে বাটিটি সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটুলি করিয়া চারু সেটি আলগোছে তুলিয়া লইল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া লইয়া চোরের মতো কয়েক বার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

BanglaBook.org

বাড়ি ফিরিয়া ধূলা পায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্মাল্য তুলিয়া দিল। বলিল, এক হাতে নয়, দু'হাতে ধর। ছেলের মা তুই, তোর তো সাহস কম নয় পরী! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল।

দুটো ভাত যে দিদি!

ভাত নয় প্রসাদ, খা।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্মাল্যপান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটি লইয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া, সোডা দিয়া অনেক বার মাজিল। নিজে এক ঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে সকলে ভালোবেসেছে ভুবন?

ভুবন অস্বীকার করিল।

তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমাকে ধরে আনলে কেন? আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, কী রে পদ্ম? সকলের ভাবসাব কী-রকম দেখলি বল তো?

পদ্ম জানাইল, সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালোও নয় কিন্তু। দু'য়ের মাঝামাঝি। পরী তাহার বোনপোকে ঠিক সময় মতো না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মা'র জন্য হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তার চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুরবেলা ভুবন চুপি চুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাহাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

কী জানো মা, মা'র মতো কেউ কি করে?

চারু বলিল, আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কী হবে? মারধর করেনি তো কেউ?

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে-কথা গোপন করিয়া গেল।

না, মারধার কেউ করেনি।

চারুর পুরা নাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরানি। এগুলি কেবল যে নাম তাহা নয়, মানান-সই নাম।

সারা দিন পরীকে চারু আজ বিশেষ ভাবে সুন্দরী দেখিল, অপরূপ অভিনব। পরী যতবার তাহার লাল করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্বাঙ্গে একটি শিহরণ বহিয়া গেল। ভাবিল, না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বৈ তো নয়।

শরীরটা চারুর ভালো লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটি আশঙ্কা সে মন হইতে কোনো মতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়, ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বউটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিন ঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটি নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটি অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবত মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল। আর খানিক পরে সে প্রথম বার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তাহার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তাহার শুকাইয়া গিয়াছে!

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাহাকে বলিল, ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শিগগির।

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল এক ঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড় বিড় করিয়া আপন মনে কী যে সে বকিতে লাগিল কেহ তাহার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর নাই বুঝুক বনমালী বারকতক তাহাকে শুনাইয়া দিল যে, ভুবনের জন্য তাহার কোনো ভয় নাই, ভুবনের ভার সে লইল।

পরীর মনে হইল তাহারও কিছু বলা দরকার।

ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনো।

কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহাদের একটি কথা বিশ্বাস করে! চল্লিশটি বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে — শুধু মৃত্যু কেন, যাহার বিধান তাহারও বোধহয় ক্ষমতা নাই যে, সে-শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

ক'দিন পরী খুব কাঁদিল। দিদি আমাকে বড় ভালোবাসত, এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তাহার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

এক দিনের তরে সুখ কাকে বলে জানেনি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে —।

বনমালী বলিল, শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।

পরী বলিল, হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে এ-রকম মরবার দাখিল হয়েছিল।

অথচ একটু যত্ন হয়নি।

না। নিলে তো কারো যত্ন! তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্য খেটে প্রাণটা দিয়েছে।

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, বড় ঘা খেয়ে গেল। আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কী বলো?

হলে না কেন?

পরী হাসিয়া বলিল, বাঃ বেশ, আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসেব থাকে? তুমি ঘরে এলে আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব!

বনমালী বলিল, তাই নাকি!

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনো পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সে-দিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলোচুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আলতা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া লইল। ছোট্ট একটি পান সাজিয়া মুখে লইয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপর বনমালীর বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়ায়া একটু হাসিল।

শোনো। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিংবোতল এনো, আমি মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো?

আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারি কাঁদছে পরী।

পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।

পদ্মের কাছে না দিলেই হয়।

আমাকে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয়।

না সাজলেই তোকে ভালো দেখায় পরী।

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া লইল। চোখ পাকাইয়া বলিল, তোকে না পাঁচশো বার বলেছি, বাবুর ধারেকাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না।

BanglaBook.org

পদ্ম এক গাল হাসিয়া বলিল, বাবু নিজে ডাকল গো। বলল, খোকাকে আন তো পদ্ম। ভয়ে মরি দিদিমণি।

তা যাই বল, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু। দেখলে বুকের মধ্যে টিপ টিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই অ্যাদ্দুর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।

পরী হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ করিস। তারপর কী হল বল।

ভয়ে ভয়ে খোকাকে তো নিয়ে গেলাম। বাবু কোলে নিল, আদর করল, চুমো পর্যন্ত খেল। তারপর বলল, বেশ ছেলেটা, না রে পদ্ম? লজ্জায় মরি দিদিমণি।

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, আচ্ছা পরের ছেলেকে তুমি এত ভালোবাসলে কি করে বলো তো? তোমার হিংসা হয় না?

বনমালী হাসিয়া বলিল, দু'দিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব কী? বরং তোর ছেলে বলে ভালোই বাসি।

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

এ কী পরিণাম? সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক!

আরশি কি প্রত্যহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালোবসা এর মধ্যে উবিয়া গেল কী করিয়া? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আরশিতে নিজেকে তাহার প্রত্যহ নূতন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক-একটি অভিনব ভঙ্গিমা আজো সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এর মধ্যে পুরানো হইয়া গেল। মাথায় না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায়?

পরীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনো চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম ঝি বড় মিথ্যে বলে নাই। বনমালীকে সে-ও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোনো স্তরই একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারে না। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুত গতিতে সমগ্র ভাবে আয়ত্ত করিয়া লয়। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনি অধীর। স্থূল হোক আর সূক্ষ্ম হোক, জীবনের রস বস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জব্দ করিয়াছিল চারু।

চারু তাহার প্রথম বয়সের নেশা। অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে-বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতার প্রথম হতাশা জাগে, চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহ-মন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে লইয়া খেলা করিত; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তাহার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘিরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মতো প্রতিভা নাই। বনমালীর পাকখাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নিচে জুঁই আর বেলফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায়, সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায়

BanglaBook.org

বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগরকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু প্রশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, কঁকায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলিতে থাকে, শোধ নিস; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন? শোধ নিস।

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া উঠে, কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা!

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে এ-বারান্দ ও-বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে উঁকি দেয়, বনমালীর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এক দিন নৈশ পর্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল বিছানায় উপুড় হইয়া সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিরদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বনমালীকে ডাকিয়া তুলিল।

ভুবন কী-রকম করছে দেখবে চলো!

কী-রকম করছে?

কাঁদছে আর ছটফট করছে। অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে?

আমি।

বনমালী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, দেখো তো কী করলে। নিভিয়ে দাও।

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটি চাহিয়া দেখিল না।

ঘরে যাও বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল!

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নিচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালীর পাশের ঘরখানি হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুয়ে থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কে রে? পরী নাকি? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কি করছিস পরী? বলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া যোগ দিলেন, মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে।

পরী তখন যে-কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিত হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটি চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ কী কাণ্ড মা। অ্যাঁ?

পরদিনটি কোনো রকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পরদিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, পরীকে পাঠিয়ে দে বনমালী।

দেব। এখন থাক।

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটি পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তাহার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

BanglaBook.org

হেমলতা অত জানেন না, তিনি আবার বলিলেন, না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস?

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, দু'টি খায়, ও আবার বোঝা কী মা?

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনির মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটি পর্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দু'দিন পরে আবার বলিলেন, যে রাগী মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয় না বাপু। কিন্তু চোখ মেলে তো এ আর দেখা যায় না বনমালী।

কী হয়েছে?

রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না বল?

বনমালী রাগিয়া বলিল, না। আমার রাগ হবে না, বলো।

হেমলতা গলা নিচু করিয়া বলিলেন, পরীর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস? ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল?

জানি! আমার চিঠি টাইপ করে।

আমি নিজের চোখে দেখেছি বনমালী। দুপুরবেলা সে-দিন চোরের মতো পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এ-দিক চেয়ে ও-দিক চেয়ে নিচে নেমে গেল।

কবে?

পরশু।

বনমালী হাসিয়া বলিল, পরশু তো? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারী চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা। পরী সে-রকম নয়।

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দঁড়ানো মাত্র মুখোশ গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেল তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত। আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভালো করিতে যাওয়া কি তাঁহার সাজে?

এ-দিকে বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এই রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মতো জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন নিভিয়া গেল কিছুই সে বুঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হেসে-খেলে দিন কাটাব? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকব? এক দিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ব? পায়ে ধরে যে-দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব?

এর মধ্যে শেষ কল্পনা দু'টিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালোবাসে। অন্তত তাহার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোনো কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, ভুবনকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে লইয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময় কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানা বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

BanglaBook.org

তাহার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মতো একটি কাজ পাইয়া বনমালী ভারি সুখী। বলে, ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়!

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে অ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিও। তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত।

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া লইতেছেন।

বনমালী বলে, আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।

হেমলতা বলেন, আমাকে চিতায় তুলে দিয়ে যাস।

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এ-দিকে ভুবন বার বার হলঘরে বড় ঘড়িটির দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকিয়া উঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে দুইটা বাজিতে চলিল কী করিয়া!

ঘড়ির ডায়ালটি ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটি বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারি কৌতুক করিয়াছে এমনি ভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটিকে শাসন করিয়া বলে, ভেঙে ফেলে দেব, পাজী কোথাকার।

ঘড়িতে ছ'টা বাজিতে আরম্ভ করা মাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, ছ'টা বাজল মামা।

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটি নীরব হয়, ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর এক প্রকার অদ্ভুত অনুভূতি হয়। ছ'টার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময় মতো ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই! যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়তো কাহার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে-আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে? তাহাকে একটু খুশি করিবার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাসে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য।

ভুবনকে সে যে ভালোবাসিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরো একটি গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত। চারুর জন্য ভুবনের শোক একটি বার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মায়ের জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই এক দিন সে ভুবনকে বলিল, একটা বাড়ি নিবি ভুবন?

নেব মামা।

আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ি লিখে দেব।

এ বাড়ি অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটি ছোট বাড়ি সম্প্রতি এক প্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়িটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল! কিন্তু পরী তো তাহার মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়িটিই দিয়া দিবে, এক দিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

BanglaBook.org

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে-জ্বালা তাহার কমিল না।

সারা দিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে, গৃহপালিত কুক্কুরীর মতো অপমান জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার পর পদ্মঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুড়িয়া মারিল। এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তের মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটিকে হ্যাঁচটা টানে কোলে তুলিয়া লইয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাশিতে কাশিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, কী করে এমন হল দিদিমণি?

পরী ফিস ফিস করিয়া বলিল, বাবুর কীর্তি পদ্ম। অন্ধকারে —।

পদ্ম চোখ মিট মিট করিয়া বলিল, সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। হুঁদো বেড়ালটার হয়েছিল দেখোনি? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই গা পুঁজে রক্তে —।

কয়েক দিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে লইয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপি চুপি ভুবনকে বলিল, মার কাছে যাবি ভুবন?

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, যাব।

এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপি চুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মা'র কাছে নিয়ে যাব।

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

মামাকে বলে যাই?

তবেই তুমি গিয়েছ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস? ছাই দেবে?

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মা'র কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল।

পরী বলিল, কাউকে কিছু বলিস নে কিন্তু খবরদার। বললে নিয়ে যায় না। যা রাস্তায় দাঁড়াগে।

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির পিছন দিকে গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তাহার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হন হন করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া স্টেশনে।

দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ও-পাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানি টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়িবার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

যা যা বলেছি মনে আছে ভুবন? কাল বিকেলে ঠিক ছ'টার সময় যেখানে গাড়ি থাকবে সেইখানে নেমে যাবি।

ভুবন বলিল, আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসি। পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, মামা দিয়েছে। ক'টা বেজেছে জানো? তিনটে বেজেছে।

ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছ'টার সময় নেমে যাবি। গাড়ি না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মা'র কাছে যাচ্ছিস কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।

BanglaBook.org

ভুবন বলিল, আচ্ছা।

রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস? ওটা পাঁচ টাকার নোট, জানিস তো? ভাঙিয়ে খাবার কিনিস।

মা স্টেশনে আসবে মাসি?

আসবে।

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

খোকাকেও দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

না না, এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ি ঢুকিল। তাহাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী?

ভুবন? ভুবনের আমি কী জানি। বাড়ি নেই?

বনমালী হাঁকিল, কেষ্ট, এ-দিকে আয়।

কেষ্ট ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

তোকে তাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।

কেষ্ট কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, কেন বাবু?

রাত-দুপুরে তুই দো-তলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস বলে। আমার ন'শো টাকা চুরি গেছে!

ঝি-চাকর আশ্রিত-আশ্রিতারা চারদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট? পালিয়ে গেছে?

ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।

দো-তলায় যে ঘরখানায় সে এত দিন ছিল, বনমালী যে সেই ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তাহার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়া-মোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নিচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।

নিচে ভাঁড়ারের পাশে এক সারিতে খানসাতেক ঘর আছে, বনমালী যাহাদের খাইতে দেয় ওটা তাহাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানি ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তাহার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়িতে যাহাদের স্থান ঝি-চাকরেরও নিচে, বনমালী অনায়াসে তাহাকে তাহাদের দলে নামাইয়া দিল? সারা দিন ধরিয়া সে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ রচনা করিয়াছে সেটি একবার শোনাও দরকার মনে করিল না?

সে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া বলিল, আমি কী করেছি? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি —।

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কাহার? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় লইয়াছে।

পরীকে নিচে যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, কী গো, ওপর থেকে তাড়িয়ে দিল? বড়লোকের মর্জি দিদি, কী করবে বলো।

পরী বলিল, কী যে বলো তা ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে? আমি যেচে এসেছি। ওপরের যে-সব ম্লেচ্ছাচার — বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষাল না।

BanglaBook.org

ক্ষেন্তি বলিল, ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ি তো এক দিন তোমার নিজের দিদির ছিল। আজ যে রানি, কাল সে দাসী! হায়রে কপাল!

ছোট স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, কাঁদছ কেন? সয়ে যাবে। বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

শোনো বলি। কলকাতার সে বাড়িতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম —।

পরী বাধা দিয়া বলিল, থাক। তুমি যাও

শোনোই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ির রাজা আমাকে বলল, নিচেটা স্যাঁতসেঁতে, তুই ওপরেই থাক। তোর মা'র সহ্য হয়ে গেছে, কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে! আমি —।

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, উহাকে শুনাইয়া বুক হালকা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোক গিলিয়া সে বলিল, ব্যাপার বুঝে আমি রাজি হলাম না। নিচে মা'র কাছেই রইলাম।

পরী শুয়ে পড়িল। আগাগোড়া চাদর-মুড়ি দিয়া বলিল, আমার জ্বর আসছে, তুমি যাও ভাই।

এক দিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ রে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না।

বনমালী বলিল, আপদ গেছে, যাক।

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটি এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটি সুন্দরবনের উপর পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে॥

লীলা মজুমদার
পাড়ার মধ্যে

যারা খালপাড়ে থাকত তাদের মধ্যে ভারি একটা অন্তরঙ্গতা ছিল। তার মানে এই নয় যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো গভীর প্রীতি বিরাজ করত; সত্যি কথা বলতে কী, এক বছর ওখানে বাস করার পরও পাড়ার অনেককেই তপতী চোখেও দেখেনি। তবে সকলের ঘরের কথা সবারই জানা ছিল।

হাটুরেরা রোজ সকালে সবার বাড়িতে মাছ-তরকারি বেচতে আসত; রুটিওয়ালার লোক রুটি-মাখন-ডিম দিয়ে যেত; গরুগাড়ি নিয়ে কয়লাওয়ালা আসত; মোড়ের মাথায় মুদীর দোকান; দোরগোড়ায় গোয়ালার আস্তানা; থাকে কখনো কোনো গোপন কথা? একই ধোপা, একই নাপিত যেখানে?

নেপালবাবু স্ত্রী প্রায় রোজ সন্ধে করে তপতীদের বাড়ি আসতেন। মোটাসোটা কইয়ে বলিয়ে মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক বয়স তো বটেই, সামনের দিকের চুলগুলি একটু পাতলা হয়ে এসেছে, কানের পাশে পাক ধরেছে। এই এতখানি চওড়া লাল কস্তাপেড়ে কাপড় পরে, সিঁথি ভরা সিঁদুর আর এক গা গয়না নিয়ে তপতীকে বলতেন, গেল সে আপিসে এতক্ষণ? আর তুমি দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে রয়েছ? জানো না একবার সুয্যি ডুবলে পুরুষমানুষেরা অন্য রকম হয়ে যায়?

দো-তলার ফালি বারান্দায় ছোট্ট বেতের চেয়ারে নেপালবাবু স্ত্রীকে বসিয়ে তপতী হেসে বলত, কী করব মাসিমা, খবরের কাগজের আপিসের যে ওই নিয়ম। ফিরতে রাত দেড়টা, সকালে দশটার আগে ঘুম ভাঙে না।

BanglaBook.org

নেপালবাবুর স্ত্রী বলতেন, আমাকে রাঙাদি বলে ডেকো ভাই। মাসিমা বলে একেবারে বুড়ো বানিয়ে দিও না। আমার নতুন বাউটি জোড়া কেমন হয়েছে দেখো; বারো ভরি লাগল।

আচ্ছা, ওদের আপিসে মেয়েরাও কাজ করে, না?

তপতী মাথা নাড়ে, না তো। সেই জন্য ওদের ভারি দুঃখ।

নেপালবাবুর স্ত্রী বলেন, তুমি তাই নিয়ে হাসছ তপতী? ওদের আপিসে না হয় মেয়েরা কাজ না করল, পাশের আপিসে তো করতে পারে? দালালি করতে আসতে পারে তো? মেয়েদের তো আর সেখানে প্রবেশ নিষেধ নেই। মেয়ে দালাল দেখেছ কখনো?

এমনি করে ঘুরেফিরে নেপালবাবুর স্ত্রী ওই একটা বিষয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছন। তাড়াতাড়ি তপতী বলে, একটু চা খান রাঙাদি?

চা আমি খেয়ে এসেছি।

তবে একটা পান সেজে দিই?

নেপালবাবুর স্ত্রী ছাঁচি পানে ভরা রুপোর কৌটো এগিয়ে দেন। পান আমার সঙ্গে থাকে, তপতী সে কি তুমি জানো না?

তপতী তখন নিরুপায় হয়ে বসে পড়ে আর নেপালবাবুর স্ত্রী বলতে থাকেন, মুস্কিল হয়েছে কী জানো? পুরুষমানুষেরা কোনো দিনও সাবালক হয় না। মনটাই ওদের হ্যাংলা, তাই চিরটাকাল চোখে চোখে রাখতে হয়। যতই না খাওয়াও-পরাও আদর-যত্নে রাখো, চোখ ওদের কোথায় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে। আচ্ছা, যে-মেয়েরা চাকরি বাকরি করে তারা কেমন ধারা হয় বলতে পারো?

নরম গলায় তপতী বলে, কেন রাহাদি, বিয়ের আগে আমিও আপিসে চাকরি করতাম। আমার বাপের অবস্থা ভালো ছিল না রাঙাদি, যে-মেয়েরা বাইরে কাজ করে তারাও আমারই মতো হয়; আবার কী-রকম হবে?

নেপালবাবুর স্ত্রী মাথা নাড়েন, না তপতী, সবাই তোমার মতো হয় না। তুমি তো আটপৌরে মেয়ে, রাঁধো-বাড়ো, স্বামীর দেখাশুনো করো, ছেলে আগলাও। তাদের স্বামীও থাকে না, ছেলেরা থাকে না। তোমরা যাদের আদর-যত্ন দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতে চাও, চোখ কিন্তু তাদের ফিরে থাকে ওই মেয়েদের দিকে। ওরা দেখতে ভারি চিক্কন হয়; কী সরু কোমর হয় ওদের তুমি ভাবতে পারো না। উঠি তপতী, পুজোয় বসি গিয়ে।

মোড়ের পরেই নেপালবাবুদের বাড়ি; নিজেদের বাড়ি, আগাগোড়া শ্বেতপাথরের মেঝে, লম্বা লম্বা নীল-রঙা আলো, সামনের ফালি জমিটুকুতে রঙ্গন আর গন্ধরাজের ঝাড়। তার ওপর গ্যাসবাতির আলো চিক চিক করে।

কিন্তু নেপালবাবুর নাকি সেখানে মন বসে না। মোড় ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই একেবারে খালের ধারে নেপালবাবুর লোহার কারখানা। দশ টাকা মূলধন থেকে নাকি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন। জনা ত্রিশ মজুর খাটে ওখানে, দুটো লরি ওঁর নিজের, দেদার লাভের ব্যবসা। কিন্তু খাটতে হয় দারুণ। পিটোন তামার মতো চেহারা হয়ে গেছে নেপালবাবুর, এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল, তার একটিও পেকেছে বলে মনে হয় না; প্রদীপের মতো উজ্জ্বল নেপালবাবুর চোখ, লোহার মতো শরীর, ক্লান্তির চিহ্ন কোথাও নেই।

যারা জানে না তারা জিজ্ঞেস করে, কার জন্য প্রাণপাত করে এত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছেন নেপালবাবু?

নিন্দুকরা যা তা বলে। বড় রাস্তায় বেরুবার মুখে একটু আগে একটি ছোট দো-তলা বাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেখানে নেলি মুখার্জি বলে একটি মেয়ে থাকে, ঝি-চাকর নিয়ে। আগে নাকি

BanglaBook.org

জমিজমার দালালি করত, কী একটা কোম্পানির হয়ে। এখন আর তার দরকার করে না, নেপালবাবুই নাকি সব খরচপত্র জোগান। বাড়িখানাও নাকি তাঁর, বেনামায় কেনা। সেই কোম্পানি থেকেই।

ভারি সুন্দরী মেয়ে ওই নেলি, ভারি গুমোর তার। পাড়ার কারো সঙ্গে মেশে না, ফুটপাথে নেমে কখনো দাঁড়ায় না। বেরোয় ট্যাক্সি করে, চাকর সঙ্গে নিয়ে। বছর ত্রিশ বয়স হবে; কার মেয়ে কেউ জানে না।

নেপালবাবুর স্ত্রী এক গা গয়না পরে পায়ে হেঁটে পাড়া বেড়ান। দো-তলা বাড়িটার সামনে দিয়েও যাওয়া-আসা করেন। নেলিকে যদি একবার দেখতে পান। কিন্তু নেলির বাড়িখানা সদাই চোখ বুজে থাকে।

পাড়ার সবার রাঙাদির ওপর ভারি সহানুভূতি। নেপালবাবু যেন একটা কী, ভদ্রসমাজে ওঁর বাস করা উচিত নয়। অথচ এ-দিকে লোকের দুঃখে-কষ্টে দেনও অকাতরে। কিন্তু পুজোর সময় নাকি দোকান থেকে এ-বাড়িতে যেমন জিনিস আসে, ও-বাড়িতেও তেমনি। তাছাড়া সত্যি কি আর রোজ অত রাত পর্যন্ত কারখানায় থাকেন নেপালবাবু? রোজ একবারটি তিন নম্বরে যাওয়া চাই-ই। একটা চক্ষুলজ্জাও নেই। তিপান্ন-চুয়ান্ন বছর বয়স হল, অথচ না চেহারায় না আচরণে তার ছাপ দেখা যায়। খুর খুর করে ঘুরে বেড়ান যেন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক। এ-দিকে ওই কাঞ্জিলালের দাদা সারা জীবন ধর্মকর্ম করে, ওই একই বয়সে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। ভগবানের বিচারটা দেখলেন তো?

নেপালবাবুর স্ত্রী এ-সব নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি করেন না, বাইরেও কিছু বলেন না। শুধু অবান্তর কথার ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান আর নেপালবাবুর সঙ্গে অতি প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না। তপতীকে বলেন, বাবা, ছেলেপুলে না হয়ে বেঁচে গেছি। দিব্যি সুস্থ শরীরে, মনের শান্তিতে আছি। কারো জন্য ভাবনা-চিন্তাও নেই, জ্বলুনি পড়ুনিও নেই। সংসারে সে-রকম আসক্তিও নেই, ধর্মের দিকে একটু মন দিতে পারি। বলে নতুন গয়না দেখান।

তপতীরা ভেতরের সব কথাই শুনেছে। শুনেই গেছে শুধু; পরচর্চা মিলন পছন্দ করে না। তবে তাই নিয়ে দু'জনার মধ্যে একটু কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে। তপতীর মনে হয়েছে পুরুষমানুষদের দুর্বলতার প্রতি মিলন যে শুধু ক্ষমাশীল তাই নয়, দস্তুর মতো প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। বলেছে, রাঙাদিকে দেখলে কষ্ট হয়, টাকা-পয়সা অঢেল দেন নেপালবাবু, ওঁদের গোটা বাড়িটা রাঙাদির ইচ্ছে মতো চলে। সব দেন, সব দেন, তবে আবার কী?

সব দেন, কিন্তু নিজে থাকেন বাইরে। মিলন হেসে বলে, নিজেকে আবার দিতে হয় নাকি? এ কি ভিকিরিকে পয়সা দেওয়ার মতো সহজ ভেবেছ? নিজেকে যে দেবে, তা নেবার লোক কোথায়? তোমার রাঙাদি?

তপতী রেগে যায়। নেবার লোকটিকে পাড়ার মধ্যে না রেখে একটু তফাতে রাখলে তো খানিকটা সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত। মিলন বুঝিয়ে বলে, আহা দূরে যাতায়াত করবার ওঁর সময় কোথায়? আর তোমার রাঙাদিটিও তো আচ্ছা মেয়ে! যা দিয়ে ওঁর কোনো প্রয়োজন নেই, এমনকী যার অভাবে ওঁর কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না, তা-ও ওই মেয়েটাকে দিতে পারেন? পাঁচ জায়গায় কাঁদুনি গেয়ে বেড়ান।

কাঁদুনি গান না রাঙাদি, কিছুই বলেন না। বলবার মতো কথা থাকলেও, শোনবার লোক নেই ওঁর।

রাগ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তপতী ভাবে, এক-আধটা ছেলেপুলে থাকলে এত দিনে ঘরে নাতি-নাতনি এসে যেত, রাঙাদির আর কোনো দুঃখ থাকত না। অমন করে স্বাধীন মেয়েদের নাম শুনলেই জ্বলে উঠতেন না।

BanglaBook.org

পরদিন বিকেলে এলেন রাঙাদি, একটু যেন খুশি মনে হল। চেয়ারে বসেই বললেন, একটা মোড়া দে না তপতী, পা-দুটো তুলি। চা করিস তো আজ দিস আমাকেও এক পেয়ালা। নেপালবাবুর স্ত্রীকে এত হাসিখুশি দেখে তপতী অবাক হয়। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে রাঙাদি বললেন, নেলি মুখার্জিকে চিনিস? বড় রাস্তার কাছে তিন নম্বরের ওই দো-তলা বাড়ির নেলি মুখার্জিকে?

তপতী বলে, তাকে না চিনলেও দেখেছে কয়েক বার। গত বছর পুজোর সময় গাড়ি জ্যাম হয়েছিল, কাছাকাছি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে তখন।

কেমন দেখতে বল দিকিনি?

কী বলবে তপতী? বলে, বেশ দেখতে।

না, ওতে হবে না, খুঁটিয়ে বল। আমার চাইতে ফর্সা? আমার চাইতে ভালো মুখ-চোখ?

তপতী রাঙাদির গৌরবর্ণ মুখের দিকে, তিন ফুল নাসার দিকে, টান চোখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে।

না রাঙাদি, ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ বলা যায়। সে এমন কিছু সুন্দরীও নয়, তবু কী যেন একটা আছে চেহারার মধ্যে, পাতলা ছিপছিপে, হাত-পাগুলো ফুলের মতো। একটা ঘন নীল সুতির শাড়ি পরেছিল, সোনালী পাড়; গলায় এক ছড়া ছোট ছোট মুক্তোর মালা ছিল; দু'হাতে দু'গাছি মোটা সোনার বালা, মাথায় কাপড় ছিল না, কানে সোনার মাকড়ি, কোঁকড়া চুলগুলো দিয়ে হাতে জড়িয়ে খোঁপা বাঁধা। ভারি ভালো লেগেছিল তপতীর।

ভয়ে ভয়ে তাকায় রাঙাদির দিকে। রাঙাদি খুশি হয়ে বলেন, সে আর ছিপছিপে নেই তপতী, তার ছেলে হবে। নেলি মুখার্জি বাঁচে কি না সন্দেহ; জানিস, অমন সরু যাদের কোমর হয় তারা ছেলে হতে অনেক সময় মরেই যায়। কাল রাত থেকে তো শুনছি টানাটানি চলছে।

চমকে তপতী রাঙাদির মুখের দিকে চায়। রাঙাদি উঠে পড়েন, যাই, আজ পায়েস পিঠে করব বলে বেশি করে দুধ রেখেছি।

তপতীর মন খারাপ হয়ে যায়। নিজের ছেলের সর্দি কাশি, কী জানি কেমন ভয় ভয় করে, বারে বারে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখে, ছেলে রেখে ওঠে। সন্ধেটা যেন আর কাটতে চায় না।

বুধবার মিলন একটু সকাল সকাল বাড়ি আসে; দশটার সময় জামা খুলতে খুলতে বলে, মোড়ের কাছে ওই দো-তলা বাড়ির মেয়েটি বাঁচল না তপতী, মেলা লোকজন দেখলাম সেখানে। এতক্ষণে নিয়েও গেছে।

তপতী বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। দু'জনার কারো খাওয়াতে রুচি থাকে না, যা হয় চারটি মুখে দিয়ে, তপতীর হাত থেকে পান নিয়ে মিলন বলে, কাঞ্জিলালের সঙ্গে ওইখানেই দেখা। বড্ড কথা বলে কাঞ্জিলাল। নাকি নেপালবাবু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তবে সঙ্গে যাননি। আর নেপালবাবুর স্ত্রী নাকি বারে বারে চাকর পাঠিয়ে ওঁকে ডাকাডাকি করিয়েছেন।

শুকনো গলায় তপতী বলে, আর ছেলেটা? সে-ও বাঁচল না?

তপতীর গলার স্বরটা অস্বাভাবিক শোনায়, মিলন আস্তে ওর কাঁধে হাতখানি রেখে বলে, নেবে তুমি ওই ছেলেটাকে? আছে সাহস?

কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে তপতীর, শুধু বলে, আছে।

সেই রাত্রেই যায় দু'জনায় তিন নম্বর বাড়িতে। অন্ধকার নিঝুম পুরী, অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর চাকর এসে দরজা খুলে দেয়। বলে, পাড়ার কে গিন্নিমা এসে নাকি ছেলে নিয়ে গেছেন। ঝি সঙ্গে গেছে।

BanglaBook.org

তপতীর বুক থেকে একটা যেন বোঝা নেমে যায়, হঠাৎ মনটা হাসি-খুশিতে ভরে যায়। বলে, বড্ড খিদে পাচ্ছে, পানুর দোকান থেকে কচুরি আলুর দম নিয়ে যাই চল। পানুর দোকান সিনেমা বন্ধ অবধি খোলা থাকে।

কাঞ্জিলাল নেপালবাবুর কারখানাতেই কাজ করে। ছিল সে ওখানে রাত অবধি, দেখেছিল সবই। পরদিন তার বউ এসে তপতীর কাছে বাঁধাকপির প্যাটার্ন শিখতে শিখতে বলে, আশ্চর্য না বউদি? সারাটা বিকেল রাঙাদি কমপক্ষে দশবার দানুকে পাঠিয়েছিলেন ও-বাড়ি থেকে নেপালবাবুকে ডাকতে, দানু দেখে দেখে ফিরে গেছে, ডাকতে সাহস পায়নি। রাতে সব চুকেবুকে গেলে পর, নেপালবাবু তখনো তক্তোপোশের কিনারায় গুম হয়ে বসে আছেন, কচি ছেলেটা পাশের ঘরে খালি কাঁদছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, তবু চ্যাঁচাচ্ছে। এমনি সময় ঝড়ের মতো মুখ করে রাঙাদি নিজে গিয়ে উপস্থিত। সবাই মনে করল এবার একটা খণ্ডপ্রলয় না হয়ে যায় না। রাঙাদি এক দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ছেলেটাকে টপ করে বুকে উঠিয়ে নিয়ে, নেপালবাবুর হাত ধরে তুলে বাড়ি নিয়ে গেলেন। মজার খবর না?

তপতী অন্যমনস্ক হয়ে যায়, প্যাটার্ন ভুল হয়, দিনের আলোটাকে ভালো লাগে।

কাঞ্জিলালের বউ বলে, গেছিলাম সকালে একবার মজা দেখতে। ছেলেটি ঘুমুচ্ছে আর রাঙাদিতে আর ঝিতে মিলে কাঁথা সেলাই হচ্ছে। কত দেখব দুনিয়াতে ভাই। আচ্ছা, এ জায়গাটা এ-রকম হয়ে গেল কেন, ভুল হয়নি তো?

আশাপূর্ণা দেবী

চরিত্রহীন

এখন? এই বয়সে ?

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সত্যিই কি মানুষের বাসনার শেষ নেই? নেই অসংযমের মাত্রা? চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

মনে মনে বয়সটার একটা মোটা হিসেব করে নিয়ে আন্দাজ করলাম রাখালমামার বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। সেই রাখালমামা, এখনও! আশ্চর্য !

বিদেশে থাকি, কালে-কস্মিনে কলকাতায় আসি, তা-ও সামান্য ছুটিতে। নিকটতম আত্মীয়দের খবর নিতেই সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারি না, তা জ্যেঠতুতো! পিসতুতো! রাখালমামা এ যাবৎ বেঁচেবর্তে পৃথিবীর অন্ন ধ্বংসাচ্ছেন কি না তাই জানতাম না, অন্য খবর তো দূরের কথা। রাখালমামার ছেলে নীতুদা আজ আমার মার কাছে দুঃখগাথা গাইতে এল বলেই শুনলাম। আর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

বাল্যকাল থেকে শুনে এসেছি বটে রাখালমামার স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়, বউ-ছেলে-সংসার সব থাকতেও নাকি একটি উপসর্গ আছে তাঁর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার উপসর্গটি আর কোথাও নয়, দেশ ভিটেয়। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত যাই হোক, পৃথিবী উলটে গেলেও তিনি যে রবিবারে দেশে যান, সেটা ভিটের টানেও নয়, পিসি খুড়োর টানেও নয়, সেই লক্ষ্মীছাড়া মাগীর টানে।

BanglaBook.org

তখন আমরা বালক বলে যে আমাদের কান বাঁচিয়ে কোনও কথাবার্তা হত এমন মনে পড়ে না। কাজেই তখনই আমরা জেনে ফেলেছিলাম রাখালমামা খারাপ লোক।

কিন্তু সে কি এ যুগের কথা?

এই যুগ-যুগান্তর পরে আবার কিনা কানে এল রাখালমামা সেই লক্ষ্মীছাড়া মাগীর টানে —।

না, এখন বুড়ো বয়সে আর হপ্তায় যাওয়ার ক্লেশ সহ্য হয় না, তাই দেশের বাড়িতেই বসবাস করেছেন রাখালমামা!

ছেলেরা কলকাতায় নিয়ে আসবার জন্য সহস্র সাধ্য-সাধনা করছে, নড়িয়ে আনতে পারছে না তাঁকে।

ছুতোরও অভাব নেই রাখালমামার। মাথা খুব পরিষ্কার। ছুতো হচ্ছে, এই বয়সে আর কলকাতায় ভাড়াটে বাড়িতে গুড়ের নাগরী ঠাসা হয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। পাজী, বদ নাতি-নাতনিগুলোর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে। সারা দিন বউদের কলহ কচকচিও তাঁর অসহ্য।

তাছাড়া ছেলেদের প্রশ্ন করেছেন রাখালমামা, পারবে তোমরা আমার শরীর-স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যা দরকার তার জোগান দিতে?

কী উত্তর দিবে ছেলেরা? 'হ্যাঁ পারব' বলবে কোন ভরসায়? বয়স হয়ছে বলে শরীর-স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যে রাখালমামার অনেক কিছু চাই। চাই এক সের করে খাঁটি দুধ, নিত্য ভাতের পাতে ছটাক খানেক করে সরতোলা গাওয়া ঘি, দু'বেলা সদ্য মাঠ থেকে তোলা টাটকা শাক, পাতা, ডাঁটা, প্রতি দিন তাজা চারাপোনার ঝোল আর বাটি ভর্তি চুনো মৌরলার টক। এ ছাড়া আর যাই হোক, এগুলো অবশ্যই চাই। এই রকম নিয়ম-যত্নে থাকতে পারলে নাকি আরো পনেরো-বিশটা বছর হেসে-খেলে, হেঁটে-ছুটে বেঁচে থাকতে পারেন রাখালমামা। আর বাঁচতেই চান তিনি।

কলকাতায় কি পয়সা ফেললেই এ-সব মেলে? এখন অবশ্য গ্রামে ঘরেও আগের মতো কিছুই নেই, তবু কিছু আছে। প্রচুর না মিলুক সামান্যও মেলে, যদি চেষ্টা-যত্ন থাকে।

কিন্তু সে-চেষ্টা করে কে?

কে আর। নীতুদা ক্ষুব্ধ বিরক্তিতে বলে, সেই তিনিই। আমরা তো বলতে গেলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। নেহাত মাসকাবারি টাকা, আর যেবারে যা ফরমাশ থাকে সেই সব নিতে মাসে একবার করে।

টাকা বন্ধ করে দিতে পারিস না? আমার মা বীরাঙ্গনা বিক্রমে বলে ওঠেন, তাহলে কেমন না সুড়-সুড়িয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন দেখি?

নীতুদা হতাশ ভাবে বলে, তাই কি হয়?

হবে না কেন? মা পুনরায় উদ্দীপ্ত, তোরা বলবি, আমরা ছাপোষা, মোট মোট নগদ টাকা যদি দিতে না পারি? একসঙ্গে থাকো, খাও দাও ব্যাস।

তাহলে আবার তোমরাই বলবে, কী কুলাঙ্গার ছেলেরা গো। বুড়ো বাপকে খেতে দেয় না।

কেউ বলবে না। আবার স্বগতোক্তি করেন মা, বাপ বাপের মতো হয় তো, মাথায় করে রাখবে ছেলেরা, বাপ অছেদ্দার কাজ করলে আবার মান্য কী?

নীতুদা মলিন মুখে বলে, সে আর কে বুঝবে? বরং সকলেই ভাবে বউরা বুঝি বুড়ো শ্বশুরের ঝামেলা পোহাতে রাজি হয় না, তাই ছেলেরা বাপকে বনবাসে দিয়েছে। এর ওপর টাকা বন্ধ!

কিন্তু এত বাড়াবাড়িটা হল কবে? মা বলেন, এ রোগ ছিল চিরকালই জানি, সুশীলাদি তো গ্রাম সম্পর্কে আমাদের বোন হয়, দেখেছি বরাবর! হাসাহাসিও করেছে সবাই, কিন্তু এত এমন বেহেডপনা ছিল না। ওই রাখালদা রবিবারে রবিবারে বাড়ি যেত, দেখা-সাক্ষাৎ গল্প-গুজব করত, এই পর্যন্ত। তবে মাস মাস খরচাটি দিয়েছে সুশীলাদিকে।

BanglaBook.org

ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে বলি, তা তখনকার দিনে তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজ এ-সব অ্যালাউ করত? সুশীলাদির বাপ-মা রাগ করতেন না?

বাপ-মা কোন চুলোয়? জ্ঞানের আগে সব খেয়ে তো কাকা, খুড়ির সংসারে ভর্তি। তা ছেলেবেলায় নিত্যি খুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বলত, কাজে নেই গেলায় আছ, দেব না ভাত। এর-ওর দোরে গিয়ে দাঁড়াত মুখ শুকিয়ে। লোকে মায়া-দয়া করে দু'মুঠো ভাত দিত। সবই ত জ্ঞাত-গোত্তর!

শ্বশুর বাড়ি?

সেখানেও তেমনি। যেমন কপাল জোর! কাকা-খুড়ি একটা বর জোগাড় করে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করেছিল। ছ'মাসের মধ্যে তাকে শেষ করে আবার সেই কাকা-খুড়ির ঘাড়ে। তাদেরই-বা ভালো লাগবে কেন? নিত্য খিটিমিটি। সেই সূত্রেই দয়া উথলে উঠল রাখালদার। বলল, শুধু এক বেলা এক মুঠো ভাতের জন্য এত লাঞ্ছনা! আমি দেব সুশীলার ভাত খরচা। তখন রোজগার করত ভালো, সদাগরী আপিসের বড়বাবু ছিল, দয়ার মেজাজ দেখাবার মুরোদ ছিল। তা সেই দয়া দেখানোই কাল হল। সুশীলাদি একেবারে গলে গেল, মাখামাখি বেড়ে উঠল। কাকা গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দিল বিধবা মেয়ের রীত চরিত্তির দেখে। আমার অবিশ্যি এ-সব শোনা কথা, স্পষ্ট মনে নেই। তবে আমরা সুশীলাদিকে দেখেছি বাপের ভিটেয় একখানা ভাঙা ঘরে পড়ে থেকে আর রাখালদার পয়সায় খেয়ে গাঁ সুদ্ধ লোকের কাজ করে বেড়াত। অসীম গতর, যার ঠেকা পড়ে সেই ডাকে, সুশীলা! কিন্তু এ বিষয়ে এতটা বেপরোয়া —।

নীতুদা বাধা দিয়ে বলে, এতটা হয়েছে মা মারা গিয়ে অবধি। মা-ও গেলেন, বাবার চাকরিও গেল।

চাকরি গেল!

ওই যে অফিসে নতুন ফ্যাসন হল বুড়ো বিদেয় করো। অথচ বাবা তখনো ওই ষাট বছরেও দুটো জোয়ান লোকের খাটুনি খাটতে পারতেন। কিন্তু সে যাক, গেল। আর যেতেই অমনি বাবা ধুয়ো ধরলেন, অফিস যেতাম, সারা দিন এক রকমে কেটেছে, এত আঁটসাঁটে থাকতে পারব না।

আমরা ভাবলাম, তা মন্দ কী, বউরা তো রাতদিন 'বাবা এই বললেন, বাবা তাই বললেন' বলে অশান্তি করছে, দেশে গিয়ে থাকতে পারেন দু'পক্ষেরই ভালো। চার ভাই পনেরো টাকা করে দেব, উনি স্বপাকে খাবেন, আর পুরনো মুনেষের ছেলেটা কাজকর্ম করে দিয়ে যাবে, এই ব্যবস্থা। বাবার তো খুব উৎসাহ, খুব স্ফূর্তি। তখন কি জানি এই সব অসভ্যতা হবে? পরের মাসেই গিয়ে দেখি রান্নাঘরে সুশীলাপিসি! বুঝুন, দেখে মনের অবস্থা কী হল! এ-সব জানতাম বরাবরই, কিন্তু একেবারে এ-রকম প্রকাশ্যে! কৈফিয়ৎ দিলেন, এঁরও হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া কষ্ট, ওঁরও নাকি ঘর পড়ে গেছে, থাকার কষ্ট, অতএব —।

কী বলব বলুন? ওঁদের লজ্জা নেই, আমাদের তো লজ্জা আছে! কিছু না বোঝার ভান করে চলে এলাম। এখনো যাই, এক বেলা থাকি, খাই, চলে আসি। কিন্তু দেখুন, এই বাজারে সংসার থেকে ষাটটা করে টাকা বেরিয়ে যাওয়া! কলকাতার বাড়িতে থাকলে তো —।

বুঝলাম নীতুদার মূল ব্যথাটা কোথায়।

অতঃপর নীতুদাতে আর মা'তে প্রবল পরামর্শ চলতে লাগল, কী করে এই অবৈধ কাণ্ডের একেবারে কাণ্ডচ্ছেদ করা যায়! ব্যবস্থা হল মা একবার সরেজমিনে তদন্ত করতে যাবেন এবং সেই যত নষ্টের মূলকে যাচ্ছেতাই করে, আর রাখাল মামাকে ধিক্কার দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়বেন, সমাজের মধ্যে থেকে এ সব অসামাজিকতা চলবে না। বলবেন, ওই পাপকে বিদেয় না করলে ছেলেরা মাসোহারা বন্ধ

BanglaBook.org

করে দেবে। কেনই-বা বন্ধ করবে না ? তুমি বাপ হয়ে যদি দেশে-গাঁয়ে তাদের মুখ দেখানোর পথ বন্ধ করতে পারো, তাদের আর টাকা বন্ধের অপরাধ কোথায় ?

আমি বলি, তুমি আবার কেন পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবে মা ? যে যা করছে করুক না, তোমার কী ?

মা ধিক্কারে আমাকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বলেন, তুই বলিস কী রে বলু ! আমার কী ? ভিটেটা আমার বাপ-ঠাকুদ্দার নয় ? সেখানে বসে যে যা করছে করবে ? বেটাছেলে বাইরে বাইরে যা করে করুক, ভিটেয় পাপ এনে তুলবে ?

লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেলি, পাপের আর কী ? বয়সের তো গাছ-পাথর নেই বাবা !

মা তাতে দমেন না, বলেন, থাম তুই বলু, বয়সের বিচার কী করছে ওরা। এখনো যখন এত ইয়ে, তখন আর — যাকগে, তুই পেটের ছেলে, কী আর বলব ! মোট কথা রাখালদাকে বুঝিয়ে আসব ভিটেয় বসে এত অনাচার চলবে না। লজ্জা নেই ? ঘেন্না নেই ? ছেলেদের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে ভয় নেই ? প্রবৃত্তিকে বলিহারী !

শেষ পর্যন্ত আমার স্কন্ধে ভর করেই মা'র বারুইপুর যাত্রা। নীতুদা যাবেন না, এ-ক্ষেত্রে ছেলেরা মুখোমুখি না হওয়াই ভালো।

কী আর করা !

তবে সত্যি বলতে কি, খুব অনিচ্ছে হচ্ছে না, আমারও কৌতূহল হচ্ছে সেই সত্তর বছরের প্রেমিক পুরুষটিকে দেখতে।

দেখলাম !

আর দেখেই প্রথমটায় মনে হল, সত্যি চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ ?

সোজা সতেজ খাড়া দেহ, উজ্জ্বল মুখ-চোখ, যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি !

লজ্জা, কুণ্ঠা, দ্বিধা, সঙ্কোচ, কোনও কিছুর বালাই নেই, একেবারে মুক্তপুরুষ। মাকে দেখে ইয়ংম্যানের মতো হৈ-হৈ করে উঠলেন, আর কে রে ! বুলবুলি না ? কী ব্যাপার ! তুই কোথা থেকে ? ই-স, কত দিন পরে দেখা। বাপ-ঠাকুদ্দার ভিটেটাকে তাহলে মনে আছে এখনো ? কেউ আসে না, বুঝলি বুলবুলি কেউ আর দেশে আসে না, দেশ একেবারে কানা পড়ে আছে।

মা তো এই মুহূর্তেই বলতে পারতেন, কেন, তুমি তো রয়েছ, দেশ-গ্রাম-বংশ সব কিছুর মুখ উজ্জ্বল করে। অথবা এ-ও বলতে পারতেন, লোকে আর আসবে কোন সুখে ? তোমাদের মতো কুলধ্বজারা যেখানে বসবাস করছেন ! বললে কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকত। কিন্তু বললেন না। জানি না — বললেন না, না বলতে পারলেন না। বহু দিন বিস্মৃত 'বুলবুলি' শব্দটা কানে গিয়ে গলাটা ভারি হয়ে এলে কিনা। মোট কথা, দেখতে পেলাম, মাথা হেঁট হয়ে বেশ পরিপাটি করেই পায়ের ধুলো নিলেন রাখালমামার।

ততক্ষণে রাখালমামা আর একবার হৈ-হৈ করে উঠেছেন, ওরে সুশীলা, কী তোর ঘোড়ার ডিমের কাজ নিয়ে রান্নাঘরে বসে আছিস ? বেরিয়ে এসে দেখ, কে এসেছে। বুলবুলি, আমাদের সেজকাকার বুলবুলি। কী একখানা গিন্নীবান্নী হয়ে গেছে। হ্যাঁ রে, এই বুঝি তোর বড় ছেলে ? সেই এতটুকুনটি দেখেছিলাম। কাজকর্ম কী করে ছেলে ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই গড় গড় করে প্রশ্ন যান রাখালমামা, আর যেন ছুটোছুটি করতে থাকেন। খুশিটা যে যথার্থ আন্তরিক, তা বোঝা যায় ওঁর অস্থিরতায়। আবার হাঁক পাড়েন, অ সুশীলা, কানের মাথা খেয়েছিস নাকি ?

ততক্ষণে সুশীলা এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সুশীলা।

BanglaBook.org

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

এঁর জন্য একটা মানুষ যুগ-যুগান্ত কাল ধরে সংসারে অশান্তি এনেছে, সমাজে বদনাম কিনেছে, অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করেছে আর এই জীবনের শেষ ঘাটে এসেও ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়, প্রতিবেশী সকলের কাছে হেয় হচ্ছে।

কালো রোগা ঢ্যাঙা এক বুড়ি, চুলগুলো ছাঁটা, সামনের দুটো দাঁত পড়া!

সেই দাঁতপড়া মুখে একটু হেসে মাকে সম্ভাষণ করলেন, তুই তো ছেলের কাছে বিদেশে থাকিস, তাই না? এলি কবে? ওমা এইটিই বুঝি ছেলে? বিলু না কি যেন ডাকনাম ছিল ছোটবেলায়।

বিলু নয়! বলু! বাবা এতও তোমার মনে আছে সুশীলাদি! বলে দিব্যি অম্লান বদনে, যে-পাপকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার দৃঢ়-সঙ্কল্প নিয়ে হানা দিয়েছেন, সেই পাপের চরণে প্রাণিপাত করলেন মা!

থাক থাক হয়েছে। আয় বোস। থাকবি ত কিছুদিন?

নাঃ, থাকব আর কী করে! মা আক্ষেপ করেন, ছেলের তো গোনাদিনের ছুটি!

আরো কিছু হয়তো বলতেন মা, কিন্তু ততক্ষণে রাখালমামা তাড়া দিয়ে উঠেছেন, আচ্ছা আচ্ছা, ও-সব কথা পরে হবে, আগে ওদের হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে দিকিন। গল্প একবার জুড়লে তো রক্ষে নেই! বুঝলি বুলবুলি, তোর এই সুশীলাদিটি আজ আর তোকে রাতে ঘুমুতে দিয়েছে! দেখবি তোকে গাঁয়ের এই তিরিশ বছরের ঘটনা কাহিনির পরিচয় দেবে বসে বসে। জানেও তো সকলের নাড়ি-নক্ষত্র।

অতঃপর অতিথি সৎকারে তৎপর হয়ে উঠলেন রাখালমামা।

কোনো বারণ মানলেন না, প্রচণ্ড রোদ্দুরে নিজে গেলেন মিষ্টি আনতে। কোথায় কোন জেলেনিকে বলে এলেন, যে করে হোক একটু মাছ জোগাড় করে নিয়ে আসতে, আর এসে অনবরত সুশীলাকে তাড়া দিতে লাগলেন, তোর হল? দুটো মানুষের রান্না করতে তুই যে বুড়ো হয়ে গেলি রে সুশীলা!

আমরা যত ব্যস্ত হতে বারণ করি, রাখালমামা ততই আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এ কি ঘুষ? না অভিনয়?

কিন্তু মা'র ব্যাপারটা কী? সে-ও কি অভিনয়?

দেখছি, আর অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আর মজা এই, একবারও আমার দিকে দৃষ্টিপাত করছেন না মা।

শুনতে পাচ্ছি রান্নাঘরে গল্পের স্রোত বইছে।

সেই তিরিশ বছরের ইতিহাস আওড়ানো হচ্ছে বোধহয়। কত অজস্র নাম কানে আসছে! ভাবছি, কী আশ্চর্য! এই দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তে কাটিয়েও মা বারুইপুরের প্রত্যেকটি মানুষকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করে এসেছেন!

তিরিশ বছরের মধ্যে অবশ্য আমি না এলেও মা এক-আধবার এসেছেন। সেই কথারই উল্লেখ শুনছি মা'র কণ্ঠে, সেবারে যখন এসেছিলাম, সুশীলাদি, মা গো মা, বাড়ি দেখে যেন কান্না পেয়েছিল। উঠোন ভর্তি আগাছা, দেয়ালের বাড়ির চাপড়া খসে খসে পড়েছে আর ইঁদুর ছুঁচোর উৎপাতে ঘর-দালান একেবারে তছনছ, রান্নাঘরের উনুন দুটো ভেঙে হুমড়ে পড়ে আছে, তুলসী মঞ্চের গাছটা শুকিয়ে কাঠ, মাগো মা সে কী দৃশ্য! এবোরে এসে যেন চোখ জুড়োল। সেই পুরনো বাড়ি এখন যেন পড়লে সিঁদুর উঠছে। চিরকালের খাটিয়ে মেয়ে তুমি!

সুশীলাদি কোনও মন্ত্র জানেন? বশীকরণ মন্ত্র! আর সেই মন্ত্রের জোরেই রাখালমামাকে —।

মন্ত্রের গুণের কথা বলেন না, বলেন হাতের গুণের কথা।

BanglaBook.org

আমাকে কাছে নিয়ে খেতে বসেন, সেই ওঁর সরতোলা গাওয়া ঘি, বাড়ির গরুর দুধের ঘন ক্ষীর, টাটকা পুকুরের মাছের ঝোল, সদ্য মাঠ ভাঙা আনাজ তরকারি, মৌরলা মাছের কড়া টক, সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সহযোগে। আর আমার চাইতে তিন গুণ বেশি অন্নব্যঞ্জন পার করে হাত চাটতে চাটতে প্রসন্ন মুখে সামনে বসে থাকা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বলেন, হাতের গুণ, বুঝলি বুলবুলি, সুশীলার হাতের গুণে নটেশাকও বাহবার হয়ে ওঠে। যা রাঁধে তাই যেন অমৃত। হাতের রান্না খেলে রুগীর রোগ সারে, পরমায়ু বাড়ে। এই দেখ না, আমার আটষট্টি বছর বয়েস পার হতে চলল, দেখে বুঝতে পারছিস?

মা হাসেন, তা বোঝা যায় না বটে।

রাখালমামা সোৎসাহে বলেন, তাই তো বাড়িঘর ভালো করে সারিয়ে নিয়েছি। বে-ওজরে আরো বিশ বছর বেঁচে থাকব আমি, দেখে নিস।

রাখালমামার বাঁচার এত বাসনা কেন? মনে হচ্ছে এই বাসনার জোরেই সত্যিই হয়তো আরো অনেক দিন বেঁচে থাকেবন রাখালমামা।

কিন্তু কিছুতেই কেন লোকটাকে পাপী, বদ, অসচ্চরিত্র, অপবিত্র মনে হচ্ছে না? মনে করতে চেষ্টা করেও না। মা'রও কি ওই একই অবস্থা?

তাই তিনি রাখালমামার কথার উত্তরে সহাস্যে বলেন, আমাকে আর দেখতে বোলো না বড়দা, দেখি তো সেই ওপর থেকে দেখব।

তোদের মেয়েমানুষদের ওই এক কথা। সব শেয়ালের এক রা। বেঁচে দরকার নেই, বেঁচে কাজ নেই — কেন রে বাপু! কিন্তু কথায় কথায় যে বেলা গড়িয়ে গেল। বলি সুশীলা, তোর আক্কেলখানা কী? তোর না হয় তিনপহর বেলাতেও পিত্তি পড়ে না, এরা হল শহুরে মানুষ, সকাল সকাল খাওয়া অভ্যেস। নাও নিজেও পিণ্ডি দুটো গিলে নাও এই সঙ্গে, অনর্থক দেরি করে লাভ নেই। বলু, চল হে আমরা বরং বৈঠকখানায় গিয়ে বসি গে! যেতে পা বাড়িয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন রাখালমামা, বললেন, নিজেদের কি রেখেছিস, না নিরিমিষ পদগুলোও সবটাই আমাদের ধরে দিয়েছিস?

এসে অবধি রাখলমামার হাঁকডাকই শুনেছি ওঁর সঙ্গে, সুশীলাদির কথা কওয়া শুনিনি, এই প্রথম শুনলাম। গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি যাবে বৈঠকখানায়?

হচ্ছে হচ্ছে, যাচ্ছিই তো। বলে তাড়াতাড়ি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে আসেন রাখালমামা।

ফিরতি পথে ট্রেনে বসে বললাম, মা এটা কী হল?

মা'র পিত্রালয় বিচ্ছেদে চিত্ত বিষণ্ণ, উদাস ভাবে বলেন, কী আর হল!

নীতুদাকে গিয়ে কী বলবে?

বলব আবার কী, মা নিজের অভ্যাসে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, বলব, কেন নড়বে রাখালটা দেশ থেকে? অত যত্ন, অত সেবা ত্রিভুবনে আর করবে কেউ ওর?

মা'র সুরটা যে উলটো লাগছে?

মা আরও উদাস ভাবে বলেন, তা কী করব! সব সময় কি এক সুর বাজে?

নীতুদা বলবে তুমি ঘুষ খেয়েছ!

ওঃ, বলবে তো আমি একেবারে ভয়ে মরে যাব; কেন, নীতু কি জজ? আমি চুরির আসামী? বলি ওই যে মেয়েমানুষটা অগাধ বুদ্ধি, অফুরন্ত গতর, আর অঢেল শক্তি নিয়ে চিরকালটা শুধু ভেসে বেড়াল, আর পরের সংসারের বেগার খেটে এল, এই মরণকালে সে একটা নিজের সংসার পেয়ে বর্তে গেছে। বেচারাকে সেইটুকুন থেকে উচ্ছেদ করে আবার ছন্নছাড়া করব? ভাবতে মায়া হয় না, কী পরিপাটি সংসার, কী গোছ, কী ব্যবস্থা, দেখলে চোখ জুড়োয়। কী করে মুখের ওপর বলব, এ সংসারে তোমার অধিকার নেই, তুমি বিদেয় হও।

BanglaBook.org

কিন্তু তোমাদের সমাজ?

চুলোয় থাক! সমাজকে আর কোন লোকটাই-বা মানছে এখন?

আর পাপ-পুণ্যি, ধর্ম-অধর্ম?

মা একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, দেখ বলু, গিয়েছিলাম বটে তেড়েমেড়ে, কিন্তু ওঁদের দেখে মনে হল পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা কি আমরা? যিনি মালিক, যিনি বিচারকর্তা, তিনি সত্য বিচার করবেন! আর ওই তোর রাখালমামা। ওঁর যা স্বভাব, শুধু সেবা-যত্নই নয়, সারাক্ষণ ওঁর খিঁচুনি খাবার জন্যও একটা লোকের দরকার। ছেলেরা পারবে? বউরা পারবে? কেউ পারবে না। শুধু নাকি যে মানুষটা চিরটা কাল ওকেই প্রাণ ঢেলেছে।

আবেগকে সংহত করে সহসা একটু চুপ করে যান মা।

আমি বলি, আমি কিন্তু বলেছি ওঁকে!

কী বলেছিস? কাকে বলেছিস?

ওই তোমার রাখালদাদাকে। বললাম, এ বয়সে এ-ভাবে এখানে একা থাকায় ছেলেরা খুব দুঃখিত, পাঁচ জনে তাদেরই নিন্দে করে। বলে, বুড়ো বাপকে ফেলে দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তা —।

তা কী? কী উত্তর দিলেন? লজ্জা পেলেন? না ধমকে উঠলেন?

লজ্জাও পেলেন না, ধমকেও উঠলেন না, ঠাণ্ডা গলায় বললেন, সে-কথা যে বুঝি না বাবা তা নয়, কিন্তু ভেবে দেখ, আমি এখানে আছি, তাই সুশীলা দুটো খেতে পাচ্ছে। ছেলেরা কি ওকে মাসোহারা দেবে? আমার চাকরি নেই, নগদ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, তাই এই কৌশল খেলে বসে আছি। চিরটা কাল যে-মানুষটা আমার মুখ চেয়েই রইল, তাকে এখন আমার টাকা নেই বলে ভাসিয়ে দেব? আর ওটারও চিরকাল নিজের একটা সংসার নেই বলে কী আক্ষেপ! তাই বলি, কিছুই তো হল না, তবু মরণকালে দুটো হাঁড়ি-কুঁড়ি নেড়েও যদি জীবনটা সার্থক হল ভেবে শান্তি পায় তা পাক। ছেলে বেটাদের তো বলে দিয়েছি, তোরা যত পারিস আমার নিন্দে করে বেড়াস। বলিস — বাবা বদমেজাজি, বাবা খামখেয়ালি, বাবা একজেদি, বাবা খিটখিটে, কারুর সঙ্গে বনিয়ে থাকতে পারে না বাবা। নচেৎ আরো যা প্রাণ চায় বলিস পাঁচ জনকে, আমার কোনো কিছুতেই গায়ে ফোস্কা পড়বে না।

মা কি ভালো করে সবটা শুনতে পেলেন? জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন দেখছি যে॥

বিমল মিত্র

জেনানা সংবাদ

বিলাসপুরের ডিএলএস আপিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তি মারা গেল। মারা গেল যত হঠাৎ, তত হঠাৎ কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়ল না। কৃষ্ণমূর্তি যতখানি ছিল বাঙালিবিদ্বেষী ঠিক ততখানি ছিল মাদ্রাজীবিদ্বেষী। অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্তির বউ ছিল বাঙালি মেয়ে।

কথা উঠল, দায়িত্বটা নেবে কে? এমন ক্ষেত্রে না-বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন না-সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কারোরই মাথাব্যথা হবার কথা নয়। কারণ কৃষ্ণমূর্তি না-বাঙালি না-মাদ্রাজী। তার আট-দশটা নাবালক ছেলে-মেয়ে আর বিধবা বাঙালি বউয়ের ভারটা নেবে তাহলে কে? প্রভিডেন্ট ফান্ডের কয়েকশো টাকা ছাড়া বেচারার নির্ভর করবার আর কিছু নেই। বিগতপ্রাণ কৃষ্ণমূর্তি আর তার বিগতশ্রী পরিবারের প্রসঙ্গটা ঘটনাক্রমে রটনায় পর্যবসিত হল।

BanglaBook.org

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের করিডরে বসে অফিসারদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আজাইব সিং বললেন, বাঙালি মেয়েরা কিন্তু স্ত্রী হিসাবে আইডিয়াল।

টি-আই বুড়ো অ্যান্টনী বললে, আমি তাহলে সত্যি কথাই বল, তেমন বাঙালি মেয়ে যদি পেতাম তাহলে আমাকে আর আজীবন আইবুড়ো থাকতে হত না।

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন, কিন্তু যাই বলো, বাঙালি মেয়েরা বড়ো ঘরকুনো, ওই স্বামীটি আর নিজের সংসারটিই কেবল চেনে তারা।

সোনপার সাহেব সিন্ধি। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল বাঙালি। গান জানত। শান্তিনিকেতনে পড়া। বললেন, আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে মুদেলিয়ার গারু, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনো অজ পড়াগাঁয়েও যদি কোনো ভারতীয় মহিলাকে দেখতে পান, জানবেন সে বাঙালি মেয়ে। মুদেলিয়ার দমবার পাত্র নন। দু-পাশে মাথা হেলাতে লাগলেন, বললেন, তাহলে বলুন না কেন মাহেঞ্জোদারোতে যে নাচওয়ালীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে-ও বাঙালির মেয়ের কঙ্কাল।

পাশের হলে বিলিয়ার্ড খেলার গোলমাল শোনা যায়। আর করিডরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নজরে পড়ে ইনস্টিটিউটের বিরাট লন। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। তীব্র আলো জ্বালিয়ে লনের ওপর দু'দলের ব্যাড্‌মিন্টন খেলা চলছে। আর দিল্লি স্টেশনের উর্দু ঠুংরি গান চলছে রেডিওতে। এতক্ষণে বোধহয় ওয়ান ডাউন এল, আজ বুঝি বম্বে মেল লেট। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে টিমটিমে ল্যাম্প জ্বেলে সার সার টাঙাগুলো শনিচরী বাজারের দিকে ছুটে চলেছে।

সোনপার সাহেব বললেন, আপনি কিছু বলছেন না মেটা সাহেব।

গুরুবচন মেটা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এখানকার পিডব্লিউআই, রেললাইনের তদারক করা কাজ তাঁর। আজীবন ব্যাচিলর। শেয়ালকোটের কোন গ্রাম থেকে কবে সিপি-তে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন কেউ জানে না। তবু রসিক পুরুষ হিসাবে বন্ধুমহলে তাঁর সুখ্যাতি আছে।

স্টেশন মাস্টার মুদেলিয়ার বললেন, আপনি কিছু মতামত দিন মেটা সাহেব।

জুন মাসের মাঝামাঝি। এবার এখনো মনসুন আরম্ভ হল না। গুরুবচন মেটা আকাশের দিকে চেয়ে সকলের গল্প শুনছিলেন।

বললেন, আমি ব্যাচিলর মানুষ, তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকা অপরাধ, তাছাড়া বেঙ্গলে কখনো যাইনি, কলকাতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছুই নেই। বাঙালি মেয়ে বলতে দেখেছি শুধু সরোজিনী নাইডুকে, জব্বলপুরে যেবার কংগ্রেসের মিটিঙে এসেছিলেন।

টি.আই বুড়ো অ্যান্টনী বলল, সরোজিনী নাইডু? হার এক্সেলেনসী...।

গুরুবচন মেটা বললেন, তবে অনেক বছর আগে এক জন বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, জব্বলপুরে।

সবাই বললেন, বলুন, বলুন।

গুরুবচন মেটা বলতে শুরু করলেন, আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, সমস্ত বাঙালি মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে তো ভুল করবেন। মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা কম, তার ওপর বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে আরো কম। কারণ প্রথমত আমি বাঙালি নই, বাংলাদেশে কখনো যাইনি, তারপর আমার অভিজ্ঞতা শুধু একটি মাত্র বাঙালি মেয়েতেই সীমাবদ্ধ।

টি.আই বুড়ো অ্যান্টনী বলল, তা হোক, বলুন মি. মেটা, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

মেটা বললেন, আমার মতে আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় যে, সব প্রদেশবাসীরাই বাঙালি মেয়েদের বউ করে পেতে চায় তো তার প্রধান কারণ হল বাঙালী মেয়েদের রান্না। অমন সুস্বাদু রান্না করতে আর কোনো জাতের মেয়েরা পারে না।

BanglaBook.org

সো ভেরি ইন্টারেস্টিং, তারপর বুড়ো অ্যান্টনী বললে।

তবে একটা কনডিশন, গল্পটা আমি যেখানে শেষ করব তার পর আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না, আপনারা জানেন বোধহয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখান শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক। কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্ল্যাইম্যাক্স আছে, সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। তাতে আপনারা রাজি? গুরুবচন মেটা সকলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন।

সোনপার সাহেব সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, রাজি আমরা, আপনি বলুন।

রেডিওতে বুঝি এবার ইংরিজি প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। রেকর্ডে জ্যাজ অর্কেস্ট্রা। সামনের লনে ব্যাডমিন্টন খেলা বন্ধ হল। কাটনি ব্রাঞ্চের শেষ গাড়িটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। এতক্ষণ সেখানে বোধহয় পেন্ড্রারোডের পথে অমরকান্টাকের রেঞ্জের গা দিয়ে টানেল পার হচ্ছে। পুব দিকে প্ল্যাটফর্মের ওপর গোস রোটি আর চায় গরমের হল্লা নেই। প্ল্যাটফর্মের তালগাছ প্রমাণ লাইট পোস্টটার আগাপাস্তলা শুধু পোকায় পোকা।

গুরুবচন মেটা বলতে আরম্ভ করলেন, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা, আমি তখন থাকি আমাদের জব্বলপুরের বাড়িতে। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে সবে লায়ালপুরে চলে গেছে, আমি থাকি সারা বাড়িটাতে একলা। মাঝে মাঝে বাবার দালালি ব্যবসাটা নিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়। কখনো নাইনপুর, গোন্ডিয়া, ছিন্দোয়াড়া, আর বালাঘাট — ন্যারো গেজের সমস্ত সেকশনগুলো। আবার কখনো ভুসাওয়াল, ইগ্‌গত্‌পুরি, বীণা, এলাহাবাদ-কাটনি। সাত দিন আট দিন পরে হয়তো এক দিন বাড়িই এলাম, আবার এক দিন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি টুপ করে।

কাজের মধ্যে কাজ ওই দালালি ব্যবসা আর ফুর্তি বলুন আর যাই বলুন একমাত্র রিক্রিয়েশন শিকার করা।

তা বাবারও ছিল শিকারের শখ, আমারও তাই। বাবার দুটো ডবল ব্যারেল বন্দুক পেয়েছিলাম আমি, একটা বারো বোরের আর একটা ষোলো বোরের, আর আমি নিজে কিনেছিলাম একটা রাইফেল — ফোর ফিফটি।

যখনি ট্যুরে যেতাম, ওটা থাকত সঙ্গে। কখনো কখনো তেমন জায়গায় গিয়ে পড়লে হাতিয়ার অভাবে যেন বেকুব না হই। একবার অনুপপুর থেকে নেবে মাইল তিনেক দূরে এক নদীর ধারে মাচা বাঁধা হল বাঘ মারবার জন্য, উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা আর শোন্ সেখানে এসে মিশেছে। জায়গাটা বাঘশিকারের পক্ষে আইডিয়াল। বিকেলবেলা উঠলাম গিয়ে মাচার ওপর আমি আর পেন্ড্রারোডের ঠাকুরসাহেবের ছেলে নর্মদাপ্রসাদ। সে-ও ভালো শিকারী, আর আমাদের 'কিল'টা রাখা হল ঠিক...।

কিন্তু যাক্‌গে, আমার গল্পে ও-সব অবান্তর প্রসঙ্গ। আমার এ গল্প তো শিকার কাহিনি নয়, এ গল্প মেয়েমানুষ নিয়ে। সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।

আপনার হাওবাগ স্টেশন দেখেছেন? স্টেশনে নেবে সোজা পুব দিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে — ডাইনে-বাঁয়ে ছোট-বড় অনেক রাস্তাই গেছে, কিন্তু যে-রাস্তাটা বিএনআর-এর মস্ত প্রকাণ্ড মাঠটা ঘুরে বেঁকে সোজা গেছে দক্ষিণ মুখো, আমি সেই রাস্তাটার কথা বলছি। এখন অবশ্য অনেক বাড়ি হয়েছে ওখানে, রেফিউজিরা ভিড় করেছে, আশেপাশের জলাজমিগুলোও ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ও তল্লাটে অমন ছিল না। ওই রাস্তায় ঢোকার মুখে ডান দিকে ছিল শুধু সানি-ভিলা, কতকগুলো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান থাকত ওই বাড়িটাতে, আর তারপর ঝোপ-জঙ্গল, কয়েকটা কবর আর সামনে বি.এন.আর.-এর জমিতে বিরাট বিরাট আমগাছ, আর তারই বাঁকে পশ্চিমমুখো শিয়ালকোট্ লজ — আমার

BanglaBook.org

বাড়ি। সামনে ধরুন বাগান এক কালে ছিল, কিন্তু তখন তত কিছু বাহার ছিল না, শুধু গোটাকতক আগাছা ছড়িয়ে আছে এ-দিক ও-দিক। তবু দো-তলার বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের রাস্তা আর আশেপাশের সব কিছুই দেখা যায়।

এক দিন আমার এক তলায় একটা ভাড়াটে এল। এ পাড়ার দিকে ভাড়াটে বড় একটা আসে না। কারণ এখান থেকে ফ্যাক্টরি অনেক দূর। তারপর জিআইপি স্টেশন থেকে এখানে আসতে গেলে রিকশা করতে হবে। বাজার-হাট সব দূরে। বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে গেলে তখনকার দিনে আরো অসুবিধে।

কিন্তু তবু একটা ফ্যামিলি এল। বাঙালি ফ্যামিলি। কুড়ি টাকা ভাড়া। এক মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে দিল। রসিদটার নিচে সই দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন নিজে। বাড়ি ভাড়া হয়েছে স্ত্রীর নামে।

আজাইব সিং বললেন, স্বামীনাথন! বাঙালি সারনেম তো অমন শুনিনি কখনো ব্রাদার।

সোনপার সাহেব বললেন, হয় হয়, মেটা ইজ রাইট। আমার ফার্স্ট ওয়াইফের কাছে শুনেছি। বাঙালি জাতটা যেমন পিকিউলিয়র, ওদের সারনেমগুলোও তেমনি পিকিউলিয়র। আমি জানি আমার ওয়াইফের এক জন কাজিন ছিল, তার সারনেম গোস।

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার বললেন, তা কেন, স্বামীনাথন কখনো কোনো বাঙালির সারনেম হতে পারে না। ওটা আমাদেরই একচেটে।

সোনপার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। টি.আই বুড়ো অ্যান্টনী বলল, ওটা একটা মাইনর পয়েন্ট। আপনার সেই বেঙ্গলি গার্লের গল্পটা বলুন মিস্টার মেটা।

গুরুবচন মেটা বললেন, সেই বেঙ্গলি গার্লের গল্পই তো বলছি, স্বামীনাথন হল তার হাজব্যান্ডের সারনেম, মিসেস স্বামীনাথন এক জন বাঙালি মেয়ে। বিয়ে করেছিল হ্যারি স্বামীনাথনকে, ম্যাড্রাসী ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান।

টি.আই বুড়ো অ্যান্টনী বলল, সো ভেরি ইন্টাররেস্টিং। আমাদের ডি.এল.এস. আপিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তির মতো। তারপর — তারপর।

গুরুবচন মেটা বললেন, কিন্তু তার আসল নাম হল —।

বলতে গিয়ে গুরুবচন মেটা নিজেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন, আসল নামটা আপনাদের আগে বলে দিয়ে আর একটু হলে ভুল করছিলাম, কারণ আসল নামটা কি আমারই জানবার কথা? এক দিন কি দু'দিন মাত্র দেখেছি ওদের, তা-ও দু'এক সেকেন্ডের জন্য। সুতরাং নাম জানা দূরে থাক চেহারাটাও ভালো করে দেখা হয়নি। আর আমি বাড়িতেই-বা থাকি কতক্ষণ? মাসের মধ্যে যে দশ-বারো দিন বাড়ি থাকি তা-ও ওই শিকার নিয়ে কাটে। তবে এক এক দিন শুনতাম বটে, যে-দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থাকতাম — বাঙালি স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান ম্যাড্রাসী স্বামীকে গান শেখাচ্ছে, বাংলা গান। গানটার একটা লাইন আমার এখনো মনে আছে। পরে শুনেছিলাম পোয়েট টেগোরের গান — হে নাটারাজ, হে নাটারাজ।

সোনপার সাহেব বললেন, এ গানটা আমার ফার্স্ট ওয়াইফ গাইত। বেঙ্গলিদের টিউন ভেরি পিকিউলিয়র।

তারপর শুনুন, গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন, এক দিন সাইকেল নিয়ে চৌকে গেছি কী কিনতে, দেখা হল সুবেদার কেদার সিং-এর সঙ্গে। কেদার আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়িতে এক তলায় নতুন এক ভাড়াটে এসেছে দেখলাম, নতুন জেনানা।

আমি বললাম, হ্যাঁ, এক ম্যাড্রাসী ফ্যামিলি।

ম্যাড্রাসী নয়, আমি চিনি ওকে। চাঁইবাসায় থাকত ওর বাবা, ফরেস্ট অফিসার; ওর নাম মিস্ সুজাতা দাশ, ওর বাবা ছিলেন মিস্টার দাশ, রইস্ আদামী, খানদানী বংশের লোক। কিন্তু সঙ্গের ও লোফারটা কে?

BanglaBook.org

আমি বললাম, ও ওর হাজব্যান্ড, হ্যারি স্বামীনাথন।

সুবেদার কেদার সিং বলল, শেষকালে কিনা ওর সঙ্গে বিয়ে হল।

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন সুবেদার সাহেবের মনঃপুত নয়। সুবেদার সাহেবের কাছেই শুনলাম মেয়েটি নাকি ভারি খুবসুরৎ ছিল আগে। ভারি বলিয়ে-কইয়ে, নাচিয়ে-গাইয়ে। চাঁইবাসার সব লোকই নাকি ভালোবাসত সুজাতাকে। বড়লোক বাপ। ঘোড়া ছিল, মোটর ছিল, আবার মাঝে মাঝে সাইকেলও চড়ত। কখনো পরত শাড়ি, কখনো শেরোয়ানী, কখনো সালোয়ার, কখনো পরত চোদ্দ হাত মাদ্রাজী শাড়ি কাছা কোঁচা দিয়ে, আবার কখনো পরত স্রেফ ব্রিচেস আর নেকটাইয়ের সঙ্গে ট্রাউজার শার্ট।

আমারও দেখে মনে হল ভারি মজবুত গড়নের মেয়ে। ভঁইষের দুধ, ঘি আর মাঠা না খেলে অমন চেহারা হয় না। তার ওপর আছে তাকতআর মেহন্নত। মোটর চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর সাইকেল পেটা।

সে-দিন প্রথম আলাপ হল।

সন্ধে তখনো হয়নি। হরিশঙ্কর রোডে গিয়েছিলাম বিল কালেকশনে, মহাসামুন্দের পি.ডব্লিউ.আই শুক্লাজী ছাড়ল না। একটা বুল-ডিয়ার মেরে নিজের ট্রলি করে রায়পুর পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। তারপর সেটা নিয়ে গোন্ডিয়া জংশনে ন্যারোগেজ ট্রেন ধরে সন্ধের কিছু আগে আমার শিয়ালকোট লজে এসে পৌঁছলাম। এবার বাড়িতে প্রায় দিন কুড়ি গরহাজির ছিলাম।

আমার চাকর আমার আগে আগে বুল-ডিয়ারটা নিয়ে ঘরে গেছে। আমি ধীরেসুস্থে আস্তে আস্তে আসছি। ক'দিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম। দীনদয়ালকে বলে দিয়েছিলাম মাঠা যেন তৈরি রাখে। গিয়েই এক গ্লাস খেয়ে নেব।

কিন্তু গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি মিসেস স্বামীনাথন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করল।

বলল, জয় রামজী কি —।

তারপর সামনে দাঁড়াতেই বলল, আপনি শিকারপ্রিয় লোক আমি জানতাম না।

আগাগোড়া ক্রেপ সিল্কের বুটিদার শাড়ি-ব্লাউজ মিসেস স্বামীনাথনের পরনে। জরিদার এক জোড়া পা-ঢাকা চটি, দু'দিকের ব্লাউজের নিচে থেকে সমস্ত হাত দুটো মাস্‌ল্‌ওয়ালা। মোদ্দা কথা আমাদের গুজরানওয়ালা লাহোরের মেয়েদের পর্যন্ত হারিয়ে দিতে পারে পাঞ্জায় — এমনি তাকতওয়ালা জেনানা। দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

তার পরেই আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে রীতিমতো বাগিয়ে ধরল। বলল, ষোলো বোরের বন্দুক ব্যাভার করেন আপনি। বললাম, তিন রকমই আছে, যখন যেটা সুবিধে, সেইটে নিই। মিসেস স্বামীনাথন বলল, আমার আর আপনার দেখছি একই।

হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড। আপনি কী কার্ট্রিজ কেনেন?

তার কিছু ঠিক নেই, আজকের বুলওয়ারাটা মেরেছি বাক্-শটে। যখন যেটা সুবিধে হয়, কখনো এলজি, কখনো এসজি।

অ্যাল্‌ফা ম্যাক্স?

তারও কোনো ঠিক নেই, তবে অ্যালফা ম্যাক্সই আমি পছন্দ করি।

মিসেস স্বামীনাথন বন্দুকটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে, ট্রিগার টিপছে, কাঁধের উপর রেখে এইম করছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা যেন জখম হয়ে আছে। আঙুলটা কাটা। দীনদয়ালকে দিয়ে দোস্ত-দোস্তালি সকলের কাছে কিছু কিছু মাংস পাঠিয়ে দিলাম। সুবেদার কেদার সিং-এর কাছে, এতোয়ারীতে মুনশীজীর কাছে, আরো অনেকের কাছে, আর পাঠালাম এক তলায় মিসেস স্বামীনাথনের কাছে।

BanglaBook.org

সেই দিন থেকে ঘনিষ্ঠতা শুরু হল। সকালবেলায় সাইকেল চড়ে মিসেস স্বামীনাথন যখন বাজার করে ফেরে তখন বেশ দেখায়। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিল্কের ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটা জুট সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি আর সামনের বেতের বাস্কেটের মধ্যে আলু, ভিণ্ডি, পারবোল আর ভাজি — এই সব।

হঠাৎ সে-দিন আমাকে নেমন্তন্ন করে বসল মিসেস স্বামীনাথন। গোয়রিঘাট থেকে গ্রীন পিজিয়ন মেরে এনেছে দু-তিন ডজন। নতুন বটফল পাকতে শুরু-করেছে, বর্ষা শুরু হয়ে গেছে কি না! বলল, আজ সকাল সকাল হ্যারি টাউনে বেরিয়ে গেছে। হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়েছিলাম বন্দুকটা নিয়ে, মতলব ছিল ডাক মারবার, কিন্তু...। আজ সন্ধে সাতটায় আসছেন তো, হ্যারিকে বলেছি, সে-ও আসবে তার আগেই।

সে-দিনকার নেমন্তন্নটা বিশেষ করে মনে আছে এই পঁচিশ বছর পরেও, কারণ অমন মাংসের রোস্ট জীবনে আর খেলাম না, আর খাবোও না।

শুনেছিলাম মিসেস স্বামীনাথন নিজে রান্না করেছিল।

সন্ধে সাতটার সময়ে নেমন্তন্ন। কিন্তু সে-দিন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সাতটা বুঝি আর বাজে না। কারণ তখন দীনদয়ালের রান্না খেয়ে খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া গ্রীন পিজিয়নটা বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। তার কাছে কোথায় লাগে মাটন, কোথায় লাগে ফাউল।

যা হোক, ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক তলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। মিসেস স্বামীনাথন সে-দিন পুরোপুরি বাঙালি সাজে সেজেছিল। একটা পিককের গায়ের রঙের মতো ব্রাইট জর্জেট শাড়ি ফিগারটাকে লেপটে জড়ানো আর চিতা বাঘের মতো ডোরা ছিটের ব্লাউজ কাঁধ পর্যন্ত, তার নিচেয় বাচ্চা হরিণের মতো নরম মোলায়েম দুটো হাত। বন্দুক হাতে যে মিসেস স্বামীনাথনকে দেখেছি গুজরানওয়ালার মেয়েদের তো কর্কশ কঠিন, কী জানি কেমন করে কেউটে সাপের ফণার মতো হাতের মাস্‌লগুলোকে সে-দিন সে লুকিয়ে ফেলেছে। আমি যেতেই পর্দা সরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল। বলল, আসুন মেটাজী।

বললাম, মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়?

হ্যারি এখনই এসে পড়বে, বোধহয় কোনো কাজে আটকে পড়েছে। সেল্‌সম্যানের কাজ বড় বিশ্রী কাজ মেটাজী, প্রত্যেককে প্লীজ করতে করতে অস্থির।

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম দু'জনে।

বললাম, ওঁর ব্যবসা তো অনেক ভালো আর আমাদের দেখুন তো, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। শরীরের আর কিছু থাকে না।

মিসেস স্বামীনাথন বলল, তা হোক, কিন্তু হ্যারি যে বাইরেই যেতে চায় না। বিয়ের আগে ওর ভালো একটা চাকরি ছিল, ছশো টাকা মাইনে পেত। সে-চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন মোটরের সেল্‌সম্যানশিপ ধরেছে। এখন কত বলি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো, তা যাবে না। আমাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে একটা রাত কাটাতে পারে না এমন ঘর-কুনো।

হেসে বললাম, সে তো যে-কোনোও স্ত্রীর পক্ষেই ঈর্ষার বিষয় মিসেস স্বামীনাথন, কিন্তু ছশো টাকার চাকরিটা ছাড়লেন কেন? আজকালকার বিজনেসের বাজার যে-রকম —।

না ছেড়ে যে উপায় ছিল না মেটাজী, তখন এমন ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, চাকরি তো চাকরি, হ্যারির জীবন নিয়ে টানাটানি। আমার রীতিমতো ভয় হয়ে গিয়েছিল।

কেন?

হয়তো আত্মহত্যা করে বসবে। বলা তো যায় না।

কেন, আত্মহত্যা করবার কী হয়েছিল?

মিসেস স্বামীনাথন বলল, হ্যারির পাগলামির কথা তো সব জানেন না। পুরুষ মানুষ যে অমন সেন্টিমেন্টাল হতে পারে তা হ্যারির সঙ্গে মেশাবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না। জানেন, তিনবার ও সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

কেন? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলে। হাসতে হাসতে মিসেস স্বামীনাথন বলল।

তারপর বলল, আমরা হলাম গোঁড়া হিন্দু বাঙালি, বাবা সাহেবী খানা খেলেও হিন্দুয়ানী আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে শেকড় বসিয়েছে, আর তাছাড়া তখন আমার হাতে চা খেতে বি.সি.এস থেকে শুরু করে আই.সি.এস পর্যন্ত পাঁচ-ছ'জন ক্যান্ডিডেট তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মোটর ড্রাইভ করে রোজ সন্ধেয় আমাদের বাড়ি আসছে। আর হ্যারি ভারি তো ছশো টাকা মাইনের মার্কেনটাইল ফার্মের অ্যাকাউন্টেন্ট, আমাকে কিনা বিয়ে করবার সাধ তার। সেন্টিমেন্টাল না তো কী বলব ওকে বলুন।

বেশ আগ্রহ হচ্ছিল গল্প শুনতে। মিসেস স্বামীনাথনের গল্প বলবার সময়ে ঠোঁটের যে অপূর্ব ভঙ্গি হচ্ছিল তাতে সেন্টিমেন্টাল হ্যারি কেন, যে-কোনো পুরুষের আত্মহত্যার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম, তারপর?

খিল খিল করে হেসে উঠল বাঙালি মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন। বলল, তারপর তো দেখছেনই এখন মিসেস স্বামীনাথন হয়েছি, কিন্তু হ্যারি অমনি ছাড়েনি আমাকে। অমন নাছোড়বান্দা পুরুষমানুষও আমি আর দুটো দেখিনি মেটাজী। এই দেখুন না, বলে হাতের কাটা আঙুলটা দেখলে উঁচু করে বলল, সারা শরীরে আমার খুঁত নেই কোথাও, অন্তত আমার অ্যাডমায়ারাররা তাই বলত। কিন্তু সারা জীবনের জন্য এই খুঁতটি আমার করে দিয়েছে হ্যারি।

গল্প আরো জমে উঠেছে। বললাম, কেন?

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে চাইল মিসেস স্বামীনাথন।

বলল, রাত ন'টা বাজতে চলল, এখনো তো হ্যারি আসছে না।

বললাম, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মিসেস স্বামীনাথন।

তা হোক, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়। আসুন আমরা আরম্ভ করে দিই।

হ্যারি নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে গেছে। তারপর শুরু হল ডিনার। অপূর্ব রান্না, অপূর্ব তার টেস্ট। জীবনে সেই ডিনারের কথা আর কোনো দিন ভুলব না।

খেতে খেতে আমাদের গল্প চলতে লাগল। বললাম, তারপর বলুন।

মিসেস স্বামীনাথন বললে, সেই দিনের ঘটনাটা বলি — মজুমদার আসবার কথা আছে, আসবার কথা আছে দীপেন, কুমার আর অলকের, কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হ্যারি দুপুর বেলা বাড়িতে এসে হাজির ওর মোটর বাইক নিয়ে। অপিস থেকে পালিয়ে এসেছে হ্যারি।

যেতে হবে শিকারে। ঠিক ছিল ফিরে আসব সন্ধ্যার আগে। কিন্তু হল না। নোয়ামুণ্ডির জঙ্গলে গোটাকতক তিতির মেরে ফিরে আসছি — হ্যারি বলল, বড়বিল সাইডিং-এর ধারে একটু বিশ্রাম নিতে। বিশ্রাম আর নেব কী বলুন, নোয়ামুণ্ডি থেকে চাঁইবাসায় আসতে ইঞ্জিন চালাতেও হবে না — এমন ঢালু রাস্তা, শুধু চেপে বসলেই হল এমন গড়ানে। তবু হ্যারি নাছোড়বান্দা, বলল, একটু বিশ্রাম করতেই হবে। সেইখানে বসেই হ্যারি কাণ্ড বাধাল। বললাম, কোন কাণ্ড?

মিসেস স্বামীনাথন আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আর একটু দো-পেঁয়াজী নিন মেটাজী। আপনার হয়তো লজ্জা হচ্ছে।

BanglaBook.org

খানিক পরে মিসেস স্বামীনাথন আবার বলতে শুরু করল, সেইখানে বসে আমরা চা পান শেষ করলাম, তারপর বোধহয় একটা ক্লান্তি এল হ্যারির শরীরে, ও শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা রেখে। তাতেও দোষ ছিল না, কারণ কোলটা আমার হলেও কেউ না-কেউ শোবার জন্যই তো হয়েছে ওটা। সুতরাং আমি আপত্তি করিনি, কিন্তু বিপদ ঘটল তারপর। হ্যারি বলল, আমি যদি হ্যারিকে বিয়ে না করি তো ও আত্মহত্যা করবে। তা কী করে হয় বলুন, আমরা হলাম হিন্দু বাঙালি আর ওরা হল মাদ্রাজী ক্রিশ্চান। আর তাছাড়া মজুমদারকে প্রায় এক রকম কথা দেওয়াই হয়ে গেছে, কিন্তু হ্যারি বলল আমার কোলে শুয়েই সে আত্মহত্যা করবে। আমাকে না পেলে ওর নাকি মরাই ভালো। তা ভালো তো ভালোই, কী বলুন, কিন্তু আমার সামানে আর আমার কোলে শুয়েই বা আত্মহত্যা করা কেন ? আড়ালে করলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট। আপনাকে আর দু-স্লাইস রুটি দেব মেটাজী ?

খানিক থেমে মিসেস স্বামীনাথন আবার আরম্ভ করল, আমি বিরক্ত হেয়ে কোল থেকে হ্যারির মাথাটা দিলাম সরিয়ে। ও আপত্তি করল না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই আমার বারো বোরের বন্দুকটায় এক মুহূর্তে একটা এল.জি পুরে নিয়ে নিজের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল আর সঙ্গে সঙ্গে — আপনি আর একটু কারি নিন মেটাজী, কিছুই খেলেন না দেখছি। বললাম, ও-কথা থাক, আপনি বলুন তারপর কী হল। মিসেস স্বামীনাথন বলল, দশটা বাজতে চলল, এখনো দেখছি হ্যারি আসছে না। নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে পড়েছে। কী বলেন ?

বললাম, তারপর বলুন।

তারপর আর কী ? এই তো আমার মাঝখানের আঙুলটা দেখছেন, আধখানা উড়ে গেছে, এ ওই হ্যারিকে কেবল বাঁচাবার জন্য। আমিও তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ধরে বাধা দিতে গেছি, কিন্তু দেরি হয়ে গেল একটু। হ্যারি বাঁচল একটুর জন্য কিন্তু আমার আঙুলটা...। বাইরে যেন সাইকেল রিকশার ঘণ্টা বাজল না মেটাজী ?

মিসেস স্বামীনাথন টেবিল ছেড়ে উঠল। বলল, এক্সকিউজ মি, এতক্ষণে বোধহয় হ্যারি এল।

সত্যি হ্যারি সাইকেল রিকশায় এল। কিন্তু সেই সময়, ঠিক আমাদের গল্পের চৌমাথায় পৌঁছবার আগেই হ্যারি না এলেই যেন ভালো করত। পরে অনেক বার ভেবেছি, সে-দিন আমার সামনে এমন অবস্থায় মিসেস স্বামীনাথনের স্বামী কেন এল। কেন এল না আরো অনেক পরে যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আমার ঘরে চলে আসতাম। তাহলে মিসেস স্বামীনাথনও অমন ভাবে ধরা পড়ত না।

সেই রাত্রে মিসেস স্বামীনাথনের যে-ব্যবহার দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না। আর সে-ব্যবহার করল কিনা আমারই উপস্থিতিতে।

রিকশার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিসেস স্বামীনাথন মাতাল হ্যারিকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। হ্যারি তখন বেশ টলছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ভালো করে।

আমাকে চিনতে পেরে হ্যারি বলল, হ্যালো বয় ?

তারপর কী একটা বেয়াদবি করতেই মিসেস স্বামীনাথন এক কাণ্ড করে বসল। দেখলাম মিসেস স্বামীনাথনের শরীরে আবার কর্কশ কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। চিৎকার করে উঠল, স্কাউন্ড্রেল !

তারপর হ্যারিকে চুলের মুঠি ধরে সে কী ঝাঁকুনি। অচৈতন্য হ্যারির চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা হল। শেষে আমার দিকে একবার কাতর চাউনি দিয়ে হ্যারিকে বেডরুমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

পাশের ঘরে যেতে যেতে হ্যারি আমার দিকে ফিরে বলল, চিয়ারিউ বয়, চিয়ারিউ।

তখনো বাকি ছিল পুডিং আর কফি। আমার ডিনার শেষ হল না। মিসেস স্বামীনাথনকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যই আমি নিঃশব্দে ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। মনে হল মিসেস স্বামীনাথনের অপমান যেই করুক তা দাঁড়িয়ে দেখাও যেন অপরাধ।

BanglaBook.org

টি.আই বুড়ো অ্যান্টনী বলল, সো ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর মিস্টার মেটা, মুদেলিয়ার বললেন, ড্রানকার্ডস্ আর অলওয়েজ স্কাউন্ড্রেল্স্, ঠিকই হয়েছে। সোনপার সাহেব বললেন, বাজে কথা, আমি তো বরাবরই ড্রিঙ্ক করি, তবে মডারেট ডোজে কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়াইফ কখনো আপত্তি করেনি। বরং, মুদেলিয়ার বললেন, তা তো করবেই না, আমি শুনেছি বেঙ্গলি গার্লরা কলকাতার হোটেলে পাবলিকলি স্মোক আর ড্রিঙ্ক করে।

সোনপার সাহেব বললেন, আই টেক সিরিয়াস অবজেকসন টু ইট।

টি. আই অ্যান্টনী বলল, চুপ করুন আপনারা। তারপর বলুন মিস্টার মেটা।

গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন।

বিলাসপুর রেলওয়ে কলোনি এখন নিস্তব্ধ। রাস্তার আলোগুলো চুপচাপ প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু বিলাসপুরের ইয়ার্ডে শান্টিং-এর শব্দ মাঝে মাঝে আকাশকে চমকে দেয়। শুধু দিল্লি রেডিওতে এখন দরবারী কানাড়ায় খেয়াল ধরেছে কোনো ওস্তাদজী। মেটাজী বললেন, তার কিছু দিন পরে হঠাৎ এক দিন দেখা হয়ে গেল মিস্টার স্বামীনাথনের সঙ্গে বাড়ির বাইরে। আমি ট্রেন থেকে নেমে 'কিংসওয়ে'তে গেছি রাত্রের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়ার মতলবে, কারণ ট্রেন লেট ছিল, আর এত দেরিতে আবার দীনদয়াল কেন কষ্ট করবে এই ভেবে। হঠাৎ দেখি, হ্যারি স্বামীনাথন দূরে একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে, বাঙালি নয়, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

আমাকে দেখতে পেয়েই হ্যারি নিজের বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে এল। এসে আমার সামনের চেয়ারেই মুখোমুখি বসল। বলল, গুড ইভনিং বয়।

দেখলাম নেশা বেশ হয়েছে। এবং ক্রমে ক্রমে আরো হবার আশা আছে। আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম, আমি উঠি।

সে কী, একটু খাবেন না?

আমার আপত্তিতে হ্যারি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। বলল, ভালো কথা, একটা কথা আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করব ভাবি!

কী কথা?

এই যে রাত্রে বাড়িতে ফিরে সুজাতার সঙ্গে আমি প্রায়ই ঝগড়া করি, আপনি টের পান? কী যে ওর স্বভাব মশাই। সকলে সব জিনিসে রস পায় না, তা না পাক, ধরুন আমার মদ খেতে ভালো লাগে, সুজাতার ভালো লাগে না। তোমার ভালো লাগে না তুমি খেও না, কিন্তু আমি যদি খাই তুমি বাধা দেবার কে? ঠিক কিনা বলুন। এখন এই নিয়ে রাত্রে মশাই রোজ আমাদের ঝগড়া হয়।

বললাম, এবার তা হলে উঠি?

কিন্তু আপনি বললেন না তো?

কী কথা?

ওই আপনি টের পান কি না?

কেন বলুন তো, আমি টের পেলেই-বা।

সেই কথাটা সুজাতাকে একবার বোঝান দিকি, আমিও যত বলি, মেটাজী টের পেলেই-বা, সুজাতা বলে, তুমি শেমলেস হতে পারো কিন্তু আমার লজ্জা করে। অর্থাৎ আমি যে মদ খাই এটা যেন দোষের নয়, দোষটা হল আপনার টের পাওয়াতে।

বললাম, মিসেস স্বামীনাথন যখন চান না, তখন আপনি ওটা খান কেন?

আপনি বুদ্ধিমান হয়ে এই কথা বলছেন? হ্যারি বোতল হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি আমাদের হিস্ট্রি কিছু জানেন না, আমি ছশো টাকার চাকরি ছেড়েছি সুজাতার জন্য,

BanglaBook.org

জানেন? নইলে আজ আমি মোটর গাড়ির পেটি সেলস্‌ম্যান! তিনবার আমি সুইসাইড করতে গেছি। তিনবার সুজাতা আমাকে বাঁচিয়েছে। সুজাতা আমাকে কম ভালোবাসে ভেবেছেন! ওর সব ভালো, অমন সতী স্ত্রী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? এক রাত্তির আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না। আমি যেমন ওর জন্য আমার চাকরি, আমার সব ত্যাগ করেছি, ও আমার জন্যে ওর বাবার প্রচুর সম্পত্তি স্যাক্রিফাইস করেছে। শেষে মজুমদারকে এড়াবার জন্য আমার সঙ্গে 'পালিয়ে এসেছে। অমন একনিষ্ঠ ভালোবাসায় তুলনা হয় না মেটাজী। কিন্তু ওর ওই এক দোষ, আমার মদ খাওয়া মোটে পছন্দ করে না। কিন্তু ন্যানসিকে দেখুন, ওই যে বসে আছে।

দূরের টেবলে বসা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখাল হ্যারি।

বলল, ওই ন্যানসিকে দেখুন। ওকে আমি যত খাওয়াব তত খাবে, একবারও না বলবে না। ও এক পিপে মদ খাওয়ালে খেতে পারে। সুজাতাকে কত বলেছি খেতে, কিছুতেই খাবে না, মাতাল দেখলে একশো হাত দূরে পালিয়ে যাবে। ওদের আর সব ভালো মশাই, বাঙালি মেয়েরা ওই এক ব্যাপারে ভারি কন্‌জারভেটিব। সে-দিন অনেক কষ্টে মাতালের হাত ছাড়িয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি চলে আসতেই হ্যারি আবার ন্যানসির টেবলে গিয়ে বসল। কিন্তু বাড়ি এসে একটু সকাল সকাল শোবার ব্যবস্থা করছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। হাওবাগের এ-দিকটা সন্ধে থেকেই অবশ্য নিরিবিলি হয়ে যায়। তার পরে ক্লান্তও ছিলাম খুব। দীনদয়াল এসে খবর দিল এক তলার মেমসাহেব সেলাম দিয়েছে।

অত রাত্রেই গেলাম নিচেয়। মিসেস স্বামীনাথন একলা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বলল, এবার আপনি অনেক দিন বাইরে ছিলেন মেটাজী?

বললাম, আমার ব্যবসায় শুধু ওই ঘোরাই সার, লাভ বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়?

মিসেস স্বামীনাথনকে বেশ চিন্তিত দেখলাম, বলল, সেই জন্যই আপনাকে ডেকেছি মেটাজী।

বললাম, হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছেন।

না, কিন্তু ক'দিন থেকেই বেশি রাত্রে ফিরছে হ্যারি। দিন দিন ওর যেন অত্যাচারটা বাড়ছে। দেখুন না, এখন এগারোটা বাজল, এখনো এল না। আপনার সাইকেলটা একবার দিতে পারেন মেটাজী? আমারটা পাঙচার হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে।

কিন্তু এত রাত্রে সাইকেল কী করবেন? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমি হ্যারিকে খুঁজতে যাব।

এত বড় শহরে কোথায় খুঁজবেন তাঁকে?

জব্বলপুরে যত মদের দোকান আছে সব জায়গায় খুঁজব। আজ একটা গাড়ি বিক্রি করবার কথা ছিল ওর। পাঁচ হাজার টাকার কার। আজ কয়েকশো টাকা ওর হাতে আসবার কথা। সেই সকালবেলা বেরিয়েছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, তারপর এই এত রাত হল। আপনি সাইকেলটা আনিয়ে দিন, আমি ততক্ষণে কাপড়টা বদলে নিই।

বলে মিসেস স্বামীনাথন ভেতরে চলে গেল সেই মুহূর্তে। আমি দীনদয়ালকে ডেকে সাইকেলটায় বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। খানিক পরেই মিসেস স্বামীনাথন বেরিয়ে এল অপূর্ব পোশাক পরে। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় মিসেস স্বামীনাথনের যে অপরূপ রূপ দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না, সালোয়ার আর শেরোয়ানী পরা পাঞ্জাবি মেয়ে হাজার হাজার দেখেছি। কিন্তু বাঙালি মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের সেই পোশাক আমার ব্যাচিলর মনে সেই রাত্রে যে মোহ বিস্তার করেছিল তা অসহ্য। অত রাত্রে ওই জ্বালাধরা পোশাক পরে মাতাল স্বামীকে মদের দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়ানো বড় রোমান্টিক মনে হয়েছিল আমার সেই তরুণ বয়সে।

BanglaBook.org

মিসেস স্বামীনাথন সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বলল, জেন্টস্ সাইকেল বলেই এই পোশাকটা পরলাম। এতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য কিন্তু নেই আমার মেটাজী।

আমি একবার বললাম, এত রাত্রে আর নাই-বা বেরুলেন, মিসেস স্বামীনাথন।

ভয়? ভয়ের কথা বলছেন?

মিসেস স্বামীনাথন হেসে উঠল। বলল, এর চেয়েও অ্যাডভেঞ্চারাস কত কাজ আমাকে জীবনে করতে হয়েছে। আর তাছাড়া আপনি মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন মেটাজী। হাজব্যান্ড যদি মনের মতো না হয় তার চেয়ে বড় অশান্তি মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই।

তারপর সাইকেলের প্যাডেলে একটা পা রেখে বলল, এ ছাড়াও আপনার তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকার অভাবেই দিতে পারা যায়নি, কথা ছিল এই টাকাটা পেয়ে ওটা মিটিয়ে দেব। কিন্তু আজ যদি সবটাই উড়িয়ে দেয়, কী সর্বনাশ হবে বলুন তো মেটাজী? হয়তো আমি গিয়ে পড়লে কিছু টাকা অন্তত বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল মিসেস স্বামীনাথন।

আমি বললাম, কিন্তু এমনও তো হতে পারে হ্যারি হয়তো মদের দোকানে নেই। অন্য কোথাও...।

কিংসওয়ে হোটেলে হ্যারি স্বামীনাথনকে যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সির সঙ্গে মদ খেতে দেখেছি সে-কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি। কিন্তু প্রখরবুদ্ধি মিসেস স্বামীনাথন আমার কথার তাৎপর্য ধরে ফেলেছে এক নিমেষে। কথাটা শুনে যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনো উত্তর বেরল না। যেন নিজেকে তার পরাজিত মনে হল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। বলল, আপনি যা ভাবছেন তা হতে পারে না মেটাজী। হতে পারে না, কখনো হতে পারে না। ওই হ্যারি তিনবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল আমার জন্যে, ও জানে আমি ওর জন্য কী-ই না স্যাক্রিফাইস করেছি...। হ্যারি অমন আনফেথফুল হতে পারে না। এখনো যে রাত্রে আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না। কিন্তু...।

কথাটা বলে কিন্তু তখনো খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস স্বামীনাথন। মনে হল যেন হঠাৎ এক বিদ্যুৎ ঘোষিত মৌসুমী ঝড় তার মনের আকাশে বইতে শুরু করেছে, তারপর কেউটে সাপের মতো ফণাটা হঠাৎ বিস্তার করে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। সত্যই তো, কিছুই অসম্ভব নয়। সাইকেলটা একবার ধরুন তো মেটাজী।

মিসেস স্বামীনাথন হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বারো বোরের বন্দুকটা বার করে নিয়ে এল। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন শরীরের বাঁ-দিকে।

সেই অবস্থায় সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বলল, আমাকে একটা এল.জি ধার দিতে পারেন মেটাজী?

কেন, এল.জি কী করবেন?

আগে দিন, তারপর বলব। একটু শিগ্গির করুন মেটাজী।

দীনদয়ালকে বলে আমার বাক্স থেকে একটা এল.জি কার্ট্রিজ আনিয়ে দিলাম মিসেস স্বামীনাথনের হাতে।

এবার বলুন এল.জি কী করবেন? আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মিসেস স্বামীনাথন বলল, হ্যারির জন্য আমারও সারা দিন কিছু খাওয়া হয়নি, কিন্তু গড় ফরবিড়, আপনার কথা যদি সত্যিই হয় মেটাজী, তখন আমি কী করব! হ্যারিকে গুলি করা ছাড়া আমার কী উপায় আছে বলুন? ওর মদ খাওয়া আমি তবু টলারেট করেছি কিন্তু মেয়েমানুষ জড়িত থাকলে ওকে

BanglaBook.org

ক্ষমা করব কী করে মেটাজী। ওকে আমি খুন করব এই আপনাকে বলে রাখছি। ওর সঙ্গে যদি মেয়েমানুষ থাকে তো আমি খুন করব। হাতিয়ার সঙ্গে রাখলাম যাতে দেরি না হয়।

তারপর একটা কথাও না বলে সাইকেলে উঠে মিসেস স্বামীনাথন অন্ধকারে অন্তর্হিত হল।

বুড়ো টি.আই অ্যান্টনী বলল, স্পেলেনডিড মিস্টার মেটা, স্পেলেনডিড। তারপর?

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন, আমার ছোট ছেলের পড়ার বইতে পড়ছিলাম ট্রুথ ইজ্ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন, কথাটা নেহাত মিথ্যে নয় তাহলে।

সোনপার সাহেব বললেন, জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা আপনার মুদেলিয়ার গারু। চোদ্দ বছর বয়সে রেলে ঢুকেছেন, খেয়েছেন চারুপানি আর ঘষটে ঘষটে আজ বিলাসপুরের স্টেশন মাস্টার। ভাবছেন চরম স্যালভেশন পেয়ে গেছেন। কিন্তু জীবনের জানলেন কী? একটু মদও খেলেন না। এক দিন আপসি কামাইও করলেন না, কখনো বেনিয়মও করলেন না জীবনে।

গুরুবচন মেটা বললেন, অন্য কথা থাক, গল্পটা শেষ করে নিই। রাত অনেক হয়ে গেল...।

ইনস্টিটিউটের সমস্ত ঘর অন্ধকার। পেণ্ড্রারোডের দিক থেকে একটা মাল গাড়ি ক্লান্ত গতিতে আসছে। দূরে লোকো শেডের দেয়ালে ইঞ্জিন-গর্জনের প্রতিধ্বনি বার বার রেল-কলোনির নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানটি পর্যন্ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল, কিন্তু মনসুন এখনো শুরু হল না।

তারপর সেই রাত্রে ওপরে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অনেক বার ভেবেছি। ভেবেছি, কিংসওয়ে হয়তো এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি সেখানে নেই। হয়তো ন্যান্সির সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের এ কী ভয়াবহ কাণ্ড! সারা দিন হ্যারির নাওয়া-খাওয়া নেই তাই মিসেস স্বামীনাথনও উপোস করেছে সারা দিন। তার পরে এই ক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় এত রাত্রে বারো বোরের বন্দুক আর ধার করা এল.জি কার্ট্রিজ নিয়ে পরের সাইকেল চড়ে স্বামীর খোঁজে মদের দোকান দেখতে যাওয়া — এ-নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে তো মনে হবে গাঁজাখুরি, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমার মনে হল আর কোনো দেশের মেয়েরা এমন করে এমন অবস্থায় বেরুতে পারত না, এক বাঙালি মেয়েরা ছাড়া। আর আমার নিজের জাত শিয়ালকোট গুজরানওয়ালার মেয়েদের কথা জানি, তারা এই দূর থেকেই যা...।

সে যা হোক, সে-রাত্রে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়েই জেগে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম, ওদের ফেরার খবর পাব বলে। হ্যারি রাত্রে ফিরবেই এমন ধারণা আমার ছিলই। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সি সঙ্গে থাকলেই শুধু বিপদ ঘটবে তা-ও জানতাম। আর এ-ও জানতাম হ্যারিকে খুন করতে পেছপাও হবার মতো মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন নয়। কারণ হ্যারিকে মিসেস স্বামীনাথন যেমন গভীর করে ভালোবাসে তেমন করে ক'জন মেয়েমানুষ তাদের স্বামীকে ভালোবাসতে পারে?

কিন্তু কোথা দিয়ে কখন সে-রাত্রে চোখে ঘুম নেমে এল টের পাইনি। পরদিনও আবার সকাল হবার আগেই জব্বলপুর ছেড়ে ভোরে ট্রেন ধরে ভুসাওয়াল যেতে হল।

কয়েক দিন পরে যখন ফিরে এলাম শিয়ালকোট লজে তখন সে-প্রসঙ্গ বাসী হয়ে গেছে। সুজাতা স্বামীনাথনকে দেখি সাইকেল চড়ে বেতের বাস্কেটে করে বাজার করে আসে। তারপর হ্যারি স্যুট্ টাই পরে সাইকেল রিকশায় চড়ে কোথায় বেরিয়ে যায়। আবার ফেরে অনেক রাত্রে। একটা টিম্ টিম্ আলো জ্বালিয়ে সাইকেল রিকশায় চড়ে।

সে-দিন সেই রাত্রে তবে কি হ্যারিকে কিংসওয়েতেই পাওয়া গিয়েছিল? ন্যান্সি কি ছিল না সঙ্গে? আমার ব্যাচিলর মনে এ-সব প্রশ্ন মাঝে মাঝে আলোড়ন করত।

BanglaBook.org

সে-দিন সুজাতা স্বামীনাথন সোজা চলে এল ওপরে আমার এলাকায়। বলল, একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম মেটাজী।

বললাম, বসুন, আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে, আপনার কথাটাই আগে বলুন।

সুজাতা বলল, তাই বলি, আপনার সেই এল.জি কার্ট্রিজটা আমার কাছেই রয়েছে। কাজে লাগেনি। ওটা এখনো কিছু দিন থাক আমার কাছে। দরকার না হলে ফিরিয়ে দেব আপনাকে। আপত্তি নেই তো?

বললাম, এবার আমার কথাটা বলি, সে-দিন রাত্রে আপনাকে বন্দুক হাতে একলা ছেড়ে দিয়েছিলাম। পরে মনে হল সঙ্গে গেলে হত। ঝোঁকের মাথায় কী হয়তো করে বসবেন। দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমার এখনো ভালো জ্ঞান হল না মিসেস স্বামীনাথন।

সুজাতা বলল, দেখুন, হ্যারিকে যদি আমি কোনো দিন খুন করি তো সে একা আমার দায়িত্বে, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আমার আর হ্যারির, এতে কোনো থার্ড পারসন নেই।

বললাম, আপনি কি সত্যি ও-বিষয়ে সিরিয়াস?

নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না মেটাজী, আমি অন্য বাঙালি মেয়ের মতো মানুষ হইনি। আমার শিক্ষা-দীক্ষা সব আলাদা। সে-দিন রাত্রে হ্যারির খোঁজে বেরিয়েছিলাম আপনার সাইকেল আর এল.জি নিয়ে, ভাববেন না ঠাট্টা করতে বা ভয় দেখাতে। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি হ্যারি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। এই মদের ওপরেই যা দুর্বলতা আছে ওর। আর কোনো কিছুতে নেই মেটাজী। হ্যারি মিছে কথা বলবার মতো লোক নয়। কিন্তু যদি...।

বললাম, সে-দিন শেষ পর্যন্ত কোথায় দেখা পেলেন ওর?

সুজাতা স্বামীনাথন বলল, ও বাড়ির দিকেই আসছিল। সারা দিন সেই মোটর বিক্রি নিয়ে এমন পরিশ্রম গিয়েছিল যে, বাড়িতে এসে খাবার সময় পর্যন্ত পায়নি। তবে স্বীকার করল ও মদ খেয়েছিল। এই নিন চার মাসের বাকি ভাড়া। একটা রসিদ সময় মতো দেবেন।

কী জানি কেন তখনো সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সির কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

কিন্তু যাবার সময়ে সুজাতা বলল, কিন্তু এ-ও বলে রাখছি মেটাজী, যদি কোনো দিন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাই, সে-দিন আমি হ্যারিকে...। আমার ওই বারো বোরের বন্দুকে এল.জি লোড করে রেখেছি। ওকে আমি খুন করবই। আপনিই সে-দিন আমার প্রথম চোখ খুলে দিয়েছেন।

বললাম, না না, মাফ করবেন সুজাতা বাঈ, আমি কিছুই জানি না। আমি কিছুই দেখিনি।

সুজাতা স্বামীনাথন বলল, না, শুধু আপনি নন, আরো অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে, হ্যারিকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু আমি নিজে যদি কোনো দিন চোখে দেখতে পাই তো খুন করব ওকে। আমি আমার বাবা-মা ভাই-বোন আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি পায়ে ঠেলে শুধু ওর টানে চলে এসেছি। শেষকালে সেই হ্যারি যদি আনফেথফুল হয়, তাহলে... আপনি ব্যাচিলর মানুষ, ঠিক বুঝবেন না।

গুরুবচন মেটা আবার আরম্ভ করলেন, ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে। ঠিক তার পরদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটল। সে-দিনও এমনি জুন মাস, মনসুন আরম্ভ হয়নি। চুপচাপ ওপরের পশ্চিমমুখো বারান্দায় বসে আছি। কোনো কাজ নেই হাতে। সামনের বাগান পেরিয়ে বি.এন.আর-এর আমবাগানের দিকে চেয়ে ছিলাম। আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে এল। দীনদয়াল এক গ্লাস ঠাণ্ডা মাঠা দিয়ে গেছে। তা-ও খাওয়া শেষ করে খালি গেলাসটা পাশের চেয়ারের ওপর রেখে দিলাম। সানি ভিলার দিকে হাওবাগ স্টেশনে বুঝি কোনো মালগাড়ি এল। ও-দিকের আকাশটা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আসছে। আমার

BanglaBook.org

সামনের বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম, সুজাতা স্বামীনাথন সাইকেল চড়ে চৌক থেকে ফিরল মার্কেটিং করে। ওপর দিকে চাইতেই দু'জনেই উইশ করলাম। তারপর আধ ঘণ্টাও কাটেনি হঠাৎ দেখি একটা সাইকেল রিকশা আসছে আমারই শেয়ালকোট লজ লক্ষ্য করে। দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়নি। গেটের মধ্যে সাইকেল রিকশাটা ঢুকতেই নজরে পড়ল হ্যারি একলা নয়। প্রচুর মদ খাওয়ার জন্য নিজে একেবারে অর্ধ বেহুঁশ, আর সঙ্গে সেই ন্যান্সি, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। সে-ও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হল না।

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হল না, এখানে ন্যান্সিকে নিয়ে এল কেন? তবে হয়তো ওর খেয়াল নেই। দু'জনে কিংসওয়ে থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে এসেছে। কিংবা হয়তো পুরনো রিকশাওয়ালা। রোজকার অভ্যাস মতো বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা দু'জনেই জানে না, কোথায় কোন বাড়িতে এসে ওদের নামিয়েছে রিক্শাওয়ালা।

উত্তেজনায় সমস্ত নার্ভ আমার শিথিল হয়ে এল। এখনি যে বিপদ ঘটবে, তা ওরা কেউ জানে না। অথচ কালকেও আমার কাছে সুজাতা স্বামীনাথন সে-প্রতিজ্ঞা করে গেছে। ও মেয়ে তো সে-কথা ভোলাবার নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার থর থর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল, এখনই এক তলায় একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে আর তারপর দুটো না হোক, একটা লাইফ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক এইম করে মারতে পারলে একটা টাইগারের লাইফের পক্ষেও একটা এল.জি যথেষ্ট।

কথাটা মনে পড়তেই আরো আতঙ্ক হল আমার। ওটা তো আমার এল.জি। যদি প্রমাণ হয় আমি সুজাতাকে ও এল.জি-টা দিয়েছি, তাহলে মার্ডার চার্জে তো আমিও পড়ব। হ্যারির বডি থেকে যদি এল.জি-টা বেরোয়! তারপর সুজাতা স্বামীনাথনের সঙ্গে ব্যাচিলর বাড়িওয়ালা গুরুবচন মেটার একটি কল্পিত সম্পর্ক খাড়া করে দিয়ে হ্যারি স্বামীনাথনকে খুনের অপরাধে...। আর ভাবতে পারলাম না।

কান পেতে রইলাম উদ্গ্রীব হয়ে। নিচে ওদের তুমুল ঝগড়া চলেছে। মাঝে মাঝে সুজাতার গলা। তারপর হ্যারির। হ্যারি মদ খেলেও মনে হল যেন সেন্স ঠিক আছে তার। এইবার বুঝি সুজাতা স্বামীনাথনের বারো বোরের বন্দুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে উঠবে। গুরুবচন মেটা থামলেন।

আজাইব সিং বললেন, থামলেন কেন মেটাজী?

বুড়ো টি.আই অ্যান্টনী বলল, শেষ হয়ে গেল নাকি?

সোনপার সাহেব বললেন, বন্দুকের শব্দটা শেষ পর্যন্ত হল কি না বলুন, মেটাজী আর দেরি করবেন না।

মুদেলিয়ার বললেন, সুজাতা কি দু'জনকেই মারল, না এক জনকে মারল?

সোনপার সাহেব বললেন, আপনার যেমন চারুপানি খাওয়া বুদ্ধি মুদেলিয়ার গারু, এল.জি তো একটা শুনে আসছেন। দু'জনকে মারবে কী করে?

মুদেলিয়ার বললেন, তবে কি নিজেই আত্মহত্যা করল নাকি সুজাতা! বড় সমস্যা ফেলেছেন, উঃ!

গুরুবচন মেটা মিটি মিটি হাসতে লাগলেন। আপনারা এ কাহিনির যত কিছু পরিণতি ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু আমার ধারকাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারবেন না এই আমি বলে দিলাম।

টি.আই বুড়ো অ্যান্টনী সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, আর বাজে কথা বলবেন না স্যার, শেষটা বলে দিন দয়া করে।

গুরুবচন মেটা বললেন, আপনাদের আমি গোড়াতেই বলেছি যে, গল্প যেখানে আমি শেষ করব, তার পরে আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। আপনারা জানেন বোধহয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ ব্যাপক, কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে

BanglaBook.org

গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তাব ক্ল্যাইম্যাক্স আছে। সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। আমার সেই শর্ততে আপনারা রাজি হয়েছিলেন, মনে আছে বোধহয়। যা হোক, এখনই শেষ অধ্যায়টা বলি।

একটু থেমে মেটাজি বলতে লাগলেন, সেই রকম উদগ্রীব হয়ে বারান্দায় ছটফট করছি, কী হবে, কী হবে! ভাগ্যিস দিনদয়াল বাড়ি ছিল না, চৌকে গিয়েছিল ভঁইষের খড় কিনতে, নইলে সে-অবস্থায় আমাকে দেখলে হয়ত পাগল ভাবত, তার আসতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি। হঠাৎ মনে হল নিচে কার গোলমাল যেন থেমে এল। পাশের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে অবাক হয়ে গেছি! আর কেউ নয়। মিসেস স্বামীনাথন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে উঠছে। মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায় পরাজয়ের কলঙ্কে, অপমানে একেবারে থরোলি অন্য রকম দেখাচ্ছে, চোখ ফেটে জল বেরুবে এখনি।

সুজাতা স্বামীনাথন আমাকে কথা বলবার অবসর দিল না পর্যন্ত। ছুটে এসে আমার একটা হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, দেখছেন তো হ্যারির কাণ্ড!

তারপর আমাকে টানতে টানতে বলল, কাম অন মেটাজী, কাম অন।

আমি হতবাক হয়ে সুজাতা স্বামীনাথনের পেছনে চলতে লাগলাম।

তারপর আমার শোবার ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, মেটাজী, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আই মাস্ট বি আনফেথফুল, আমি এর প্রতিশোধ নেব। বলে এক মুহূর্তে ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে সজোরে খিল লাগিয়ে দিল॥

প্রতিভা বসু

রিফিউজি মেয়ে

গৃহকর্ত্রীর কাছে বকুনি খেয়ে বিতাড়িত মেয়েটি ভেকু ভেকু রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাংলাদেশ থেকে এসেছে। দেখতে খুবই সুন্দর। একান্ত ভাবেই সরল এবং অজ্ঞ। পথঘাটও চেনে না। বয়স বড়ো জোর চোদ্দ কি পনেরো। শাড়ি পড়ে বলে বড়ো দেখায়। পাশের ফ্ল্যাটের কাজের মেয়ে দামিনীর মা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কী রে, এ সময়ে রাস্তা ঘুরছিস, কাজ নেই?

মেয়েটা কেঁদে ফেলে বলল, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কেন, তুই কী করছিলি?

মাইনে চেয়েছিলাম।

মাইনে চেয়েছিস বলেই তাড়িয়ে দিল? সে কী কথা!

চার মাস কাজে লেগিছি, একটা টাকাও দেয়নি।

তোর মাইনে কত?

জানি না।

জানিস না মানে? হাবা নাকি? মাইনে ঠিক করে কাজে লাগিসনি?

বলিছিল অনেক দেবে।

অমনি তুই চলে এলি? এখানে তোর কে আছে?

কেউ না।

BanglaBook.org

তবে তুই এলি কী করে?

দালাল ধরি টাকা দিয়ি।

এখানে তোর কেউ নেই তবে এলি কেন?

ওখানে যে থাকা যায় না। ওরা টালায়, বিয়া বসতি চায়।

কারা টালায়? কারা বিয়া বসতি চায়?

যাদিগো দেশ। আমারে এটটা কাজ দিবা দিদি?

দেব। তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি দোকানে যাচ্ছি। ঘরে চিনি নেই, এখন দেরি করতে পারছি না, ফিরে আসি, কাজের কথা বলব। দুটো কাজ আছে আমার হাতে। দামিনীর মা দৌড়ে দৌড়ে চলে গেল। মেয়েটা দাঁড়িয়ে রইল।

অন্য ফ্ল্যাট থেকে এক জন ভৃত্য বেরিয়ে এল। নাক ঝাড়ছিল, চোখ পড়ে গেল মেয়েটার দিকে। অমনি চোখ-মুখ চকচকে দেখাল, বিগলিত গলায় বলল, আরে, তুই এখানে? কী করছিস?

মেয়েটা বলল, যা খুশি তা কুরছি, তোমার কী?

রাগ করছিস কেন? আমি কি তোকে কোনো খারাপ কথা বলছি?

আমার খারাপ-ভালোর দরকার নেই। তোমার কাজে তুমি যাও, আমার দিকে চাইও না।

চাইব না? না চেয়ে পারা যায়? তোকে যে আমি ভালোবাসি তা কি তুই জানিস না?

জানবু না কেনো। খুব জানি। ভালো কইরাই জানি। সক্কলের ভালোবাসাই আমার জানা আছে।

ভৃত্যটা এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল। মেয়েটি এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে ছুঁবে না, কেউ ছুঁলি আমার ভাল্লাগে না।

কেন রে, ভৃত্যটির মুখ তেমন বিগলিত। সে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে ফস করে তার ব্লাউসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। মেয়েটা একটা কামড় বসিয়ে দিয়ে দূরে সরে গিয়ে কাঁদতে লাগল।

এই ফ্ল্যাট বাড়িতে মোট চব্বিশটা ফ্ল্যাট। পায়রার খোপের মতো ঘরে ঘরে সব সংসার। প্রত্যেকের বাড়িতেই কাজের লোক আছে। কোনো বাড়িতে পুরুষ, কোনো বাড়িতে মেয়ে। তাদের নানা রকম বয়স, নানা রকম চরিত্র। কেউ আজ আসে কাল যায়, আবার কেউ কেউ টিকে যায়। আবার কেউ এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কারো সঙ্গে কারো ভাব-ভালোবাসা নেই, থাকলেও মুখে মুখে। তবে ভাব ভালোবাসার প্রশ্ন না থাকলেও এর বাড়ির লোক সে ভাঙিয়ে নিচ্ছে তার বাড়ির লোক সে ভাঙিয়ে নিচ্ছে, এটা প্রায় নিয়ম।

নন্দিতা এ-বাড়ির তেতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকে। পেশা অধ্যাপনা। বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। স্বামী বছর চারেক আগে কোনো অজানা অধরা অসুখে মারা যাবার পরেই এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়েছে। আগে কলকাতার বাইরে ছিল, স্বামী ছিল মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, বদলির চাকরি, ঘুরে ঘুরেই থাকতে হয়েছে তার সঙ্গে। তাই চাকরি করা তার পোষাত না। মৃত্যুর পরে চেষ্টাচরিত্র করে কাজে বহাল হয়ে এখানে এসেছে, এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। বিজ্ঞানের ভালো ছাত্রী, এমএ'তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল, পিএইচডি-ও করেছিল। গবেষণার কাজে নিয়োজিতও করেছিল নিজেকে, বিয়েটা হঠাৎই হয়ে গেল। কুণাল অর্থাৎ তার স্বামী তার কোনো আত্মীয় দাদার শ্যালক। সেই দাদার বাড়িতেই আলাপ, এবং অল্প দিনের আলাপেই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হওয়া এবং দাদার মধ্যস্থতায় বিবাহ। কিন্তু সুখ সইল না। কপালদোষে মারা গেল কুনাল, নন্দিতা রিক্ত হয়ে ফিরে এল কলকাতায়। কিছু দিন মা-বাবার কাছে থেকে চাকরি পাবার পরে চলে এসেছে আলাদা বাড়িতে। সন্তানাদি হয়নি, একাই থাকে।

প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সঙ্গেই ছোট্ট একটা ব্যালকনি আছে সামনের দিকে। আজ ছুটির দিন, কলেজ নেই, নন্দিতা সেই ছোট্ট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল এবং চেঁচিয়ে ভৃত্যটিকে বকে উঠল অ্যাই

বলে। ভৃত্যটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটিও বকা শুনে ওপর দিকে তাকিয়েছিল। ইঙ্গিতে ডেকে ওপরে নিয়ে এল তাকে। আদর করে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, তোমার নাম কী?

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, কমলা।

বাঃ, সুন্দর নাম। কোথায় থাকো?

এই বাড়িরই একটা ফ্যালাটে ছিলাম, খেদিয়ে দিয়েছে।

ওমা কেন? এমন সুন্দর একটা মেয়েকে কে খেদিয়ে দিল। কদ্দিন ছিলে সেখানে?

তিন-চার মাস।

তিন-চার মাস রেখে তাড়িয়ে দিল? কী করেছিলে?

কিছু করিনি। ওনার ছেলেডা কী ওষুধ খেয়ে নেশা করে আর সব কথাতেই মারতি ওঠে। ওর মাকেও মারে। আমাকেও মারিছে।

সে কী!

হুঁ। পেরায়ই তো মারে। দেখো না পিঠটা দেখো, কেমন বাড়ি মারিছে লাঠি দিয়ে। অন্য দিন মা ঠেকায় আজ ঠেকায়নি।

কেন?

বলিছিলাম, এরম মারলি পরে আমি থাকবনি, আমারে মাইনে দিয়ে দাও, আমি চলি যাই। বলতে মা-ও বলল, কুত্তার বাচ্চা, খাতি দিচ্ছি, পরতি দিচ্ছি আবার মাইনে। এই বলে মা খুব জোড়ে চড় মারি বলল, সাগর যে মারে খুব ভালো করে। তখন আমি বার হয়ে এলাম।

চুপ করে থেকে নন্দিতা বলল, এখন তুমি কোথায় যাবে?

জানি না।

বাড়ি কোথায়?

খুইলনে।

এখানে কোথায় থাকো?

এখানে তো ওই ফ্যালাটেই ছিলাম।

মা-বাবা কোথায় থাকেন?

সাহস গেরামে।

তা তুমি এখানে কেন?

পাঠিয়ে দিল যে দালাল দাদার সঙ্গে।

দালাল দাদা?

টাকা দিলি বাংলাদেশ থেকে যে দালাল আমাদের এখেনে নিয়ে এসেছে, সে আমার ডাক দাদা হয় সম্পক্কে। দুশো টাকা দিয়ি মা-বাবা আমাকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। তিন মাসের খোরাক খরচও দিয়েছে। বলেছে, ক'দিন তোমার বাড়িতে রাখো, এ-দিকে বন্দোবস্ত করে আমরাও পালাব, তখন একটা ছোট বাড়িটারি দেখে দিও, আমরা থাকব।

না। এক মাস হতি না হতি দালাল দাদা বলল, তোকে বসিয়ে বসিয়ে ক'দিন খাওয়াব? চল, চাকরি করবি। এই বলে এই ফ্যালাটে দিয়ে গেল। এখানে বাসন মাজতি হয়, কাপড় কাচতি হয়, দাদা ওষুধ খেয়ে বমি করলি সেই সব ধুতি হয়, আবার ঘর ঝাড়ামোছা, রান্না করা —।

সব তুমি করতে?

সব আমি করতাম।

BanglaBook.org

নন্দিতা নিশ্বাস ফেলে বলল, বেশ তো ছিলে বাংলাদেশে, হঠাৎ চলে এলে কেন? যদি আসতেই হত তবে তো মা-বাবার সঙ্গেই আসতে পারতে।

আমি বড়ো হইছি যে। বড়ো মেয়ি যে ওখানে থাকতি পারে না। আমার খুব কষ্ট ছিল, বাড়ি থেকে বেরুতেই পারতাম না। তা-ও তো একবার হাত ধরি টানিটানি ঝোপির ধারে নিয়ে গিয়ে — মুখ নিচু করল কমলা।

নন্দিতা সেই প্রসঙ্গ থামিয়ে বলল, এখন তুমি কী করবে?

আমি জানি না। দামিনীর মা দিদি বলিছে দু'টা কাজ আছে তার হাতে, আমাকে দিবে। রিকশাওয়ালাও বলিছে তার হাতে অনেক বড় কাজ আছে, সঙ্গে গেলেই দিতে পারিবে। ওর সঙ্গে যাতি আমার ভয় করে। কেবল কেমনি করে তাকায়, গায়ে ঠেস লাগায়।

লেখাপড়া শিখেছ?

না।

কেন?

দু'টা দিদি ছিল, বড়ো দিদিটা দশ ক্লাসে উঠেছিল, তারপর এক দিন আর ইশকুল থিকে ফিরল না।

সে কী!

চুরি করি নিয়ে গেল। মা-বাবা কাঁদি কাঁদি মরল, তবু চোরেরা দিদিরে ফিরত দিল না। ছোটো দিদি সেভিনে উঠছিল, মা-বাবা বন্ধ করি দিল পড়া। এক বুড়ার সঙ্গে বিয়া দিয়ে দিল তাড়াতাড়ি। সিজন্য আমাকেও আর বাইরে পাঠায়ে পড়ায় না। ঘরে কিছু কিছু পড়িছি। কুড়ির ঘরের নামতা জানি, যোগ-বিয়োগ জানি, বাল্যশিক্ষা শেষ করিছি।

বাবা কী করেন ওখানে?

আমাদের কাঠের গোলা আছে। বাড়ি অনেক বড়ো, নারকেল গাছ আছে চব্বিশটা, সুপারি গাছ আছে বারোটা, কিন্তু সব ওরা পাড়ি নিয়ে যায়, আমরা কিছুই পাই না। বাবা বলে, এখন কাঠের গোলাটাও ছোটো হতি হতি এত ছোটো হয়ে যাচ্ছে সেটাও রাখা যাবে না।

ছোটো হচ্ছে কেন? চলে না?

ওরা ভাগ নেয় যে। বাবা তাই ঠিক করিছে সব ছাড়ি চলি আসবে এখানে। বিক্রি করার চেষ্টা করিছে। কেউ নিতি চায় না, বলে ছাড়িয়া যান দেখেশুনে রাখব। বাবা বলে, দখল তো পাবেই ছাড়ি গেলে, আর কিনবে কেন? ভালো লোক খুঁজিছে, পালেই দিয়া দেবে।

ঠিক আছে। এখন তুমি আমার কাছেই থাকো।

কী কাজ করব?

যা তোমার খুশি। একটু চা করে দেবে। ঘরটরগুলো গুছোবে।

আর বাসন মাজব, কাপড় কাচব।

না না, ও-সব তোমাকে করতে হবে না। লেখাপড়া করবে। বই কিনে দেব, খাতা কিনে দেব, একটু এগুলে স্কুলে ভর্তি করে দেব।

দিবে? বালিকার উল্লাসে হাততালি দিয়ে বলে উঠল কমলা। তুমি খুব ভালো। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগিছে। কী বলে ডাকব?

সে তোমার যা খুশি। শোনো, আমার রান্না আমিই করি। এক জন ঠিকে মেয়ে এসে অন্যসব কাজ করে দিয়ে যায়, তুমিও হাতে হাতে কিছু করবে, আমাকে রান্নায় সাহায্য করবে।

আর মা বলি ডাকিব।

মা! থমকাল নন্দিতা। মা ডাকের সঙ্গে এখনো তার পরিচয় হয়নি। নিজের ছেলে-মেয়ে নেই বলেও হয়নি, এই কাঁচা চেহারায় কাজের লোকজনেরা ডাকে না বলেও হয়নি। স্বামীর সঙ্গে থাকাকালীন সবাই বউদি বলে ডাকত, এখন দিদি বলে ডাকে। ঠিকের কাজের মেয়েটি দিদিমণি বলে।

BanglaBook.org

অবশ্য ঠিক ঠিক সময়ে বিয়ে করলে, ঠিক ঠিক সময়ে সন্তান হলে এত বড়ো মেয়ে থাকতে পারত বৈ কী। চেহারা যতই ছিপছিপে হোক, যতই কাঁচা দেখাক, তেতাল্লিশ বছর তো পূর্ণ হল গত মাসে। বলল, সে তোমার যা খুশি ডেকো, আমি স্নান করতে যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণে এই শাড়ি দুটো ভাঁজ করে রাখো, কেমন?

শনিবার নন্দিতার ছুটির দিন, মানে অফ ডে। মাথা মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল কমলা শুধু তার শাড়ি দুটোই ভাঁজ করে রাখেনি, বিছানার এলোমেলো বেডকভারটা সুন্দর টান টান করে দিয়েছে, ছড়ানো ছিটানো ড্রেসিংটেবিলটা ফিটফাট করেছে, এখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। তাকে দেখে এক গাল হেসে বলল, মা, এই ঝাড়ুটা একদম খারাপ। ফুলই নেই। তুমি আর একটা ঝাড়ু কিনি দিও, তখন আমি খাটের তলাটায় সব ঝাড়ি দেব।

নন্দিতা বলল, তুমি তো খুব কাজের মেয়েও দেখছি।

মুক্তোর মতো দাঁতের পাটি দেখিয়ে সে হাসল, এখন থেকে আর তোমাকে রান্না করতিও দিব না, আমি রাঁধব।

বেশ তো। এখন কী খাবে বলো? সকালে কী খেয়েছ?

সকালে? কিছু খাইনি। সকালে তো ওরা মারিছিল, বকিছিল, চলি আলাম।

আহা, এখনো খাওনি? চলো, খাবে চলো। কী খেতে ভালোবাসো? ছোট্ট খাবার ঘরে এসে টুকটাক টেবিল সাজিয়ে নিয়ে বসল নন্দিতা। পাশেই ইলেকট্রিক টোস্টারে রুটি ভরতে ভরতে বলল, স্টোভ জ্বালতে পারো?

জ্বালব?

ওই দেখো কেটলিতে জল ভরা আছে, স্টোভ জ্বেলে বসিয়ে দাও, জল ফুটলে ঢেলে দাও পটে। তুমি চা খাও নিশ্চয়ই?

কমলা লজ্জা লজ্জা হেসে বলল, চা আমি খুব ভালোবাসি মা।

সব কথাতে অত মা মা বলছ কেন?

ওই বাড়িতে আমি মাসিমা বলতাম।

তবে আমাকে কেন মা মা করছ?

আমার মাকে আমি খুব ভালোবাসি। মাকে ছাড়ি আসি কত কাঁদিছি, এখন মনে হতিছে মাকে আবার পেয়ে গেছি। মাগো তুমি আমার মা হতে চাও না?

ঢোক গিলে হাসল নন্দিতা, কথা শোনো মেয়ের! কেন চাইব না? মা হতে কে না চায়?

তবে? স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসাল কমলা, ফুটলে বেশ নিপুন হাতে পটে ঢালল। টোস্টার থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে টোস্ট উঠতে দেখে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল।

দিন দশেক বাদে নন্দিতা যখন কলেজে আর কমলা যখন চান করে খেতে বসবে, এই সময় দরজায় বেল বেজে উঠল টুং টাং করে। দৌড়ে খুলতে গিয়েছিল, কিন্তু খুলল না। মা বলে গেছে মট করে দরজা খুলবে না, বুঝেশুনে খুলবে।

এই ক'দিনে সে সত্যি নন্দিতার মেয়ে হয়ে গেছে। তার জন্য কত বই এসেছে, খাতা এসেছে, পেনসিল এসেছে। সুন্দর সুন্দর স্কার্ট ব্লাউজও এসেছে। নন্দিতা বলেছে, অতটুকু মেয়ে এখুনি শাড়ি কী? ফ্রক পরো। সালোয়ার কামিজ কিনে দেব পুজোর সময়।

কমলা বলেছে, ফ্রকই তো পরতাম। মা বলিছে, আর ফ্রক না, এখন বড়ো হয়ে গিছ, দিনরাত আঁচল দিয়ে শরীর ঢাকি রাখিবা, নইলে পাজিগুলান তো গিলি খাবে। হেসে অস্থির, মা বলে আমাকে গিলি খাবে। এত্তো মানুষ একটা মানুষকে বুঝি গিলি খাতি পারে?

BanglaBook.org

নন্দিতা থামিয়ে গিয়ে বলেছে, আর শোনো, ও-রকম অপরিষ্কার হয়ে থাকবে না, সকালে উঠে ব্রাস দিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়ে তার পরে চায়ের টেবিলে এসে বসবে, বুঝেছ?

কমলা এখন নন্দিতার পাশে বসেই খায়। পাশের খাটে ঘুমোয়। সুন্দর চেহারা আরো সুন্দর দেখায়। নন্দিতা যদি তাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দেয় কোথাও, অবিশ্বাস হবে না কারো। পোশাক-পরিচ্ছদও তার উপযুক্তই। আদব-কায়দা শেখায়। লোকজন এলে হেসে বলে, পুষ্যি নিয়েছি। ভালো করিনি? তারপর বলে, একা থাকি, মেয়েটা এসে আমাকে ভরে দিয়েছে।

সত্যিই ভরে দিয়েছে। কুণাল নেই, সে আছে। কী শূন্যতা। সন্তান হয়নি বলে কোনো দিন কোনো ইচ্ছে কাতর করেনি, কিন্তু কুণাল চলে যাবার পরে অনেক বার মনে হয়েছে একটা থাকলে ভালোই হত। সে-ইচ্ছেই হয়তো ভগবান পূরণ করে দিয়েছেন মেয়েটাকে পাঠিয়ে। নইলে সে এসেই মা বলে ডাকতে চাইল কেন? কেউ তো বলে না।

অনেক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত কমলা খুলেই দিল দরজাটা। মাকে তো সে এইরকমই খুলতে দেখে। বরং সে যদি খুলতে গিয়ে কে! কে! বলে চ্যাঁচায়, মা রাগ করে। বলে, ও-রকম কে কে কোরো না, ওটা অভদ্রতা। দিনের বেলা ভয় কী? রাত্রিবেলা হলেই আমাকে না ডেকে খুলবে না।

খুলেই দেখল তার দালাল দাদা দাঁড়িয়ে আছে।

হাসি মুখে বলল, তুই ও-বাড়ি ছেড়ে এসেছিস? বেশ করেছিস। ভালো খবর আছে।

কমলা খুশি হয়ে বলল, ভালো খবর আছে? কী খবর দালাল দাদা?

তোর মা-বাবা এসেছে।

মা-বাবা এসেছে? কোথায়? কবে? আনন্দে লাফিয়ে উঠল কমলা।

চল, দেখবি। নিয়ে যাই তোকে।

অখন? অখন কী করি যাব? এখানেও আমি এক জন মা করিছি। মা খুব ভালো। আমাকে কত ভালোবাসিছে, লিখাচ্ছে, পড়াচ্ছে, এই দেখো জামা কিনি দিছে, আবার বলিছে গানের ইস্কুলে ভর্তি করে দিব। আমি এক দিন আপন মনে গান করিছিলাম, মা শুনে বলল, তুমি এত সুন্দর গান করো, এত সুন্দর গলা, ঠিক আছে তোমাকে আমি গানের স্কুলে ভর্তি করি দিব। সেই মা কলেজে পড়াতি গেছে। বাড়ি খালি। আমি তো অখন যাতি পারব না। দাদার হাত জড়িয়ে ধরল, বিকালে আসিবা? আমার মন কেমন করতেছে মা-বাবার জন্য। এই মা কলেজ থেকে আলি আমি জিজ্ঞাসা করি রাখব, তুমি নিয়ে যাবা আমাকে।

আরে বোকা, তোর মা-বাবা তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এখুনি চলে আসবি দেখা করে। কতক্ষণ? দু'মিনিট।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে? কই? কোন রাস্তায়? চলো তাদেরে নিয়ে আসি গিয়ে ঘরে।

কমলা বেরিয়ে এল। দরজাটা টেনে দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নামল দাদার সঙ্গে। কিন্তু সিঁড়ির মুখে এসে দেখল কেউ নেই। দাদা বলল, আরে এই গলিতে নয়, বড়ো রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কমলা চিন্তিত হয়ে বলল, বড়ো রাস্তার মুখে? সেখানে যাতি আসতি তো সময় লাগবে, ঘর যে খোলা রইল।

কিছু হবে না। এইটুকু সময়ের মধ্যে কী হবে? এখুনি তো ফিরে আসবি।

না দাদা।

আরে বেশ চল চল, কিছু হবে না।

প্রায় জোর করে দাদা তাকে গলির মুখে নিয়ে এল। ছোট্ট গলি, রাস্তার মুখে আসতে এক মিনিট লাগে না। দেখা গেল একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, ঠেলে ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট

BanglaBook.org

দিল ড্রাইভার। কমলা চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল, মুখে চেপে ধরে শুইয়ে দিল সিটের ওপর। তারপর কোথায় যে তাকে নিয়ে এল কিছুই সে জানতে পারল না। অঘোরে ঘুমিয়ে থাকল। যখন চোখ খুলল, নিজেকে একটা ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেল। এসেছিল দুপুরবেলা, এখন প্রায় সন্ধ্যা। চারদিকে তাকিয়ে প্রায় হাহাকার করে কেঁদে উঠে বলল, আমি কোথায়?

এক জন বর্ষীয়সী মহিলা মোটা শরীরে থপ্‌থপিয়ে এগিয়ে এসে বলল, আ, মোলো যা, একেবারে নেকি। ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। এই রিফিউজি মেয়েগুলোনের ঢং দেখলে মরি আর কী। কয়েক দিনের মধ্যে তো শেষে নাগর নাগর করে হেঁদিয়ে মরবি। নে, ওঠ, মুখ-হাত ধুয়ে সাজ করে নে। সুন্দর মেয়ে, সুন্দর মেয়ে, বলে তো মিনসে এই কয় মাসে কম টাকা নিল না। আজ থেকেই উশুল করতে হবে॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছলনাময়ী

এমন কত আসে, কত যায়, কেহ কাহারও কথা মনে করিয়া রাখে না। দেওয়ালের গায়ে কাঠকয়লার মৃতের নাম স্থায়ী করিয়া রাখার চেষ্টা নিত্য নূতন লেখার অন্তরালে অস্পষ্ট হইয়া আসে, তারপর খুব ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেও একটা নামেরও স্পষ্ট পাঠোদ্ধার করা চলে না। চিতার পোড়া কয়লার স্তূপ জমিতে জমিতে আদি গঙ্গার গর্ভ ভরিয়া উঠে, হিন্দু পাপ-স্ক্ষালনের বোঝা টানিতে টানিতে জননী ভাগীরথী শীর্ণা হইয়া শীর্ণতরা হইতে আসেন। ভাঁটায় নামিয়া যাওয়া ঘোলাটে জল আর পঙ্কিল তীরের অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ স্বর্গযাত্রার পথে নরকের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই শ্মশানঘাটেই দুই জনে দেখা হইয়া গেল। দক্ষিণ কলিকাতার অতি বিখ্যাত এই শ্মশানে কত সন্ন্যাসী-সাধু আসিল, কত ধুনির আগুনের কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া ছাতের জ্বলিয়া-যাওয়া সাদা রঙটার উপর কালোর প্রলেপ বুলাইয়া দিল; তুলসীদাসের রামায়ণ, শঙ্করের মোহমুদগর, কামরূপের মন্ত্রসিদ্ধ অভিচার-তন্ত্র অথবা বেদ-বেদান্ত উপনিষদের বহু আলোড়ন এখানকার আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিল; বাঙালি বিহারি পাঞ্জাবি মাদ্রাজি — তাহাদের আর সীমা সংখ্যা নাই। ইহারা তাহাদেরই দুই জন।

মনের মিলটা যেমন দুর্লভ, সুলভও তেমনই; সারা জীবনের চেষ্টাতেও অনেক সময় এ বস্তুটি ঘটিয়া উঠে না, আবার অতি সহজেই কোন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে পরস্পরের কাছে আসিয়া পড়ে সেটা একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কাল্পনিক ভৈরবানন্দের তখন তুরীয় অবস্থা। কল্কেতে এক সিকি গাঁজা পুরিয়া একটি প্রচণ্ড টানেই সে প্রায় তাহার বারো আনা পরিমাণ পোড়াইয়া ফেলিয়াছে এবং নাক-মুখের সমস্ত ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া মুদিত চোখে ধোঁয়াটাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পাঠাইয়া ব্রহ্মমার্গ পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বলি, ও দাদা শুনছ?

আহ্বানটা করুণ এবং মিনতিপূর্ণ; কিন্তু ভৈরবানন্দের ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

ওহে ভায়া, শুনতে পাচ্ছ?

BanglaBook.org

অগ্রজ সম্বোধনে কাজ হয় নাই, কিন্তু ভায়া ডাকটা সার্থক হইল। মনে হইল, হঠাৎ যেন একটা গ্যাসের বোমা নিঃশব্দে ফাটিয়া গিয়াছে। পোড়া গাঁজার আকস্মিক বিকট দুর্গন্ধ আর পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য ভৈরবানন্দের দাড়ি-গোঁফ-জটাশোভিত বিরাট মাথাটিকে দৃষ্টির আড়াল করিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং আগুন রাঙানো কাঠকয়লার মতো দুইটি অসন্তুষ্ট চোখ মেলিয়া ভৈরবানন্দ তাকাইল।

যে তাকিয়েছিল সে-ও সন্ন্যাসী অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বেশধারী। বয়স বেশি নয়, সুতরাং দাড়িটা এখনও তেমনি ভাবে উলুবনের মতো যথেচ্ছ বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তবে দুই-এক বছরের মধ্যেই বোধহয় তার খেদ করিবার কারণ থাকিবে না। লোকটি শৌখিন, জটাগুলিকে সযত্নে মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

কী চাও?

উত্তরে লোকটি অতিশয় মোলায়েম ধরনে হাসিল। গোঁফের আগাছায় জঙ্গল ভেদ করিয়া ফাটা ঠোঁট জোড়া দুই ফাঁক হইয়া গেল এবং কোকেন খাওয়া কালো দাগে চিহ্নিত গজদন্তের মতো দুইটি দাঁত উপরের পাটি হইতে উদ্ধত ভাবে সামনে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সবটাই টেনে মেরে দেবে দাদা? সামনে মা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন, মহা পুণ্যির স্থান এই শ্মশানক্ষেত্তর, এখানে একাই ছিলিমটা পুড়িয়ে শেষ করে দিও না। এই তো আমরা সাধু-সন্ন্যাসী বসে রয়েছি, আমাদের দান করো — পুণ্যি হবে, পুণ্যি হবে।

বলার ভঙ্গিতে ভৈরবানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কাকের মাংস কাকে খায় না বাপু, সন্ন্যাসীর দান পুণ্য কীসের?

সে-কথার উত্তর না দিয়াই লোকটি কহিল, এই তো দাদার হাসি ফুটেছে, একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং নয় তাহলে। মাইরি, যে করে চোখ উলটে শিবনেত্তর হয়ে বসে ছিলে, তাতে দণ্ড তিনেকের মধ্যে মুখ খুলবে এমন ভরসাই ছিল না; দাও তাহলে, একটান টেনেই নিই।

মনে কী যে ভাবান্তর ঘটিয়া গেল, কল্কেটা না বাড়াইয়া দিয়া ভৈরবানন্দ থাকিতে পারিল না। তারপর তেমনই হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে এখানে নতুন আমদনি দেখছি। কবে এলে, কোত্থেকে এলে?

নবগত কল্কেতে ভালো করিয়া ন্যাকড়াটা জড়াইয়া লইল এবং তারপর কষিয়া একটা টান মারিবার পূর্বক্ষণে এক চোখ বুজিয়া এবং আর একটা ঈষৎ ট্যারা করিয়া কহিল, বলছি, একটু দাঁড়াও।

আলাপটা সেই হইতে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে-দিনের গাঁজার ক্ষোভ ভৈরবানন্দের মিটিয়া গিয়াছে।

আসল কথা, নবাগত অর্থাৎ ভূমানন্দের অবস্থাটা বেশ সচ্ছল। কোথা হইতে সে যেন একটা শাঁসালো ভক্ত সংগ্রহ করিয়াছে, প্রত্যেক দিন সওয়া পাঁচ আনার গাঁজা সে গুরুকে নিবেদন করে, প্রসাদ পায়। পাটের বাজারে ফাটকা খেলিয়া তাহার যাহা আয়, সে-আয়ের যথাসর্বস্ব নেশা এবং আনুষঙ্গিকের পিছনে ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অংশটি সে গুরুসেবায় নিয়োগ করে। শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই, কেন কে বলিবে, হঠাৎ তাহার এই বিশাল বিশ্ব সংসার এবং দারা-পুত্র-পরিবারকে নিতান্তই মায়াপ্রপঞ্চময় বলিয়া মনে হয়। গাঁজার ধোঁয়া মগজের মধ্যে যতই ঘন হইয়া জমিতে থাকে, ততই তাহার মানসিক বৈরাগ্য যেন সেই ধোঁয়ার বেলুনের মতো ফাঁপিয়া উর্ধ্বলোকে আরোহণ করিয়া চলে। বিকৃত কণ্ঠে সে শ্যামাসঙ্গীত জুড়িয়া দেয় —

তোর খাঁড়ার ঘায়ে মায়ার বাঁধন
ঘুচিয়ে দে মা শ্মশানকালী —

ভূমানন্দ খুশি হইয়া বলে, শাবাশ বেটা, শাবাশ। তোর হয়ে যাবে, এ যাত্রা তুই 'তরেই গেলি।

কিন্তু এটা উহাদের বাহিরেব মুখোশ। সত্যকারের পরিচয়ের দিক হইতে কেহ কাহাকেও ঠকায় নাই। অসঙ্কোচে বিগত জীবনের ইতিহাস পরস্পরের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে। এবং সবচাইতে এইটাই বিস্ময়কর যে, দুই জনেরই অতীত কহিনির মূলে একটা বিশেষ বস্তু বিরাজ করিতেছে এবং সেই বস্তুটি হইতেছে নারী।

ভৈরবানন্দ হঠাৎ যেন সমাধিস্থ অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠে। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, তারা তারা! মেয়ে জাতকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই, ওরা সব পারে।

ভূমানন্দ মুখের উপর এমন একটা শ্মশানবৈরাগ্যের ভাব টানিয়া আনে যে, এই মুহূর্তে তাহাকে দেখিল ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

বলে, শঙ্কর বলেছেন — নাকি ছলনাময়ী, ত্রিভুবনকে ওরাই ছলনার নাগপাশ দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

ইহাদের এই নারীবিদ্বেষ কিন্তু নিছক সন্ন্যাসব্রতের জন্যই নয়। কারণটা তা হইলে খুলিয়াই বলি।

ভূমানন্দের অবস্থা এক কালে এ-রকম ছিল না। তাহার আদি নাম বা পরিচয় এখানে ঘাঁটিয়া লাভ নাই। জমিদার বংশে তাহার জন্ম। দলে পড়িয়া তাহার পাখা গজাইল এবং অতি অবলীলাক্রমে দশ বছরের মধ্যেই জমিদার আকণ্ঠ ঋণের চাপে মারোয়াড়ি খেরো-খাতার কালো কালো অক্ষরের নিচে তলাইয়া গেল। ভূমানন্দের তাহাতে খেদ ছিল না, কিন্তু তাহাতে গোল বাধাইল নারী।

অর্থাৎ জমিদারির বারো আনা পরিমাণ যে বিদ্যাধরীর সেবায় সে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, সেই যখন দুর্দিনে তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাহারই দেওয়া হিলম্যানের গাড়িতে চাপিয়া এক ভাটিয়ার সঙ্গে লেক ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল, তখন ভূমানন্দের আর সহিল না। নির্জন গলিতে রাত্রিতে জানালা বাহিয়া যে ঘরে ঢুকিল এবং লম্বা ছুরিখানা এক দিকের বুকের কোমল মাংসপিণ্ডটাকে ভেদ করিয়া সোজা ফুসফুস পর্যন্ত চালাইয়া দিয়া পথে নামিয়া আসিল।

অতঃপর তাহাই শেষ পথ।

ভৈরবানন্দেরও প্রায় একই দশা। নমঃশূদ্রের ছেলে হইয়া সে গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের কুমারী মেয়েকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু বেশি দিন হজম করিতে পারিল না। মাস খানেক পরে এক দিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখিল, তাহার কাশীর বাড়ির চারদিকে পুলিশ গিজ গিজ করিতেছে। অতএব উপায়ান্তর আর না দেখিয়া সামনে যাহাকে পাইল, তাহারই মাথায় একটা মদের বোতল চূর্ণ করিয়া সে অদৃশ্য হইল। লোকটা সেই আঘাতেই খুন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহার সন্ধানে পুলিশের হুলিয়া গোটা দেশটাকেই যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছু দিন এ-দিক ও-দিক গা-ঢাকা দিয়া থাকিয়া ভৈরবানন্দ দাড়ি-গোঁফ-জটাভারকে যথেচ্ছ বাড়িতে দিল, তারপর চার পয়সার গিরিমাটি কিনিয়া সমস্ত কাপড়-চোপড়গুলোকে রাঙাইয়া লইয়া এবং গায়ে প্রচুর ছাই মাখিয়া সে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটেই জাঁকিয়া বসিল।

এবং এইভাবে প্রায় অর্ধেক ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত সে এখানে আসিয়াই জুটিল।

কিন্তু তারপর হইতে এই জীবনটাই ইহাদের সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। অতীতের কথা কখনও কখনও দিবা স্বপ্নের মতো হইয়া মনের সামনে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু তাহা লইয়া খুশি হওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে-স্মৃতির সঙ্গে ফাঁসির দড়িটা এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়াইয়া আছে যে, সে-দিনের কথা স্মরণ করিলেও ইহারা শিহরিয়া উঠে।

সন্ধ্যা হইয়া আসে। ও-পারে চেতলার আলো দুই-একটি করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আদি গঙ্গার মন্থর জলে জোয়ারের চেতনা লগে। একটু একটু করিয়া জল বাড়িতে থাকে, কাদা মাখা তীর ছাপাইয়া জল একেবারে স্নানঘাটের ফাটা সিঁড়িটা স্পর্শ করে। হিন্দুর একান্নপীঠের এক পীঠ, অদূরের ভারত বিখ্যাত কালী-মন্দির হইতে আরতির বাজনা শুনিতে পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

তাহারই মধ্যে মিলিত একটা হরিধ্বনি যেন চারিদিকে সুর কাটিয়া দেয়।

ভৈরবানন্দ বলে, ওই এল আর একটা।

সে-দিকে চোখ বুলাইয়া ভূমানন্দ জবাব দেয়, বুড়ো। এর জন্য আবার এত ঘটা কেন রে বাবা?

তা ঘটা একটু বেশিই বটে। সঙ্গে লোকজন প্রচুর আসিয়ছে, যে-পরিমাণ ফুল দিয়া তাহারা মড়া সাজাইয়া আনিয়াছে, তাহাতে সমস্ত ফুলের বাজারই নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার কথা। খোল করতাল লইয়া সেই যে তাণ্ডব তালে কীর্তন চলিতেছে তো চলিতেছেই।

কিন্তু কথাটা তাহা লইয়াই নয়।

আরও একটা মর্মান্তিক দৃশ্য সকলের চোখেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া বাজিতেছিল। বছর ষোলো-সতেরোর একটি মেয়ে, চোখের জলে তাহার সুশ্রী গাল দুইটি ভাসিয়া যাইতেছে, মাথার রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত গালে মুখে কপালে তাহার সিঁদুর লেপা, মৃতের পায়ের কাছে পাগলের মতো মাথা কুটিতেছে। এমন যে ভৈরবানন্দ, সে অবধি চোখ ফিরাইয়া আনে। একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া বলে, বুড়ো ঘাটের মড়ার প্রাণে এত রস! একটা কচি মেয়েকে পথে বসালে তো!

ভূমানন্দ হঠাৎ যেন কেমন বিকৃত ভাবে হাসিয়া উঠে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। কিন্তু বুড়োর দোষ নেই ভায়া, নারী ছলনাময়ী — ছলনাময়ী!

তারপর অনেকক্ষণ দুই জনেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকে; কী যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি উহাদের মনের উপর দিয়া অন্ধকারের মতো বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ও-দিকে এত আলো থাকিলেও এ-দিকটা অপেক্ষাকৃত ছায়াচ্ছন্ন। দুই-তিনটি চিতা হইতে পোড়া কাঠকয়লা এখনও সরানো হয় নাই, তাহাদের চোখের সম্মুখে ধ্বংসাবশিষ্ট চিতাগুলির সেই রিক্ত রূপ কেমন যেন খাপছাড়া দেখাইতেছিল।

ও-দিকে আর একটা চিতা প্রায় নিভিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে, কাঠকয়লার রাশি রাশি অঙ্গারের মধ্য হইতে দগ্ধাবশিষ্ট হাড়ের নিদর্শনস্বরূপ কয়েক টুকরা জমাট ক্যালসিয়াম ফসফেট আর কালো একটা কাঠের গুঁড়ির খানিকটা গাঢ় রক্তের মতো আগুনের রঙে রঙিন হইয়া হিংস্র ভাবে চাহিয়া আছে। মাথায় পাগড়ি আঁটিয়া কালো জোয়ান চেহারার এক জন হিন্দুস্থানি লম্বা একটা বাঁশের সাহায্যে চিতার পোড়া কয়লাগুলি পরিষ্কার করিতেছে। কাঁচা কাঠ, বাঁশ আর পোড়া মাংসের পরিচিত একটা তীব্র গন্ধে জায়গাটা বিষাক্ত হইয়া আছে। ভৈরবানন্দের যেন চটকা ভাঙিয়া যায়। একটা হাই তুলিয়া একান্ত উদাসীন কণ্ঠে বলে, নাঃ, মায়া, সব মায়া। সেই যে তুলসীদাস বলেছেন না? দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী —।

ওখানেই তো আমাদের মিল দাদা।

ভূমানন্দ আবার তেমনি অকারণেই হাসিয়া উঠে। শ্মশানের মৃতের চারিদিকে খোল-করতালে নামসংকীর্তন চলিতেই থাকে, আদি-গঙ্গার জলে জোয়ারের অস্ফুট কলতান তাহার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, কালীমন্দিরের আরতির বাজনা ক্রমশ নিস্তব্ধ হইয়া আসে, ধুনির আগুনে দেওয়ালের গায়ে লেখা মৃতের অজস্র নামগুলি যেন অদ্ভুত রকমের জটিল হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে; গঙ্গার ও-পারে চেতলার ইলেকট্রিক আলোগুলোকে ঘিরিয়া রাশি রাশি দেওয়ালি পোকা প্রদক্ষিণ করে; আর থাকিয়া থাকিয়া সেই মেয়েটির কান্না যেন কেমন একটা অস্বস্তির মতো বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে।

ভূমানন্দের কথাটার জের টানিয়াই অনেকক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ উত্তর দেয়, হুঁ, মেয়েমানুষ! বড়ো ব্যাপার ভায়া, কিচ্ছু বোঝবার জোটি নেই।

সুতরাং দুই জনের বন্ধুত্বই সুগভীর। নারীজাতির প্রবঞ্চনা সম্পর্কে তাহারা উভয়েই একটা সুচিন্তিত সমাধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষের চরিত্রগত অসামঞ্জস্য যেখানে যাহাই থাক, একটা বিশেষ

BanglaBook.org

ক্ষেত্রে তাহারা এমন নিভাঁজ ভাবেই মিলিয়া যায় যে, তখন সেই অসামঞ্জস্যগুলিকে আর আলাদা ভাবে খুঁজিয়া লওয়া চলে না।

অতএব বলিতে পারা যায়, স্ত্রীজাতির ছলনাকে ঘিরিয়াই তাহাদের এই বন্ধুত্বটা এমন ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এবং সে-বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়াও এমন কিছু কঠিন নয়। বসিবার জায়গার অধিকার লইয়া একটা নাঙ্গা সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভূমানন্দের ঝগড়া বাধিয়া গেল। ব্যক্যবলে কুলাইল না তো বাহুবল আসিল। কুস্তি করা ডাল-রুটি-চিবানো বিহারির সঙ্গে নেশাখোর ক্ষীণপ্রাণ বাঙালির পারিবার কথা নয়, ভূমানন্দকে কাঁধে তুলিয়া একটা আছাড় বসাইবার পূর্বক্ষণে ভৈরবানন্দ আসিয়া জুটিল, এবং ভূমানন্দ শুধু যে রক্ষা পাইল তাহা নয়, চিমটার ঘা খাইয়া কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে সেই রাত্রেই নাগা সন্ন্যাসী শ্মশান ঘাট ছাড়িয়া সরিয়া পড়িল।

রাত বাড়িয়া চলে, জোয়ারের জল স্তিমিত হইয়া থম থম করিতে থাকে; এখনই ভাঁটার টান আসিবে। শুকতারাটা ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার উপরে আসিয়াছে, ইলেকট্রিক লাইটের চারদিকে দেওয়ালি পোকারা মরিয়া মরিয়া প্রায় শেষ হইয়া গেল, শ্মশানের অবশিষ্ট চিতাটাও নিবিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে। অস্বাভাবিক নির্জন এই পৃথিবী, অস্বাভাবিক নির্জন এই শ্মশান ঘাট। কোথাও কেহ নাই। শুধু দূরে একটা দড়ির খাটিয়ার উপরে সেই হিন্দুস্থানিটা পড়িয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতেছে।

আর শুধু জাগিয়া আছে ইহারা, এই দুইটি মানিকজোড়। ঝুলির মধ্য হইতে ভূমানন্দ একটা বোতল বাহির করিল, কারণ পান করিবার এইটাই উপযুক্ত অবসর।

ভৈরবানন্দ তান্ত্রিক, অর্থাৎ তন্ত্রের কতগুলো বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানকে সে নিজের সঙ্গে অসঙ্কোচ ভাবে মিলাইয়া লইয়াছে। ভয়-লজ্জার প্রতিবন্ধক তো গৃহস্থাশ্রমেই লোপ পাইয়াছিল, ধর্মের আশ্রয় পাইয়া ঘৃণা জিনিসটাকেও সে ধুইয়া-মুছিয়া বেমালুম সাফ করিয়া ফেলিয়াছে। এই অঘোরপন্থীরা না করিতে পারে এমন নোংরা অনুষ্ঠান পৃথিবীতে বিরল।

তাই মাটির পাত্রে ঢালিয়া দুই-এক চুমুক টানিবার পরে ভৈরাবানন্দ কহিল, উঁহু, জুৎ হচ্ছে না ভায়া, চাট নেই।

ভূমানন্দ হাসিয়া বলিল, এত রাত্রে তোমার জন্য কে পাঁঠার কালিয়া নিয়ে বসে আছে বাপু ?

দাঁড়াও।

টলতে টলতে ভৈরবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, জ্বলন্ত চিতাটার দিকে আগাইয়া গেল। তারপর মড়া ঠেলিবার পোড়া বাঁশ আর চিমটার সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুনের মধ্য হইতে কী একটা সাদা জিনিস লইয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল, এই যে, চাট এনেছি।

ভূমানন্দ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

আরে, এ যে মড়ার খুলি!

হি-হি করিয়া ভৈরবানন্দ হাসিতে লাগিল, কহিল, তাতে কী হয়েছে, পুড়ে দিব্যি চানাচুর হয়ে আছে। মদের সঙ্গে জমবে চমৎকার। খেয়েই দেখো না এক কামড়।

বলিয়া খুলিটা মুখের মধ্যে এক গ্রাসে খানিকটা পুরিয়া দিয়া কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিল। একটা চোখ বুজিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিল, আহা-হা মহাশঙ্খ! সাক্ষাৎ অমৃত রে! এ রসে বঞ্চিত থাকতে নেই।

নেশা আকণ্ঠ না হইলে কী হইত বলা যায় না, কিন্তু ভূমানন্দ এ রসে বঞ্চিত রহিল না।

অশ্লীল একটা শব্দ করিয়া ভৈরবানন্দ প্রমত্ত স্বরে বলিল, এ-সব 'ম'কারে আর জোর নেই দাদা। এখন যদি একটা মেয়ে মানুষ থাকত।

জড়াইয়া জড়াইয়া ভূমানন্দ জবাব দিল, উঁহু, উঁহু, আমি ওতে নেই। ভায়া, ওই 'ম'কারটাই মারাত্মক।

BanglaBook.org

মাথার উপরে শুকতারাটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে, আদিগঙ্গার মরা জল নিদ্রিত মহানগরীর অবচেতন পঙ্কিল চিন্তাধারার মতো বহিয়া যাইতেছে। নিবিয়া-আসা চিতার শেষ আগুনের শিখার ইহাদের শ্মশানচারী প্রেতের মতোই বীভৎস মনে হইতেছিল।

এমনি করিয়া দিন চলিতেছিল। স্বভাবের দিক দিয়া অমিল অনেক আছে, মিলেরও অভাব নাই। খুঁটিনাটি বিরোধ একেবারে না বাধে এমনও নয়। কিন্তু সে-বিরোধ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি তাহার মূলও মনের মধ্যে বেশি দূর পর্যন্ত নিজেকে বাড়াইয়া দিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না।

সে-দিন কিন্তু দুই জনের টনক নড়িল।

একে গঙ্গার ঘাট, তার উপর শ্মশান। মানুষের অন্ধ শ্রদ্ধা, তাই এখানে স্নানের জন্য ভিড় করিয়া আসে। জাহ্নবীর জলে স্নান করিবার পুণ্যটাই পরম লাভ, তাহার সঙ্গে মহাশ্মাশনের যোগাযোগ ঘটিলে তো আর কথাই নাই।

সুতরাং এখানে সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকা নিছক পারমার্থিক নিষ্কৃতির জন্যই নয়। নানা বয়সের বহু কিশোরী তরুণী বা যুবতি স্নান করিয়া অর্ধনগ্ন ভাবে জল হইতে উঠিয়া আসে, সেগুলি ফাউ। স্নান করিয়া যাইবার পথে দানের পুণ্য হিসাবে সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে অনেকেই দুই-একটা পয়সা ছুঁড়িয়া দিয়া যায়, প্রলোভনটা প্রধানত তাহারই।

এখানকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহা লইয়া অনেক সময় রেষারেষি চলে। প্রত্যেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করে, কেমন করিয়া অন্যের চাইতে নিজেকে বেশি পরিমাণে খাঁটি প্রমাণ করিবে।

ইহারা দুই জন বহু দিন যাবৎ একচ্ছত্র হইয়াই ছিল, কিন্তু কোথা হইতে সে-দিন এক ভৈরবী আসিয়া হাজির। ভৈরবীই বটে। চেহারা তাহার সুশ্রী না হইলেও সুগঠিত, মুখের উপরে অত বেশি পরিমাণে ছাই না মাখিলে বোধহয় আরও একটু ভালো দেখাইত। দৃঢ় শরীরের গড়ন, অপচয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ত্রিশূল আঁকিয়া আশেপাশে গোটা কয়েক মড়ার মাথা ছড়াইয়া লইয়া সে দিব্যি জাঁকিয়া বসিল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন রাতারাতি ইহাদের কারবার ফেল পড়িয়া গেল।

ভিড় — ভৈরবীর চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টাই ভিড়। ভৈরবী সাধারণ স্ত্রীলোক নয়, সে স্বয়ং মা কালীর ডাকিনি-যোগিনীদের এক জন। যাহার হাত দেখিয়া যে-কথা সে বলিয়া দেয়, তাহাই যেন নির্ঘাত লাগিয়া যায় একেবারে, এতটুকুও ভুল নাই।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভৈরবানন্দ বলে, তা তো নির্ঘাত লাগবেই, সোমত্ত বয়েস যে!

ভূমানন্দ চিমটা দিয়া ক্ষিপ্তের মতো মাটিটা খুঁড়িতে থাকে, বলে, ওকে যে করে হোক তাড়াও দাদা। এখানে ও মাগি আর দিন কয়েক থাকলেই আমাদের পাত্তাড়ি গুটিয়ে সরে পড়তে হবে।

ভৈরাবানন্দ দাঁতের পাটির মধ্য হইতে চিবাইয়া চিবাইয়া অস্ফুট স্বরে বলে, ইচ্ছা করে, ওর গলার মধ্যে সোজা ত্রিশূলটা চালিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিই।

উঁহু, ও কাজ করতে যেও না। পুলিশের হাঙ্গামাটা বড্ড খারাপ, ঠেকে শিখেছ তো।

পুলিশ! তা সত্য। ভৈরাবানন্দের মেজাজ শান্ত হইয়া আসে।

পুলিশের বিভীষিকা এখনও তাহার যায় নাই। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে তাহাদের স্বপ্ন দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠে। কাছাকাছি তাহাদের দুই-এক জনকে দেখিলে এই পাঁচ বছর পরেও বুকের মধ্যে দুপ দুপ করিয়া ঢেঁকির পাড় পড়িতে থাকে।

ভূমানন্দ বলে, এমন একটা কিছু করো, যাতে এখানে টিকতে না পেরে তিন দিনেই সটকে যায়।

চিন্তিত ভাবে ভৈরাবানন্দ জবাব দেয়, তাই দেখতে হচ্ছে।

BanglaBook.org

উদ্যোগপর্বে বেশি সময় নষ্ট হইবার কথা নয়। অতএব দুপুরের খররৌদ্রে সমস্ত শ্মশান-ঘাটটাই যখন নির্জন হইয়া আসিয়াছে তখন গলখাঁকারি দিয়া ভৈরাবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কী মনে করে?

ভৈরবী ঝকঝকে দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিল, হাসিটা তাহার চমৎকার! কহিল, মায়ের স্থানে এসেছি, এতে আবার মনে করা-করির কী আছে?

ভূমানন্দ উগ্রস্বরে কহিল, আরে রেখে দাও তোমার মায়ের স্থান, ও-সব ন্যাকামি ভালো লাগে না। ওই তো নিমতলা, কাশিমিত্তির, বরানগর রয়েছে, ও-সব জায়গায় না গিয়ে এখানে মরতে এলে কেন?

এলুম, ইচ্ছে! ভৈরবী তেমনি অকুণ্ঠিত ভাবে হাসিল।

ভৈরবানন্দ ভৈরবস্বরে কহিল, না, ও-সব ইচ্ছে চলবে না এখানে। এখান থেকে যেতেই হবে তোমাকে।

যদি না যাই?

বলছি, তোমাকে যেতেই হবে। নইলে —।

নইলে মারবে নাকি? কৌতুকোজ্জ্বল নির্ভিক চোখ তাহাদের দিকে মেলিয়া ধরিয়া ভৈরবী বিদ্রুপ করিয়া কহিল, আহা-হা,হা কী সব বীরপুরুষ রে! দুটো ষাঁড়ের মতো ষণ্ডা জোয়ান মিলে একটা মেয়েমানষের গায়ে হাত দিতে এসেছ, লজ্জা করল না?

সত্যিই এতক্ষণে লজ্জা করিল। তাহা ছাড়া ভৈরবীর হাসিতে এমন একটা বিচিত্র কিছু ছিল যে, ইহাদের মনের মধ্যে এতক্ষণের উদ্যত উদ্দীপ্ত পৌরুষটা যেন ধুলাপড়া লাগিয়াই হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

এমনকী ভৈরবানন্দ, ভূমানন্দ সেই প্রথম পরিচয়ের পর হইতে যাহাকে সচেতন অবস্থায় আর হাসিতে দেখে নাই, সে কিনা অনায়াসে সম্মুখের দাঁতের পাটিটা বিকশিত করিয়া ফেলিল! আর ভূমানন্দ — চোখ দুইটা তাহার তীব্রভাবে জ্বলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেটা ক্রোধে নয়, অন্য কারণে।

ভৈরবানন্দ কাশিয়া কহিল, আহা-হা, সে কী কথা, রাগ করছ কেন? এসেছ, বেশ, থাকবে। সে তো ভালো কথাই। আমদের তাতে আপত্তির কী আছে?

ভূমানন্দ সঙ্গে সঙ্গেই খেই ধরিয়া কহিল, ওটা — ওটা, তোমাকে একটু ঠাট্টা, তা বুঝতে পারছ না?

ভৈরবী বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই রাগ করিল না। নিরুত্তরে খানিকটা হাসিল শুধু।

আদিগঙ্গার জলে তেমনই জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়া যায়, শ্মশানঘাট নিত্য নূতন শবযাত্রীর কোলাহলে আর হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে, দেওয়ালের হোয়াইট-ওয়াশের উপর আরও কয়লার লেখা পড়িতে পড়িতে মৃতের নামগুলি আরও একটু অস্পষ্ট হইয়া আসে। ও-পারে ইলেকট্রিক লাইটের চারপাশে ঘাসের উপরে সকালবেলা তেমনি করিয়াই অসংখ্য মৃত দেওয়ালি পোকা জমিয়া থাকে।

কিছুই বদলায় নাই, ইহাদের মনের মধ্যে কোথায় একটু একটু করিয়া বিচ্ছেদ ঘনাইয়া আসিতেছে, শুধু জোর করিয়া কেউ সেটা প্রকাশ করিবার চেষ্টা কর না। কিন্তু তাহার অস্বস্তিটা যেন পলে পলে অনুভব করা যায়।

ভূমানন্দের শিষ্যটি তেমনি করিয়াই গাঁজার অর্ঘ্য আনিয়া নিবেদন করে, ভূমানন্দ নিজে কয়েকটা সুখটান টানিয়া আবার কল্কেটা শিষ্যের দিকেই বাড়াইয়া দেয়। পাশে যে ভৈরবানন্দ অনেকক্ষণ হইতে তৃষিত চোখে চাহিয়া আছে, সেটা তাহার নজরেই আসে না।

BanglaBook.org

ভৈরবানন্দ গাঁজার কল্কেটার গতিবিধি লক্ষ্য করে, কিন্তু কোনও কথা বলে না, কিন্তু কোনও কথা বলে না। নীরবে তাহার চোখ উগ্র হইয়া উঠে, কী ক্ষুধিত ভাবেই না ভূমানন্দ ভৈরবীর সর্বাঙ্গ দৃষ্টি দিয়া গ্রাস করিতে চাহিতেছে। ভৈরবানন্দের কঠিন হাতের মধ্যে চিমটাটা শক্ত হইয়া উঠে, রক্তে রক্তে সে যেন ঝড়ের সঙ্কেত অনুভব করে। সেই যে কবে মদের বোতল বসাইয়া একটা মানুষের মাথা সে চুরমার করিয়া দিয়াছিল, রক্তের ছিটায় আর স্পিরিটের গন্ধে তাহার নাক মুখ চোখ ভরিয়া গিয়াছিল, সেই স্মৃতিটাই বার বার করিয়া মনের সামনে ভাসিয়া উঠে।

আর ঠিক তাহাদের মুখোমুখি বসিয়া ভৈরবী অর্থপূর্ণ ভাবে হাসে, দুই জনের দিকে চাহিয়া লীলায়িত কটাক্ষ করে। বলো কী গো ঠাকুররা, অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ যে? কী দেখছ এত করে?

ভূমানন্দ লজ্জা পাইয়া বলে, কই, না।

কিন্তু ভৈরবানন্দের ধরনটা অপেক্ষাকৃত নির্বোধ হইলেও এ-ক্ষেত্রে সে সপ্রতিভতার পরিচয় দেয়। ফস করিয়া বলে, দেখবার জিনিস, দেখব না?

ভৈরবী মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া বলে, ই — স!

ভূমানন্দ ভৈরবানন্দের দিকে কটমট করিয়া তাকায়।

মন্থর দিন, মন্থরতর রাত্রি। পিছনে মহানগরীর এমন গতি-চঞ্চল জীবন এখানে আসিয়া যেন শ্মশানের মৃত্যুর মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। সেই একঘেয়ে দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি চলে। শুধু কাঁধে করিয়া যাহাদের আনা হয়, তাহারাই নূতন; অনুষ্ঠানটার কোথাও কোনও বৈচিত্র্য নাই।

সন্ধ্যার রঙ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয়, তারপর রাত্রি বাড়ে। যে-দিন মড়া আসে, সে-দিন সারা রাত্রেই শ্মশান জাগিয়া থাকে। আর যে-দিন আসে না, সে-দিন গভীর রাত্রে যেন শ্মশানকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মৃত্যু ঘুরিয়া বেড়ায়। যেন অশরীরী প্রেতাত্মাদের নিশ্বাসে গঙ্গার জল শঙ্কিত সঙ্কীর্ণ গতিতে বহিয়া চলে।

মাধ্যরাত্রি। চারিদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা। সামনে কেবল একটা গ্যাস-পোস্ট জ্বলিতেছে।

ভৈরবানন্দ উঠিয়া বসিল। কত দিন সে নারীসঙ্গ পায় নাই, অসংযত উপবাসী কামনা তাহার শিরাস্নায়ুগুলি মধ্যে যেন বিপ্লব চালাইতেছে। এ-পাশে নেশার ঝোঁকে ভূমানন্দ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর ও-ধারে ভৈরবী অঘোরে ঘুমাইতেছে, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অবাধে যেন ভৈরবানন্দের কানে আসিতেছিল।

ভৈরবানন্দ হিংস্র একটা জানোয়ারের মতো হামাগুড়ি দিয়া ভৈরবীর দিকে অগ্রসর হইল। ওই গ্যাসটা এখন যদি কেহ নিবাইয়া দিতে পারিত, বেশ হইত তাহা হইলে।

সমস্ত দেহের উপর আকস্মিক একটা ভারি চাপা পড়িয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম, ভৈরবী রুদ্ধশ্বাসে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে গেল, কে?

তাহার মুখে হাত চাপিয়া ভৈরবানন্দ বলিল, চুপ, আমি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ভূমানন্দ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, বিকৃত বীভৎস স্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, শা — লা, তোকে আমি খুন করব।

তারপর খুনোখুনি রক্তারক্তি পর্ব অনেক দূর পর্যন্ত যখন অগ্রসর হইয়াছে, তখন নিজের ঝুলি কাঁথাগুলি এক সঙ্গে গুছাইয়া লইয়া ভিড় ঠেলিয়া ভৈরবী নিঃশব্দে অন্ধকার পথে নামিয়া গেল।

নারী ছলনাময়ী। ইহাদের দুই জনকে যত সহজে কাছে টানিয়া আনিয়াছিল, তত সহজেই অবলীলাক্রমে আবার দূরে সরাইয়া দিল॥

BanglaBook.org

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয় পক্ষ

বিয়ের পরের মাসেই স্ত্রী মারা গেল। ভুবনমোহনের তখন জোয়ান বয়স, তার ওপর মা বেঁচে। মাস চারেকের মধ্যে আবার নতুন বউ ঘরে এল।

কিন্তু বরাত ভুবনমোহনের। বছর চারেক, তার বেশি নয়। একটি মেয়ে ভুবনমোহনের কোলে তুলে দিয়ে এ বউও চোখ বুঝল। তিন দিন, তিন রাত ভুবনমোহন বিছানা ছাড়ল না। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। মা আর ছিলেন না। দূর সম্পর্কের এক পিসি সান্ত্বনা দিতে এসে কেঁদেই আকুল। অনেক বোঝাবার পর ভুবনমোহন বিছানা ছেড়ে ডিসপেনসারিতে এসে বসল, কিন্তু ওই বসাই সার। রোগীদের ভালো করে দেখল না, ওষুধপত্রও হাতের কাছে যা পেল, তাই বিলিয়ে কাজ সারল।

দিন কয়েক পরে তাল বুঝে পিসি একবার চেষ্টা করল।

তোর এমন কী বয়স ভুবন। এ বয়সে অনেকের বিয়েই হয় না। আর একটা বিয়ে কর। মেয়েটাকে দেখবার একটা লোক দরকার, তাছাড়া তোকেও তো এ-ভাবে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখা যায় না।

কম্বলের উপর বসে ভুবনমোহন গীতা পাঠ করছিল। এক মুখ দাঁড়ি-গোঁফ। শীর্ণ দু'টি চোখ। মুখ তুলে পিসির দিকে চেয়ে বলল, বিয়ে করব পিসি। আপত্তি করব না। খাটিয়ার চার ধারে ফুল সাজিয়ে ভালো লগ্ন দেখে যাত্রা শুরু করব। সঙ্গে নাম সংকীর্তন, খই ছড়ানো, সব হবে।

বালাই ষাট, অলক্ষুণে কথা শোনো ছেলের। ভুবনমোহনের কথা শেষ হবার আগেই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পিসি উঠে গিয়েছিল।

ভুবনমোহনের পেশা ডাক্তারি। অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি। শুধু বাপের রোগীগুলোই নয়, তাঁর নাড়িজ্ঞপিত্ত পেয়েছিল। আশপাশের গোটাচারেক গাঁয়েতে আর কেউ পাত্তা পায় না। সর্দি থেকে সন্নিপাতিক, হাঁপানি থেকে হার্নিয়া সব ব্যাপারে ভুবনমোহনের ডাক পড়ে। ইদানিং অবশ্য হাসপাতালের কোট-প্যান্ট পরা দু'এক জন ছোকরা ডাক্তার ঘোরাফেরা করে শিরা ফুঁড়ে ওষুধ দেয়, দাঁত ভাঙা সব দাওয়াইয়ের নাম বলে, কিন্তু তত করেও জমাতে পারেনি। ভুবনমোহনের প্র্যাকটিসের শক্ত বুনিয়াদে একটুও ফাটল ধরেনি।

ভুবনমোহনের অবস্থা দেখে রোগীরা প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ, স্বয়ং ধন্বন্তরি হাত গুটিয়ে থাকলে পৃথিবীতে মড়ক লাগবে যে! বাড়ি বাড়ি কান্নার রোল উঠল।

গাঁয়ের দু'এক জন মাতব্বর ধর্না দিল।

ভুবনমোহন কিন্তু অটল। হাত জোড় করে বলল, আমাকে মাপ করুন আপনারা। ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। উঠে দাঁড়াবার কোনও জোর পাচ্ছি না। নিজের ওপরই বিশ্বাস হারিয়েছি। কাজেই আপনাদের চিকিৎসা করব কোন ভরসায়। লোকেরাও ছাড়বে না।

তা কি হয়? উঠে বসতে হবে ভুবনমোহনকে। এর চেয়ে কত শোক পায় মানুষ, কত বড় আঘাত। এই সব বিপদের মধ্য দিয়েই তো মানুষের পরীক্ষা, মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। পুরুষ মানুষের এত অল্পে কাহিল হলে কি চলে?

দু'এক জন মোহমুদগর আওড়াল, কেউ কেউ গীতার মোক্ষম অংশ।

একটু বুঝি টলল ভুবনমোহন। কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, আমি দিনকতকের জন্য বাইরে যেতে চাই। তীর্থে তীর্থে ঘুরে যদি মনটা ঠিক করতে পারি। গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন।

দিনকয়েক নয়, ভুবনমোহন ফিরল মাস দুয়েক পর। গোঁফ-দাড়ির চিহ্ন নেই, বপু কিঞ্চিৎ স্ফীত, মুখে সলজ্জ হাসি। পেছনে অবগুণ্ঠনবতী তরুণী।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েটি পিসির কাছে ছিল। খবর পেয়ে পিসির কাছে এসে দাঁড়াল মেয়ে কোলে নিয়ে।

নতুন বউ মালতী। ঘোমটা টেনে এগিয়ে গিয়ে পিসিমাকে প্রণাম করেই ছোট মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল।

পড়শিরা অবাক। পাড়ার দু'এক জন জিজ্ঞাসাও করে ফেলল।

ডিসপেনসারির টেবিল-চেয়ার মুছতে মুছতে ভুবনমোহন মুখে অমায়িক হাসি ফোটাল।

মিছেই আমরা লাফালাফি করে মরি। আমরা কেউ নই ভাই, অন্তরাল থেকে আর এক জন সুতো টেনে চলেছেন। তিনি নাচাচ্ছেন, আমরা নাচছি।

অবশ্য এই নাচানাচির ব্যাপারটা ভুবনমোহন এক সময় পরিষ্কার করেও বলল।

প্রয়াগ ছাড়বার মুখে। শত কুলে কেউ কোথাও নেই। বুড়ো রুগ্ন বাপ সম্বল। তাকে নিয়েই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলাপ ধর্মশালায়। বাপ হাঁপানিতে কাত। মালতী ভুবনমোহনের কামরায় ঢুকেছিল সাহায্যের আশায়। বিদেশ-বিভুঁই, একলা মেয়েছেলে। যদি দয়া করে একটা ডাক্তার ডেকে দেয় ভুবনমোহন।

ওষুধের বাক্সটা ভুবনমোহনের কাছেই ছিল। নিজের যদি চিকিৎসার দরকার হয়, সেই ভেবেই সঙ্গে নিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মালতীর বাপ অনেকটা সামলে নিল। আলাপ-পরিচয় তো হলই, সেই সঙ্গে বিগত জীবনের টুকরো টুকরো কথারও লেনদেন।

তীর্থ ভ্রমণে বাপ আর মেয়ের সঙ্গে ভুবনমোহনও জুটে গেল। মালতীর বাপের চিকিৎসার ভার নিল ভুবনমোহন আর ভুবনমোহনের দেখাশোনার ভার নিল মালতী। মালতীর বাপের শরীর খুব না সারলেও, যত্ন আত্তিতে ভুবনমোহনের চেহরা ফিরে গেল। ময়লা কাপড়-চোপড় বদলে ফর্সা পরিচ্ছদ অঙ্গে উঠল। মুখে বিষাদের আমেজ কেটে গিয়ে হাসির আভাস।

বিয়ের কথাটা মালতীর বাপ পাড়ল বৃন্দাবনে। ভুবনমোহনের অবস্থা তখন ভিজে ভিজে। যত্ন তোয়াজে কাদা কাদা ভাব। জোর গলায় আপত্তি করতে পারল না। কেবল নিজের বয়সের উল্লেখ করে মৃদু প্রতিবাদ করল।

আপত্তি টিকল না।মালতীর বাপ উমা-মহেশ্বরের বয়সের ব্যবধানের নজির বাতলে ভুবনমোহনকে আর হাঁ করতে দিল না। বিয়ে হয়ে গেল।

আমিও ভাবলাম, পিসিরও বয়স হয়েছে, মেয়েটাকে দেখবার একটা লোকও তো দরকার তাই...। কোনও রকমে ঢোঁক গিলে ভুবনমোহন কথাটা শেষ করল।

ভুবনমোহনের হালচাল বদলাল। এমনিতেই মাথায় চুল কম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টাকেরও প্রসার। কিন্তু পাড়ার নাপিত গদাধরকে ডেকে বিরল কেশের যত্ন নিতে শুরু করল। রোগীরা ওষুধের মৃদু গন্ধ ছাড়া আরও একটা গন্ধ পেতে লাগল। আতরের গন্ধ।

পথে-ঘাটে ভুবনমোহন ধরাও পড়ে গেল। হাট ফেরত একেবারে লোকের মুখোমুখি।

হাটে এসেছিলেন বুঝি? হাতে কী ওটা? কী কিনলেন?

বিব্রত ভুবনমোহন হাতের মোড়কটা পিছনে সরাতে সরাতে বলে, ও একটা ইয়ে।

লোকেরাও নাছোড়বান্দা। বলতেই হয় ভুবনমোহনকে। রঙিন তাঁতের শাড়ি। ব্লাউজের ছিটও খানিকটা।

শুধু শাড়ি নয়, মাঝে মাঝে বিপিনের দোকান থেকে স্নো, পাউডার, কাঁচের চুড়িও কেনে ভুবনমোহন।

বন্ধুবান্ধব দু'এক জন হালকা ঠাট্টাও করে।

এ-ও একটা রোগ ভুবন। ক্যালেন্ডুলা থার্টি কিংবা ইপিকাফ খেয়ে একবার দেখ না।

BanglaBook.org

বেশির ভাগ লোক ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না। নতুন আর কী করছে ভুবনমোহন। বৃদ্ধস্য না হোক প্রৌঢ়স্য তরুণী ভার্যা হলে এ-রকমই হয়।

রোগীরা কিন্তু মুশকিলে পড়ল। আগে ভুবনমোহনের কোনও গোলমাল ছিল না। দিনে-রাতে যখন রোগী এসে দাঁড়িয়েছে, ভুবনমোহন এক পায়ে খাড়া। শুধু হাতের মুঠোয় দর্শনী পেলেই হল। বাক্স বোদগলদাবা করে স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ত। আজকাল কিন্তু সন্ধ্যার পরে তাকে বাড়ির বার করাই মুশকিল। নানা ওজর আপত্তি তুলে পাশ কাটাবার চেষ্টা। রাত্রে ভালো চোখে দেখতে পাই না কিংবা বাড়িতে ওর শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। আর একেবারে পা জড়িয়ে ধরলে সাকরেদ বিশ্বনাথকে এগিয়ে দিয়েছে।

বেশ, বিশুই না হয়ে যাচ্ছে। ও দেখে আসুক, দরকার হলে কাল সকালে আমি না হয় যাব।

বিশ্বনাথ পাড়ার ছেলে। বিএ পর্যন্ত পড়েছে। তারপর বছর চারেক অফিসের চৌকাঠে মাথা ঠুকে ঠুকে ক্লান্ত হয়ে ভুবনমোহনের কাছে এসে দাঁড়াল।

শুধু পাড়ার ছেলে নয়, খুব দূর সম্পর্কে লতায়-পাতায় কী একটা আত্মীয়তা ছিল।

প্রথমে ভুবনমোহন তেমন গা করেনি। এ-সব ছেলের মতিগতি তার খুব জানা। এখন চাকরি জুটছে না, তাই হোমিওপ্যাথি করার শখ হয়েছে। আবার চাকরির সন্ধান পেলেই সব ছেড়ে ছুটবে। তাছাড়া হোমিওপ্যাথি শেখা এ-সব চঞ্চলমতি ছেলে-ছোকরার কাজ নয়। শুধু পড়াশোনাই নয়, রোগীর আকৃতি প্রকৃতি ভালো করে বোঝা চাই। শুধু রোগের নয়, রোগীরও ইতিহাস। শিরিঞ্জে লাল-নীল রঙ দিয়ে শরীর ফুঁড়লেই হয় না।

বিশ্বনাথ কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড করল। তাক থেকে ধুলো ঝেড়ে মোটা মোটা বই পেড়ে নিয়ে পড়তে বসে গেল। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কোথা থেকে হোমিওপ্যাথির আনকোরা পত্রিকা জোটাল। নতুন নতুন কেসের বিবরণ, পুরোনো ওষুধের বিস্ময়কর আরোগ্যের কাহিনি নিয়ে সময় অসময়ে আলোচনাও চালাল ভুবনমোহনের সঙ্গে।

প্রথন দিকে বিশ্বনাথ শুধু কমপাউন্ডার। বুড়ো দীননাথ মারা যেতে তার জায়গা খালি হল। তারপর ছোট ছোট কেসে ভুবনমোহন তাকে পাঠাতে লাগল। চিকিৎসা বিশ্বনাথ ভালোই করত, কিন্তু রোগীর আত্মীয়রা তেমন সন্তুষ্ট নয়। একটু চুল পাকেনি মাথায়, চামড়া কোচকায়নি, এত ছোকরা ডাক্তারে কখন অসুখ সারে? যমদূতকে আটকাতে হলে বয়সের ওজন চাই, আর চাই ভারিক্কী চেহারা। টানাটানি করে যাতে রোগীকে ছিনিয়ে আনতে পারে কালের কবল থেকে।

ক্রমে ক্রমে রোগীর আত্মীয়রাও মেনে নিল, কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল মালতী।

কী ব্যাপার তোমার বলো দেখি? নিজের কবর নিজে খুঁড়ছ?

সর্বনাশ, ভুবনমোহন চোখে-মুখে এখন আতঙ্কের ভাব ফুটিয়েছে, আমাকে তুমি মোক্ষবুল আমোদ পেয়েছ নাকি? কবর খুঁড়ব কীসের জন্য?

রসিকতা রাখো, মালতী মুখঝামটা দিয়েছে, নিজের রোগী এমন করে পরের মুঠোয় তুলে দেয় কেউ! এমনিতেই আজকাল সদরে হাসপাতাল হয়ে অবধি রোগীর ভিড় বেশ কম। তারপর দেখবে রোগীগুলোর হাত ধরে তোমার নাকের সামনে বিশ্বনাথ আর একটা ডাক্তারখানা খুলে বসবে।

ভুবনমোহন মালতীর কাছে এসে থুতনি ধরে একটু আদরের চেষ্টা করল। মুচকি হেসে বলল, কী যে বলো গিন্নী, তেমন জাঁদরেল রোগীদের বাড়ি কি আর পাঠাই? ছুটকা ছাটকা রোগী, পয়সার জোর নেই, বিনা ভিজিটে ডাক্তার খোঁজে, সেখানেই দেখিয়ে দিই বিশ্বনাথকে। ছোকরা এমনিতে ভালো। শেখবার চেষ্টা আছে, কিন্তু শুধু কি আর বই পড়া বিদ্যায় ডাক্তারি করা চলে, বিশেষ করে হোমিওপ্যাথি?

BanglaBook.org

কথা বাড়ায় না মালতী। কেমন গোঁজ হয়ে থাকে। প্রয়োজনে দু'একটা কথা বিশ্বনাথের সঙ্গে বলতে হয়, কিন্তু কেমন আড়ো-সাড়ো ভাব। খিঁচিয়ে ছাড়া মিষ্টি কথা মালতীর মুখ দিয়ে বার হয় না। বিশ্বনাথও কাঁচুমাচু। পারতপক্ষে মালতীর ছায়া মাড়ায় না।

রাত্রির কালে ভিজিট বেশি। ভুবনমোহন ইদানীং রাত্রির ডাকে বেরোয় না বাড়ি থেকে। বিশ্বনাথকে ঠেকিয়ে দেয়।

এ নিয়ে মালতীর অভিযোগের অন্ত নেই।

এই তো কাছে-পিঠে রাজপুর। কতক্ষণেরই-বা মামলা। গেলে না যে বড়।

প্রথম প্রথম ভুবনমোহন অন্য কথা বলত। এ-সব ছোটখাটো কেস আর হাতে নেবে না। তা ছাড়া সারা রাত জাগিয়ে রাখবে। রোগী চোখ না খুললে ডাক্তারকেও চোখ বুজতে দেবে না। ভারি হাঙ্গামা।

কিন্তু মালতীকে বোঝানো অত সোজা নয়। ভ্রূ বাঁকা করে মালতী জিজ্ঞাসা করেছে, ও-সব বাজে ওজর রাখো, আসল কথাটা কী বলো তো?

একটু ইতস্তত করে ভুবনমোহন আসল কথাটাই বলেছে, কথাটা কী জানো গিন্নী, রাত্রে তোমাকে ছেড়ে যেত ইচ্ছে করে না। দিনের বেলা কোনও রকমে কাটাতে পারি, কিন্তু রাত্রে তোমাকে ছেড়ে থাকবার কথা মনে হলেই কেমন বুক ধড়ফড় করে।

মুখ-চোখের অপূর্ব ভঙ্গি করে মালতী সরে গিয়েছে সেখান থেকে, আঁচল চাপা দিয়েও হাসি লুকোতে পারেনি। কেবল বলেছে, ঢং! সে-দিন বিকেল হতেই ভুবনমোহনের দরজায় লোক এসে দাঁড়াল।

কুমিরখালির মেজবাবুর অবস্থা খারাপ। সকাল বেলা গড়গড়ায় টান দিতে দিতে হঠাৎ ছিটকে পড়লেন মাটিতে। মাঝখানে মিনিট পনেরোর জন্য একটু জ্ঞান ফিরেছিল, আবার একটানা বেহুঁশ। সঙ্গে পাল্কি আছে। ডাক্তারবাবুকে এখনি রওনা হতে হবে।

ভুবনমোহন চোখে অন্ধকার দেখল। এখন কুমিরখালি যেতে হলেই তো সর্বনাশ। মাঝপথে একটা খাল, সেটা পেরিয়ে আরও মাইল চারেক। মানে বিকেলে রওনা হলে রাত্রে ফিরে আসা সম্ভব নয়। একবার মনে ভাবল বিশ্বনাথকেই পাঠিয়ে দেব নিজের শরীর খারাপের অজুহাতে, কিন্তু সাহস হল না। কুমিরখালির বাবুদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। লাঠিয়ালের বংশ। লাঠির জোরে জমিদারির পত্তন করেছিল। তাছাড়া অসুখে-বিসুখে বারকয়েক ভুবনমোহন গিয়েছিল। মোটা দর্শনী আর যত্ন-আত্তির পরিসীমা নেই।

মালতীকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দুর্গা নাম স্মরণ করে ভুবনমোহন রওনা হয়ে পড়ল। মন ভার, মেজাজও তিরিক্ষে। মালতী আসার পর বাইরে বিশেষ রাত কাটাতে হয়নি।

ভুবনমোহনের ভাগ্য ভালো। হারাণগঞ্জের মাঝামাঝি গিয়েই খবর মিলল। জনকয়েক পাইক রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল। পাল্কি আটক করল।

আর যাবার দরকার নেই। মেজকর্তা অনেকটা ভালো। তাঁর ছেলে খবর পেয়ে শহর থেকে সাহেব ডাক্তার নিয়ে এসেছে। সেই জন্যই তারা ছুটতে ছুটতে আসছে। কষ্ট করে ডাক্তারবাবুকে মিছি মিছি আর এতটা পথ যেতে হবে না।

লোক ভালো। শুধু খবরই পাঠায়নি, পাইকের হাতে মোটা দর্শনীও পাঠিয়েছে।

ভুবনমোহনের ইচ্ছা হল পাল্কি থেকে নেমে একটু থেমে নেয়। পয়মন্ত বউ বটে মালতী। রোগীকে ছুঁতে হল না, বাইরে রাত কাটাতে হল না, অথচ পুরো টাকা পকেটে এল।

পাল্কি ফিরল। বাড়ির কাছ বরাবর এসে মতলবটা ভুবনমোহনের মাথায় এল, ঠিক আছে, মালতীকে অবাক করে দিতে হবে। বেহারাদের বলে পাল্কি নামাল। কাছাকাছি একটি রোগী আছে, তাকে দেখে বাড়ি যাবে। পাল্কি ফিরে গেল।

BanglaBook.org

পেটকাপড়ে টাকা ক'টা বেঁধে ভুবনমোহন বাড়ির দিকে ঢুকল।

এ-দিকে অন্ধকার। খিড়কির দরজা খোলা। ঝি বোধহয় বাসন নিয়ে পুকুরঘাটে গিয়েছে। পা টিপে টিপে ভুবনমোহন ওপরে উঠে এল।

কেউ কোথাও নেই। চুপি চুপি ভুবনমোহন শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। আলমারির ওপর ওষুধের বাক্স রেখে সাবধানে জামা ছেড়ে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মেয়েটা পাশের ছোট খাটে শোয়। মালতী পান খেয়ে রান্নাঘর তদারক করে তবে শুতে আসবে। হঠাৎ চুড়ির শব্দ হতেই ভুবনমোহন আপাদমস্তক চাদর চাপা দিল। আজ মালতী একটু তাড়াতাড়িই শুতে আসছে। বোধহয় বাড়ির কর্তা নেই বলেই।

ভুবনমোহন নিশ্বাস রোধ করে শুয়ে রইল। আওয়াজে বুঝল মালতী চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কখন চোখে ধুলো দিয়ে ওপরে উঠে এসেছে বলো তো? মালতীর মিহি গলা শোনা গেল।

ভুবনমোহন অবাক। অন্ধকার পা টিপে টিপে এসে কোনও লাভ হল না। মালতীর নজর চারদিকে।

তবু ভুবনমোহন কোনও উত্তর দিল না। দেখাই যাক না কী করে মালতী।

মালতী বাইরের কমানো হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে খাটের কাছে দাঁড়াল। মশলা দেওয়া পানের মিষ্টি গন্ধ, চুলের সুবাস, তাছাড়াও সান্নিধ্যের একটা মৃদু গন্ধ ভুবনমোহনের নাকে এল।

থোক টাকা ক'টা মালতীর হাতে তুলে দেবার সময়ে আনন্দে মুখ-চোখের চেহারা কেমন হবে, ভাবতে ভাবতে ভুবনমোহন চমকে উঠল।

ঝুঁকে পড়ে মালতী মোলায়েম গলায় বলল, জানো বিশুদা, বুড়ো যেন মাটি কামড়ে থাকে। আবার সোহাগ জানানোর কী ঢং, আমাকে ছেড়ে থাকতে ওঁর নাকি কষ্ট হয়। মরণ আর কী!

কথা শেষ হবার আগেই খিল খিল করে মালতী হেসে উঠল। বাঁধভাঙা স্রোতের উচ্ছ্বাস যেন হাসিতে॥

সন্তোষকুমার ঘোষ

করুণ শঙ্খের মতো

আদালত থেকে বেরিয়ে এসেই নন্দিতা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। যেন বাড়ির গাড়ি ওর অপেক্ষাতেই ছিল। কপাল ভালো। কতটা ভালো, যেন সেইটে পরখ করতেই নন্দিতা ছোট্ট রুমালটায় তার কপালটা মুছে নিল। এত লোক, এত চোখ, গা শির শির করে। চালাও ট্যাক্সি, যত তাড়াতাড়ি পারো, আমাকে এই মানুষের বন থেকে উদ্ধার করে ছুটে চলো। মানুষের বন, না বনমানুষের, রুমালটায় শুধু ঘাম নয়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিরও ছোপ। যে-জল তার চোখে থাকার কথা, তা যেন জায়গা বদলে কপালে লেগেছে। রুমালটা ছোট্ট হলে কী হবে, ভারি দুষ্টুও। তুই ঘাম আর বৃষ্টির ফোঁটা মুছে নিবি, এই না কথা ছিল? অথচ দেখো, সিঁদুরের দাগটাও মুছে নিল। নকল সিল্কের রুমালটা লালে লাল। যে-রক্ত নন্দিতার বুকের ভিতরে গোপনে, তাকে বাইরের বাতাসে একেবারে উতাল করে দিল। লোকে ভাববে কী?

ট্যাক্সিটা মিটার ডাউন করেছিল। ড্রাইভার উৎসুক মুখে তাকিয়ে। বুকের ভিতরে ছপ ছপ আওয়াজ, নিজের কানে নিজেই শোনা যায়। যেন কেউ তার শাড়ি, শায়া, জামা থপ থপ করে কাচছে। নন্দিতার

হৃদয় (এই নামে কিছু আছে কি? কখনও এই চরাচরে কোথাও ছিল কি?) কলতলা হয়ে গেছে। কোনও রকমে চাপা গলায় সে খালি বলতে পারল, যোধপুর পার্ক। আর দেরি নয়, হে ট্যাক্সিওয়ালা দয়া করে দাঁড়ালে যদি, আর একটু দয়া করো। পার করে দাও এই পথটুকু, যত তাড়াতাড়ি পারো, তত।

তার কারণ সে ইতিমধ্যে অনেক না-চেনা চোখের মধ্যে এক জোড়া চেনা চোখ দেখতে পেয়েছে। বিরামের। বিরাম এখনও আদালতের বারান্দায়। নামেনি, হয়তো বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে। নামেনি, তবু অপলক তাকিয়ে আছে। সিঁদুর জলে মাখামাখি রুমালটার আড়ালে থেকে নন্দিতা সব দেখতে পাচ্ছে। চোখ তো নয়, যেন মিটমিটে দু'টি আলো। রাত্তিরে বেড়ালের চোখ যে-রকম জ্বলে, কতকটা সেই রকম। বিরামের চাউনিটা তীব্র না বিষণ্ণ, ভালো করে পরখ করার সাহস নেই নন্দিতার । সময়ও নেই। ট্যাক্সির চাকা যখন গড়াতে শুরু করেছে, ভিড়ের মধ্যে তর ভেঁপু যখন চারপাশের সব চ্যাঁচামেচিকে চাপা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে, নন্দিতা তখন, এতক্ষণে এই প্রথম, বুকের ভিতরটা ফাঁকা আর ফাঁপা করে দিয়ে শ্বাস ছাড়তে পারল।

রুমালটা তো রক্তে আর কান্নায় মানে সিঁদুরে আর জলে গোল্লায় গেছে, তাই তুলে নিল আঁচলের একটা কোণ। আরও একবার মুখটা মসৃণ ভাবে মুছে ওই আঁচলটাই গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসল।

বিরামের চোখে কষ্ট ছিল, না ধিক্কার বা তিরস্কার, সেটা যাচাই করে নেওয়াই হল না। পালাতে হবে যে, এক্ষুনি, এক্ষুনি। এই লোকজনের কাছ থেকে, বিশেষ করে একটি লোকের অদ্ভুত দৃষ্টির কাছ থেকে। কিংবা কে জানে, নন্দিতা হয়তো নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে। এই মুহূর্তে।

বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে অবশ্য অনেক মুহূর্তই কাটল। মিটারে কত উঠেছে না দেখেই নন্দিতা এক হাতে বাড়িয়ে দিল একটা দশ টাকার নোট, আর এক হাতে দরজা খুলে তড়বড় করে নেমে গেল।

সেই বাড়ি, সেই তর তর সিঁড়ি। চাবিটা ব্যাগে ঠিক খোপেই আছে, দরজার ফোকরটাও যথাস্থানে। কিছু হারায়নি বা স্থানচ্যুত হয়নি। আবার কিছুই যেন যথাপূর্ব নেই। তখনও শেষবেলা সন্ধ্যার কোলে মুখ গুঁজে মূর্ছা যায়নি, তখনও অন্ধকার দিনের রোদের রেশটুকুকে করেনি আত্মসাৎ। বাড়ির বাইরের মহা নিমগাছটা ঝির্‌ঝিরে জল আর হাওয়া ঝরিয়ে দিচ্ছিল। একটুখানি আকাশ জানলার কাচের ফাঁকে, বাইরের রাস্তায় কচ্চিৎ একটা গাড়ির পোড়া পোড়া গন্ধ, কখনও-বা রিকশার ঠুন ঠুন ছন্দ।

মেঘলা দিন, তাই বিকেলটাকেও সকালের মতো লাগে। মুখ ভারি, তবু করুণ হলেও মনোরম। অভ্যস্ত হাতেই সুইচ টিপে নন্দিতা ঘরটাকে আলোয় আলো করে দিল। তখন আলনায় শাড়ি, দেওয়ালের ফটো আর আয়নাটা ওকে দেখতে পেল। যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। অথচ থেকেও নেই। যে-শূন্যতা বাইরের আচ্ছন্ন আকাশে, সে-শূন্যতার ছায়া নন্দিতা তার অন্তরেও অনুভব করছে। নেই নেই, সে নেই, কেউ নেই কিছু নেই। নেই থেকে কিছু হবে এই আশাতেই নন্দিতা তাড়াতাড়ি সংলগ্ন চানের ঘরটায় ঢুকল। যেন সেখানকার শ্যাম্পু, সুগন্ধি তেলের শিশি আর সাবানের মৃদু সুবাসে সে তার পুরানো হারানো সত্তাকে ফিরে পাবে। চানের ঘরের আয়তন ছোট বলেই বোধহয় এত আরাম, এতঅভয় স্বস্তি। মাথার উপরে ঝরনা। ছিপি খুলে দিতেই তার ঝর ঝর আদর নন্দিতার সমস্ত শরীর ধুয়ে দিতে থাকল। কার স্পর্শে? তার মায়ের? সে কত দিন আগেকার কথা? মাকে ছেড়ে এই বাড়িতে এসে উঠেছে আন্তত বছর ছয়েক আগে। আর মা তাকে — সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন কবে যেন , কবে যেন? সে-ও কম না, বছর তিনেক হবে। দিন তারিখ সাল এখন আর মনেও পড়ে না।

তোয়ালে দিয়ে যখন গা রগড়াচ্ছে নন্দিতা, কার ছোঁয়া? তার স্বামীর? সে-ও তো হারানো। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে এই তো মোটে আধ ঘণ্টা আগে নন্দিতা পুরোনো বাড়িটাতেই ফিরে এল।

BanglaBook.org

বিচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ। আঃ, এতক্ষণে যেন সব জুড়োল। ছড়ায় বলে, খোকা ঘুমোল। কোনও ছড়ায় কিন্তু খুকি ঘুমোল বলে না। বলবে কেন? আমি তো খুকি নই; আমি অনেক দিন ঘর করা নারী।

বিরামের সঙ্গে যত দিন ছিলাম, তত দিন আমার একটা নাম ছিল হয়তো। কিন্তু আমি যে আমি এই কথাটাও কি বোঝা যেত? শুধু যুক্ত ছিলাম এইমাত্র। কে জানে, সব বিবাহিতা মেয়ের আর একটা নাম হয়তো সংযুক্তা। আমি নেই, সে আছে। অথবা তার ছায়া হয়ে আমি আছি। কিন্তু যদি এমন কোনও সাজানো বাগানে আর একটা ছায়া পড়ে? তবে তো এই ছায়া আর একটা ছায়ায় ঢেকে যাবে!

আমি এখন আমি। শেকড় নই, ছায়াও নই, আমি রক্তমাংস মজ্জা মিলিয়ে কায়া। স্বাধীন। বেশ তবে তাই হোক, এবার সেই কায়ার বুকের ভাঁজে একটু সেন্টের সুগন্ধ ঢালি না। দরাজ হাতে স্প্রে করলে এই আমি ভুর ভুর হয়ে যাব। কিংবা কস্তুরী মৃগের মতো 'ম'। রক্তের রঙ তো ঢাকা যায় না! গন্ধটা যদি ঢাকা পড়ে।

নন্দিতার মগজে একটা ঝিম ঝিম আবেশ নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল, স্নায়ুর সংবেদনশীল কেন্দ্র থেকে যত শিরা আর উপশিরা রঙে রঙে চিৎকার করছিল। নন্দিতা জামাটর নিচের বন্ধনী আরও আঁটসাঁট বোতাম টিপে শক্ত করে দিল। এই নিচেকার জামাটাই তো সব চেয়ে নিচের নয়, তার তলাতেও আছে পরতের পর পরত, আছে মসৃণ ফর্সা চামড়া। সেই চামড়াও নিচে? কে জানে কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকে মন। মনেরও স্তন আছে কি না আজ পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী দার্শনিক সে-কথা জানাননি। থাকলে মনকেও ব্রা পরানো যেত। দূর, যাকে লাগাম পরানোই শক্ত তার আবার বক্ষ-বন্ধনী। তবু নন্দিতা ভাবল, বাইরের বুকে একটা বাঁধন থাকলে ভিতরের বুকটাকেও বুঝি বেঁধে আটকানো যাবে। যেমন স্ফীত কিছু সুডৌল মাংসপেশী, তেমনই অনুভূতি। শারীরিক স্ফীতিকে যদি শিকেয় তুলে তুঙ্গ করা যায় তবে মানসিক উচ্ছ্বাসের জন্যই-বা কোনও দড়াদাড়ি, ফিতে হুক-টুক নেই কেন?

আসলে খুবই কষ্ট হচ্ছিল নন্দিতার। সেটাকে ঢাকতে যত সেন্ট আর পাউডার। আচ্ছা, বিরাম আজকেই আদালতের বারান্দায় ও-ভাবে তাকিয়ে ছিল কেন? তখন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, নন্দিতার এতক্ষণে মনে পড়ছে, একটা পাকা বটফুল টুপ করে স্যাঁতসেতে মাটিতে পড়েছিল, শিরীষ গাছটার ফুলের রোঁয়া উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়েছিল তার গলায় আর ঘাড়ে। কার ছোঁয়া, কীসের? সে জানে না। শুধু দৌড়ে এসে ট্যাক্সিতে বসেছে। ট্যাক্সিটার স্পিড ছিল অন্তত ষাট-সত্তর কিলোমিটার। কিন্তু বিরামের সেই চোখ আর চেয়ে থাকা? তার স্পিড কত? যেন আরও বেশি। যেন সিঁড়ি-টিড়ির বাধা মানেনি, ধাওয়া করে এসেছে এইখানে, এই ঘরে, এত দূরে। শুধু তাকানোও যে একটা কুকুরের মতো অনুগত অনুসরী হতে পারে নন্দিতা আগে জানত না তো! ওই দৃষ্টি এখন লকলকে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। তা হাঁপাক না! নন্দিতার সারা শরীর আর সত্তাকে এত করুণ লেহন করছে কেন?

কথাটা নন্দিতা ড্রেসিং আয়নাকে জিজ্ঞেস করল। আবার কপালে বড় করে পরল সিঁদুরের টিপ, যেটা ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে খানিক আগে মুছে তাকে অধবা করে দিয়েছিল। নির্ভুল কাচ তাকে দেখিয়ে দিল হাতের শাঁখা জোড়াও। নন্দিতার ঠোঁট একটু বেঁকে গেল। সোনা দিয়ে বাঁধানো হোক না, শাঁখা জোড়া ভেঙে দিলে বেশ হত। যাদের স্বামী মারা যায়, তাদের নোয়াটাকে নাকি খুলে নেয়, শাঁখা ভেঙে ভাসিয়ে দেয় জলে! আর যাদের স্বামী চলে যায়? তাদের শাঁখার কী গতি হয়, নন্দিতা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারল না।

ইচ্ছে করলে এই তো আমি সিঁদুরের টিপটা ফের মুছতে পারি। সিঁথির লাল দাগটা তো কত কালই নেই। বুকের ভিতরের রাস্তা দিয়ে সরু কোনও লাল যন্ত্রণার আলপথ চলে গেছে কি না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিতা একটা আঙুল ছুঁইয়ে সেটা পরখ করতে চাইল।

BanglaBook.org

এ কী অদ্ভুত ব্যাপার সে ভাবছিল। গিয়েও যে যায় না, সব শেষ হলেও পিছু পিছু পা টিপে আসে! কুকুরের মতো যার জিভ শুধু হা-হা শ্বাস ছাড়ে। জিভ আছে অথচ লালা নেই, তাকানো আছে, কিন্তু সেটা তাড়া করে না, নন্দিতা এই অসম্ভব অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিতে পড়ে, তোলপাড় হতে থাকল।

ঠিক তখনই সিঁড়িতে শোনা গেল ঠক্ ঠক্ জুতোর শব্দ। আমি জানি তুমি কে, আমি জানি এই পায়ের আওয়াজ কার। তোমার পায়ে পড়ি এক্ষুনি এসো না, অন্তত মিনিট দুই সময় দাও আমাকে। সামলে নিতে, ভেবে নিতে — যা ছেড়ে এলাম কিংবা যা আমাকে ছেড়ে গেছে। গঙ্গার ঘাটে কখনও যাওনি? সেখানে পুণ্যবতীরা সবাই ডুব দেয়। পাপবতী আমি, আমিও একটুখানি সময়ের জন্য আগেকার জলে একবার শেষবার ডুব দিতে চাই। কয়েকটা মিনিট শুধু। ভিক্ষে করছি। এই শাঁখাটা বড্ড ঢলঢলে লাগছে যে। সিঁদুরের এই ফোঁটাটা দরকার হয়, না হয় আবার মুছব আবার আঁকব — এবার যে আসছে এই তোমার জন্য।

একটু সময় দেবে? ধরো আমি যদি ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিই? আগেও কত রাত্তিরে দিয়েছি। তখন বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, অথচ ভিতরে, সারা শরীরে ফটফটে ছটছাট আলো। জ্বলে জ্বলে। জ্বলত জ্বলত। তোমার বুকের গন্ধ পাই না কেন? আমি চাপা হাসতাম সেই অন্ধকারে। আরও চাপা গলায় বলতাম, পাও না? বিরাম বলত, না। বলতাম, কেন, এত যে আতর মাখলাম। সে বলত, সে তো কেনা! বলতে বলতে খামচে ধরত, আমার ঠোঁট, ঠোঁট ছাড়িয়ে জিভ চুষে শেষ করে দিতে চাইত। অন্ধকারে গাঢ় গলায় বলত, কেনা জিনিস তো চাই না। বলেছি, তবে? সে বলেছে, শুধু পেতে চেয়েছি, পেতে চাই।

আরও কত কত রাত, যখন আমার বুকের উপরে — বলতে কী পায়ের নখ থেকে কপাল, আমার কপাল পর্যন্ত একগাছি সুতোও নেই, মাঠের মতো, আকাশের মতো ব্যাপৃত, আমি উদ্‌লা, তখন সে আমার শরীররে অন্ধিসন্ধিতে কী জানি, কোন গন্ধ খুঁজত। খুব নিচু গলায়, খুব উঁচু হয়ে বলতাম, কী খুঁজছ তুমি, কী চাও?

পায়ে পড়ি হে সিঁড়ির ধুপধাপ শব্দ, হে সময়, আমাকে আর একটু সময় দাও। সব কথা নিজেকে বলে বলে খালাস হয়ে যাই, যে-ভাবে এক্ষুনি যদি ফের বাথরুমে যেতাম তবে আয়নাটার কাছে মনের সব চাপ আর তাগিদ হালকা করে দিয়ে আসতে পারতাম।

বিরাম সেই গন্ধভরা অন্ধকারে বলেছে, কোথায় তুমি? আমি বলেছি, এই তো। মায়েরা যে-ভাবে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায় সেই গলায়। বলেছি, দেখো তো, আমার বুকের একটুও আড়াল নেই! সে মানত না। সে কি বুকের ভিতরে আরও কোনও বুকে আব্রু আছে কি না সেইটাকে খুঁজত? তাকে ছিন্নভিন্ন আর উদ্‌ভিন্ন করে দিতে চাইত?

জানি না, আমরা তো জানি আমরা যা আছি তাই। আমার ভিতরে আর একটা যে আমি একেবারে খোলামেলা; বুকের তলার আরও একটা বুক যে থাকতে পারে কখনও ভাবিনি। তাই নানা সুগন্ধি দিয়ে ওকে ঠেকাতে চাইতাম। কে জানে, হয়তো ঠকাতাম নিজেকেও।

রাস্তার একটা টিম টিম আলো মাঝে মাঝে ওই অন্ধকারকে জেব্রা করে দিত। বিরাম আমার খোলা আর খালি শরীরটাকে পাগলের মতো কাছে টানত। বলত, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে খালি বলত, আমি তোমার ভিতরটাকে জানতে চাই।

আমি তো গা এলিয়ে, সমস্তটাকে ঢিলে করে দিয়ে শুয়ে আছি। বলেছি, যা জানবার জেনে নাও তুমি। সে বলত, প্রবেশ করব।

বোকা ছেলে! একটা সিন্দুকের ডালা যদি-বা ঘামে চিটচিটে হয়ে কেউ দু হাতে টেনে তুলল, তার পরেও ভিতরে যদি চকচকে কোনও সোনা দানা মোহর না দেখতে পাওয়া যায়? শরীরের দশাই তো

BanglaBook.org

এই। সে শেষে যেতে পারে না, শুধু শেষ হয়ে গিয়ে হাঁপায়। সেই কুকুরের লকলকে জিভ। অশেষের ঠিকানা পায়নি বলেই বিরাম রোজ বলত, রোজ রোজ বলত আর বলত, কী? না লাগছে। কোথায়? আমি বলতাম। তখন আমিও ইঁদারার মতো টলটলে হয়ে গেছি, বিরামের মুখ আমার উন্মুক্ত বুকে, বলতাম, সব তো খুলে দিয়েছি, তবু পারছ না? এ যেন দস্যুর হাতে চাবি তুলে দিলাম, তার পরেও সে ধন-দৌলতের কোনও ঠিকানা পেল না।

বিরাম, তুমি সেই দস্যু। কেন ফিরে ফিরে নিচের ঘরে, কেন কোনও মন্দিরের গর্ভগৃহে নিবিষ্ট প্রবিষ্ট সাষ্টাঙ্গে লিপ্ত হয়েও বলছ, লাগছে? কী সে বিরাম, কী সে? কোথায় বলো তো, কোথায়? সারা গায়ে কিছু তো নেই, দেখছ না আমি এখন নির্বাস, আমি শুধু আমার নির্যাস। আছে শুধু শাঁখাজোড়া। তাতেই কষ্ট? সেইটাকেই তুমি বলছ, লাগছে? ওই একটুখানি বেড় কি বেড়া হয়ে যায়?

জানি না, ভাবতে পারছি না, সময় আমাকে আর সময় দিচ্ছে না। ধপ ধপ জুতোর শব্দ, এখন একেবারে দোরগোড়ায়। কলিং বেল বাজছে!

নন্দিতা জামা কাপড় গুছিয়ে সংবৃত হয়ে গেল। সাড়া দিল, মানে দরজাটা খুলল। আমি জানতাম অনুপম তুমি আসবে। বাঃ তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তো! তোমার জন্যই তো নন্দা, তোমার জন্যই। আমার মনের কথাটা যদি পড়তে পারো তবে পাড় নাও। আজকে এই সময়টায় লোডশেডিং হলে কী দারুণ হত বলো তো? জিজ্ঞেস করার দরকার কী অনুপম। সব লোডশেডিং করেছি বলেই তো আমরা দু'জন এখানে আজ মুখোমুখি হয়েছি। স্ট্রেচলনের ট্রাউজার পরে তুমি তৈরি, আমিও তাই নাইলনের শাড়ি-শারা শরীরে জড়িয়ে। এসো সব ছাড়িয়ে, যা কিছু আমাদের ছড়িয়ে আছে সব বাধা এড়িয়ে, এসো ' ানি এরপর কী। তুমি যদি তৈরি থাকো তবে আমিও তৈরি। কপালের টিপটাকে ভালো লাগছে না? ভালো না লাগলে মুছে দিও। চুমু দিয়ে জিভের ডগা দিয়ে।

আজকেও তুমি এই সব কথা বলবে নন্দা? তোমার কথা কেমন যেন কাটা কাটা। দূর, আমি সব হাত বুলিয়ে মিলিয়ে দেব।

আমি নন্দিতা। বিরামের চাকরিটা হঠাৎ কেন গেল বলো তো? কেন তুমি তোমার অফিসে আমাকে একান্ত সচিব করে নিলে? আমার যে এক, তার যে তখনই অন্ত হয়ে গেল। স্বামীর কাজ নেই, আমার কাজের উপরে একটা ডবল কাজ মিলল। অনুপম, হে সম্রাট তুমি মহানুভব।

নন্দিতার এই সব মনোগত কথা অনুপম শুনতে পায়নি। সে বানানো কোনও নাটকের চরিত্রের মতো বানানো কোনও সংলাপ শুনছিল। তার কানে ভাসছিল, আমি, এই অনামিকা, এখন সব খুলে দিতেই রাজি। যে-ভাবে দরজাটা খুললাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। জানতাম তুমি আসবে। তাই তো একটু আগে বাথরুমে গিয়েছিলাম। কেন বলো তো? আমার সমস্ত পুরোনোকে ধুইয়ে ঢেলে দিলাম। আর নতুনের জন্য নিজেকে ছিমছাম তকতকে করে তুললাম। এক ঢিলে দুই পাখি। মেয়েদের মন যদি-বা দু'মুখো সাপ হয় তাদের শরীরটা শান বাঁধানো মেঝের মতোই। কোনও এক জন পা ফেলবে এই জন্যই তারা মসৃণ ধৌত তৈরি।

আচ্ছা অনুপম, তুমি খেয়ে এসেছ? রাত্তিরের খাওয়া?

খাইনি নন্দা।

তোমার নন্দা মানে এই নন্দিতা বলছি, তোমার চোখ দুটো এ-রকম ধূসর কেন?

চোখকেই কি তোমার ভয়?

না, তা-ও নয়। যখন তোমার একান্ত সচিব হলাম, তখন ছুটির পরে দুটো চোখ ছুটে ছুটে আমার পিঠের জামা ফুঁড়ত। আজকেও জানো, অন্য দুটো চোখ ধাওয়া করেছিল, যে-চোখ দুটোর মালিকের সঙ্গে আমি বিছিন্ন হয়ে গেলাম। আচ্ছা, পুরুষের চোখ কি শুধু ধাওয়া করে? চায় চায় আর যায়?

BanglaBook.org

আবার বলি, আচ্ছা বিছিন্নতাবাদ কি একেই বলে? একটা মেয়ে কখনও একাকী কি কোনও দ্বীপ হয় বা হতে পরে?

কী বললে, কী বললে তুমি? আমি তো আছি। নাটক হলে এখানে নায়িকার সংলাপের আগে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত 'মৃদু হাস্য'।

সে-সব থাক। আবার বলো, খেয়ে এসেছ, না খাবে?

আমরা দু'জনেই খাব নন্দিতা, আমার নন্দা। এসো, আলোটা নিবিয়ে দিই।

কোথায় গেল স্ট্রেচলন কোথায়-বা নাইলন? কিছু নেই, কিচ্ছু নেই। তার সমর্থ উরু কদলী কাণ্ডের মতো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে, একটি পুরোনো পরিচিত বিছানায় আরও দু'টি পা আর হাত হঠাৎ যেন অক্টোপাস, আতুর নিশ্বাস।

ওরা ডিনার খাচ্ছে।

তবু নন্দিতার শরীরে-মনে কী যেন! কেউ ছিল, এখন নেই। সেই স্মৃতি। পুরুষ। কেউ তাকে অবধারিত খুলতে চাইছে। পুরুষ।

পুরুষেরা জানে না কেন যে, খোলা মানেই মেলে দিতে পারা নয়। বোঝে না কেন প্রথম দ্বিতীয়ের পরেও তৃতীয় কোনও পুরুষ থাকতে পারে, তার নাম নেই, মুখ নেই, সে অতি-অতীত পূর্বতন কোনও ক্ষণ। সেই তৃতীয়টি এই মুহূর্তে নন্দিতাকে উন্মথিত উন্মোচিত করছিল। অনুপম তাকে বিগলিত গলায় বলল, আমাদের মধ্যে আর কিচ্ছু নেই। দারুণ, তাই না? এই সময়টার জন্যই আমরা কত দিন ধরে বসেছিলাম বলো তো?

নন্দিতা মনে মনে হাসল। সেই হাসাটাই নির্বাক বলা, বসাটা শোয়া হয়ে গেল, তাই বলছ দারুণ, তাই না?

ভীষণ ভালো লাগছে, অন্ধ-বন্ধ শ্বাস ছেড়ে গাঢ় কুয়োর তলা থেকে অনুপমের গলা ভেসে এল। সে বলল, তুমি কিন্তু কিছুই বলছ না।

ভালো লাগাছে আমারও, সারা শরীরে সাড়া দিতে দিতে নন্দিতা আস্তে আর স্তিমিত, বলল, ভালো লাগছে, কিন্তু একটু লাগছেও।

ব্যথা দিচ্ছি? অনুপম বোকা গলায় বলল। কোথায়? উত্তর শুনল, জানি না। মরিয়া হয়ে বলল, শরীরে? তখন তীব্র চিৎকার করে উঠল নন্দিতা। হাত দুটো শূন্যে তুলে বলল, তোমার লাগছে না অনুপম? আমার কিন্তু লাগছে। দেখো, এই দুটোতে।

নন্দিতার রোগা কব্জিতে পুরোনো এক জোড়া শাঁখা অন্ধকারে সাংঘাতিক সাদা হয়ে জ্বলতে থাকল॥

BanglaBook.org

সমরেশ বসু

সহযাত্রী

মেল ট্রেনটার প্রথম শ্রেণীর দরজার পাশেই রিজারভেশনের নামের লিস্ট টাঙানো ছিল। দূর পাল্লার মেল ট্রেন। আজকাল দূর পাল্লার অনেক এক্সপ্রেস্ বা মেল ট্রেনই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, এবং খুব কম স্টপেজ দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছোয়। আমি যে মেল ট্রেনের যাত্রী, এটাকে সাবেকি

বললেই হয়। যদিও মেলটির রাজকীয়তা তার জন্য কিছুমাত্র কমেনি। এ মেল গাড়িটির সমস্তটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত না হলেও একটি বগী শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত — এ-রকম শুদ্ধ বাংলা কোনো যাত্রীই বলে না। বলে এয়ার কনডিশন্ড। আমি যে এয়ার কনডিশন্ড কামরার টিকিট কাটতে পারলাম না, এমন না। কারণ টাকাটা আমাকে খরচ করতে হত না। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আমি সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে একটি সেমিনারে যোগ দিতে যাচ্ছি। আহ্বায়ক উদ্যোক্তারা, সরাসরি ট্রাঙ্কল করেই জানতে চেয়েছিলেন, আমি কী-ভাবে যেতে চাই। তাঁরা আমাকে প্লেনে যাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। আমি তা নাকচ করেছিলাম। কাজের ব্যস্ততার দিক থেকে দেখতে গেলে আমার প্লেনে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু একটা বড় রকমের কাজ শেষ করে আমি একটু আরামের নিশ্বাস ফেলতে চাইছিলাম। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে রিলাক্স করতে চাইছিলাম। সে-জন্যই আমি ট্রেনে যাবার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। সময়টা যেহেতু জানুয়ারি মাস, শীতকাল, সেই হেতু আমি এয়ার কনডিশন্ড কামরায় যাওয়াও বাতিল করে দিয়েছিলাম।

এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় আমি আর এক দিকের বাস্তবতা ভেবে দেখিনি। সে-ভাবনাটা মাথায় এল হাওড়া স্টেশনে এসে। ট্রেনে যাওয়া মানেই অনিবার্য ভাবে অন্য যাত্রীর সঙ্গী হওয়া। দুই আসনেক সিঙ্গল কুপে জায়গা পেলেও অন্তত এক জন যাত্রী আমার সঙ্গী হবেই। সঙ্গী যাত্রী থাকলেই যে সুবিধা ঘটবে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। কেবল একটিই মাত্র আশঙ্কা। সঙ্গী যাত্রীটি কেমন হবে। কেননা তারই ওপর অনেকটা নির্ভর করবে আবার নির্বিঘ্ন ও শান্তিদায়ক ভ্রমণ।

স্টেশনে এসে এ পর্যন্ত ভাবার পরে যখন প্রথম শ্রেণীর দরজার পাশের ঝোলানো নামের লিস্টের দিকে তাকালাম, তখন আমার মনটা বেশ একটু দমে গেল। দেখলাম, আমার নাম রয়েছে একটি চার বার্থের কুপে। আমি ছাড়া আরো তিন জনের নাম রয়েছে সেই কুপে। মিস্টার ও মিসেস আর. গুপ্ত এবং মিস এ. দত্ত। তার মানে একটি পরিবার। সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী ও কোনো আত্মীয়। গুপ্ত ও দত্ত বাঙালি অবাঙালি দুই-ই হতে পারে। বাঙালি অবাঙালি বা তাঁদের বয়স যাই হোক, তা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। দীর্ঘ দু'রাত্রির ভ্রমণ নির্বিঘ্নে আর শান্তিতে কাটলেই হল। এর মধ্যে একটিই আমার কাছে শুভ বলে মনে হল। আমাকে দেওয়া হয়েছে একটি লোয়ার বার্থ। তবে আমার সহযাত্রীদের ওপর অবিচার করা হয়েছে বলেই আমার মনে হল। গুপ্ত দম্পতীকেই লোয়ার বার্থ দু'টি দেওয়া উচিত ছিল। অবিশ্যি সেটা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারব। সবই নির্ভর করছে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্কের ওপর।

মেল ট্রেনটা ছাড়ে রাত্রি দশটার কাছাকাছি সময়ে। তখনো পনরো-কুড়ি মিনিট সময় ছিল। আমার মালপত্রের মধ্যে ছিল একটি মাঝারি আকারের স্যুটকেস, একটি ব্রিফকেস। গাড়ি নিয়েই স্টেশনের পার্কিং-এ ঢুকেছিলাম। তারপর গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে ড্রাইভারকে স্যুটকেস নামিয়ে দিতে বললাম। স্যুটকেস আর ব্রিফকেস সামনের আসনেই রাখা ছিল। ড্রাইভারকে বললাম, তোমাকে আর আসাত হবে না। এ দুটো আমিই হাতে করে নিয়ে যেতে পারব।

ড্রাইভার তবুও আপত্তি করল। আমি আর আপত্তি শুনলাম না। বললাম, আমার একটুও কষ্ট হবে না। আমার কম্পার্টমেন্ট সামনেই। তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও।

আমি এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে ব্রিফকেস নিয়ে আমার কামরায় গিয়ে উঠলাম। অন্যান্য যাত্রীরাও তখন উঠতে ব্যস্ত। মালপত্র নিয়ে কুলিদের ভিড়ও কম নেই। ইংরেজি অক্ষর মিলিয়ে আমার কুপে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, সেটা কামরার একেবারে অন্য প্রান্তে। দরজাটা বন্ধ দেখে, বাঁ-হাতের স্যুটকেস নামিয়ে, হাতল টেনে খোলবার চেষ্টা করলাম। খুলল না।

BanglaBook.org

তার মানে, আমার সহযাত্রীরা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। আমি দরজায় আস্তে করে ঠক্ ঠক্ শব্দ করলাম। প্রায় দশ সেকেন্ড বাদে দরজা খুলল। আমি তখন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে দোহারা চেহারার একটি লোক। বয়স অনুমান চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। পরনে তার লুঙ্গি আর গায়ে বোতাম খোলা পাঞ্জাবি। বাঁ-হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। ইনিই নিশ্চয় মি. আর গুপ্ত হবেন। আমাদের পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হল। লোকটির রঙ ফর্সা। চওড়া মুখ। মোটা নাক। এক জোড়া সরু গোঁফ। চোখ দুটো বড়, আর ঈষৎ লাল। দরজাটা খুলে দিয়ে আমাকে একবার দেখে সরে দাঁড়ালেন। আমি স্যুটকেস তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা থাকলেও কুপের মধ্যে বেশ গরম। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কসমেটিক আর বিশেষ চেনা বিদেশি এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়েছিল। তার সঙ্গে আরো একটি গন্ধ আমার ঘ্রাণে ধরা পড়ছিল, সুরার অনুগ্র গন্ধ। কিন্তু কোন আসনটির দিকে এগিয়ে যাব, স্থির করতে আমার একটু সময় লাগল। লোয়ার বার্থের একটিতে সালোয়ার-কামিজ পরা এক মহিলা লম্বা হয়ে শুয়েছিলেন। মলাট ঢাকা দেওয়া একটা বই পড়ছিলেন তিনি। মহিলা বলতে, তাঁর বয়স আমার চোখে চব্বিশ-পঁচিশের বেশি না। আমি ঢোকার পরে সে একবার চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে আমাকে দেখল। আবার বইটা চোখের ওপর টেনে নিল। আর একটি লোয়ার বার্থেও আর এক মহিলা, যিনি বসেছিলেন কাচ বন্ধ জানলা ঘেঁষে। তাঁর বয়সও তিরিশের কম নিশ্চয়ই। পরনে তাঁর কাঁচুলি-কাট নীল জামা, নীল শাড়ি। তিনি একটি ইংরেজি রঙিন ফিল্ম পত্রিকা নিয়ে আসনের ওপর দু'পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। হয়তো উনিই হবেন মিসেস গুপ্ত। কারণ চকিতের জন্য হলেও তাঁর ঢেউ খেলানো খোলা চুলের সিঁথিতে সরু লাল রেখাটি চোখে পড়ছিল। অন্য যে-জন শুয়ে বই পড়ছিল, আমি তাঁর মুখ ও মাথা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছিলাম না। হয়তো সে মি. গুপ্তের কোনো বোন। আমি যে-রকম এদের ভেবেছিলাম, এঁরা তা নন, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। কারণ দুই মহিলার বয়সই প্রায় সমান। দু'জনেই যুবতী।

মহিলাদের করোকে ভালো করে দেখবার আগে আমি আমার বসবার জায়গাটি ঠিক করে নিতে চাইলাম। কিন্তু সালোয়ার কামিজ পরা যুবতীটির আচরণ আমার মোটেই ভালো লাগল না। সে যে-ভাবে মুখের সামনে থেকে বই সরিয়ে একবার আমাকে দেখেই আবার বই টেনে মুখ আড়াল করল, এটা মোটেই ভদ্রজনোচিত আচরণ হল না। ভদ্রলোক তখনো দাঁড়িয়ে ছিলেন। জানলার কাছে বসা যুবতী ভদ্রলোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ভদ্রলোকও তার দিকে একবার দেখলেন। একটু মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত তুলে বসে থাকবার সঙ্কেত করলেন। তারপরে সালোয়ার কামিজের দিকে তাকিয়ে মোটা স্বরে ডেকে বাংলায় বললেন, অলকা, তুমি উঠে বসো। ভদ্রলোককে বসতে দাও।

আমি তখন হাত থেকে স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখেছি। ব্রিফকেসটা হাতে। সালোয়ার কামিজ পরা যুবতী মুখের সামনে থেকে বইটা আবার সরাল। চোখ দুটো তার বেশ বড়ই এবং কালো। রঙ প্রায় ফরসা। মুখের গড়ন প্রায় গোল। আই লাইনার ছাড়াও কাজলের টান আছে চোখে। নাক তেমন চোখা নয়। পুষ্ঠ ঠোঁটে রঙের প্রলেপ। তার দু'চোখে যেন চাপা বিরক্তি ফুটে উঠল। আমাকে দেখে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। তারপরে মাথা তুলে জানলা ঘেঁষা সরে বসল।

তখনো পর্যন্ত শোবার গদি টেনে নামানো হয়নি। আমি ব্রিফকেসটা আপাতত ওপরের বার্থে রাখলাম। সিটের ওপর স্যুটকেসটা রেখে গায়ে জড়ানো শালের ভিতরে পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করলাম স্যুটকেসের চাবি। মনে মনে সহযাত্রীদের কথা ভাবছি আর মনটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি যে এদের কাছে অনাহূত, তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমি নিরুপায়। এ কুপেতে আমি ইচ্ছো করে আসিনি। আমার টিকিটের ভাগ্য আমাকে এখানে ঢুকিয়েছে। অন্যথায় এদের সহযাত্রী হবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।

BanglaBook.org

স্যুটকেস থেকে বের করলাম রাত্রে পরে শোবার মোটা ছাপা কাপড়ের পাজামা আর পুরো হাতা জামা। গায়ে জড়াবার জন্য একটা মোটা শুজনি, আর ফুঁ দিয়ে ফোলানো বেলুন বালিশটাও বের করলাম। ব্রিফকেসের ওপর বেলুন বালিশটা রেখে ভালোই শোয়া যাবে। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই আছে ব্রিফকেসের মধ্যে। প্ল্যাস্টিকের একটি গ্লাসও আছে। নেই শুধু জলের পাত্র। জানতাম, এ গাড়িতে ডাইনিং কার আছে। তেষ্টা পেলে সেখানে গিয়ে জল খেতে হবে। অথবা হয়তো পয়সা দিলে এক বোতল জল দিয়েও যেতে পারে। সহযাত্রীদের একটি বেশ বড় আকারের নীল রঙের ওপর নানা রকম এনামেলের কারুকার্য করা জলের জাগ রয়েছে। ডান দিকের লোয়ার বার্থে বেশ কয়েকটি ছোট খাট ব্যাগ রয়েছে। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে এসেছেন। ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন একটি ব্যাগ। সিগারেটের শেষাংশটি গাড়ির মেঝেতে ফেলে পায়ের স্যান্ডেল দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ তাঁর হাতের কাছেই রয়েছে ছাইদানি।

আমি স্যুটকেসটা বন্ধ করে, রাত্রে পরার জামা পাজামা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ের শালটাও খুলে রাখলাম। গাড়ি ছাড়তে এখনো কয়েক মিনিট বাকি। শেষ মুহূর্তের যাত্রীরা হুড়মুড় করে উঠছে। যাত্রীদের বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভিড়ও কম ছিল না কামরার মধ্যে। আমি একবার আমার সহযাত্রীদের দিকে তাকালাম। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম, তাদের সকলের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরে গেল। আমি জামা-কাপড় বদলাবার জন্য বাথরুমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম। মিনিট দুয়েক লাগল জামা-কাপড় বদলাতে। আবার ফিরে এলাম কুপে। এবার ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল না। ঢুকতেই চোখে পড়ল, ভদ্রলোক রঙিন পানীয়র গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। আমি হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকতেই একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাসটা ডান দিকের মুখ খোলা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনে মনে হাসলাম। দরজাটা বন্ধ করে কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি স্টিলের র‍্যাকে ঝুলিয়ে রাখলাম। পশমী শালটাও ভাঁজ করে সেখানেই রাখলাম। পাঞ্জাবীর পকেটে রয়েছে আমার পার্স, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। ওপরের বার্থ থেকে ব্রিফকেসটা নামিয়ে খুললাম। পার্সটা ঢুকিয়ে দিলাম ভিতরে। মার্কুইসের সমাজতত্ত্বের ওপর একটা বই বের করে নিলাম। এখন আমি অনেকটা ঝাড়া হাত-পা। গাড়িও ছাড়ল। আমি প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরালাম। ভাবলাম, ভদ্রলোককে বলি, উনি অনায়াসেই আমার সামনে মদ্য পান করতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি তো নেই বটেই, ও-বিষয়ে আমার কোনো নীতিবাগীশতা বা নিষেধও নেই।

আপনি কি এখনই শোবেন? ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

আমি ওঁর দিকে তাকালাম। কথাটা উনি আমাকেই জিজ্ঞেস করেছেন। বললাম, না। অন্তত ঘণ্টা খানেকের মধ্যে নয়।

তাহলে ওকে সিটটা ছেড়ে আসতে বলতাম। ভদ্রলোক একটু হেসে, সালোয়ার কামিজ পরা যুবতীকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে বললেন, আপনাকে নিচের বার্থই দেওয়া হয়েছে।

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, আপনাদের অসুবিধে হলে আমি ওপরের বার্থে গিয়ে শুতে পারি। আমার কোনো আপত্তি নেই।

দেখলে? ভদ্রলোক এ-দিকে ও-দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দুই যুবতীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আমি বলেছিলাম, ভদ্রলোককে দেখেই মনে হচ্ছে, রাত্রে নিচের বার্থ ছেড়ে দিতে উনি আপত্তি করবেন না। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আপনি আসার আগে আপনাকে নিয়ে আমরা অনেক রকম আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম। আপনি বুড়ো মানুষ হলে কিছুই বলার ছিল না। আগে আপনি যখন জামা-কাপড় বদলাতে গেলেন, তখনই আমি এদের বলেছিলাম, আপনি নিচের

BanglaBook.org

বার্থ ছেড়ে দিতে আপত্তি করবেন না। আমার কথাই ঠিক হল। আমরা বলবার আগেই আপনি নিজে থেকেই রাজি হয়ে গেলেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আমি হেসে বললাম, এতে ধন্যবাদ দেবার কী আছে? চার বার্থের কুপেতে আপনি দু'জন মহিলা নিয়ে যাচ্ছেন। নিচের বার্থ দুটো রাত্রে আপনারই বেশি দরকার।

অথচ রিজারভেশনের লোকটি সে-কথা বুঝল না। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, বোধহয় আপনার টিকিটটা আগে কাটা হয়েছিল।

সালোয়ার-কামিজ পরা যুবতী রুষ্ট স্বরে বলল, আমি তো বলেইছিলাম, কিপটেমি না করে চারটে বার্থই রিজার্ভ করে নেওয়া ভালো। তাহলে আর উটকো ঝামেলা পোয়াতে হত না।

কথাগুলো আমার কানে খুব খারাপ ভাবে বাজল। উটকো ঝামেলা বলতে সে নিশ্চয় আমাকেই বোঝাতে চাইছে। ভদ্রালোক গম্ভীর মুখে রীতিমতো চাপা ঝাঁজের স্বরে বললেন, আজেবাজে কথা বলছ কেন? মানি, গোটা কুপটা রিজার্ভ করতে পারলে আমাদের সুবিধা হত। তা তো পাইনি। এখন ভদ্রলোকের সামনে এ-ভাবে কথা বলার মানে কী?

সত্যি অলকা, তুই এখনো কোথায় কী বলতে হয়, তা শিখিসনি। ইংরেজি ফিল্মের রঙিন পত্রিকা হাতে যুবতী হেসে কথাগুলো বললেও, তার বিরক্তি চাপা থাকল না। এবং সে সলজ্জ কুণ্ঠিত হেসে আমার দিকে তাকাল। বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি বললাম, আপনাদের অসুবিধে আর অস্বস্তির ব্যাপারটা আমি বুঝি। আমিও যদি আপনাদের মতো সপরিবারে যেতাম, তাহলে এক জন বাইরের লোক থাকলে একই রকম অস্বস্তি বোধ করতাম। বিশেষ করে মহিলারা থাকলে নানা অসুবিধেয় পড়তে হয়। তবে আপনাদের আমি বলেই রাখছি, দিনের বেলা আপনাদের কোনো রকম অসুবিধে হলে আমাকে বলবেন। আমি সেই সময়টা কুপের বাইরে চলে যাব।

অসুবিধে আর কী হতে পারে? ভদ্রলোক বললেন, জামা-কাপড় বদলাবার জন্য দু'চার মিনিট লাগতে পারে। সে-রকম হলে বাথরুমেই যাবে।

আমি বললাম, না, তার কী দরকার? মোটের ওপর আমাকে নিয়ে আপনারা ভাববেন না।

আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। অলকা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে হাতের বইসুদ্ধ আমার দিকে দু'হাত জোড় করে বাড়িয়ে ধরল। হেসে বলল, অমনটি বলা আমার ঠিক হয়নি। আমি একটু মাথা মোটা আছি।

অলকার কথা শুনে ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্য যুবতীটিও খিল খিল করে হেসে উঠল। অলকার হঠাৎ ও-রকম আচরণ দেখে আর কথা শুনে আমিও না হেসে পারলাম না। তার সরল স্বীকারোক্তিটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে না। ভদ্রলোক হাসতে হাসতেই বললেন, তোমার যে মাথাটা মোটা, সেটা তাহলে বোঝ।

দেখছিস মহুয়া, আমার পেছনে লাগছে? অলকা অন্য যুবতীটির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

মহুয়া নাম্নী যুবতী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আবার ফোড়ন কাটছ কেন? ওর যা মনে হয়েছে, তাই বলেছে।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে, অলকা আর মহুয়া দু'জনের দিকেই নাড়িয়ে বলল, আমি আর কিছু বলছি না বাবা।

আমি ইতিমধ্যে মহুয়াকেও দেখে নিয়েছিলাম। ওকে ফরসাই বলতে হবে। ছিপছিপে, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। টিকলো নাক, টানা চোখ। তার ঠোঁটেও রঙের প্রলেপ, এবং চোখে আই লাইনার ছাড়াও

BanglaBook.org

কাজলের রেখা টানা। অলকার তুলনায় তাকে হয় তো রূপসী বলা যায়। কিন্তু অলকার শরীরের ঔদ্ধত্যের মধ্যে একটা অন্য আকর্ষণ আছে। দু'জনেরই দু'হাতের দশ আঙুল ম্যানিকিওর করা। মহুয়ার মতোই অলকারও ঘাড় অবধি ছাঁটা চুল খোলা। কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যে তুই সম্বোধন শুনে সম্পর্কটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ভদ্রলোক যে মি. গুপ্ত, সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

মি. গুপ্ত ব্যাগের ভিতর থেকে তাঁর পানীয়র গেলাস তুলে চুমুক দিলেন। ও-বিষয়ে যে আমি আপত্তি করব না, তা উনি বুঝে নিয়েছেন। গেলাসে চুমুক দিয়ে তিনি মহুয়ার দিকে তাকালেন। মহুয়াও ওঁর দিকে তাকাল। মহুয়ার ঠোঁটের কোণে হাসি। চোখের তারায় যেন কীসের ইশারা। আমি লক্ষ্য না করার ভান করে বইটা টেনে নিলাম। আর বইটা নিতে গিয়েই চকিতে চোখে পড়ল, অলকা মি. গুপ্তর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে।

স্যার, আপনার কি একটু হুইস্কি চলবে?

মি. গুপ্ত যে আমাকেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছেন, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। আমি মুখ তুলে হেসে বললাম, না। আপনি চালিয়ে যান।

আমি একলা চালাচ্ছি না। মি. গুপ্ত বললেন, আমরা তিন জনেই চালাচ্ছি। তাই বলছিলাম, আপানি আর বাদ থাকেন কেন? সকলে মিলে তাহলে একটু আসর জমানো যেত।

বললাম, আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা খান। আপনাদের আসর জমে উঠুক।

দেখলাম মহুয়া ব্যাগের আড়াল থেকে তার পানীয় গেলাস হাতে তুলে নিল। অলকা বাঁ-দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে আসনের নিচের থেকে ওর গেলাস বের করে আনল। তিন জনেরই দৃষ্টি আমার দিকে। তিন জনেরই মুখে হাসি। মি. গুপ্ত বললেন, আমরা গাড়িতে উঠেই শুরু করেছিলাম। আপনি আসাতে আড়াল করতে হয়েছিল। কী-ভাবে নেবেন না-নেবেন, জানতাম না তো। সকলেই সব কিছু পছন্দ করে না।

রেলের আইন মাফিক অন্য যাত্রী পছন্দ না করলে মদ্যপান বারণ। কিন্তু যারা মদ্যপান করে তারা সে-আইন বিশেষ মানে না। তাছাড়া মহিলাদের মদ্য বা ধূমপান আমার কছে নতুন কিছু না, অস্বাভাবিকও না। আমি হেসে বললাম, আমার অপছন্দের কিছু নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। মহুয়া গেলাসে চুমুক দিল। গেলাসটা রাখল, দুই জানলার মাঝখানে টেবিলের ওপর। একটা ছোট ব্যাগ টেনে বের করল বড় ব্যাগের কাছ থেকে। ব্যাগের চেন খুলে তার ভিতর থেকে বের করল সিগারেটের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার। সিগারেট ধরাল একটা। এই সময়ে দরজায় খট্ খট্ শব্দ হল। সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার দিকে। অলকা আর মহুয়া ওদের গেলাস দুটো রাখল টেবিলের ওপর জলের জাগের পিছনে। মি. গুপ্ত উঠে দরজা খুললেন। দেখা গেল ডাইনিং কারের বেয়ারা। সে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনাদের খাবার এখনই দিচ্ছি।

আরো পরে দিলেও চলবে। মি. গুপ্ত বললেন।

বেয়ারার চোখ পড়ল আমার ওপর। আমি ভাবতে পারিনি এই রাত্রে খাবার পাওয়া যেতে পারে। আমি মোটামুটি খেয়েই বেরিয়েছিলাম। তবে আমি একটু বেশি রাত্রেই খেতে অভ্যস্ত। বেয়ারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, খাবার চাই কি না। আমি বললাম, দু পিস্ বাটার টোস্ট আর এক কাপ কফি পেলেই চলবে।

বেয়ারা ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে যেতেই রেলের টিকিট চেকার তাঁর লিস্ট নিয়ে ঢুকলেন। আমাদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নাসারন্ধ্র স্ফীত করলেন। বললেন, আপনাদের টিকিটগুলো একটু দেখাবেন।

BanglaBook.org

আমি ব্রিফকেস খুলে পার্স বের করলাম। রিজারভেশনের টিকিট-সহ দুটো টিকিট বাড়িয়ে দিলাম। চেকার দেখলেন। লিস্টের সঙ্গে নাম মিলিয়ে পেন্সিল বুলিয়ে টিকিট ফিরিয়ে দিলেন। মি. গুপ্তরে হাতে মহুয়া টিকিট দিল। মি. গুপ্ত দিলেন চেকারকে। চেকার যথারীতি লিস্টের সঙ্গে নাম মিলিয়ে, টিকিটগুলো চেক করে ফিরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। মি. গুপ্ত উঠে দরজার লকটা আটকে দিলেন। তারপর চলল তাঁদের পান। আমি চেষ্টা করলাম বইয়ে মনোনিবেশ করার।

দ্রব্যগুণ বলে একটা ব্যাপার আছে। পানের মাত্রা যতই বাড়তে লাগল, তিন জনের আচরণও বদলাতে লাগল। মহুয়ার সঙ্গে মি. গুপ্তর নিচু স্বরে কথা হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝেই দু'জনের উচ্চ হাসি কুপের ভিতরটাকে চমকে দিচ্ছিল। মহুয়া হাসতে হাসতে মি. গুপ্তর গয়ের ওপর ঢলে পড়ছিল। মি. গুপ্ত মহুয়ার গাল টিপে দিচ্ছিলেন।

আমি চোখ তুলে দেখব না ভেবেও, চকিতের জন্য আমার দৃষ্টি সে-দিকে চলে যাচ্ছিল। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। স্বামী-স্ত্রী হলেও এক জন বাইরের লোকের সামনে শালীনতার প্রশ্নটা থেকেই যায়। আমি তিন জনের মদ্যপানে আপত্তির কোনো কারণ দেখিনি। কিন্তু ও-রকম আশালীন আচরণও প্রত্যাশা করিনি। তা ছাড়া অলকাকে মি. গুপ্তর আর এক পাশে গায়ে গা ঠেকিয়ে হাসতে দেখে আমি মনে মনে অবাক না হয়ে পারিনি। অলকার কথাগুলোও আমার কানে ভালো লাগেনি। সে মি. গুপ্তর গায়ের ওপর পড়ে বলল, দু'জনে কী বলছ আর মজা মারছ। আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন?

মি. গুপ্ত অলকার দিকে ফিরে বললেন, তোকে বাদ দিয়ে কখনো মজা মারতে পারি? আমরা অমিতার গল্প করছিলাম। অমিতা আর সেই প্রফুল্ল দে...।

মি. গুপ্তর কথা শেষ না-হতেই অলকা খিল খিল করে হেসে উঠল। আর মহুয়ার মতোই মি. গুপ্তর গায়ে ঢলে পড়ল। তিন জনেই প্রায় গায়ে জড়াজাড়ি করে কথা বলছে, হাসছে। তিন জনের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারটা আমার কাছে ক্রমেই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তার পরে মহুয়া এক সময়ে আমার দিকে একবার দেখে বলে উঠল, আমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছি। মি. ঘোষের নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে।

ঠিক বলেছ মহুয়া। মি. গুপ্ত বললেন।

আমি কিছু বললাম না। বইয়ের দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসে রইলাম। আমি যে মি. ঘোষ, তা নিশ্চয়ই বাইরে বগীর গায়ে আটকানো লিস্ট থেকেই দেখে নিয়েছিল। মহুয়া সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এবার একটু জায়গা বদল করি। এক জায়গায় বসতে আর ভালো লাগছে না।

আমি চোখ তুলে একবার তার দিকে দেখলাম। সে তখন মি. গুপ্তকে চোখের ইশারায় কিছু বলছিল। ভাবতে পারেনি, আমি মুখ তুলে তার দিকে তাকাতে পারি। মি. গুপ্তর দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। তাড়াতাড়ি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার যেখানে খুশি বসো না। কে বারণ করছে?

এক পলকের জন্য হলেও আমি দেখলাম মহুয়ার আরক্ত চোখে-মুখে মজার হাসি। বুকের আঁচল সরে গিয়েছে অনেকখানি। কোনো রকমে কাঁধে ছুঁয়ে আছে। নাভির নিচে তার শাড়ির বাঁধন। কাচুলির মতো সামান্য জামায় তার শরীরের অধিকাংশই যেন উন্মুক্ত। সে আমার আসনে এসে বসল। এবং জানলার দিকে না গিয়ে অনেকটা আমার কাছাকাছি বসে গেলাসে চুমুক দিল।

এই সময়ে দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। আমিই উঠে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে দেখলাম বেয়ারা দু'হাতে অনেকগুলো খাবার নিয়ে এসেছে। আমি সরে দাঁড়াতে, সে ভিতরে ঢুকে একটু যেন থমকে গেল। মহুয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর জলের জাগ, হুইস্কির বোতল সরিয়ে দিল। বেয়ারা তিন

জনের ঢাকা দেওয়া খাবার টেবিলের ওপর বসিয়ে দিল। বলল, আমি জলের বোতল আর ওই সাহেবের খাবার নিয়ে আসছি। দরজা বন্ধ করবেন না।

সে বেরিয়ে গেল। এবং এক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এল। আমার বাটার টোস্ট আর কফির ট্রে সিটের পাশে খাবার জায়গায় রাখল। চরটে বোতল ছিল ট্রের ওপরেই। তিনটি বোতল তুলে বড় টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে যাবার আগে বলল, আমি কাল সকালে এসে বাসনপত্র সব নিয়ে যাব। রাত্রে আর আসব না।

সে যাবার আগে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল। মহুয়া উঠে গিয়ে ভিতর থেকে লক করে দিল।

মি. গুপ্ত বললেন, খাবারটা খেয়ে নেওয়া যাক।

আমি ডান দিকে ফিরে আমার খাবারের দিকে মনোযোগ দিলাম। মাখন টোস্ট বেশ গরমই ছিল। কফিপট থেকে কফি ঢেলে নিয়ে একটু চিনি মিশিয়ে নিলাম। চা, কফি কোনোটাই আমি দুধ মিশিয়ে খেতে পারি না।

মি: ঘোষ, আমাদের অনেক খাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। মহুয়া বলল, আপনাকে একটু চিকেন আর ফিশফ্রাই দিই।

আমি আপত্তি করে বললাম, না না, আমাকে কিছু দেবেন না। আমি বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছি। এই টোস্ট আর কফিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মহুয়া তখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, একটু ফিশফ্রাই আপনাকে নিতেই হবে।

আমি কিছু বলবার আগেই মহুয়া একটি ফিশফ্রাই আমার প্লেটে দিয়ে দিল, আর ঝুঁকে পড়ল আমার ঘাড়ের ওপর, যেন চলন্ত ট্রেনে টাল সামলাতে না পেরেই ওর শরীরের ধক্কা লাগল আমার শরীরে। আমার কাঁধে হাত রেখে নিজেকে পতন থেকে বাঁচাল। বলল, সরি মি. ঘোষ।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ভদ্রতা করে বললাম।

মহুয়া সরে গেল। অলকা তখন মি. গুপ্তকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। মি. গুপ্ত বললেন, মহুয়া, মি. ঘোষকে কিছু দিয়েছ ?

দিয়েছি। মহুয়া বলল, এবার তুমি খেয়ে নাও। অলকা, আয় তুই আর আমি খেয়ে নিই।

অলকা বলল, দাঁড়া, আগে মালটা শেষ করি।

আমার কানে কথাটা খট্ করে বাজল। অলকার উচ্চারণ আর বলার ভঙ্গিটা এতই খারাপ, কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে সেটা একান্ত অসম্ভব মনে হল। মহুয়া বলে উঠল, আঃ, আজেবাজে কথা বলছিস কেন ?

মহুয়ার এই আপত্তি কতটা খাঁটি, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। নেশাটা তার আর গোলাপী নেই। ঘোরটা আরো বেশি। তবুও অলকার কথাটা হয়তো ওর কানে বেজেছে, নিতান্ত আমার কথা ভেবেই। আমার মনে হল, এরা সবাই ও-ভাবে কথা বলতেই অভ্যস্ত। কিছুক্ষণ আগে মহুয়া মি. গুপ্তর সঙ্গে যে-আচরণ করছিল, সেটাও আদৌ শালীন ছিল না। এখন অলকাও প্রায় সেই রকম আচরণই করছে মি. গুপ্তর সঙ্গে। মহুয়ার এ-দিকে সরে আসাটা কি একেবারে উদ্দেশ্যহীন ? সব মিলিয়ে আমার মনে নানা অবাক জিজ্ঞাসা।

আমি খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে হাত মুখ মুছলাম। সিগারেট ধরিয়ে দরজা খুলে বাইরে গেলাম। দরজাটা টেনে দিলাম। মনটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখনো গোটা রাত্রি, একটি পুরো দিন ও আর এক রাত্রি বাকি। সহযাত্রীরা আমার কাছে ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে। যাত্রীর তালিকায় যে পরিচয়ই লেখা থাকুক, তিন জনের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝে ওঠা কঠিন। যদিও জানি, এ-সব নিয়ে ভেবে আমার কোনো লাভ নেই।

BanglaBook.org

আমি ওপরের বার্থে শুয়েছিলাম। কুপের ভিতরের আলো নেভানো হয়েছিল। জ্বলছিল শুধু একটি নীল আলো। কিন্তু নিচে কী ঘটছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছিল না। মি. গুপ্ত যে ভদ্রলোক নয়, সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। এখন দেখছি, সে একটি নির্লজ্জ পশু। আমি চোখ বুঝে থাকলেও আমার সামনেই ঘটছিল প্রবৃত্তির নগ্ন ব্যাভিচার। তার মধ্যে অলকা মাতাল হয়ে মুখে যা আসছিল, তাই বলছিল। মহুয়া তাকে থামতে পারছিল না।

এক সময়ে আমাকে অবাক অসাড় করে দিয়ে অলকা বলে উঠল, কেন, কী জন্য চুপ করব? আমরা বেশ্যা, তাই? আমরা তো কারোর সঙ্গে জোর করে শুতে যাচ্ছি না।

গুপ্ত বোধহয় অলকার মুখ চাপা দিয়ে বলল, চুপ কর।

মি. ঘোষ কি জেগে আছেন? মহুয়ার গলা শোনা গেল।

এখন জেগে থাকার মতো অন্যায় কিছু নেই। আমি মৃতবৎ পড়ে রইলাম। রাত্রের ট্রেন ছুটে চলেছে বাইরের অন্ধকারে॥

মহাশ্বেতা দেবী
যশবন্তী

হীরনিয়া। উজ্জয়িনী আর মান্দাসোরের মাঝামাঝি মাঝারি একটা স্টেশন। রাত বারোটা হবে। ভোরের আগে ট্রেন নেই। পাশে এসে বসলেন ডাক্তার মালহোত্রা।

সেনসাহেব, একটা সিগারেট খান।

সিগারেট নিলেন সেনসাহেব। আধা অন্ধকারে সুনিপুণ ধূম্রচক্র বানাতে লাগলেন মালহোত্রা। কিছুক্ষণ গেল। মালহোত্রা বললেন, সেনসাহেব, একটা গল্প শুনবেন?

আপনি বলবেন?

নিশ্চয়।

মন্দ কী! হেলান দিয়ে বসলেন সেনসাহেব। হীরনিয়াতে নতুন হাসপাতাল খোলা হল। এক্স-রে'র যন্ত্র বিক্রি করেন সেনসাহেব, ডেনমার্কের একটা ফার্মের প্রতিনিধি হিসাবে। তাই তাঁকে খবর দিয়েছিলেন মালহোত্রা। উজ্জয়িনী থেকে তাঁকে আনিয়ে হাসপাতালে মেসিনটা বিক্রি করিয়ে দিলেন আজ। ষোল হাজার টাকায় বিক্রি হল। কমিশন পাবেন সেনসাহেব, তাছাড়া যশবন্তী দেবীর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর টাকাতেই হাসপাতাল হয়েছে। মেসিনও কেনা হল। মহিলার সঙ্গে সেনসাহেবের সময়টা ভালোই কেটেছে। ভরসা মিলেছে — যশবন্তী দেবী ভবিষ্যতে যেখানে যেখানে টাকা দিয়ে মেসিন কিনে দেবেন, সেখানেই সেনসাহেবের ডাক পড়বে। মালহোত্রা আগাগোড়াই ছিলেন, শুধু যশবন্তী দেবীর সঙ্গে কথা বলবার সময় কোথায় যেন সরে পড়লেন। খামখেয়ালী লোক।

তাঁর মনের কথা বুঝলেন মালহোত্রা। বললেন, ভাবছেন, আমি সরে পড়লাম কেন? সেটাই তো গল্প। সেনসাহেব, আপনি জানেন না যশবন্তীকে আমি যে এড়িয়ে গেলাম, তাতে বেঁচে গেল যশবন্তী। নয়তো লজ্জা পেয়ে যেত। মাথা নিচু হয়ে যেত। আমি ওর লাজ রাখলাম সেনসাহেব, সরে এলাম।

বিশ বছর আগে আমি ওকে শেষবার দেখেছিলাম। জয়পুরের কাছে একটা ছোট গ্রামে। রাত হবে একটা। ঠিক এই রকমই রাত সেনসাহেব, অল্প অল্প বৃষ্টিও ছিল। আমার ঘরের দরজা খুলে ঢুকেছিল

যশবন্তী। আমার পা ধরে কেঁদেছিল। বলেছিল, একটু বিষ দাও ডাক্তারবাবু, আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক। আমি যে আর সহ্য করতে পারি না। আমি পারিনি সেনসাহেব। আমি পালিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে তুমি জড়াচ্ছ কেন যশবন্তী? ও বলেছিল, নয় তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো ডাক্তারসাহেব। বুঝে দেখুন সেনসাহেব, আজ আপনি যশবন্তীকে দেখলেন, ওর বয়স হয়ে গিয়েছে পঁয়তাল্লিশ। তখন ওর বয়স পঁচিশ। রূপ তো আপনি দেখলেন নিজের চোখে। ওর যৌবনের জৌলুসের কথা ভাবুন। আমার বয়স তখন তিরিশ। যশবন্তী কাঁদছে অঝোরে আমার পায়ের কাছে বসে। ও-পাশের ঘরে তার স্বামী মৃত্যুশয্যায়। ছোট ছেলে রয়েছে। হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল যশবন্তীর কাছ থেকে এখনি সরে যেতে না পারি, তাহলে ধরা পড়ে যাব, আমার মনটা দেখে ফেলবে যশবন্তী। জেনে যাবে, আমি আমার মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে বাঁচাতেই শুধু আসিনি, যশবন্তীর সাহচর্যের প্রলোভনও আমার ছিল। রূঢ় হয়ে উঠলাম। বললাম, মাঝ রাতে রঙ্গালাপ করতে এসো না আমার সঙ্গে। সময় নেই আমার।

হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক করে শব্দ হল। বুক শুকিয়ে গেল আমার। গোঁড়া রাজপুত পরিবার। মেয়েরা দিনমানে স্বামীর সঙ্গে দেখা করে না। যশবন্তীর শ্বশুর বাড়িতেও বিধিনিষেধের অন্ত নেই। সেখানে মাঝ রাতে বাড়ির বড়বউয়ের সঙ্গে আমি ডাক্তার হয়ে এমনি ঘনিষ্ঠ করে বসে আছি, ভেবে দেখুন কী পরিণতি হতে পারে।

বাঁচিয়ে দিল যশবন্তী। এক মুহূর্তে কেমন করে বদলে গেল। আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল, আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু, আমি আত্মহত্যা করব।

অপূর্ব অভিনয়। পাথর হয়ে গেছি। দরজা ঠেলে ঢুকলেন নবলের বাবা — যশবন্তীর শ্বশুর। একখানা দরজা জোড়া বিশাল শরীর। চুল, গোঁফ, দাড়ি সব পাকা। ঢুকে যশবন্তীকে ডাকলেন, যশবন্তী। বেটি পাগল হয়ে গিয়েছিস? কী করছিস বল? ডাক্তারবাবু কী করবেন?

যশবন্তী আকুল হয়ে শ্বশুরের পা জড়িয়ে ধরল পালটা। পিতাজী, ডাক্তারবাবু দেবতা। আপনি বলুন আপনার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে।

কান্নায় আকৃষ্ট হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যশবন্তীর ছেলে। তার দিকে চেয়ে চোখে ভাব খেলে গেল যশবন্তীর, দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম সেনসাহেব, ঘৃণা — স্পষ্ট দেখালম, ঘৃণা জ্বলে উঠল তার অশ্রুভেজা চোখে। সমান ঘৃণা আর একটু তাচ্ছিল্য নিয়ে আমার দিকে সে তাকাল। চাউনির একটা ঝিলিক মাত্র। তার পরই ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল যশবন্তী। তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন শ্বশুর। বললেন, পাগলী!

আমার ভয় তখনও কাটেনি। ভাবলাম, ভোর হলে আর এখানে নয়। কিন্তু ভোরবেলা জয়পুর থেকে ডাক্তার সেহগাল এলেন। দু'জন পুরো দিনভর লড়লাম একটা ভারি ডোজের মরফিয়া খাওয়া আধমরা রুগীর সঙ্গে। সন্ধ্যা বরাবর নিশ্চিত হলাম। জানলাম, বেঁচে উঠবে। নবল। রাতেই চলে এলাম। যখন আমরা দু'জন বেরিয়ে আসছি তখন ঢাকঢোল বেজে উঠল বাড়িতে। ঢাকঢোল বাজিয়ে সেজেগুজে চলেছে যশবন্তী রানির মতো। স্বামী বেঁচে গেল জেনে বুকের রক্ত দিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে চলেছে। দেখে ভয় হল আমার। মনে হল, কী সাংঘাতিক মেয়ে এই যশবন্তী, সবটাই তার অভিনয়। নইলে যে স্বামীর সঙ্গ তার কাছে অসহ্য, যার ভয়ে সে নিরন্তর শঙ্কিত, তারই মঙ্গল কামনায় বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দেয় যশবন্তী? চলে এলাম আমি।

জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল মালহোত্রা। সেনসাহেব, একটা কথাও আপনি বুঝবেন না, যদি না আপনাকে ওদের পুরো ইতিহাসটা বলি। নবল আর যশবন্তীর জীবন নিয়ে গল্প হত না সেনসাহেব, যদি না কুঁয়ারসাহেব এসে পড়ত তার মধ্যে।

BanglaBook.org

সেনসাহেব বললেন, শ্যামগড়ের কুঁয়ারসাহেব ? তাঁর নামেই তো হাসপাতালটা উৎসর্গ করেছেন যশবন্তী। তাই না?

হ্যাঁ। নইলে জমবে কেন বলুন? মালহোত্রার কণ্ঠে কিন্তু ব্যঙ্গ নেই, আছে একটু বিষাদমিশ্রিত বিস্ময়। বললেন, সেনসাহেব, যশবন্তী আর নবল পাশাপাশি গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে। যশবন্তীর যখন বয়স আট, আর নবকলের বয়স তেরো, তখনই বিয়ে হল ওদের। ওদের বিয়ের নিয়ম জানেন তো? শৈশবে হয় বিয়ে। তারপর বর-কনে দু'জনের বয়স হলে আবার অনুষ্ঠান উৎসবের পর ঘর করতে আসে মেয়ে। যশবন্তীর বাবা কুলে সম্মানে বড়। শিশোদীয়া ঘরের রক্ত আছে শরীরে। অবিশ্যি পয়সার স্বচ্ছলতা তাঁর নেই। নবলের বাবা বংশমর্যাদায় সমকক্ষ নন বৈবাহিকের। তবু তিনিও মানী ঘরের ছেলে। তাছাড়া খুনজখমও সহজেই হয়। কাজেই নবলের বাবা সহজেই পয়সা কামাতে লাগলেন। জমি হল, মোষ নিলেন, ইঁদারা দিলেন বাপ-মায়ের নামে। তাঁরই এক ছেলে নবল। ছেলেকে জয়পুরের বনেদি স্কুলে রেখে পড়ালেন ঠাকুরসাহেব। বংশমর্যাদার যেটুকু কমতি ছিল, যশবন্তীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে সেটা কায়েম করলেন।

নবল কলেজে পড়তে এল আমাদের সঙ্গে। আঠারো বছর বয়সে, পড়াশুনোয় ভালো। তবে কলেজে পড়াতে তার মা'র আপত্তি ছিল। যথেষ্ট পড়েছে, আর পড়ে কী হবে? এবার দোহরা করে বউ আনবেন তিনি ঘরে। গ্রামে এসে বললেন, নবল, বাপ যা জমিজমা করেছেন তাই দেখবে, বাপের সঙ্গে কাজ করবে। নবলের বাবার মতলব অন্য রকম। ল পড়াবেন নবলকে। তাঁর ডবল রোজগার করবে নবল। চায় তো বিলেতে যাবে। চায় তো দিল্লী, বোম্বাই, যেখানে খুশি প্র্যাক্টিস করবে।

নবলকে বিয়ে নিয়ে ক্ষ্যাপাতাম আমি। আমি কাশ্মীরের ছেলে। শৈশবে বিয়ে আমার দেশে বেনজির নয়। কিন্তু আমি তো বিয়ে করিনি। নবলকে ঠাট্টা-তামাশা করতাম।

দোহারা হবার আগে নবল চলে গেল গাঁয়ে। আমাদের সব নেমতন্ন করে গেল।

ছাত্রজীবন — হৈ-হৈ করে গেলাম আমরা পাঁচ জন। আমাদের নিতে হাতি এল স্টেশনে, নবল এল ঘোড়া চড়ে। জয়পুর থেকে সত্তর মাইল নয় তো, যেন সাতশো মাইল দূরে এসেছি, আর দুশো বছর পিছিয়ে গিয়েছি। ঠাকুরসাহেবের ছেলের দোহরায় জয়পুর থেকে কলেজী ছোকরারা এসেছে খবর পেয়ে ক্ষেতের চাষিরা সকৌতুকে দেখল চেয়ে চেয়ে।

বউ এল পরদিন। সন্ধেবেলা আতশবাজি পুড়িয়ে, বোমা ফুটিয়ে পাল্কিতে বউ চাপিয়ে নিয়ে এল নবল। আমরা বন্ধু-বান্ধবরা মিলে বউয়ের জন্য উপহার এনেছিলাম। জেদ ধরলাম বউয়ের হাতে দেব। নবলের বাবা-মা অন্যদের আপত্তি উপেক্ষা করলেন। উপহার নিয়ে গেলাম তাঁদের সঙ্গে আমরা ক'জন।

ভেতরের ঘর। নিচু দরজা, ঘরটা আঁধার আঁধার। ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিক এনেছেন নবলের বাপ। ছেলে-বউয়ের জন্যে ঘর সাজিয়েছেন নতুন ফার্নিচারে। খাটের ওপর জড়োসড়ো হয়ে এসে বসে ছিল যশবন্তী। মাথার ওপর নিয়ে বুক অবধি ওড়না। লজ্জায় মাথা আরও নিচু। নবলকে বললাম, ভাবীর মুখ না দেখালে হবে না। অতর্কিতে ঘোমটা তুলে নিল নবল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা। একটু সম্ভ্রম জাগায় এমনই চেহারা। ষোল বছর বয়স হলে কী হয়, বেশ মর্যাদা ও গাম্ভীর্য আছে মনে হল। স্মিত ও সলজ্জ হেসে নমস্তে জানাল। উপহার নিল। অল্পস্বল্প ঠাট্টা-তামাশা করে চলে এলাম আমরা।

আমরা ফিরলাম পরদিনই। নবল রয়ে গেল।

তারপর পাশ করে বেরিয়ে গেলাম আমি। নবল মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। যশবন্তীর কথায় তার অর্ধেকটা ভার থাকত। যশবন্তী ঘরে আসবার পর থেকে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছে। খুব ভাগ্যবতী মেয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের যাবার জন্যও লিখত, কিন্তু ছাত্রজীবনের ব্যাপার জানেন তো,

Banglabook.org

একটার পর একটা হুজুগ নিয়ে জড়িয়ে পড়লাম আমরা। সরকারি টাকায় পড়ছিলাম আমি, ডাক্তারি পড়তে চলে এলাম বোম্বাই। পাঁচটা বছর কোথা দিয়ে চলে গেল।

বম্বে থেকে খাণ্ডালায় গিয়েছি। পুনা ফিরতি নেমেছি দু'দিনের জন্য। আমরা তিন জন। আমার বন্ধু ডাক্তার কার্লেকার, মিসেস কার্লেকার আর আমি। কার্লেকারদের বন্ধু পারেখের বোর্ডিং হাউসে উঠেছি। আমার পাশের তিনখানা ঘরের একখানা সুইট। জানলাম, নিয়েছেন কোন এক জন দেবনাগ। পৌঁছিয়েই আমরা চলে এলাম স্টেশনে। স্টেশনের খাবারঘরে খেলাম, বেড়াতে গেলাম লোটাভ্‌লা। ফিরতে ফিরতে বারোটা বাজল। কার্লেকাররা ঘুমাতে চলে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। শরৎকাল। খাণ্ডালায় সেই রাতটা আমার এমন চমৎকার লাগল। বাড়ির পেছনে পাহাড়, পাহাড়ের ঢালু গায়ে বাড়ি। পরিষ্কার বাতাস। সবে বর্ষা শেষ হয়েছে। পাহাড়ের গা দিয়ে ঝরে পড়ছে অসংখ্য ঝরনা। পশ্চিমঘাটের ওটা একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য সেনসাহেব, না দেখলে বুঝবেন না। ঝরনার শব্দ আসছে কানে। আর ফুল, সেনসাহেব, ফুলে ফুলে নিচু হয়ে পড়েছে রাত কি রানী আর কুর্চি ফুলের গাছ। এক আকাশ তারা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কানে এল আমার পাশের বন্ধ দরজার পেছন থেকে মেয়ের গলায় ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। আমি আর সহ্য করতে পারি না, তুমি মেরে ফল আমাকে। বলো আমার কী দোষ! পুরুষের ক্রুদ্ধ ও চাপা কণ্ঠে তর্জ্জন শোনা গেল। তারপর হঠাৎ থেমে গেল কান্না। বুঝলাম, আমার এখানে বলবার বা করবার কিছু নেই। ঘরে চলে এলাম। কিন্তু অদ্ভুত কৌতূহল হল মনে।

সকালে চায়ের টেবিলে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। ঢুকলাম যখন, তখন আলাপ হল আমার পাশের ঘরের অতিথির সঙ্গে। মাথা নিচু করে কাগজ দেখছিলেন ভদ্রলোক। কাঁচা-পাকা মেশানো চুল। মুখ তুললেন যখন, অবাক হয়ে গেলাম। আমার বন্ধু নবল। তখন মনে পড়ল নবল সিংহ দেবনাগ ছিল তার পুরো নাম। যশবন্তীকেও দেখলাম। শুধু আমি নয়, ঘরের সব ক'জনই তাকিয়ে দেখল। সেই গ্রামের মেয়ের সহজ ভাব নেই। পুরো সাদা রেশম আর হীরে পরেছে যশবন্তী — সে আরো অনেক সুন্দর হয়েছে। কিন্তু চোখের নিচে কালি। বিষণ্ণ চাউনি। আমার মনে হল কোনো একটা ভয়ের ছায়া দেখলাম তার চোখে। নবলের চেহারাই-বা কী হয়ে গিয়েছে? চোখের নিচে কালি, কপালে রেখা, চুল কাঁচা-পাকা। যশবন্তীর হাত ধরে ঢুকল একটি বাচ্চা ছেলে, ধবধবে রঙ, লাল চুল — চমৎকার দেখতে। বয়স হবে বছর দুই। নবল কেমন একটা অভদ্র আর রূঢ় ব্যবহার করল যশবন্তীর সঙ্গে। তার নির্দেশে যশবন্তী নমস্কার করল আমাকে। আমাকে দেখে নবল যেন অকূলে কূল পেয়েছে মনে হল। ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। একখানা ছোট খাট। খাটের নিচে দেখলাম কয়েকটা বোতল। নবল স্বীকার করল, হ্যাঁ, সে প্রচুর মদ খাচ্ছে ইদানীং। বলল, মালহোত্রা, আমি কাপুরুষ, নইলে খুন করতাম কুঁয়ারসাহেবকে, তারপর আত্মহত্যা করতাম আমি। তা-ও পারছি না, অথচ যশবন্তীকেও কষ্ট দিচ্ছি, বিশ্বাস করো মালহোত্রা, আমার বেঁচে থাকবার কোনও অধিকার নেই।

দরজায় এসে দাঁড়াল যশবন্তী। বলল, আবার তুমি! আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, ছি ছি, ডাক্তারসাহেব তোমার বন্ধু, তাঁর সামনে...।

হঠাৎ কেঁদে ভেঙে পড়ল যশবন্তী। আর আশ্চর্য কী, নবল রূঢ় কণ্ঠে বলল, যাও, যাও যশবন্তী, আমার সামনে থেকে যাও তুমি।

তার কথা শেষ না-হতেই বেরিয়ে গেল যশবন্তী। আমি বললাম, নবল, তুমি এতখানি নিচে নেমে গিয়েছে? তোমার স্ত্রীকে আমার সামনে অপমান করছ। বেরিয়ে এলাম আমি। পাশের দরজা বন্ধ। নইলে ক্ষমা চাইতাম যশবন্তীর কাছে। কিন্তু নবল আমার পেছন পেছন এল। বলল, মালহোত্রা,

BanglaBook.org

আমার কথাগুলো শোনো, পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি, জ্বলে যাচ্ছি। আর তুমি দেখলে সামাজিক আদব-কায়দা!

তার কণ্ঠে একটা মিনতি ছিল। চোখে ছিল একটা সকরুণ বিষাদ। সেনসাহেব, আপনি কী বলবেন জানি না, আমি ঠেলতে পারলাম না নবলের অনুরোধে। পেছন পেছন গেলাম তার ঘরে। আর কি জানেন, কৌতূহল, তা সে যতই ভালো লাগার মনে করুন না কেন, দুর্দম্য হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। নবল আর আমি চলে গেলাম পাহাড়ের গায়ে। দুটো বড় পাথরের ছায়ায় বসলাম। নবল বলতে লাগল তার কথা। বড় আশ্চর্য কথা সেনসাহেব।

রাজস্থান কতখানি প্রাচীনপন্থী আর অনুন্নত তা তো দেখছেন আপনি। যেমন গরিব দেশ, তেমনি গোঁড়া সমাজ। অনেক কানুন এদের মধ্যে শত শত বছর চলে আসছে, আজও তার পরিবর্তন হয়নি। এই এখন, উনিশশো সাতান্ন সালে যা দেখছেন, বিশ বছর আগে তো এ-রকম ছিল না। কী-রকম ছিল আপনি ঠিক বুঝবেন না সেনসাহেব, বাংলাদেশেরে সঙ্গে তার মিল নেই।

যশবন্তী আর নবল খুব সুখী হয়েছিল। নবল শেষ অবধি জয়পুরে বসেছিল উকিল হয়ে। মাঝে মাঝে গ্রামে আসত। যশবন্তীর সঙ্গে কথা ছিল এবার তাকেও জয়পুরে নিয়ে যাবে।

এমনি সময়, শীতের মুখে নবলদের গ্রামের কাছে তাঁবু ফেললেন শ্যামগড়ের কুঁয়ারসাহেব বনবীর সিং। ওরা বুঝি রাঠোর। নবলের পিতৃবংশ আসলে শ্যামগড়ের প্রজা। তাদের বর্তমান গ্রাম হচ্ছে বিবাহসূত্রে পাওয়া। নবলের বাবা নেমতন্ন করে কুঁয়ারসাহেবকে নিজের বাড়িতে আনলেন। যশবন্তীকে নিয়ে গেলেন প্রণাম করাতে। রাজার প্রতি আনুগত্য ওরা কেমন করে প্রকাশ করে জানেন তো? লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে — অন্নদাতা, প্রাণদাতা বলে আর নমস্কার করে। তাছাড়া বিয়ের আগেই বরকে রাজবাড়িতে ঘুরিয়ে আনবার নিয়ম আছে, বিয়ের পরে বউকে যদি সম্ভব হয়।

খুব সেজেগুজে গেল যশবন্তী। প্রণাম জানাল। মুখ দেখলেন কুঁয়ারসাহেব। বললেন, ঠাকুরসাহেব, আশীর্বাদ আমি পাঠিয়ে দেব।

পরে আর এক দিন এমনি এলেন হঠাৎ। বললেন, তাঁর তাঁবুতে নাকি স্টোভটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, স্টোভ একটা ঠাকুরসাহেবকে দিতে হবে।

দু'দিন যেতে না-যেতেই ঠাকুরসাহেবকে ডেকে পাঠালেন কুঁয়ারসাহেব তাঁর তাঁবুতে। যে-প্রস্তাবটা জানালেন, সেটা আপনার কানে খুব আশ্চর্য লাগবে সেনসাহেব, কিন্তু মানুষকে আপনি দয়া করে বুঝবেন তার দেশ, কাল আর সংস্কার দিয়ে। সোজাসুজি জানিয়েছিলেন যশবন্তীকে খুব ভালো লেগেছে তাঁর। আর তখন পর্যন্ত, কি জানেন, রাজোয়ারা ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া, আর তার ফলে সন্তান হওয়া খুব একটা বে-নজির নয়। এই সব সন্তানকে বলা হয় ক্ষেত্রজ-পুত্র আর তার ফলে মেয়েটির পতিকুল উচ্চ সম্মান পায়। কুঁয়ারসাহেবের প্রস্তাব শুনে বৃদ্ধ ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন, তার আগে তিনি বউকে কেটে ফেলে দেবেন। কুঁয়ারসাহেব দু'বার ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, অজস্র সম্পদ, সম্মান সবই পাবে যশবন্তী। আর এমন নয় যে এ-ঘটনার কথা এই প্রথম শুনছেন ঠাকুরসাহেব।

ঠাকুরসাহেব গম্ভীর হয়ে ফিরলেন বাড়ি। যশবন্তীকে ডেকে পাঠালেন। তার দিকে কেমন নতুন দৃষ্টিতে তাকালেন। কী বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না।

পরদিনই তাঁবু থেকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি পাঠালেন কুঁয়ারসাহেব। অন্যায় হয়ে গিয়েছে তাঁর, যেন ক্ষমা করেন ঠাকুরসাহেব। তাছাড়া চলেও যাচ্ছেন তিনি।

তাঁবু উঠিয়ে যে-দিন চলে গেলেন কুঁয়ারসাহেব, সে-দিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরসাহেবের মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন নবলের মা, যশবন্তীকে নিয়ে। পাঠকজী ভজন গাইবেন জেনে বউকে পাল্কি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, রাত তখন আটটা হবে।

BanglaBook.org

রাত সাড়ে আটটা, ঠাকুবসাহেব উঠোনে বসে মামলার কথাবার্তা বলছেন লোকজনের সঙ্গে, পাল্কিবাহকরা চার জন ছুটে এল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঠাকুরসাহেবের পা ধরে। সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। মোটরগাড়ি তাদের পথ রুখেছিল। ধরে নিয়ে গিয়েছে বহুজীকে। ভয় পেয়ে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন বহুজী।

তার পরের কথা বলে কী হবে বলুন। অন্যত্র কী হত জানি না। এখানে ঠাকুরসাহেবকে দোষ দিল অনেকেই। বলল, অনেকেই রাজোয়ারা-ঘরে যোগাযোগ স্থাপন করাকে গৌরব বলে মানে। তাঁর ক্ষেত্রেই-বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন, সমাজকেই ভয় ছিল ঠাকুরসাহেবের। সমাজের মনোভাব তিনি বুঝলেন। আশ্বত হলেন। নবলের কথা? যুক্তি দিয়ে বুঝলেন, নবলের আর একবার বিয়ে দেওয়া চলবে।

আর যশবন্তী? প্রশ্ন করলেন সেনসাহেব।

যশবন্তীর কথাই ভাবুন। সাত দিন বাদে রাত দশটায় ধূলিধূসর একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে নামল যশবন্তী। খবর পেয়ে তৈরি ছিলেন ঠাকুরসাহেব। তাঁকে দেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে গেল যশবন্তী। কাঁদতেও সে ভুলে গেল। একটা জান্তব কৌতূহলে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল মেয়েরা। বউরা জিজ্ঞাসা করল, রাজাসাহেবের ঘরকন্না কী-রকম? বর্ষীয়সীরা অবাক হয়ে বললেন, এ তো সেই পুরনো কঙ্কণ!

আর লজ্জার কথা কি গৌরবের কথা ভেবে দেখুন। অলঙ্কার এল প্রস্থে প্রস্থে শ্যামগড় থেকে। এত জমি মিলল যে, নিজেই ছোটখাট সর্দার বনে গেল ঠাকুরসাহেব।

কিন্তু যশবন্তীর কথা ভাবুন। তার পরে জানা গেল, সন্তানসম্ভাবিতা যশবন্তী। খবর পেয়ে নবল এল, আনন্দিত হয়ে উপহার নিয়ে। তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঠাকুরসাহেব। নবল আমাকে বলল, আমি যশবন্তীকে খুন করতে পারতাম মালহোত্রা, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। বাবাকে বলেছিলাম কুত্তা, আর বলেছিলাম যশবন্তীকেও খুন করব, সেই কুঁয়ারকেও খুন করব। তুমি জানো না মালহোত্রা, অপমান করে কথা বলেছে বলে বাপ-ছেলের মধ্যে খুনোখুনি হয়ে গিয়েছে, এ নজির বিরল নয় আমাদের দেশে।

যশবন্তীর ঘরে যখন ঢুকলাম, তখন দু'জন মুখোমুখি দাঁড়ালাম। থমকে গেলাম। এ সে-যশবন্তী নয়, একে আমি চিনি না। সর্বাঙ্গে হীরে-মুক্তো। চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি। আহত, ভয়ার্ত, তীব্র। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কী-রকম হয়ে গেলাম মালহোত্রা। যশবন্তী ঢলে পড়ে যেত, আমি ধরে ফেললাম। কাঁদতে লাগল যশবন্তী। বলতে লাগল, খুন করো আমাকে তুমি। মেরে ফেল। আমি কলঙ্কিত।

কলঙ্কিত যশবন্তী? মালহোত্রা, কী রূপসী যে লাগল যশবন্তীকে! মনে হল, এমনি করে যদি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে যশবন্তী তাহলে তার সব কলঙ্ক ক্ষমা করতে পারব আমি। বলো মালহোত্রা, আমি কী কাপুরুষ নই? কী অন্ধ সত্তা বলো আমার, আমি নিজেই নিজের কাছে হেরে গেলাম মালহোত্রা।

সেনসাহেব, তারপর নবল যশবন্তীকে নিয়ে চলে এল জয়পুর। স্বামী যে তাকে ক্ষমা করবে তা ভাবেনি যশবন্তী। তাই সেবায়, যত্নে, প্রেমে সমস্ত সময় নবলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিল যশবন্তী। এক-এক সময় মনে হত, সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের রাত বুঝি আসেনি তাঁর জীবনে। সেই তীব্র আলো জ্বলছে সদ্য চুনকাম করা বাংলোর ঘরে। মসলিনের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে শ্লথদেহে, রক্তচক্ষু কুঁয়ারসাহেব। কিন্তু বড় নিষ্ঠুর এই বাস্তব জীবন, সেই রাতটাকে কি ইচ্ছে করলেই অস্বীকার করতে পারে যশবন্তী? কখনও কখনও মাঝ রাতে দেখেছে নবল জেগে উঠে চেয়ে আছে তার দিকে।

BanglaBook.org

অদ্ভুত বিজাতীয় একটা বিদ্বেষ তার চোখে। দেখে চাবুক খেয়েছে মনে মনে যশবন্তী। তাদের সযত্নে গড়ে তোলা সুখশান্তির দিন ক'টা ভেঙেচুরে গিয়েছে এক নিমেষে।

এই দ্বন্দ্ব আর বিদ্বেষের মধ্যেই জন্মাল যশবন্তীর ছেলে। ছেলে মানেই বংশধর। উৎসব পড়ে গেল ঠাকুরসাহেবের বাড়িতে। যশবন্তী খুব কষ্ট পেয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু তাকে দেখতে এল না নবল। যখন জ্ঞান হল, যশবন্তী প্রথমেই খুঁজেছিল নবলকে। কিন্তু কোথায়? জয়পুরের বাড়ি বন্ধ। আর সে-দিনই খবর নিয়ে এল শ্যামগড়ের এক জন কর্মচারী, ছেলের জন্য এক লাখ টাকা দিচ্ছেন কুঁয়ারসাহেব। বৃত্তি ঠিক করে দিলেন মাসে পাঁচশো টাকা।

নবল ফিরল তিন মাস বাদে। বদলে গিয়েছে একেবারে। মদ খাচ্ছে, অশ্লীল রসিকতা করছে, রূঢ় আর রুক্ষ কথাবার্তা। অথচ যত ঘৃণা তার যশবন্তীর ওপর। ছেলেটার ওপর আক্রোশ হলেও বুঝতাম।

সব কথা আমাকে বলল নবল। বলল, সে যশবন্তীকে ছাড়তে পারছে না, নিজেও সজ্ঞান হতে পারছে না। তাই তার আচার-আচরণ একান্ত কাপুরুষের মতো। আর রোজগার? ছেলের জন্য যে-টাকা আসে, তা সে ছোঁয় না। তার বাপের যথেষ্ট টাকা আছে।

শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। লজ্জিত হলাম। নবল বলল, দেখো, আমি এত অত্যাচার করি, ও একটা কথা বলে না। ওর যদি দোষ দেখতাম, তাহলে আমার ব্যবহারের যুক্তি থাকত। ও শুধু বলে, তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেল। আমি একটা কাপুরুষ মালহোত্রা।

আমি বললাম, আমি যদি তুমি হতাম নবল, তাহলে যশবন্তীর থেকে দূরে থাকতাম। কেননা একটা কিছু বে-পরোয়া করে ফেলবার সময় ছিল তখন। এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আমার তো তাই মনে হয়। শুনে উঠে এসেছিল নবল।

সেই রাতেই আমরা চলে আসব সব ঠিকঠাক। হঠাৎ যশবন্তীর চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। বিষ খেয়েছে নবল। আমি একমাত্র ডাক্তার আশেপাশে ক'মাইলের মধ্যে।

আমি আর যশবন্তী প্রাণপণ যুঝলাম সেই রাতে। যশবন্তীকে আমি বললাম, শক্ত হতে হবে মিসেস দেবনাগ, এই সময় আপনাকে তো ভেঙে পড়লে চলবে না।

কেন? ওঁর কি আপনি খারাপ অবস্থা দেখছেন?

সিরিয়াস! বলে আমার কথা হারিয়ে গেল। যশবন্তীর চোখে পলকে একটা মরিয়া আশা ছেয়ে গেল। দেখে আমার করুণা হল। তার পরেই আশঙ্কা হল। নবলের মৃত্যুতে যশবন্তী যদি মুক্তি পায় হাজার বিড়ম্বনা থেকে, তাহলে আমি খুশি হব? ছি ছি, আমি না ডাক্তার? বললাম, এখনও কিছু বলব না। দেখি।

ভোরে তাকে আনলাম বম্বে। বিপদটা কাটল সেই রাতেই। তবু নার্সিংহোমে রাখলাম সাত দিন।

সাত দিন ধরে যশবন্তীকে নিয়ে বম্বের দ্রষ্টব্য সব জায়গা দেখালাম ঘুরে ঘুরে। খুব ভালো লাগছে ওর বুঝলাম। নবলও বলত, মালহোত্রার সঙ্গে যাও না যশবন্তী, ঘুরে এসো। চৌপাটিতে ঘুরতে ঘুরতে চামেলীর বেণী কিনে দিয়েছিলাম মনে পড়ছে। মাথা নিচু করে স্মিত হেসে চুলে বেণী পরছে যশবন্তী, দেখতে আমার খুব ভালো লেগেছিল সেনসাহেব।

যে-যশবন্তীকে হাসতে দেখলে আমি অনাত্মীয় আমারই ভালো লাগে, তার এতটুকু হাসিমুখ সহ্য করতে পারল না নবল। একটু ভালো হয়ে উঠতেই গালাগালি শুরু করল। আবার যশবন্তী গুটিয়ে নিল নিজেকে। নবলকে দেখেশুনে আমার মনে একটা ভয় হল। হয়তো ওর ম্যানিয়া দাঁড়িয়ে যাবে। সমস্ত ব্যাপারটাই তো বিশ্রী। যশবন্তী পরে সেই রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল সেনসাহেব। স্পষ্ট বলল, নবল যে ছেলেটাকে ভালোবাসে তার কারণ হচ্ছে, ও বোঝে যশবন্তী ঘৃণা করে ছেলেটাকে। তাই ছেলেটাকে ভালোবেসে ও যশবন্তীর ওপরেই শোধ তোলে। এ যদি দু'দিনের ব্যাপার হত তো

BanglaBook.org

সইতে পারত যশবন্তী। কিন্তু সারা জীবন ধরে এই জোড়াতালি টেনে চলা কি সম্ভব? আর এখন শুধু নবলকে ভরসা করে দেশে ফিরতে ভয় পায় যশবন্তী। কী করে বসবে তা ঠিক কী আমি যদি সঙ্গে যাই, তবে ভরসা পাবে যশবন্তী।

আমি বললাম, আমার সঙ্গে ক'দিনের চেনা তার? আমি তাকে ভরসা দেব? যশবন্তী বলল, সমস্ত জীবনটার ইজ্জত তার চলে গিয়েছে। এখন সে খড়কুটো ধরেই বাঁচতে চায়। তাছাড়া নবল তো আমার বন্ধু, তাকেই-বা আমি ছাড়ব কী করে? যদি সে আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে? আড়চোখে তাকালাম। সাদা রেশমের শাড়ির ফাঁকে চেলি অনাবৃত করেছে গৌর দেহের খানিকটা। গলায়, কানে, হাতে হীরে জ্বলছে। কী আকর্ষণ! চোখে জল নেই। বললাম, আমি রাজি আছি। আমার হাতটা একটু চেপে ধরল যশবন্তী। উষ্ণ, স্বেতাক্ত হাত। তারপর চলে গেল ত্বরিতে। আমার মনে হল, যদি কুঁয়ারসাহেবের স্মৃতি এতই ঘৃণিত যশবন্তীর কাছে, তবে তাঁর উপহারের গহনাগুলোই-বা সে কেন পরে থাকে?

গাঁয়ে পৌঁছিয়ে কী হয়েছিল, তা আপনাকে বলেছি সেনসাহেব। নবলের বাবা-মা ছেলের মনঃকষ্ট বুঝেছিলেন। তাঁদের চোখে যশবন্তীর কোনও দোষ ছিল না। তাছাড়া আমিও ভেবেছিলাম, যদি নবলকে কোনও মতে সুস্থ করে তুলতে পারি। মানসিক বিকারটা কাটাতে পারি, সুখী করতে পারি পরিবারটাকে। সেনসাহেব, আপনি কি বলবেন সে আমার অহমিকা? আমি বলি, মূর্খতা, আর আমি তারই দাম দিচ্ছি বিশ বছর ধরে। বেশ ভালো ছিল নবল, আমার কাছে বলেছিল যে, সে ভালো করেই বুঝেছে নিজেকে এমনি করে নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। এবার সে সুখী করবে যশবন্তীকে।

কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর নেশা। আত্মপীড়ন, আত্মনিগ্রহ, করুণা আকর্ষণ আর ভালোবাসা প্রত্যাখান, এর একটা বেড়াপাক আছে। তার মধ্যে যে পড়েছে, সে তো বেরিয়ে আসবার পথ ভুলে গিয়েছে। একেই বলি আমি, ভূতে পাওয়া। নিজের ভূত নিজেরই ঘাড়ে চেপে বসল নবলের। সে মরফিয়া খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া খাবে না, তাই সে খেয়ে বসল। তার পরে সেই রাতের কথা তো আপনাকে বলেছি। আমি তার যশবন্তী। পাশের ঘরে মরছে নবল। যত মরিয়া হয়ে উঠছে যশবন্তী তত সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। দশ জন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এত সুন্দরী হয়ে ওঠে মেয়েরা?

সেনসাহেব বললেন, তার পরে এই আপনার সঙ্গে দেখা?

দেখা আর হল কোথায় সেনসাহেব। আসল কথাই তো বলিনি। সে-দিন চলে এলাম বটে, কিন্তু যশবন্তীকে ভুলতে পারলাম না। জয়পুরে এসে অপেক্ষা করলাম, যদি কোনও খবর দেয় যশবন্তী। নবলের জন্যও তো আমার কথা মনে পড়তে পারে তার। কোনও খবরই মিলল না।

এক বছর কেটেছে। আমি বম্বের সেই নার্সিংহোমেই আছি। হঠাৎ সকালে হৈ-হৈ করে ঘরে ঢুকল নবল। দেখে যা আশ্চর্য হলাম, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। নবলের স্বাস্থ্য ফিরে গিয়েছে, সুন্দর হয়েছে, ঝলমল করছে চেহারা। বলল, মালহোত্রা, তুমি আমার জন্য যা করেছ, তার প্রতিদান তো দিতে পারব না। আজ তোমাকে ধরে নিয়ে যাব। যশবন্তী গাড়িতে বসে আছে।

আবার যশবন্তী? বললাম, নবল, এখন নয়, সন্ধ্যার আগে নয়, অপারেশন আছে একটা। সন্ধ্যার পর একাই এল নবল। বলল, গল্পটার শেষটা তোমাকে শুনতেই হবে মালহোত্রা।

শেষটা কি জানেন সেনসাহেব? আমি চলে আসবার পরই নবলকে যশবন্তী বলেছিল, তাকে ত্যাগ করতে। বলেছিল, আর একবার বিয়ে করুক নবল, তাকে ছেড়ে দিক।

কুঁয়ারসাহেবের খবর এসেছে বুঝি? রূঢ় ভাষণে বলেছিল নবল। যশবন্তী বলেছিল, শ্বশুরের ইঁদারায় গভীর জল আছে, তার আবার ভাবনা কী? মরে যেতে রাজি আছে, যদি নবল সুখী হয়।

তখন একটা বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নবল। কাউকে না জানিয়ে গিয়েছিল শ্যামগড়।

BanglaBook.org

দরবারী নিয়ম মানতে গেলে কুঁয়ারের সঙ্গে দেখা হত না তার। তাই সন্ধেবেলা ঢুকেছিল চট করে কাচঘরে। অতর্কিতে তাকে ঢুকতে দেখে চমকে গিয়েছিলেন কুঁয়ারসাহেব। তিনি রুখে উঠবার আগে নবল বলেছিল, সে যশবন্তীর স্বামী। আর যা যা বলেছিল, সে-কথাগুলোর মানে নেই। বোধহয় বলেছিল, কুঁয়ারসাহেবকে সে খুন করতে চায়। খুব নাটকীয় কথাবার্তা সন্দেহ নেই।

গোলমাল শুনে একে একে ছুটে এসেছিল ম্যানেজার, চাকরবাকর, আমিন, করণ। সুন্দর চেহারার সাহেব এক জন, সে বুঝি কুঁয়ারের সেক্রেটারী, সে-ও এসেছিল। তাদের দেখে হতবুদ্ধি কুঁয়ার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, উইলি, এই লোকটা আমাকে খুন করতে চায়।

মদ্যপানে ঢুলু ঢুলু চোখ, কোমর থেকে সিল্কের পায়জামা খসে পড়বে ভয়ে কর্ড দিয়ে বাঁধা, ফর্সা ও নির্বুদ্ধি মুখখানায় ভয়ের ছাপ, চোখে জল, কুঁয়ারসাহেবকে দেখে হঠাৎ হা-হা- করে হেসে ফেলেছিল নবল। বলেছিল, আমার হাতে কি অস্ত্র আছে?

নবলের কথা শুনে কুঁয়ারসাহেব ছোট, ঘোলাটে চোখ দুটো পিট পিট করে মনে করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনে করতে পারলেন না। বললেন, যশবন্তী? কোন যশবন্তী? আমি শুধু কিশোরীকে জানি। কিশোরী কোথায়?

ম্যানেজার নবলকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন, কুঁয়ারসাহেবের বিমাতার একটি ছেলে হয়েছে। ওয়ারিসান বেড়ে গেল বলে কুঁয়ারের মন খারাপ। তাছাড়া ইদানীং আফিং খান উনি, মাথা সব সময় ঠিক কাজ করে না। অপারেশন করাতে গিয়ে মারা গিয়েছে একটি মেয়ে, তার ভাইরা দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছে কুঁয়ারের কাছে। বড় বিপদে আছেন বনবীর সিং। আর একটা কথা কি, কুঁয়ারের অত মনে থাকে না, ভুলে গেছেন, ম্যানেজারের অবিশ্যি মনে আছে, যশবন্তী দেবীকে টাকা দেওয়া হয়েছিল, জমিও। কেন, নবল কি আরও কিছু চায়? তাহলে লিখে আর্জি দিতে হবে। বিবেচনা করবে এস্টেট।

নবল মাথা নাড়ল। বলল, কুঁয়ারের মনে নেই? একদম নয়?

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়লেন ম্যানেজার। বললেন, স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল, যে-কারণে কোর্ট থেকে তাঁর গদির দাবি নাকচ করে দিতে পারে।

তখন একটা অদ্ভুত ধাক্কা খেল নবল। বলল, মালহোত্রা, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝলাম কী মূর্খতা করেছি আমি। ভেবে দেখো, মাঝখানে যে রয়েছে বলে আমার আর যশবন্তীর মধ্যে আড়াল ছিল, সে যশবন্তীকে মনেই রাখেনি। তার কোনও অস্তিত্বই নেই কুঁয়ারের কাছে। সেই প্রথম মমতা হল আমার যশবন্তীর জন্য। স্নেহ হল। বলো মালহোত্রা, এখন তুমি আমাকে কী বলবে?

যশবন্তীর কাছে ফিরছি যখন, চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে আমার। সেই যেন আমি প্রথম চিনলাম যশবন্তীকে। তার দুঃখে নিঃসঙ্কোচে কাঁদলাম আমি, আর মনে হল আমার দু'হাতে ধরি যশবন্তীকে, সব লজ্জা ঢেকে দিই তার। বলো মালহোত্রা, কী যন্ত্রণা পেয়েছে যশবন্তী, ক'টা বছর ধরে? কুঁয়ারসাহেব অত্যাচার করেছে, তার কলঙ্ককে জয়ধ্বনি দিয়ে পুজো করেছে সমাজ, বলেছে ক্ষেত্রজ-পুত্রের মায়ের সৌভাগ্যের শেষ নেই। আমি আমি? আমি করেছি অবিচার।

সেই সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ফিরলাম যখন, বুঝি-বা আমার চোখেমুখে এই সব কথা লেখা ছিল। খাটে হেলান দিয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যশবন্তী। ঘরে আলো ছিল না। আমি আলো জ্বাললাম। ডাকলাম যশবন্তীকে, আর আমার বুকের মধ্যে এই প্রথম ভেঙে পড়ল যশবন্তী।

সেনসাহেব, আমার মনে হল বড় মূর্খ আমি। দেখুন, ওদের ভাঙা আপনি থেকেই জোড়া লেগে গেল। আমার ভূমিকাটা কি মূর্খের মতো নয়? আরও কি জানেন, তবু আমি গেলাম নবলের সঙ্গে।

গিয়ে দেখলাম, আমি হলাম তৃতীয় ব্যক্তি। যশবন্তী সংসারে তার নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছে। আমার উপস্থিতি বা অস্তিত্ব সবগুলোই অবান্তর তার কাছে। তাই আর যাইনি। বলুন আপনি, একেবারে ফালতু হয়ে যেতে ভালো লাগে?

সেনসাহেব বললেন, যশবন্তীর স্বামী এখনও জীবিত?

নিশ্চয়। স্বামী বেশ নামকরা উকিল। ছেলে পড়ছে সিন্ধিয়া স্কুলে। বড় ছেলে বিলেতে।

হাসপাতাল?

কুঁয়োরসাহেবের দেওয়া টাকায়। কী দরকার ওদের সে-টাকায় বলুন? বহু টাকা রোজগার করে নবল। কিন্তু আমার কথাটা ভাবুন। সেই থেকে কী হল, না বিয়ে করলাম না, কাজকর্মের উন্নতি করেছি। ইন্দোরে ডাক্তারি করি, আপনাদের মতো এক্স-রে সেল্‌স ইঞ্জিনিয়ারদের মারফত কিছু টাকাকড়ি পাই, কী-রকম যেন হয়ে গেলাম। আমি একটা মূর্খ, তাই না সেনসাহেব?

বলে হাসতে লাগলেন মালহোত্রা। হাসতে লাগলেন ব্যঙ্গের সুরে। তারপর বিষম খেয়ে কাশতে কাশতে থামলেন।

ট্রেন আসছে। লাল আর সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন জ্বলছে মাথার ওপরে। তার আলো এসে পড়েছে মালহোত্রার মুখে। করুণ একটা হতাশার ছাপ আঁকা একদা সুদর্শন একখানা মুখ। দেখে সেনসাহেবের মনে হল, শেষ হাসিটা যেন কান্নার সুর ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

দু'জনে পাশাপাশি চলতে লাগলেন॥

অরবিন্দ গুহ

মিথ্যে কথা

আউটডোরে দারুণ ভিড়। যে-দিন ডক্টর আর. এস. দাশগুপ্তের আউটডোর থাকে সে-দিন এমনি দারুণ ভিড়ই হয়।

একটা বেঞ্চিতে স্ত্রীকে বসিয়ে রেখে মোহন টিকিট কাটল। তারপর স্ত্রীকে বলল, লতিকা, এখানেই চুপচাপ বসে থাকো, অন্য কোথাও যেও না। ডক্টর দাশগুপ্ত এখনও আসেননি। কখন আসবেন কে জানে।

আউটডোরের বাইরে এসে মোহন একটা সিগারেট ধরাল।

আচ্ছা, ডক্টর দাশগুপ্তই যে লতিকাকে দেখবেন এমন কোনও নিশ্চয়তা তো নেই। হয়তো তাঁর কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট লতিকাকে দেখে বিদায় করে দেবে। ডক্টর দাশগুপ্তের চেম্বারে গেলে অবশ্যই তিনি নিজে দেখতেন, কিন্তু সেখানে তাঁর ফি যে পাঁচশো টাকা। মোহনের অত টাকার জোর কোথায়।

কিন্তু চেনাশোনা কাউকে যদি পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যি কাজ হাসিল হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ ঘাড়ে হাত পড়তেই মোহন চমকে উঠল, আরে বুবি, তুমি?

হ্যাঁ, আমিই বটে। তা বরিশালের স্কুল-কলেজ ছাড়বার পর তোমার সঙ্গে তো আর দেখা হয়নি।

মোহন বলল, তা হয়নি। স্কুল-কলেজের অনেক বন্ধুর সঙ্গেই দেখা হয়নি। তা তুমি এখানে?

আমি এখানেই চাকরি করি।

BanglaBook.org

মোহন খুশি হয়ে বলল, তুমি এখানেই চাকরি করো? তাহলে ভাই আমার একটা উপকার করে দাও।

কী উপকার?

মোহন বলল, আমার ওয়াইফ লতিকা মিত্তিরকে দেখাতে এনেছি ডক্টর আর এস দাশগুপ্তকে। তা তিনি যে দেখবেন এমন তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। হয়তো তাঁর কোনও অ্যাসিস্ট্যান্টই দেখে বিদায় করে দেবেন। তুমি একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারবে যাতে ডক্টর দাশগুপ্ত।

তা হয়তো পারব। দেখি। তুমি সিগারেটটা শেষ করে আউটডোরে এসো। সিগারেটে তাড়াতাড়ি শেষটান দিয়ে মোহন ভিতরে ঢুকল। একটু বাদেই রবি এসে মোহনকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বোসো।

রবি বসলেন মোহনবাবুর মুখোমুখি। বললেন, তারপর খবর কী বলো। কেমন আছ?

মোহন হতাশ গলায় বলল, এই তো দেখছ ভাই, ওয়াইফকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে এসেছি। কেমন আর আছি, কোনও রকমে দিন কাটাচ্ছি।

তারপর ফিস ফিস করে বলল, ডক্টর দাশগুপ্ত কি এসেছেন?

রবি গলা নামিয়ে বললেন, এসেছেন।

কোথায় আছেন তিনি?

এখানে।

এখানে কোথায়?

গলা আরও নামিয়ে বললেন, তোমার সামনে, তোমার মুখোমুখি।

চমকে উঠল মোহন। বলল, আরে, তাই তো, তাই তো। তা আমি কেমন করে বুঝব যে আমাদের রবি বড় ডাক্তার হয়ে ডক্টর আর এস দাশগুপ্ত হয়েছেন।

রবি আপত্তি করে বললেন, আমি মোটেও বড় ডাক্তার হইনি। কয়েক জন চেলাচামুণ্ডার ঢাকের জোরে বড় ডাক্তার সেজে বসে আছি। যাকগে। তোমার ওয়াইফকে আমি নিজেই দেখব। তবে সকলের শেষে দেখব। আজকের আউটডোরে তোমার ওয়াইফই হবেন আমার লাস্ট পেশেন্ট। আচ্ছা, তুমি থাকো কোথায়?

আমি থাকি কালীঘাটে।

কালীঘাটে কোথায়?

রবি অবাক হয়ে বললেন, আরে, ওই রাস্তা দিয়ে তো আমি রোজ বাড়ি থেকে এখানে কিংবা চেম্বারে আসি। আবার ওই রাস্তা দিয়েই তো বাড়ি ফিরি। কী আশ্চর্য, এক দিনও তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। যাকগে। তুমি এখন বাইরে গিয়ে বসো। কাজ শেষ করি, তারপর গল্পগুজব করা যাবে।

হ্যাঁ, সেই ভালো।

হাসি মুখে বাইরে চলে এল মোহন। এমন ঘটনা সে যত্যি সত্যি ঘটতে পারে তা কি কল্পনা করা যায়?

লতিকার পাশে এসে বসল মোহন। সব ঘটনা সবিস্তারে শুনল লতিকা। শুনে চোখ বড় বড় করে লতিকা বলল, উঃ, কপালে থাকলে কী না হয়। বড় ডাক্তারবাবু যখন তোমার বন্ধু।

লতিকাকে থামিয়ে মোহন বলল, আরে, শুধু বন্ধু নয়, বাল্যকালের বন্ধু। বড় ডাক্তার হয়েছে বলে বিন্দুমাত্র দেমাক নেই, নিজেই আমার সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলল। কিন্তু একটা খারাপ খবর আছে।

কী?

BanglaBook.org

তোমাকে উনি নিজেই দেখবেন। কিন্তু সকলের শেষে দেখবেন। আজকের আউটডোরে তুমিই হবে ওর লাস্ট পেশেন্ট।

অ্যাঁ? তাহলে আর বাল্যবন্ধুর ওয়াইফ হয়ে আমার কী লাভ হল?

মোহন মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, হয়তো তোমাকে আর সকলের চেয়ে ভালো করে দেখবেন, আর সকলের চেয়ে বেশি করে দেখবেন।

লতিকা ভুরু কুঁচকে বলল, কে জানে। এখন তীর্থের কাকের মতো এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে তা ভগবান কিংবা তোমার বড় ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না।

ঘড়ির দিকে তাকানো অর্থহীন। একে একে রোগীরা বিদায় নিচ্ছে, হলঘর অর্ধেকের বেশি ফাঁকা হয়ে গেল, তবু ডাক আসে না। ডক্টর আর. এস. দাশগুপ্ত ভুলে গেলেন না তো? মোহন কি আরেক বার বড় ডাক্তারবাবুকে মনে করিয়ে দিয়ে আসবে যে...।

ঠিক এই সময়ে বড় ডাক্তারবাবুর চাপরাশির গলা শোনা গেল, লতিকা মিত্র, লতিকা মিত্র, চলে আসুন, চলে আসুন।

লতিকাকে নিয়ে মোহন ঢুকে পড়ল বড় ডাক্তারবাবুর ঘরে। লতিকা হাতজোড় করে বড় ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করার আগেই বড় ডাক্তারবাবু হাতজোড় করে লতিকাকে নমস্কার করে ফেলেছেন।

বড় ডাক্তাবাবু বললেন, বসো। বসুন।

তারপর বড় ডাক্তারবাবু বললেন, মোহন, তুমি চুপচাপ বসে থাকো, একটিও কথা বলবে না। রোগীর সঙ্গে যারা আসেন তারা বড্ড বেশি বাজে বকেন।

লতিকার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে বড় ডাক্তারবাবু বললেন, বলুন, আপনার কী অসুবিধে। সব খুলে বলুন, কিছু লুকোবেন না। মনে করবেন, এখন আপনার কাছে আর কেই নেই, কিছু নেই, শুধু আপনি আর ডাক্তারবাবু আছেন, সব কথা নির্ভাবনায় খুলে বলুন।

একটু কেশে গলা সাফ করে নিয়ে লতিকা সব কথা খুলে বলতে লাগল। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু দু-একটি প্রশ্ন করলেন, প্রশ্নের উত্তর দিতে লতিকা ভুল করল না। সব শুনে ডাক্তারবাবু ডাক দিলেন, প্রণতি।

নার্সের নাম প্রণতি। ডাক্তারবাবু বললেন, প্রণতি, তুমি এঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।

লতিকাকে-নিয়ে ভেতরে চলে গেল প্রণতি। খানিক বাদে আবার ভেতরে এসে ডাক্তারবাবুকে বলল, স্যার, শুইয়ে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু বললেন, ঠিক আছে, চলো।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে ডাক্তারবাবু আর লতিকা বেরিয়ে এলেন। লতিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু কী যেন ভাবলেন। তারপর মাথা নিচু করে মোহনকে বললেন, মাত্র একটা ওষুধ লিখে দিলাম। আন্দাজে আর ওষুধ দেব না। কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। বাইরে থেকে করিয়ে আনাই ভালো। চলো।

প্রেসক্রিপশনটা বুক পকেটে রাখতে রাখতে মোহন বলল, কোথায় যাব?

ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, সে কী? বাড়ি যাবে না?

মোহন বলল, তা তো যাবই, কিন্তু...।

মোহনের হাত ধরে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, অত কিন্তু কিন্তু কোরো না। আমি তো ও-দিকেই যাব, পথে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাব। ওঠো।

বাইরে এসে ডাক্তার দাশগুপ্ত গাড়ির দরজা খুলে বললেন, মোহন, তুমি আমার পাশে বসো। আর আপনি পিছনে বসুন।

BanglaBook.org

চমৎকার সুন্দর গাড়ি। মোহন আশ্চর্য হয়ে বলল, এই গাড়ি তোমার?

ডাক্তার দাশগুপ্ত হেসে বললেন, হ্যাঁ। গাড়ি হচ্ছে ডাক্তারবাবুর পৈইতে। গাড়ি ছাড়া আর কী দিয়ে ডাক্তারবাবু রোগীদের কাছে নিজের বামুনত্ব জাহির করবেন?

ডাক্তার দাশগুপ্ত গাড়ি ছেড়ে দিলেন। লতিকা বলল, আপনি নিজেই গাড়ি চালাবেন নাকি?

ডাক্তার দাশগুপ্ত হেসে বললেন, তাই তো বরাবর চালাই। আমার গাড়ি আমার হাতে নিরাপদ, অন্তত আমার রোগীর চেয়ে আমার গাড়ি আমার হাতে ঢের বেশি নিরাপদ। শুনুন, আপনাদের বাড়ি এলে আমাকে বলবেন কিন্তু।

আচ্ছা।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মোহন ঘাড় ফিরিয়ে ফিস ফিস করে কী যেন বলল লতিকাকে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, মোহন, ফিস ফিস করে তুমি নিজের ওয়াইফকে যা বললে তা আমি পুরোপুরি শুনতে পেয়েছি।

লতিকা বলল, তাহলে তো ভালোই হল। আপনি রাজি তো, আমাদের বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাবেন?

মোহন বলল, অ্যাই আস্তে, তিনটে বাড়ির পরই আমাদের বাড়ি।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল।

তিন জনে নামলেন গাড়ি থেকে। ডাক্তার দাশগুপ্ত হাসি মুখে বললেন, সুযোগ যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ব কেন? চা খেয়েই যাই।

দো-তলায় বসবার ঘরে বসলেন তিন জনে। মোহন বলল, দো-তলাটা সম্পূর্ণ আমার।

ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, বাঃ। দু'জনেই আছ, একটা দরকারি কথা সেরে রাখি। রোগীর অবস্থা যা দেখলাম কোনও কথাই এখন নিশ্চিত ভাবে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

লতিকা ভীরু গলায় বলল, কী-রকম সাবধান থাকতে হবে?

আমার মনে হয়, আপনার একটু ঘন ঘন মেডিক্যাল চেকআপ দরকার।

লতিকা তাকাল মোহনের শুকনো মুখের দিকে। বলল, ঘন ঘন মানে কী? সপ্তাহে এক দিন?

ডাক্তার দাশগুপ্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, সপ্তাহে অন্তত এক দিন।

মোহন জিজ্ঞেস করল, সপ্তাহে অন্তত এক দিন কোন ডাক্তারবাবু কী কী চেক-আপ করবেন?

ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, সে-সব ডাক্তারি ব্যাপার তো তোমরা বুঝবে না। তবে কাজটা সাংঘাতিক কিছু নয়, এক জন মোটামুটি ভালো ডাক্তাবাবুই করতে পারবেন। আছে তোমার চেনাশোনা মোটামুটি ভালো কোনও ডাক্তারাবু?

মোহন কাঁচুমাঁচু হয়ে বলল, আমি মোটামুটি ভালো ডাক্তার কোথায় পাব? আমি যাদের চিনি তাদের প্রত্যেকেই উচ্চস্থ, অবিশ্যি তাদের নিজেদের মতে।

ডাক্তার দাশগুপ্ত হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তা যা বলেছ। থাকগে, এ নিয়ে তোমাদের ভাবনার কোনও দরকার নেই। আমি তো তোমার বাড়ির সামনে দিয়েই রোজ দু'বেলা যাওয়া-আসা করি, হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে আমিই চেকআপ করে যাব। কী বলো?

মোহন বলল, কী আর বলব বলো। ডাক্তার হিসেবে তো বড় আছই, মানুষ হিসেবেও তুমি যে কত বড়...।

মোহনকে থামিয়ে লতিকা বলল, বাস্তবিক রবিদা, মানুষ হিসেবেও তুমি যে কত বড়...।

BanglaBook.org

লতিকাকে থামিয়ে নিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, আঃ লতিকা, কী হচ্ছে এ-সব, দু'জনেই ছাপার অক্ষরে কথাবার্তা আরম্ভ করলে কেন? আমি কিন্তু এবার সত্যি সত্যি রেগে যাব। আচ্ছা লতিকা, আমাকে চা খাওয়াবে বলে নিয়ে এলে, কোথায় চা?

লতিকা বলল, জল বসানো হয়ে গেছে। এখনই যাচ্ছি। রবিদা, তুমি মানুষ নও, তুমি...।

লতিকা, তুমি ঠিক ধরেছ। লতিকাকে আবার থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, আমি মানুষ নই, আমি দেবতা।

হ্যাঁ, দেবতা, তা-ই।

মোহন খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল, খুব ভালো, খুব ভালো।

ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, কী খুব ভালো?

মোহন আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, নিজেদের অজান্তে লতিকা তোমাকে 'তুমি' বলেছে, 'রবিদা' বলেছে আর তুমি লতিকাকে 'লতিকা' বলেছে, তুমি বলেছ, আমার কাছে এখন এর চেয়ে ভালো আর কী? আপনা আপনির মধ্যে 'আপনি' ভালো লাগে না, 'তুমি'ই ভালো লাগে।

লতিকা আর দাশগুপ্ত এক সঙ্গে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন আর মোহনও তাদের গলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসতে লাগল।

হাসতে হাসতে লতিকা উঠে গেল আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল। হাতে ট্রে, তিন কাপ চা, একটা প্লেটে কেক আর সন্দেশ আর আরেকটা প্লেটে চানাচুর।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে লতিকা বলল, আচ্ছা রবিদা, তোমার ছেলে-মেয়ে ক'টি?

এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, একটিও না। কী আর করা যাবে, ওদের জননীই কখনও আমার বাড়িতে আসেননি, ওরা আর কেমন করে আসে।

বুঝেছি, তুমি বিয়ে করোনি।

ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, সাবাস, তোমার মাথা খুব পরিষ্কার। যাকগে, তোমাদের কটি?

লতিকা একটা আঙুল তুলে বলল, একটি। ছেলে। ব্যাস।

স্কুলে পড়ে?

লতিকা বলল, হ্যাঁ। মাদার এলিজাবেথ'জ স্কুল। ক্লাস ফোর। এখন গরমের ছুটি, বাড়িতেই আছে। ওর ডাকনাম জাম্বো, ভালো নাম শোভনলাল।

লতিকা থামতেই মোহন বলল, জাম্বোর লেখাপড়ায় মন আছে, আশা করি শেষ পর্যন্ত ভালোই করবে। কিন্তু একটা মস্ত দোষ আছে। একটা অসুখই বলা যায়।

অসুখের নাম শুনেই ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, কী অসুখ?

গলা নামিয়ে মোহন বলল, অসুখ কি না তা-ও কী বলতে পারি না। ব্যাপারটা কী জানো, বাইরে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনা। ঠিক বলতে পারি না, এখনই হয়তো জাম্বো আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছে।

ডাক্তার দাশগুপ্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, এটা অসুখ নয়। কিন্তু এ-রকম করতে করতে হয়তো ভবিষ্যতে একটা বিতিকিচ্ছি অসুখ হতে পারে। ডাকো তো একটু।

দেখছি।

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মোহন। এবং জাম্বোর হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল। বলল, যা বলেছি তাই।

জাম্বো ঘোর আপত্তি করে বলল, মোটেও তা নয়, আমি আড়ি পেতে কারও কথা শুনছিলাম না, কখনও কারও কথা শুনিনি।

BanglaBook.org

ডাক্তার দাশগুপ্ত জাম্বোকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তা তো বটেই। কারও কথা আড়ি পেতে শোনার মতো মানুষই তুমি নও। আচ্ছা, বলো তো আমি কে?

জাম্বো বলল, তুমি তো আমার রবিকাকু।

টেবিলে আলগোছে চাপড় দিতে দিতে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গেল যে তুমি কখনও কারও কথা আড়ি পেতে শোনো না। তা কী করছিলে এখন?

অঙ্ক করছিলাম।

জাম্বোর পিঠ চাপড়ে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, যাও, গিয়ে অঙ্ক করো।

ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেল। এবার তাহলে উঠি। বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ছুটতে হবে। ভালো কথা, মোহন, আজই সন্ধ্যার সময় লতিকাকে নিয়ে যাও, টেস্টগুলো করিয়ে আনো।

কোথায় গেলে ভালো হয়?

একটু ভেবে নিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, সার্চলাইট-এর নাম শুনেছ?

শুনেছি।

সার্চলাইট কোথায় জানো?

জানি।

তাহলে ওখানেই নিয়ে যাও। চলি।

সে-দিনই সন্ধ্যাবেলায় সার্চলাইট-এ ঢুকল মোহন আর লতিকা। এয়ার কন্ডিশনড। চতুর্দিক সাফসুতরো। সব ঝকঝক করছে।

মোহন কাউন্টারে গিয়ে ডক্টর আর এস দাশগুপ্তের প্রেসক্রিপশন জমা দিল। কাউন্টারের ভদ্রমহিলা প্রেসক্রিপশনগুলো ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন।

এবং অবিলম্বে প্রেসক্রিপশনখানা হাতে নিয়ে ভিতর থেকে এক জন সুটবুট পরা ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বিনীত গলায় ডাকলেন, লতিকা মিটার, লতিকা মিটার।

লতিকা আর মোহন উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক ওঁদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসবার আগে বললেন, আপনারা দয়া করে বসুন।

দু'জনে বসল।

ভদ্রলোক নিজের বুকে হাত রেখে বললেন, আমি ডক্টর সমাদ্দার। এই প্রতিষ্ঠানের সামান্য এক জন সেবক, লোকে অবশ্যি আমাকে মালিক বলে মানে, কিন্তু তা ভুল। এই প্রতিষ্ঠানের আসল মালিক আপনারা। তারপর মিস্টার মিটার, আপনি তো ডক্টর দাশগুপ্তের বাল্যবন্ধু।

মোহন বলল, হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে ডক্টর সমাদ্দার ঘণ্টি বাজিয়েছেন, এক জন নার্স এসে ঢুকল।

ডক্টর সমাদ্দার বললেন, সিস্টার, মিসেস লতিকা মিটারকে ভেতরে নিয়ে যান। এই টেস্টগুলো পারসোনাল ইন্টারেস্ট নিয়ে এখনই করিয়ে ফেলুন।

সিস্টারের সঙ্গে লতিকা ভেতরে চলে গেল।

ডক্টর সমাদ্দার তারপর মোহনকে বললেন, কফিতে আপত্তি নেই নিশ্চয়?

মোহন কিছু বলার আগেই মোহনের সামনে এক কাপ কফি এসে গেল। ডক্টর সমাদ্দার বললেন, আপনি কফি খান। আমি ভেতরে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিসেস মিটারের টেস্টগুলো করিয়ে আসি।

BanglaBook.org

কফি খেতে খেতে মোহন আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। কত টাকা দিতে হবে? যা সঙ্গে এনেছেন তাতে কুলিয়ে যাবে তো? দেখা যাক।

মোটমাট দু'ঘণ্টা বাদে লতিকা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সমাদ্দার। তিনি আধ গ্লাস জল খেয়ে বললে, যাক, সব টেস্ট হয়ে গিয়েছে। কাল বিকেলের মধ্যে আপনার বাড়িতেই সব রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

মোহন কাঁচুমাচু ভাবে বলল, ডক্টর সমাদ্দার, কত হল?

ডক্টর সমাদ্দার ভুরু কুঁচকে বললেন, কী কত হল?

ইয়ে, এই সব টেস্টের বিল।

বাকি আধ গ্লাস জল এক চুমুকে খেয়ে ডক্টর সমাদ্দার বললেন, মিস্টার মিটার, টাকার কথা বলে আপনি আমাকে বড় ব্যথা দিলেন। টাকা, টাকা, টাকা। জগতে টাকাই কি সব? ডক্টর দাশগুপ্ত টেলিফোনে আপনাদের কথা আমাকে বলেছেন। তাঁর বাল্যবন্ধুর ওয়াইফের কয়েকটা টেস্ট করে টাকা নেব আমি? আমি কি এতই নরাধম, পাপিষ্ঠ, অধমাত্মা পামর? ডাক্তার হয়েছি বলে কি আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধাভক্তি বা ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবে না? ছিঃ, আপনি দয়া করে আর টাকার কথা মুখে আনবেন না, আমার বুকে বড় ব্যথা লেগেছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের চোখের জল মুছে ফেললেন ডক্টর সমাদ্দার।

তাঁকে নমস্কার করে মোহন আর লতিকা বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে মোহন বলল, আসলে রবির দৌলতেই এত খাতিরযত্ন পেলাম, পয়সা পর্যন্ত নিল না। রবি হয়তো দেবতা।

তা যা বলেছ। কিন্তু এখনও তোমার সন্দেহ? কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে লতিকা বলল, রবিদা নিশ্চয় দেবতা।

তিন দিন বাদে দুপুরবেলা ডক্টর দাশগুপ্ত এলেন মোহনের বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে গট গট করে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, জাম্বো, জাম্বো, জাম্বো।

জাম্বো ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। লতিকাও এল।

জাম্বোর হাতে ডক্টর দাশগুপ্ত তুলে দিলেন কালার-পেন্সিলের বাক্স, মস্ত চকোলেট, দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট।

লতিকা ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি এত সব আনতে গেলে কেন রবিদা?

ডক্টর দাশগুপ্ত বললেন, এ-সব আমার আর জাম্বোর ব্যাপার, এখানে তুমি নাক গলাবে না। যাও জাম্বো, মন দিয়ে লেখাপড়া করো।

জাম্বো হাসি মুখে চলে গেল।

ডক্টর দাশগুপ্ত বসবার ঘরে ঢুকে সোফায় বসে পড়লেন। বললেন, লতিকা, আজ তোমার রিপোর্টগুলো দেখব। তারপর মেডিক্যাল চেক-আপ করব।

লতিকা বলল, রিপোর্টগুলো বেডরুমে আছে। নিয়ে আসি।

ডক্টর দাশগুপ্ত বললেন, নিয়ে আসতে হবে না, চলো, আমিই রিপোর্টগুলোর কাছে যাই। বেডরুমে আলো আছে তো?

লতিকা ঘাড় হেলিয়ে বলল, আলো জ্বালালে আলো, আলো না জ্বালালে অন্ধকার।

বেডরুমে এসে আলো জ্বালিয়ে রিপোর্টগুলো দেখলেন ডক্টর দাশগুপ্ত। মনে মনে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, না, আপাতত ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু মেডিকেল চেক-আপ সপ্তাহে অন্তত দু'দিন করাতে হবে। আর আরও একটা ওষুধ খেতে দেব তোমাকে। ওষুধটা আমার বাড়িতেই আছে, পরদিন নিয়ে আসব।

BanglaBook.org

লতিকা বলল, তুমি লিখে দাও, দোকান থেকে কিনে আনব।

ডক্টর দাশগুপ্ত ধমক দিয়ে বললেন, চুপ। অযথা কিনতে যাবে কেন? ওষুধটা তো আমার বাড়িতে পড়েই আছে। নাও, শুয়ে পড়ো। মেডিক্যাল চেক-আপটা হয়ে যাক।

গালে টোল ফেলে লতিকা আস্তে একটু হাসল। বলল, ধ্যেৎ, ঘরের দরজা হা করে খুলে রেখে মেডিক্যাল চেক-আপ হবে নাকি?

ডক্টর দাশগুপ্ত সায় দিলেন, হুঁ, ঠিক কথা। দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো।

মেডিক্যাল চেক-আপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে ডক্টর দাশগুপ্ত চলে গেলেন।

দিনের পর দিন যাচ্ছে। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন মেডিক্যাল চেক-আপ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

গরমের ছুটি শেষ হয়ে জাম্বোর স্কুল কবে খুলে গেছে। অবশ্যি সে-দিকে কোনও অসুবিধা নেই। জাম্বোর মর্নিং সেকশন। স্কুল থেকে এসে সে স্নান-খাওয়া শেষ করার আগে রবিকাকু কোনও দিনই আসে না। রবিকাকু যে-দিন আসেন সে-দিনই জাম্বোর জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসেন। দিলীপকুমার রায়ের দ্বিজেন্দ্রগীতির ক্যাসেট, শচীন দেব বর্মনের নজরুলসঙ্গীতের ক্যাসেট, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট। হরেক রকম ইংরেজি ও বাংলা বই। নানা রকম খাবার, চিনে খাবারের গরম প্যাকেট, মোগলাই খানার গরম প্যাকেট, ডেকারস লেনের রমেশবাবুর দোকানের কাটলেট, ডেভিল, ফিসরোল, ফিসফ্রাই। উপহারের কিছু নমুনা দেওয়া গেল, সব লেখার জায়গা নেই।

এক দিন রাত্রে লতিকা নজর করল যে-জাম্বো ভাত খুব কম খাচ্ছে। বলল, তুমি এত কম খাচ্ছ কেন?

বাঁ-হাতে নিজের পেটে হাত বুলোতে বুলোত জাম্বো বলল, আমার পেট যে ভরে গেছে।

মোহন আরেক হাতা চাটনি নিয়ে বলল, এত অল্পে পেট ভরে খেলে চলবে কেন? না খেলে শরীরে জোর পাবে কী করে? তোমার মায়ের শক্ত অসুখ, তারপর তুমি যদি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া না করো তাহলে তো মুশকিলের কথা।

আঙুল দিয়ে প্লেটে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে জাম্বো বলল, মা, আজ থেকে আমি কয়েক দিন বাবার সঙ্গে শোব।

লতিকা বললেন, তা শোবে।

মোহন বলল, আমার সঙ্গে শুতে যখন ইচ্ছে করেছে তখন শোবে বৈ কী।

হাত-মুখ ধুয়ে জাম্বো গিয়ে বাবার আগেই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে মোহনের ঘুম ভেঙে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার, মোহন একেবারে অভিভূত। অতটুকু ছেলে জাম্বো, সে কেমন করে জানল যে, বাবার শ্রান্ত শরীর একটু কোমল সেবা চায়। বাবার ব্রহ্মতালু থেকে দু'পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পরম মমতায় আ-স্তে নরম হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জাম্বো। আজকালকার দিনে ক'জন ছেলে বোঝে বাবার দুঃখ-কষ্ট। ক'জন ছেলে বাবার শরীরে নিজের ফুলের মতো আঙুল বুলিয়ে দেয়? চূড়ান্ত সুখে মোহন আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

পর পর পাঁচ রাত্রে একই ঘটনা। পরম সুখ নিজের মনে রেখেছে মোহন। এ-সব দুর্লভ সুখ পাঁচ জনকে বলার মতো নয়, পাঁচ জনকে বললেই এ-সব সুখ হাসি-তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

পাঁচ রাত্রির পর খেতে বসে জাম্বো আবার বলল, মা, আজ থেকে আমি আর বাবার সঙ্গে শোব না। আবার আগের মতো শোব।

মা বলল, আচ্ছা।

বাবা বলল, আচ্ছা। আবার কখনও যদি তোমার আমার সঙ্গে শুতে ইচ্ছে করে, শোবে।

BanglaBook.org

খুশি হয়ে জাম্বো বলল, আচ্ছা।

পরদিনই জাম্বো স্কুল থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এল, বিগ আন্টি দিয়েছেন। সাংঘাতিক ব্যাপার, বিগ আন্টি অবিলম্বে মাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

স্কুলে আবার কী হয়েছে কে জানে। লতিকা দেরি করল না, স্কুলে গিয়ে বিগ আন্টির সঙ্গে দেখা করল।

বিগ আন্টি বললেন, বসুন।

লতিকা চিঠিখানা বিগ আন্টির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দেখুন আমি...।

বিগ আন্টি বললেন, শোভনলালের মা।

লতিকার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বিগ আন্টি। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, শোভনলাল সম্পর্কে আমাদের এক্সপেকটেশন একটু বেশি। আমরাও ওর কাছে অনেক কিছু আশা করি। কিন্তু সম্প্রতি ওর বিষয়ে আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

লতিকা করুণ মুখে বলল, কেন?

ডান হাতের একটি আঙুলে টেবিলে বারকয়েক টোকা দিয়ে বিগ আন্টি বললেন, সম্প্রতি ওর ভিতরে কতগুলো পরিবর্তন দেখা গেছে। লেখাপড়ায় মন দেয় না, আন্টিরা পড়িয়ে যান কিন্তু ও জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি কিছু লক্ষ্য করেননি?

লতিকা শান্তভাবে বলল, না, তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি। অল্পস্বল্প নজরে পড়েছে, আজকাল ও খায় কম, চেহারাও একটু খারাপের দিকে যাচ্ছে, এই রকম আর কী?

একটা লাল-নীল পেনসিল হাতে তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন বিগ আন্টি।

তারপর বললেন, দেখুন, আজকাল আপনাদের তো একটি কি দু'টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভাবনাচিন্তা। কিন্তু আমাদের, আমরা যারা বাচ্চাদের এডুকেশন নিয়ে সারাক্ষণ কাজকর্ম করি, হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের কথা ভাবতে হয়। তা আসল ব্যাপারটা কি জানেন, আমাদের মনে হয় যে শোভনলাল দিনে দিনে অ্যাবনরমাল হয়ে যাচ্ছে, ওকে এখনই কোনও বড় ডাক্তার দেখানো দরকার। আপনি কী বলেন?

অল্প একটু হেসে লতিকা বলল, আমি আর কী বলব, আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় ওকে বড় ডাক্তার দেখাব।

বিগ আন্টি জোড় হাতে একটা নমস্কারের ভঙ্গি করে করে বললেন, ঠিক আছে।

স্কুল থেকে লতিকা সরাসরি চলে এল বাড়িতে।

কী সৌভাগ্য, রবিদা গল্প করছে জাম্বোর সঙ্গে, রবিদার গল্প শুনে খিল খিল করে হাসছে জাম্বো। লতিকাকে দেখে রবিকাকু বললেন, তোমার ক্যাসেট, চকোলেট আর গল্পের বইয়ের প্যাকেট নিয়ে এখন নিজের ঘরে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করো।

ক্যাসেট, চকোলেট আর গল্পের বইয়ের প্যাকেট নিয়ে জাম্বো চলে গেল।

লতিকার মুখে সব কথা শুনে রবিদা বললেন, ঠিক আছে, ভাবনার কিছু নেই। এ বিষয়ে যা করার আমিই করব। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। নাও, কাজটা আগে শেষ করি।

মেডিক্যাল চেক-আপ করতে করতেই জাম্বোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শেষ করে ফেললেন ডাক্তার আর এস দাশগুপ্ত। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এক জন বড় ডাক্তার এক সঙ্গে দু-রকম কাজ করতেই পারেন। বিদায় নেওয়ার আগে ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, তুমি কাল মোহনকে ছুটি নিয়ে বাড়ি থাকতে বোলো। আমি কাল বিকেল সাড়ে চারটেয় আসব। তুমি, মোহন আর জাম্বো রেডি হয়ে থাকবে। যে-বাড়িতে আমার চেম্বার, সে-বাড়িতেই ডক্টর শশাঙ্ক সোমের চেম্বার, খুব বড় সাইক্রিয়াট্রিস্ট। বিগ আন্টি যখন বলেছেন তখন দেরি করার দরকার নেই।

BanglaBook.org

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় বিকেল সাড়ে চারটেয় ডাক্তার দাশগুপ্ত এলেন। গাড়ি থেকে নামলেনও না, হাত বাড়িয়ে ইশারা করলেন, লতিকা, মোহন আর জাম্বো তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

চেম্বার। এয়ার কন্ডিশনড। বিস্তর রোগী চুপচাপ বসে আছে। ডক্টর দাশগুপ্ত ফিস ফিস করে বললেন, লতিকা, চিন্তার কিছু নেই, আমি টেলিফোনে শশাঙ্কদাকে সব বলে রেখেছি। তোমরা একটু বোসো।

দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকে পড়লেন ডক্টর দাশগুপ্ত। ডক্টর শশাঙ্ক সোম মুখ তুলে বললেন, এই যে রবি, তোমার জন্যই বসে আছি। এখনও রোগী দেখতে আরম্ভ করিনি, তোমার পেশেন্ট দিয়েই আরম্ভ করব। এসেছে তো? ডাকো।

বাইরে এসে হাত তুলে ইশারায় তিন জনকেই আসতে বললেন ডক্টর দাশগুপ্ত। তারপর চার জন ঢুকে পড়লেন।

মৃদুমধুর হাস্যে আপ্যায়ন করে ডাক্তার শশাঙ্ক সোম বললেন, তিন জন আমার সামনে চেয়ারে বসুক আর শোভনলাল আমার পাশে বসুক।

ডক্টর দাশগুপ্ত বললেন, শশাঙ্কদা, ওর ডাকনাম কিন্তু জাম্বো।

ডাক্তার শশাঙ্ক সোম বললেন, ইয়েস, জাম্বো। ডাকনামই ভালো। আজকাল ডাকনামেই ছেলেদের নামডাক।

কথা বলতে বলতেই শশাঙ্ক সোম টর্চ জ্বেলে জাম্বোর গলার ভেতরে দেখলেন, জিভ দেখলেন, চোখ দেখলেন, হাতের দশ আঙুলের নখ দেখলেন। তারপর বললেন, জাম্বো, তোমার সবই তো ভালো দেখছি। কিন্তু তুমি ঠিকমতো খাওনা কেন? স্কুলে আগের মতো লেখাপড়ায় মন দাও না কেন, তোমার মন খারাপ হয়ে আছে কেন? আমার কাছে সব তুমি খুলে বলো, তাহলেই আমি সব ঠিক করে দেব।

ডাক্তার সোমের কথা বলার সুরে আশ্বাস পেয়ে জাম্বো বলল, রবিকাকুর মতো ভালো লোক আর হয় না। কিন্তু তাকেও মিথ্যে কথা বলে ঠকানো হয়েছে। হয়তো রবিকাকু তা এখনও জানেন না, হয়তো কখনও জানবেন না। রবিকাকুর মতো মানুষকে মিথ্যে কথা বলে ঠকানো হয়েছে বলে আমার মনে বড় দুঃখ, আমি তাই তাঁকে তুষ্ট করার জন্য তাঁর মুখে হাসির গল্প শুনে হাসি না পেলেও খিল খিল করে হাসি।

ডাক্তার শশাঙ্ক সোম মাথা নেড়ে বললেন, তারপর বলে যাও। নির্ভয়ে বলে যাও।

জাম্বো নির্ভয়ে বলল, ভুলে বাড়িতে আমার নোটবুক রেখে এসেছি। সেখানে তিনটি তারিখ লেখা আছে। নোটবুক সঙ্গে থাকলে আমি আপনাকে দেখাতে পারতাম কোন তিনটি তারিখে রবিকাকুকে মিথ্যে কথা বলে ঠকানো হয়েছে। এক গ্লাস জল খাব?

এল এক গ্লাস জল। ঢক ঢক করে সব জল এক চুমুকে খেয়ে নিল জাম্বো।

জাম্বোর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ডাক্তার শশাঙ্ক সোম বললেন, তারিখ জানার আমার কোনও দরকার নেই। তুমি কি সিওর যে, তোমার রবিকাকুকে মিথ্যেকথা বলে ঠকানো হয়েছে?

ডান হাত মুঠো করে টেবিলে আস্তে একটি কিল মেরে জাম্বো বলল, সেন্ট পারসেন্ট সিওর। আমার মা আমাকে পই পই করে শিখিয়েছে যে, আমি যেন কখনও মিথ্যে কথা না বলি। আমি বলিও না মিথ্যে কথা। কিন্তু আমার সেই মা-ই মিথ্যে কথা বলে রবিকাকুকে ঠকিয়েছে।

ডাক্তার দাশগুপ্ত হতভম্ব। মোহন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগল। আর লতিকা চেয়ার ছেড়ে কী একটা বলবার উপক্রম করতেই ডাক্তার শশাঙ্ক সোম তাকে বসে পড়তে ইশারা করলেন।

BanglaBook.org

অগত্যা কিছু না বলেই বসে পড়ল লতিকা। মনে মনে সিদ্ধান্ত করল, এ-সব হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর কুফল। ইংলিশ মিডিয়ামে ছেলেদের শাস্তি দিয়ে শাসন করা হয় না, এই তার পরিণাম। আশ্চর্য, বিগ আন্টি আর অন্য আন্টিরা কি জানেন না যে, স্পেয়ার দ্যা রড অ্যান্ড স্পয়েল দ্যা চাইল্ড?

তিন জনের চোখ-মুখ তাকিয়ে দেখলেন ডাক্তার শশাঙ্ক সোম। তারপর বললেন, জাম্বো, তুমি কি ঠিক জানো...।

কথা শেষ করতে না দিয়ে জাম্বো বলল, ঠিক জানি, ঠিক জানি, ঠিক জানি। আমি নিজে পরখ করে দেখেছি এক জোড়া তো দূরের — একটিও নেই।

ডাক্তার শশাঙ্ক সোম খুব নরম গলায় বললেন, কীসের একজোড়া? কীসের একটি?

জাম্বো আরও নরম গলায় বলল, মা তো মেডিক্যাল চেক-আপের জন্য রবিকাকুকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন। আমি — এক দিন নয়, দু'দিন নয় — তিন দিন বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনেছি যে, মা স্পষ্ট করে রবিকাকুকে বলেছেন, খুব সাবধান রবিদা, আমার হাজব্যান্ডের পিছনেও কিন্তু এক জোড়া চোখ আছে॥

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ঘর-সংসার

দুটো স্টপেজ আগে থেকে চেষ্টা করে পা-দানির কাছাকাছি পৌঁছানো গেছে। কিন্তু থামতে না-থামতে এক দঙ্গল লোক হুড়োমস্তি উঠে পড়ল। এবং তারপর যা হয়। নামতে দিন। নামতে দিন। আঃ, সরুন না। নেমে দাঁড়ান। কন্ডাকটর!

ভিতু গলায় পিছনে একদম ফাঁকা গাড়ির খবর জানিয়েও কাজ হল না। সুতপার সামনে মুখোমুখি একটা গুঁফো লোক। ইয়া বড় জুলপি। বিশাল পাঁচিলের মাথায় দুটো চোখ খোদাই করা হয়েছে যেন। সুতপা 'যেতে দিন, নামব' বললেও সেই চক্ষুষ্মান প্রকাণ্ড পাঁচিল একটুও চঞ্চল হল না।

এ-দিকে পিছন থেকে কে ভরাট আকাশবাণীর গলায় বলে চলেছে, আঃ, ভদ্রমহিলাকে নামতে দিন না। এ কী অভদ্রতা! ও মশাই, শুনছেন? কী আশ্চর্য! আরে, আপনিও একটু ঠেলুন না। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। ঠেলুন, ঠেলুন।

সুতপা পিছু ফিরে লোকটকে দেখে নিল। এবং একটু হাসলও। সরছেনা যে। কী করব?

পিছনের কণ্ঠ ধমক দিল। তাহলে আগ বাড়িয়ে নামতে যান কেন? মহিলাদের এই এক বদ অভ্যেস। নিজেরাও নামতে পারবেন না, কাউকে নামতেও দেবেন না।

সুতপার রাগ হল। একটু সরবার চেষ্টা করে বলল, নিন, আপনি চেষ্টা করুন না দেখি।

এক ইঞ্চি জায়গা নেই যে উনি সুতপার সামনে এসে লড়াইটা দেবেন। চেষ্টা করে অগত্যা হাসতে দেখা গেল ভদ্রলোককে। নাঃ, অসম্ভব।

কন্ডাকটর শাসাতে শুরু করেছে ততক্ষণে। ঘণ্টা দিচ্ছি!

BanglaBook.org

সুতপা আচমকা পিছনে জোর চাপ টের পেল। তারপর কী হল কে জানে, সে দেখল কখন যেন শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে ফুটপাতে এসে পড়েছে। বাসটা চলে গেল ধুঁয়ো ছেড়ে। তার পাশেই সেই ভদ্রলোক পোশাক ঝাড়ছে রুমাল দিয়ে। বক বক করছে আপন মনে।

সুতপাকে তাকাতে দেখে সে হাসল। দেখলেন? সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। এ না হলে মোটেও নামা যেত না। উঃ, আমার হাড়গোড় ব্যথা হয়ে গেছে।

সুতপার রাগ হয়েছিল। কী বিচ্ছির চাপটা না গেল পিঠের দিকে! কিন্তু এবার রাগের বদলে হয়তো কিছু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জরুরি হয়ে পড়ল। সে পালটা হেসে বলল, আমারও। তবে আপিসের ছুটির সময় তো! আজকে বরং ভিড়টা কমই। সেই সামনের লোকটা বদমাইশি করছিল, তা না হলে...।

ও-পক্ষ ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, বেশি মস্তানি করলে দিতুম না নাকটা ভেঙে!

সুতপা হাঁটতে থাকল। স্টপেজের একটুখানি পরেই বাঁ-হাতে ঢুকলে একটা বাজার। বিকেল থেকে সন্ধে বাজারটা ভারি জমে ওঠে। টাটকা মাছ, শাকসবজি মেলে প্রচুর। ব্যাগ থেকে সে থলেটা বের করে নিল। বাজারে ঢোকবার মুখে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালও। ভদ্রলোককে অকারণে ফের একবার দেখবার ইচ্ছা।

সুতপা দেখল, ভদ্রলোকও তার মতো ফোলিও ব্যাগ খুলে একটা থলে বের করল। তারপর এ-দিকেই এগোল।

জীবনে হয়তো অকারণেই কোনও কোনও মুহূর্ত আসে যখন কারও সম্পর্কে কৌতূহল হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে। সুতপার জানতে ইচ্ছে করছিল, কোথায় থাকে লোকটা, কী করে-টরে। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। পঁচিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। রুক্ষ-বিশৃঙ্খল চুল। সাদা শার্ট ঢাকা হালকা রঙের ফুলহাতা শোয়েটার গায়ে, পরনে ঘিয়ে রঙের প্যান্ট। একটু রোগা, লম্বাটে গড়ন। সুতপার আন্দাজ আছে এক ধরনের। পোশাকের রঙের ব্যাপারে মানসিকতার কিছু পরিচয় থাকে — সে বিশ্বাস করে। সচরাচর এ ধরনের ফিকে রঙ যারা ব্যবহার করে, তাদের মনটা বয়স অপেক্ষা প্রবীণতর। সুতপার যা ধারণা। যেমন তার নিজের। তার আপিস-সঙ্গিনী অসীমা ঠাট্টা করে বলে, সুতপার সাজগোজ যাই থাক, কেমন না বিধবা বিধবা ছিরি। হতে পারে।

বেগুনের দরাদরি করার সময় ভদ্রলোক পাশে এসে গেল। কত বলছে? পঁচিশ? দেখুন কাণ্ড! শীত যাই যাই করছে, এখনও পঁচিশ! আর গলা কেটো না বাবা, রক্ত বলতে কিছু কি পাবে?

সবজিওলা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, দরাদরি নাই।

আরে! নিয়ে ফেললেন? যা বলছে, তাই? এ জন্যই ওরা পেয়ে বসে।

সুতপা থলে বাড়িয়ে দিয়েছিল। একটু হাসল। নেব তো আড়াইশো মাত্র। আর দরাদরি করার মতো ধৈর্য নেই।

আমিও কি তার বেশি নেব ভাবছেন নাকি? বেগুনওলা, লক্ষ্মী ভাইটি, কথা শোনো। পাঁচ কমাও। কেমন? দিনকাল যা পড়েছে, তোমাদের দোষ কী ভাই! সবই আগুন একেবারে।

বেগুনওলা কেন কে জানে হাসল। বলল, সে-দিনকে ঝড়বিষ্টি হয়ে গেল না? সবজির আর আছে কিছু? আমাদের হ্যাঙ্গামাটা তো দেখবেন না বাবু। যাকগে, ছ টাকা দিন।

চারপাশে ভিড় বেশ জমে উঠেছে। সাবই আপিস-টাপিসের লোক। সকালে বাজার করে তারপর রান্নাবান্না শেষ এবং সেগুলো গেলার সময় থাকে না হাতে। যানবাহনের ঝুক্কি আছে। সময় মতো আপিস পৌঁছনো চাই। তাই সন্ধের দিকে কাজটা সেরে রাখলে সব দিকেই সুবিধে। সুতপা আলুওলার কাছে এল।

BanglaBook.org

অমনি সাড়া পাওয়া গেল। কই, আমাকে দর করতে দিন। যা বলবে, লক্ষ্মী মেয়ের মতো...। হাঃ হাঃ হাঃ

সুতপা হাসল না অবশ্য। কিন্তু থলে বাড়িয়েও দিল না।

বারো টাকা? ওই ছুঁচোর ডিমের দর বারো টাকা? মাথা খারাপ! চলে আসুন এ-দিকে।

সুতপা পা বাড়াতে বাধ্য হল। পিছনে আলুওলা বলল, ছুঁচোর ডিম! এরপর আরশোলার ডিমও কিনতে হবে দাদু।

কত ভাইটি? এগারো টাকা? আলু তুলে পরখ করছে। তারপর সুতপার উদ্দেশ্যে — মন্দ নয়, বুঝলেন? পরক্ষণেই চোখ টিপল। এই দাদু, এক টাকা কমাও। তোমারও বউনির সময়...।

দ্বিতীয় আলুওলা দাঁত ছরকুটে বলল, বউনি-টউনি চলবে না দাদু। সারা দিনই বউনি। কম হবে না।

হবে, হবে। আড়াইশো দাও। এই নাও, আড়াই টাকা।

সুতপার থলে কতকটা কেড়ে নিয়ে আলুগুলো ঢুকিয়ে দিল। আড়াই টাকা দিন। ভাইটি আর আড়াইশো চাই।

সরে এসে সুতপা সকৌতুকে বলল, পঞ্চাশ পয়সা লাভ হল।

তাই-বা কম কী? যাকগে। আর কী নেবেন? চলুন এবারে মাছ দেখা যাক।

সুতপা বলল, চলুন।

কিন্তু আপনি কথা বলবেন না, আমি বলব। এ-সব আপনারা মেয়েরা পারবেন না।

সুতপা হাসল।

কইমাছ নেবেন? আমার তো চমৎকার লাগে।

সুতপা বলল, দেখি।

তিন জায়গায় কই, ভেটকি আর চারাপোনার দরাদরি করে শেষ অব্দি ট্যাংরাতে এসে ঠেকল। সুতপা ট্যাংরা নিত না। নিয়ে ফেলল। দেড়শো করে থলে পিছু।

তারপর কাঁচালঙ্কা। উচ্ছে। নটে শাক। পেঁয়াজ। সুতপা দেখল, সে ক্রমশ দারুণ ভাবে জড়িয়ে পড়েছে এই লোকটার সঙ্গে।

গেটের মুখে এসে এতক্ষণে ও সিগ্রেট ধরাল। হাসিমুখে বলল, থাকেন কোন দিকে?

সতীকান্ত লেনে।

তাই নাকি? কত নম্বর?

সাঁইত্রিশের দুই।

কী আশ্চর্য! আমি আপনার উলটো দিকে আঠারোর পাঁচ। চিলেকোঠায়। আপনি?

দো-তলায়।

সুতপা হাঁটতে থাকল। আপনাকে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছিল।

আমারও।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর প্রশ্ন এল, স্কুল না আপিসে চাকরি করেন?

সুতপা বলল, আপিসে।

সরকারি?

নাঃ। হেওয়ার্থ অ্যান্ড রয়-তে।

আমি ইস্টার্ন পায়ারস-এ।

সামনের স্টপেজে নামলে সতীকান্ত লেন পাঁচ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু এক স্টপেজ আগে নামবার কারণ এই বাজার। দিনের আলো নিভে এসেছে। এখানে-ওখানে সুন্দর ছিমছাম ঘরবাড়ির আনাচে-কানাচে জমে ওঠা আবর্জনার মতো চাপ চাপ বস্তিবাড়ি। খোলার ঘর। আলোর আভাস নেই সেখানে।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে কিছু উঁচু গাছপালা — শিমুল, তাল, নিম। ভাবা যায় না, কলকাতায় এমন সব গাছ এখনও টিকে আছে। সুতপা আবছায়া আর আলোর ছটার আড়ালে শিমুল গাছগুলোয় ফুল ফুটেছে কি না দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।

যাই বলুন, আমাদের এ পাড়াটা এখনও ভালো আছে। বেশ শান্ত এখনও। দাদা থাকেন শ্যামবাজারের দিকে। এখানে আসবার কথা বলছেন। বাসা খুঁজছি। আপনার সন্ধানে থাকলে-টাকলে বলবেন কিন্তু।

বলব। সুতপা ঘাড় নাড়ল।

সামনেই তো থাকি। নিজে না পারেন, কাউকে পাঠিয়ে খবর দিতে পারেন। শ্যামলবাবু — মানে আমার নাম শ্যামল বোস। খোঁজ করলেই নিচের ওরা দেখিয়ে দেবে।

সুতপা হাসল। বাস স্টপেজেও দেখা হতে পারে।

ও হাসল — সশব্দে। পারে কই? অ্যাদ্দিন তো দেখিনি।

চিনতেন না তাই। এখন তো চিনে রাখলেন।

যা বলেছেন। আপিসের তাড়া, তার ওপর বাসের দিকেই মনটা বাঁধা। কে উঠছে-নামছে বা দাঁড়িয়ে আছে, দেখবার সময় কোথায়?

সুতপা মনে মনে খুঁজছিল। একই স্টপেজ, অথচ এই শ্যামল বোসকে কোনও দিন দেখেছে বলে মনে হচ্ছে না তো!

শ্যামল বোস পকেট থেকে কাগজ বের করে বলল, আপনার নেম-অ্যাড্রেসটা টুকে রাখি। বাসার ব্যাপারে কাজ লাগতে পারে। কি বলেন?

সুতপা হাসতে হাসতে বলল, কী মুশকিল! আমাকে কী বাসার এজেন্ট ঠাউরে বসলেন! দালালের বদলে সে সাবধানে এজেন্ট শব্দটা ব্যবহার করল।

জিভ কাটল শ্যামল। সরি, ভেরি সরি। আসলে ব্যাপরটা কী জানেন? আমার ধারণা মেয়েদের পক্ষে এ-সব খোঁজখবর রাখার সুযোগ আছে। পাড়ার কোথায় কী হচ্ছে-টচ্ছে, ওঁদের চেয়ে আর কে জানেন? হাঃ হাঃ হাঃ!

সুতপা বলল, কে জানে বাবা, কোথায় কী হচ্ছে-টচ্ছে পাড়ার! একা থাকি, মেলামেশার সময় কম। ও-সব খবর রাখে তারা, যারা ফ্যামিলিতে থাকে।

কী আশ্চর্য! শ্যামল বলল। আমার মতোই একানড়ে! হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হয় আমার মতো, নাকি লোক রেখেছেন?

সুতপা জবাব দিল, মেয়েদের রাঁধাটা সমস্যা নয়। আপনাদের অবশ্য ঝামেলা।

হ্যাঁ, বড্ড ঝামেলা। লোক রাখার খরচ না হয় দেওয়া গেল, কিন্তু আমি আবার যার-তার হাতে খেতে পারি না। কে যে হাতে সিক্‌নি ঝাড়বে, সেই হাতেই রান্না করবে, তার ওপর ঘাম-টাম — ছ্যা, ছ্যা! তার চেয়ে স্বপাকই ভালো।

সুতপা সায় দিয়ে বলল, আমারও তাই। তাছাড়া ওরা বড্ড চুরি করে।

চুরি? আর বলবেন না। আজকাল চুরি করাটা সবাই মায়ের পেট থেকে শিখে আসে যেন। ঝি-চাকরের কথা ছেড়ে দিন, আমরা ভদ্রলোকেরাই কি কম নাকি? আপিস থেকে পেপারওয়েট অব্দি পকেটে নিয়ে যেতে পিছপা হই না। সে-দিনের এক কাণ্ড শুনুন, জাস্ট একটা উদাহরণ — আমাদের মর‍্যালিটি কোথায় পৌঁছেছে...।

সুতপা বাধা দিয়ে বলল, আমার আপিসেও গত কালকে এক মহিলা...।

শ্যামল বোস পালটা বাধা দিল। সেই কথা। ইচ্ছে করে, হ্যাত্তেরি — দিই সব ছেড়েছুড়ে। একটা পেটের জন্য নরকে পচে মরার অর্থ হয় না।

BanglaBook.org

সুতপা বলল, কিন্তু যাবেনই-বা কোথায়? সবখানেই তো এই।

শ্যামল বোস খিক খিক করে হাসল। বরং সন্নেসীরা ভালোই আছে।

কে জানে! সুতপা নীরস এবং আনমনা হয়ে বলল। আমার কী মনে হয় জানেন শ্যামলবাবু? কেউ কোথাও...।

আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি।

সুতপা মুখ নামিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক লজ্জায় জবাব দিল, সুতপা সুতপা রায়।

শ্যামল বোস হাসল ফের। দেখুন কাণ্ড। কথায় কথায় হুট করে পৌঁছে গেলাম। যে-চিলেকোঠা দেখছেন, ওখেনে। চাদ্দিকটা বেশ খোলামেলা। কিছু মনে না করেন যদি, আসবেন একবার। অন্তত ফাঁকাতে কিছুক্ষণ নিশ্বাস নেওয়া যাবে! কী বলেন?

সুতপা আঙুল তুলে দেখাল। ওই যে-জানালাটা দেখছেন, ওখানে। সাবলেটে আছি। খুব ঝামেলা হচ্ছে। ভাড়াটে ভদ্রলোক মন্দ না, আমার আত্মীয়ের মধ্যেই। কিন্তু ওনার স্ত্রী-মহিলা বড্ড ইয়ে...। আচ্ছা, চলি।

শ্যামল বোস আনমনা হয়ে বলল, আচ্ছা। ফের দেখা হবে।

হল দেখা। কিন্তু বাস স্টপেজে নয়, কিংবা বিকেলের বাসেও নয়। সেই বাজারে।

বাস থেকে নামবার সময় অব্দি ওর কথাটা ভুলেই গিয়েছিল সুতপা। বাজারের দিকে পা বাড়িয়ে তক্ষুনি মনে পড়ে গেল এবং সে কেমন অস্বস্তিবোধ করল। বাজারে থাকলে দেখা হওয়া খুবই সম্ভব, ছোট্ট বাজার কিনা। এবং হয়তো আগ বাড়িয়ে যেচে তার কেনাকাটায় হস্তক্ষেপ করে বসবে। এ এক জ্বালাতন!

আসলে প্রশ্নটা লিবার্টির। সুতপা তার নিজের ইচ্ছে মতো কেনাকাটা করতে পারবে না। তাছাড়া তার মেয়ে-রসনার বিশেষ একটা আলাদা ব্যাপার আছে — সেটা চেনা পুরুষমানুষের অন্তরঙ্গ ছবির সামনে প্রকাশ পাওয়া অস্বস্তিকর। সে টকের সবিশেষ অনুরাগিণী। হয়তো শ্যামল বোস তক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে, খাবেন না, খাবেন না, ওতে শরীরের ক্ষতি হয়। অ্যাসিড হবে।

সতর্ক চোখে চাদ্দিক দেখে বাঁধাকপির সামনে যেই না যাওয়া, অমনি কোত্থেকে এসে গেল লোকটা। কী কাণ্ড! ছিলেন কোথায় বলুন তো? বাসে অন্তত দেখা হবে ভাবলাম...।

সুতপা বলল, বাস তো একটা নয়।

হো-হো করে হাসল শ্যামল। যা বলেছেন! তবে কী জানেন, শেষ অব্দি বাজারে দেখা হবেই ধরে নিয়েছিলাম। সেই ফাঁকে এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বাজারটা সার্ভে করে ফেলেছি। খানিকটা আইডিয়া হল আজকের। কপি নেবেন? নিন, আজ একটু সস্তা। এখানে নয়, ও-দিকটায় আসুন, তাজা কপি। দরও একটু কম। তারপর চলুন, মাছের মুড়ো নেবেন। কপির ঝাল হবে চমৎকার। অত বড়ো একটা মুড়ো কুড়ি টাকা, রীতিমতো রক্তাক্ত! ফের হেসে উঠল শ্যামল।

সুতপা অসহায় বোধ করিছিল। বেশি কিছু নেব না আজ। রান্নার ঝামেলা।

শ্যামল বলল, মেয়েদের আবার ঝামেলা! ও আপনাদের সহজাত দক্ষতার ব্যাপার। আস্ত উনুনে চাপিয়ে দিলেই চমৎকার ব্যঞ্জন হয়ে বেরিয়ে আসবে। চলুন।

শ্যামলকে আজ খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে নাকি? সুতপা ভাবল। কিন্তু সে নিজে উৎ ফুল্ল হতে পারছে না কেন?

এই যে, খানিকটা পেঁয়াজকলি নিন। দাদু, এ-দিকে শোনো।

না না। ও নেব না।

নেবেন না? ভারি চমৎকার লাগে কিন্তু। শীত এখনও তো রয়েছে। কেমন নিস্তেজ দেখাল শ্যামলকে।

BanglaBook.org

সুতপা একটু হাসল। বরং মুলো নিচ্ছি।

মুলো? আর স্বাদ নেই। তবে বলছেন যখন, নিন। এই যে, মুলোর জোড়া কত ভাইটি?

কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরছে, দুটো থলেই বেশ ভারি আর ঠাসা। দু'জনেই হাসতে হাসতে আসছে।

যা সব কেনালেন, রাঁধতে-বাড়তে বছর চলে যাবে। সুতপা বলল।

শ্যামল বলল, যাক না। কাল হরতাল। ছুটি।

সুতপা চমকে উঠল। আরে, তাই তো! কেন তবে মিছি মিছি এ-বেলা...।

শ্যামল বলল, কথাটা আমারও মনে ছিল না। এই মাত্র মনে পড়ল। অভ্যেস হয়ে গেছে আসলে। বিকেলে বাজারটা না করলে মনে হয়, খুব গোলমাল হয়ে গেল কোথাও। তাই না?

কিছুক্ষণ নীরবতা।

হঠাৎ শ্যামল বলল, কাল তো ছুটি। কী করবেন বাড়িতে বসে বসে? চলুন না কোথাও ঘুরেটুরে আসি।

সুতপা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, কোথায় আর যাব? সবখানেই তো ভিড় আর হইচই। বরং...।

বরং কী? সিনেমা-টিনেমা?

সুতপা হাসল। এবার কিন্তু আমার ইচ্ছেমতো।

শ্যামল একটু ঘনিষ্ঠ হল হাঁটতে হাঁটতে। ইচ্ছেমতো মানে?

সুতপা বলল, হ্যাঁ। এ-সব তো আর বাজার করা নয়। দরাদরি, এখান-ওখান ছোটাছুটির ব্যাপার নয়। আমি যেখানে যেতে বলব, যা চয়েস করব...।

শ্যামল সোৎসাহে ওর বাঁ-হাতটা ধরে বলল, পাগল! যা খুশি — আমি রাজি।

সুতপা চোখে ঝিলিক তুলে আলগোছে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে চাপা গলায় বলল, আঃ, কী অসভ্য। চারপাশে সব হাঁ করে দেখছে না!

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গুপ্তধন

রেল ইয়ার্ডের পাশে ইন্দির ওকে টানতে টানতে নিয়ে এল। জায়গাটা এমনিতেই নির্জন, তা এখন তো সন্ধ্যা উতরে গেছে। এখন কেউ ভুলেও এ-দিকে পা দেয় না।

কুতকুতে চোখে চারপাশ একবার তাকিয়ে দেখে নিল টিটো। এক দিকে টিনের বেড়া, অন্যদিকে কয়েক থাক ভাঙা রাবিশের স্তূপ, কিছু বনতুলসী আর বুনো কচুর ঝোপ। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পায়ের নিচে তাই কাদা কাদা ঠেকছে। তাছাড়া পেটগুলানো কেমন একটা গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। কিন্তু ও-সব তখন বড় কথা নয়, কাদা বা গন্ধ টিটো গ্রাহ্য করে না। ওর সারা গা জুড়ে তখন কেমন একটা ভিন্ন ধরনের চাপা উত্তেজনা গজাতে শুরু করেছে। বুকের ভেতর যেন দক্ষযজ্ঞ চলছে। একটু কান পেতে থাকলেই যেন শোনা যেতে পারে ঢিব ঢিব করছে বুকটা। কিন্তু ইন্দিরার সে-দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সাঁড়াশির মতো কেবল ওর হাতের কব্জিটাকে ধরে রেখেছে ইন্দির। আর টানতে টানতে ওকে আরো অন্ধকারে ভিতর সেঁধিয়ে নিয়ে চলেছে।

BanglaBook.org

আরো খানিকটা এগোতেই টিটো ফিস ফিস করে বলল, কেউ দেখে ফেললে কিন্তু চোর-ছ্যাঁচড় ভাববে রে ইন্দির, সেটা কি ভালো হবে?

ইন্দির তখনো ওর হাত ছাড়েনি। বিচ্ছুটাকে ওর বিশ্বাস নেই, হাত আলগা পেলেই ছুটে পালাতে পারে। সাহস দেবার জন্য বলল, এ-দিকে কেউ এলে তো দেখবে। আর একটু ও-পাশে চল টিটো, জিনিসটা একবার একটু দেখেই তোকে ছেড়ে দেব।

টিটোর ডান হাতে রয়েছে একটা কাগজের মোড়ক। কী রয়েছে তাতে কে জানে। তবে যাই থাক, টাকা-পয়সা যে নয়, তাতে সন্দেহ নেই। টাকা-পয়সা কেউ অমন ভাবে কাগজে জড়িয়ে নিয়ে যায় না। তাহলে কি থাকতে পারে, সোনা-গয়না? ধুস্, ধুস্, সোনাই যদি হবে তাহলে অমন ভাবে কেউ ওটাকে সিটের পাশে ফেলে রেখে নেমে যায় না। টাকা-পয়সা বা সোনা-গয়না নাই থাক, কিছু একটা যে আছেই তাতে সন্দেহ নেই। টিটো খুব সর্তক ভাবে ওটাকে আগলে রেখেছে।

ইন্দিরেরও নজর সেই মোড়কটার দিকে। নইলে কোথায় ওর লিলুয়ায় নামার কথা, ও নেমে পড়ল টিটোর পেছন পেছন।

ঘটনাটা ঘটেছে খানিকক্ষণ আগে। দু'জনই ওরা ডানকুনি লোকালে বাড়ি ফিরছিল। দু'জনেরই লিলুয়ায় নামার কথা, কিন্তু মাঝপথে একটা মজার ঘটনা ঘটল। ওদের কামরাটা ছিল ফাঁকা ফাঁকা। স্টেশনে ঢোকবার মুখে গাড়িটা একটু দাঁড়াতেই দু'জন লোক তড়িঘড়ি ট্রেন থেকে নেমে চোখের নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। নামতেই পারে, কত লোকই তো ও-রকম নেমে যায়। কিন্তু টিটোর চোখে পড়ল একটা কাগজের মোড়ক। লোক দুটোই হয়তো ভুলে ওটা ফেলে গেল। কী ভুলো মন রে বাবা। টিটো এগিয়ে এসে সুট করে মোড়কটা তুলে ধরল। কিন্তু খুলতে সাহস হল না। এ-দিক ও-দিক তাকাল, তারপর কামরা পালটাবার জন্য গেটের কাছে আসতেই ইন্দির এসে খপ করে ওর হাত ধরল, কী রে?

টিটো বলল, কিছু নয়।

কিছু না মানে, আমি দেখিনি বলতে চাস?

ইন্দিরের যা স্বভাব, হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারে। টিটো ফিস ফিস করে বলল, চেঁচাস না। ভালো হবে না।

ঠিক আছে, চল নামি তাহলে।

টিটো বুঝল ও ধরা পড়ে গেছে। এ সময় চেঁচামেচি করলে বলাই, বিষ্টুরাও ছুটে আসতে পারে। আর তাহলে সবাই মিলে দেখতে চাইবে জিনিসটা। যদি কিছু দামি মাল থাকে, চোর ঠাওরাতে পারে ওকেই। কেউ বিশ্বাস করবে না, মালটা ওর কুড়িয়ে পাওয়া। ফলে ইন্দিরের কথায় ও নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

নেমে পড়তেই ইন্দির ওক কব্জি ধরল, আয়, এ-দিকে আয়।

কোথায়?

আয় না। আমি একটা মেয়ে বই তো নই। আমাকে অত ভয় পাওয়ার কী আছে শুনি?

ভয় ঠিক নয়। টিটো এই তেরো-চোদ্দ বছরের খেঁকুরে মেয়েটাকে কোনো দিন বিশ্বাস করে না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ও জিনিসটাকে যে হাতাবার তাল কষছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু টিটো এক মুহূর্তে কী ভাবল, তারপর রাজি হয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করে নিল, তেমন অবস্থা বুঝলে ও ধানখেতের মধ্য দিয়েই দৌড় লাগাবে। ইন্দির তো দূরের কথা, অনেক বড়রাও ওর সঙ্গে দৌড়ে পারে না।

ইন্দিরের সঙ্গে গায়ে গায়ে সেঁটে ও এগিয়ে চলল। কিন্তু ততক্ষণে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। রেল ইয়ার্ডের পাশটায় আরো অন্ধকার। সামনেই একটা আদ্যিকালের তেঁতুল গাছ। সন্ধ্যা হলেই

BanglaBook.org

এ-সব গাছে হাজার হাজার পাখি এসে ভিড় জমায়, পাখিগুলো এখন ডালে পাতায় কোথায় কোথায় লুকিয়ে পড়েছে, কে জানে।

টিটো গাছটার দিকে বেশিক্ষণ তাকাল না। ভাগ্যিস্ ভালো, ইন্দির এখন ওর পাশে আছে। নইলে একা একা ও এই ভূতুড়ে গাছটার দিকে এগোতেই পারত না। অনেক সময় মানুষের আত্মাও যে ওই রকম পাখির বেশ ধরে গাছের ডালে বসে থাকে না, কে বলতে পারে। কোনটা আসল পাখি আর কোনটা প্রেতাত্মা, টিটোর পক্ষে তা বিচার করা সম্ভব নয়।

আরো খানিকটা এগিয়ে একেবারে তেঁতুল গাছের গোড়ায় এসে ইন্দির বলল, বোস এখানে। এই অন্ধকারে এ-দিকে কেউ আসবে না! একটু শান্ত হয়ে একবার বোস তো।

টিটোর কেমন ভয় ভয় লাগছিল। উপায় না দেখে ও ইন্দিরের গা ঘেঁষে বসে পড়ল। ঘেঁটু ফুলের মতো ভেজা ভেজা কেমন যেন একটা গন্ধ আছে ওর গায়ে। গন্ধটা ওর স্নায়ুর ভেতর ঢুকে কেমন যেন গেঁথে যেতে লাগল।

ইন্দির বলল, দে এবার। জিনিসটা দেখি।

টিটো এ-রকমই একটা ভয় পাচ্ছিল। গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, ওটা আমার।

আমার তো কী হয়েছে। দেখলে ক্ষয়ে যাবে নাকি! দে না।

টিটো এবার একটু সরে বসার চেষ্টা করে। কিন্তু গছটার দিকে চোখ পড়তেই আবার চমকে ওঠে। এ-দিককার ডালটা কি আগে থেকেই এত ঝোলানো ছিল। নাকি টিটো একটু সরার চেষ্টা করতেই ওটা অমন ঝুলে পড়ল। ও বলেই ফেলল, আমার ভয় করছে।

ইন্দির ওর দিকে তাকিয়েই ছিল, বলল, তুই চুরি করেছিস না ডাকাতি করেছিস যে ভয় করবে।

ও-কথা না। টিটো আঙুল তুলে তেঁতুল গাছের ঝোলান ডালটার দিকে ইঙ্গিত করল। কী আছে গাছে? কেমন কৌতুকে তাকায় ইন্দির।

টিটো ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারল না। এই রাত্রিবেলায় ওখানে কী থাকতে পারে। আবার ও খানিকটা সরে ইন্দিরের গায়ে গায়ে সেঁটে বসল।

আর সেই সুযোগে ইন্দির ওকে বুকের কাছাকাছি টেনে নিল।

ইন্দিরের গা-টা কেমন কুকুরের পেটের মতো গরম। এক চাপ নরম মাংসও যেন চেপে বসেছে ওর গায়ে। টিটোর সারা গায়ে কেমন ঝিম ঝিম করা ভালো লাগার একটা স্রোত বইতে শুরু করল। ও বোবা হয়ে গেল।

ইন্দির ওর ঘাড়ের ওপর একটা হাত তুলে রাখল, তুই না একটা ক্যাবলা। পুরুষমানুষের অত ভয় থাকতে নেই।

টিটো কথা বলল না। কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না ওর।

আমি যদি তোর মতো ছেলে হয়ে জন্মাতাম, এত দিনে দেখতিস কত কিছু করে ফেলতাম। ইন্দির ওর গায়ে আলতো করে একটা টোকা মারল।

ঘোড়ার ডিম করতিস। ছোট্ট করে উত্তর দিল টিটো।

অবশ্য তুই এখনো পুরোপুরি ছেলে হয়ে জন্মাসনি। তুই এখনো শিশু, মায়ের দুধ খাস।

ভ্যাট। এক ঝটাকায় ইন্দিরের হাতটাকে কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দিল টিটো।

ইন্দির আবার হাতটা তুলে আনল ওর কাঁধে, খাস না বুঝি? কত বয়স তোর শুনি? আমি যত দূর জানি, তোর এখনো দশ হয়নি।

টিটো দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এখানে হাত দিয়ে দেখ না, গোঁফ উঠছে আমার। দশ বছরে কারো গোঁফ ওঠে না।

BanglaBook.org

দেখি! অন্ধকারে ইন্দির হাত তুলে এনে ওর ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে দিল, আই বাপ মেয়েদের মতো ঠোঁট রে তোর। কী নরম।

বাজে কথা। তোর ঠোঁট বুঝি ছেলেদের মতো?

হাত বুলিয়ে দেখ না। দেখলেই বুঝতে পারবি।

আমার দরকার নেই। টিটো আবার গাছটার দিকে তাকাল। গাছের অন্ধকারটা ক্রমশ যেন কেঁপে কেঁপে বড় হয়ে উঠেছে। অথচ ইন্দিরটার কোনো নজর নেই সে-দিকে। একটা কিছু হয়ে গেলে তখন বুঝবে।

ইন্দির বলল, ঠিক আছে, অনেকক্ষণ তো হল, এবার খুলে দেখা। কী পেয়েছিস দেখি। টিটো আবার শক্ত করে মোড়কটাকে ধরে বুকের মধ্যে লুকোল।

কী হল, দেখা না। কথা দিচ্ছি আমি ছোঁব না। দেখা।

টিটো বলল, ঠিক আছে, তুই যদি না ধরিস তাহলে আমি দেখাতে পারি।

বললাম তো ধরব না।

টিটো এবার আড়চোখে একবার ইন্দিরের চোখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে ছাই কিছু বোঝা যায় না। তার বদলে ওর চিবুকের কাছে হঠাৎ একটু ইন্দিরের গরম নিশ্বাসের হলকা লাগল।

ঠিক আছে, তুই একটু সরে বোস, আমি দেখাচ্ছি।

একটু ঢিলে হয়ে সরে বসল ইন্দির।

টিটো কাগজের মোড়কটা কোলের ওপর রেখে ধীরে ধীরে গুপ্তধন আবিষ্কার করতে বসে গেল।

হায়, হায়, এ কী রে! কেমন যেন মিইয়ে পড়ল টিটো। কয়েক ফ্যাতা কাগজের ভাঁজ খুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল পাকে পাকে সুতলি জড়ানো দুটো বোমা। এতক্ষণ এ দুটোকেই ও গুপ্তধন মনে করে বুকের ভেতর আঁকড়ে রেখেছিল। কী বোকা!

ইন্দির টিটোর অবস্থা দেখে হি-হি করে হেসে উঠল, খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে। আরো ওটা আমার আমার কর।

আমি কী করে বুঝব, লোক দুটো বোমা ফেলে যাবে ট্রেনে।

তুই একটা অপয়া। আমি ভাবছিলাম মণিমুক্তো মোহর কত কিছু থাকবে।

তোর জন্যই তো এমন হল। তুই যদি অমন করে আমার পিছু না লাগতিস তাহলে এমন হত না।

ঘোড়ার ডিম হত তাহলে। দাঁড়া ও-দুটোকে আবার জড়িয়ে রাখি। কপাল ভালো, এতক্ষণ ও-দুটো নিয়ে ঘুরছিস, ফেটে যায়নি। ফেটে গেলে কী কেলেঙ্কারি হত বল তো!

ইন্দির ভয়ে বোমা দুটোকে আবার কাগজের মোড়কে জড়িয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

মিছি মিছি আমরা গাড়ি থেকে নেমে এই এখানে এলাম। টিটোর গলায় আক্ষেপ।

এখানে এসে ভালোই হয়েছে। বোকার মতো কোথায় গিয়ে তুই ওটাকে খুলতিস আর অমনি পুলিশ এসে খপ করে তোকে ধরত। তুই তো এখনো পুলিসের গুঁতো খাসনি কোনো দিন। খেলে বুঝতিস।

তুই খেয়েছিস বুঝি?

আমি বড় হয়ে গেছি না। মেয়েদের গায়ে পুলিশ কখনো হাত দেয় না। তাছাড়া এবার থেকে আমি ফ্রকের বদলে শাড়ি পড়তে শুরু করব।

টিটো একটুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস বলে তোর অনেক সুবিধে।

BanglaBook.org

সুবিধে কেন? কৌতুকে ড্যাব ড্যাব করে তাকায় ইন্দির।

কেন কী আবার। নারানবাবু তোকে মাঝে মাঝেই পয়সা দেয়, আমি দেখিনি বুঝি।

সে তো আমি ওর গা-হাত-পা টিপে দিই বলে, দোকান থেকে চা সিগারেট এনে দিই, জল তুলে দিই তাই।

তুই মেয়ে বলেই তোকে দিয়ে ও-সব করায়। আমি কাছে গেলে কেমন খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে দেখিস না। এমন ভাব দেখায়, যেন ভিক্ষুক তাড়াচ্ছে।

ইন্দির হেসে উঠল, তুই বড্ড ছেলেমানুষ। এই জন্যই তো বলছিলাম, তুই মায়ের দুধ খাস।

আবার খানিকটা বিরক্ত হয় টিটো। সত্যি কথা বললে তো তোর গায়ে লাগবেই।

সত্যি কথা আবার কী, নারানবাবু আমাকে এমনি এমনি পয়সা দেয় না, রীতিমতো খাটিয়ে পয়সা দেয়।

টিটোর ঠোঁটের ডগায় অনেক খারাপ কথা এসে যাচ্ছিল, চেপে গেল। অনেক সময় অনেক সত্যি কথা বলা যায় না। তাছাড়া ইন্দিরকে এ সময় খারাপও লাগছিল না। ভগবান যেন ওকে ছানা-মাখন দিয়ে গড়েছে। তাছাড়া ওর শরীরের গন্ধটার মধ্যেও কেমন যেন একটা আকর্ষণ রয়েছে।

আবার একটু গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছে ওরা। টিটোর কাঁধের ওপর আবার একটা হাত তুলে দিয়েছে ইন্দির। টিটোর বুকের ভিতর যেন দুম দুম করে শব্দ হতে শুরু করেছে। কেমন আড়ষ্ট হয়ে ও সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইন্দির ওর হাতখানা এবার নিজের কোলের ওপরেই টেনে নিল, ঠিক হয়ে বোস না টিটো। তুই না ভয়ানক ভিতু, ভয়েই মরে গেলি। অথচ এই সাহস নিয়ে তুই রেলে ঘুরে বেড়াস কী করে, বুঝি না।

টিটো অস্বীকার করতে পারে না যে, ও ভীতু। চুপ করেই থাকে।

তাছাড়া তোর গায়ে একদম জোর নেই, এই তো তোর শুকনো শুকনো হাত।

টিটো একটু বিব্রত ভাবে হাসবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, তোর চেয়ে বেশি জোর। ইচ্ছে করলে আমি কালুদার মতো ঘুষি মেরে নারকেল ফাটাতে পারি।

ছাই পারিস। যাদের হাত-পা অত ঠাণ্ডা তারা কিছু পারে না।

তোরও তো ঠাণ্ডা। টিটোর গলার স্বর ফ্যাস ফ্যাস করে উঠল।

আর ঠিক এই সময়ই ওরা দু'জনে চমকে উঠল। কে একটা লোক যেন এ-দিকেই এগিয়ে আসছে। হাতে একটা টর্চ। ইন্দির ফিস ফিস করে বলল, চুপ।

টিটো ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল, সত্যি সত্যি একটা ছায়ামূর্তি। মূর্তিটা কি তেঁতুল গাছের দিকটাতেই এগিয়ে আসছে নাকি! কী জানি বাবা, কী মতলব রয়েছে মাথায়।

কে রে বাবা! এ-দিকে এই অন্ধকারের দিকে কী চায়। ইন্দিরও ঠিক বুঝতে পারছে না, কে হতে পারে লোকটা। হঠাৎ যদি ওদের দেখে ফেলে এখানে, নির্ঘাত চোর চোর করে চেঁচিয়ে উঠবে।

স্টেশনের দিকটা এখন নিঝুম হয়ে থাকার কথা। এ-সব স্টেশনে ট্রেন এলেই যা একটু লোকজন দেখা যায়। অনায়াসে ওরা স্টেশনে গিয়ে বসেও গল্প করে কাটাতে পারত। পরের লোকাল আসতে রাত ন'টা।

ইন্দির ফিস ফিস করে ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল, কথা বলিস না টিটো। লোকটা বোধহয় চৌকিদার। শেডের পিছন দিকটা দেখতে এসেছে।

টিটো কথা বলবে কী, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ইন্দিরই এখন ওর ভরসা। মেয়েটার আর যাই হোক, বেশ সাহস আছে। ফলে ইন্দিরের গায়ে গায়ে একদম সেঁটে যাচ্ছিল। যেন ইন্দিরকে ও সামনে রেখে পাঁচিলের মতো পিছনে লুকোবার চেষ্টা করছিল।

ছায়ামূর্তির হাতের টর্চটা একবার তেঁতুল গাছের গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। আলোটা আর একটু নিচের দিকে নামলেই ওরা ধরা পড়ে যেত।

BanglaBook.org

কিন্তু ইন্দিরের যেন ভয়ডর বলতে কিছুই নেই। এই অবস্থাতেই ও ফিস ফিস করে কী যেন বলতে চাইছে।

কী? কী বলছিস?

এখানে বসাটা ঠিক হচ্ছে না। চট করে ওই রাবিশগুলোর পেছনে চল।

টিটো একটু ঝাঁকি খেল। তুই আগে যা।

ঠিক আছে। আয়, আমার পেছনে আয়। শব্দ করিস না যেন।

ইন্দির হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে সুট করে রাবিশের স্তূপের পিছনে এসেই মাথা নিচু করে বসে পড়ল।

টিটোও অনুসরণ করল ওকে। যত রাজ্যের খোয়া ভাঙা আর পাথরের ঢেলার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল টিটো।

ইন্দির আবার ওর গায়-গায় সেঁটে গেল। তারপর একটু একটু করে মাথা তুলে দেখতে লাগল লোকটা কী করে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ ইন্দির ফিস ফিস করে বলল, আর একটু জোরে চেপে ধর না আমাকে, বেশ লাগছে।

অন্য সময় বলে টিটো ওর নাকের ওপর ঘুঁষি চালিয়ে দিত, কিন্তু এখন ইন্দির ছাড়া ওর উপায় নেই।

টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে লোকটা ততক্ষণে প্রায় তেঁতুল গাছটার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। কী জানি বাবা, কাগজের মোড়কটা ওর চোখে পড়ে গেছে কি না।

ইন্দির ওর গলা টিটোর গলার সঙ্গে চেপে রেখেছে। ভীষণ বিড়ি খায় ইন্দির। ওর মুখ থেকে বিড়ির গন্ধ ভেসে আসছে। তা হোক, এখন আর বিড়ির গন্ধ নিয়ে ভাবলে চলবে না ওর।

ছায়ামূর্তিটা কিন্তু এবার শেডের দিকটা দেখে নিয়ে আবার ফিরে যেতে শুরু করেছে। চৌকিদার যে-সন্দেহ নেই। চৌকিদার না হলে অমনি করে ফালতু ফালতু আসে কেউ।

যাক বাবা, বাঁচা গেল। ইন্দির আরো কিছুক্ষণ পর বলল।

টিটোও যেন ততক্ষণে আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, চলে গেছে? ও ইন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

হ্যাঁ গো মশাই, গেছে। ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেছিস তুই।

টিটো একটু সহজ হবার জন্য হাসল, ভয় না। আসলে লোকটা আমাদের দেখে ফেললে ঝামেলা হত।

ছাই করত আমাদের। আমরা তো আর চোর নই। যারা চুরি করে তাদের ধরুক না। এই টিটো, আর একটু চেপে ধরনা আমাকে।

ধুত। টিটো মুহূর্তের মধ্যেই এর হাত দুটো ইন্দিরের গা থেকে সরিয়ে আনল। চল, উঠি এবার।

উঠে কোথায় যাবি? পরের লোকাল আসতে রাত ন'টা। এখনো ঢের দেরি।

চল না প্ল্যাটফর্মে যাই? লোকটা আবার যদি দেখতে আসে?

ছাই আসবে। তুই না একটা নাম্বার ওয়ান ক্যাবলা।

ক্যাবলা তো ক্যাবলা। টিটো ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ইন্দির বলল, তুই একলা যাস তো, আমি চেঁচিয়ে চৌকিদারকে জানিয়ে দেব।

চৌকিদারের কথায় ও আবার একটু থমকে দাঁড়ায়। এ-দিক ও-দিক তাকায়। ইন্দিরও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে এক পলক ও টিটোকে দেখে নিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল।

হাসছিস যে? প্রশ্ন করে টিটো।

তোর অবস্থা দেখে।

BanglaBook.org

কেন, কী করেছি আমি? তুই না এমন করছিস যেন —।

ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। আর হাসব না। এই আমার দিকে একটু তাকা দেখি।

টিটো ওর চোখের দিকে তাকাল, কী হয়েছে? দেখল, অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে ইন্দিরের চোখ।

ইন্দির ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর হাত দুটো বিছিয়ে দিল, দাঁড়া, একটা মজা করব।

কী মজা। বুকের ভেতর আবার ঢিব ঢিব শব্দ শুরু হল টিটোর।

আমার দিকে তাকিয়ে থাক না।

তাকিয়েই তো আছি। টিটো মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকল। ছায়া ছায়া অথচ নিটোল মোমের মতো ইন্দিরের মুখখানা যেন এগিয়ে আসছে। ইন্দির যেন সম্মোহন করে ফেলেছে ওকে। টিটো চোখ ফেরাতে পারল না। জাদুকরীর মতো ইন্দির যেন এখন চোখের খেলা দেখাতে শুরু করেছে।

এক ঝলক উষ্ণ নিশ্বাস ওর কপালে ছুঁয়ে গেল। টিটো ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। ঝাঁঝালো একটা গন্ধ যেন ক্রমশ ওকে ঘিরে ফেলেছে। ও বিড়ি খাওয়া কটু এক জোড়া ঠোঁটের স্পর্শ পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বুকের ভেতর দুম দুম করে বোমা ফাটতে শুরু করল। অনাস্বাদিত একটা জগতে ধীরে ধীরে পৌঁছে যেতে শুরু করল টিটো।

অনেকক্ষণ ওইভাবে কেটে গেল ওদের। লালার আর রক্তে ঠোঁটটা জ্বালা করে উঠতেই টিটো একটু শব্দ করে কঁকিয়ে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল ইন্দির, কী হল?

সমস্ত শরীরটা তখনো থর থর করে কাঁপছে। কথা বলতে পারল না টিটো। জামাটা উলটে নিয়ে ঠোঁট মুছতে শুরু করল।

ইন্দির বলল, ধুত! ফালতু। মায়ের দুধ খা-গে-যা।

টিটো কথা বলল না।

ইন্দির বলল, চল রে ক্যাবলা। প্ল্যাটফর্মেই যাই চল। আয়। টিটোর হাত দুটো ও সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল।

রাবিশের স্তূপ থেকে তেঁতুল গাছটার কাছে আসতেই টিটোর চোখে পড়ল কাগজের মোড়কটা।

ইন্দির বলল, কী দেখছিস? ভয় নেই রে ক্যাবলা, ফাটবে না, আয়।

ফাটবে না কেন? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় টিটো।

ইন্দির হাসে, সব বোমাই কি ফাটে নাকি! তোর মতো ভেজা যে, আয়।

ওরা প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে লাগল॥

BanglaBook.org

পূর্ণেন্দু পত্রী

অন্ধকারে নিশিকান্ত

আকাশ বড় দয়ালু। আন্ধকারেও সে রোদ আলো দেয়। প্রকৃতিও কম দয়ালু নয়। মরা চোখের দৃষ্টি খামতিটাকে পুষিয়ে দেয় অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর অতিরিক্ত তৎপরতা দিয়ে। আকাশ এবং পৃথিবীর এই জাতীয় উদার সাহায্য না পেলে অন্ধের পক্ষে কঠিন হত বাঁচা।

নিশিকান্ত অন্ধ। গত বৈশাখেই তার মরে যাওয়ার কথা। কিন্তু অন্ধ বলেই সে বেঁচে গেল। নিজেও বাঁচল, একটা সংসারকেও পথে বসার হাত থেকে বাঁচাল। আড়ালে আবডালে লোক বলাবলি করে, উনি মরবার মানুষ নয়। নিশিকান্তর বয়স নিয়ে নানা মত। কেউ বলে আশি, কেউ ভাবে পঁচাশি। কেউ তাতেও সন্তুষ্ট নয়। উনি কি আজকের লোক গা? মোর ঠাকুর্দার মুখে ওঁর কত কিত্তি-কথা শুনেছি। সেই ঠাকুর্দা চিতেয় গিয়ে শুয়েছেন কবে। সে-শ্মশানে এখন স্কুলবাড়ি উঠেছে। তবে?

গত বৈশাখেই নিশিকান্ত মারা যেতে পারত। আগুন লেগেছিল বাড়িতে। বাড়ির বউ-ছেলে-মেয়ের দল সকাল থেকে চৌধুরীদের বাড়ি খাটা-খাটনির কাজে। চৌধুরীদের বাড়িতে শ্রাদ্ধ। গোটা গ্রাম খাওয়াবে। শুধু বাটনাই বাটা হচ্ছে তিন রাত্রি ধরে। বাড়িতে ছিল মাত্র তিন জন লোক। নিশিকান্তর ছোট ছেলে সহদেবের বউ কুন্তি। বড় ছেলে কার্তিকের নাতি পাঁচ বছরের ঘনা। ঘনার পেটটা খারাপ। জন্ম থেকেই পেটরোগা ছেলে। অসুখে ভুগে ভুগে, দিনরাত শুধু খাই খাই কান্নায় কেঁদে পেটটা তার লাউয়ের মতো ফোলা। তাই তাকে নিয়ে যায়নি তার মা-বাবা দাদু-দিদিমারা। মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখে গেছে, ফেরার সময় তার জন্য মুড়ি-মুড়কি দই-মিষ্টি নিয়ে আসবে। কুন্তি যায়নি গরু-বাছুরের দেখাশোনা আর সংসার সামলানোর অন্যান্য কাজের জন্য। নিশিকান্ত ছিল তার নিজের ঘরে, আবছা অন্ধকারে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে যেমন শুকিয়ে থাকে, তেমনি। বেঁচে থাকার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি হাঁটাচলা ছাড়া সে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে না। ওইটুকু হাঁটাচলাও করে কখনো লাঠি ধরে, কখনো নাতি-নাতনির সাহায্যে।

নিশিকান্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিশ্রী এক ধরনের গন্ধে। আর সেই সঙ্গে কানে আসছিল আগুনে বাঁশ-ফাটার ফট্ ফট্ শব্দ। আগুনে ঘর পুড়লে কেমন গন্ধ হয়, নিশিকান্ত জানে। তার এক জীবনে এ-রকম গন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে বহুবার। অভিজ্ঞতা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল নিমেষে। লাঠি হাতে নিয়ে পড়ি মরি করে ছুটে এসেছিল উঠোনে। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল প্রাণপণ শক্তিতে। কুন্তি তখন বাড়ির ধারেকাছে ছিল না। নিশিকান্ত দেখতে পেয়েছিল কেবল ঘনাকে। কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে সে ঘর পোড়ানোর আগুনের নাচ দেখতে পেয়েছিল। তার হাতে এক গোছা শুকনো পাকাটি। মুখের দিকটা আগুনে পোড়া। রান্নাঘর থেকে পাকাটি জ্বালিয়ে খেলা করতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিল সে-ই।

ওরে কে আছিস? ও বউমা! পাড়ার মানুষরা কে আছ গো। ওরে ও কার্তিক। ঘরদোর সব গেল যে আগুনে পুড়ে। হায় ভগবান! এ কী কাণ্ড করলে গো! ওরে ও সহদেব, ও বুড়ি, ও বউমারা, ও খেন্তি, ও নন্ত, হায়! হায়! গ্রামের মানুষরা কি অন্ধ হায়ে গেল নাকি? কে আছ গো, ছুটে এসো না একবার!

শেষ পর্যন্ত ছুটে এসেছিল গোটা গ্রামের প্রায় অর্ধেকটা। গরুর জন্য কুঁড়ো-জাউলি সিদ্ধ করতে বসিয়ে কুন্তি এক ফাঁকে ছুটে গিয়েছিল চৌধুরীদের বাড়ি। কার্তিকের বড় ছেলে হরিপদর বউ মেনকার গোপন নির্দেশ মতো। চৌধুরী বাড়ির বিপুল আয়োজনের মধ্য থেকে সামান্য হাত সাফাই করে রোজই সে কিছু না-কিছু সরিয়ে রাখে। কুন্তির মারফৎ সেগুলো চালান আসে বাড়িতে। পেট কাপড়ের আঁচলে তিন টুকরো কাঁচা মাছ নিয়ে কুন্তি যখন হন হন করে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময়েই দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল লাল আগুনে পুড়ছে তার নিজের মাথা বাঁচানোর আশ্রয়। সে ভেবেছিল, অন্য কারো কপাল পুড়ছে। কুন্তি যখন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন আগুন নেভানো শুরু হয়ে গেছে, বিশ-পঁচিশ মানুষের অবিশ্রান্ত এবং গলদঘর্ম চেষ্টায়। পুড়ে ছাই হয়ে গিছল রান্নাঘরটা। ভাগ্যিস রান্নাঘরে চালের সঙ্গে বসতবাটির চালের ছোঁয়াছুঁয়ি ছিল না, তাই খুব অল্পের উপর দিয়ে কেটে গিয়েছিল ফাঁড়াটা। বসতবাটির বাঁ-দিকের চালের খানিকটা পুড়েছে উড়ো আগুনের হল্‌কা থেকে।

BanglaBook.org

এই বুড়ো মানুষটা না থাকলে আজ তোরা সব্বোসান্ত হয়ে যেতু, বুঝলি কার্তিক।

গ্রামসুদ্ধ মানুষ নিশিকান্তর প্রশংসায় মুখর। যে-আগুন থেকে সংসারকে বাঁচিয়েছিল নিশিকান্ত, সেই সংসারই এক দিন নিশিকান্তকে নির্বাসিত করল তার নিজের ঘর থেকে। আগুনে পুড়বার পর থেকেই দেখা দিয়েছিল সমস্যাটা। বাঁ-দিকের যে-অংশটা পুড়েছে, সেইদিকে ছিল নিশিকান্তের ছোট ছেলে গণেশের ঘর। যত দিন না চাল ছাওয়া যায়, গণেশ তার বউ ছেলে নিয়ে কোথায় থাকবে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড় ভাই কার্তিকের কাছে বড় সমস্যা। তখন গণেশই দিয়েছিল প্রস্তাবটা।

বাবাকে একটা কাজ করলে হয়নি? বৈঠকখানাটাকে ছুই দিয়ে ঘিরে ওকে থাকতে দিলে কী হয়?

গণেশের প্রস্তাবে রাজি হয়নি কার্তিক। বরং মনে মনে সে বিরক্ত হয়েছিল। বুড়ো বাপের উপর এতটুকু মমতা নেই গণেশের। কিন্তু এক দিন কার্তিককে গণেশের প্রস্তাবে সায় দিতে হল। সেজ ভাই নকুলের বড় ছেলে তারকের বিয়ের সময়। তারককে তো একটা ঘর দিতেই হবে। অগত্যা নিশিকান্তকে ঘর ছেড়ে আসতে হল। একটা লাঠি, একটা ছেঁড়া মাদুর, তার চেয়ে ছেঁড়া এবং ময়লা একটা কাঁথা, একটা বেগুনে রঙের সুতির চাদর, লাল চামড়ায় তালি দেওয়া এক জোড়া জীর্ণ কালো চটিজুতো, কফ, থুতু ফেলার আর রাত্রে আগুনে হাত-পা সেঁকার জন্য দুটো মাটির মালসা, নিজস্ব হুঁকো, লাঠি এই রকম কিছু আসবাবপত্র নিয়ে তারকের বিয়ের দু'দিন আগে নিশিকান্ত বাসা বদল করল মাঘ মাসের এক বিকেল বেলায়। বিয়ের ক'টা দিন খুব দুঃখ পায়নি। বাড়ি ভর্তি হৈ-হৈ রৈ-রৈয়ে ভুলেছিল। বিয়েবাড়ির উৎসবটা নিভে যাওয়ার পর থেকেই তার মনের এবং শরীরের কষ্ট ক্রমাগত বেড়ে চলে। দিনটা তবু কোনোমতে কাটাতে পারে। সন্ধে থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপে। আম জাম তাল খেজুরের ডালপালা ঝাঁকিয়ে হু-হু করে ছুটে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া।

নিশিকান্তর চোখ থাকলে বুঝি দেখতে পেত ঠাণ্ডা হাওয়া কেমন করে লোমকূপের ফুটো দিয়ে কাঁথা সেলাইয়ের ছুঁচের মতো ঢুকে পড়ছে তার শরীরে। মেনকা মালসা ভর্তি আগুন রেখে যায় পায়ের কাছে। যতক্ষণ আগুন, ততক্ষণ তাপ। কিন্তু মালসার আগুন তো সারা রাত থাকে না। তখন আবার হাড়ে-মাসে কাঁপুনি। এই জাতীয় শরীরের কষ্টের সঙ্গে আবার আরো একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে নিশিকান্তর। সে-সমস্যা আলোর। ভোর হবার পর থেকেই তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে এক রকমের হলুদ আলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রঙটা ক্রমশ লালচে হয়ে ওঠে। আবার বিকেল থেকে লালচে ভাবটা মরতে মরতে কালো। আর সেই আলোয় ছায়া ফেলে, আলোকে ভেঙেচুরে কারা যেন আসে দিনরাত। নিশিকান্ত কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।

কে যায়?

আমি।

আমি বললে, আমি কী আর বুঝব। কী নামটা বল না হে।

আমি শশো।

ও শশো। হ্যাঁ রে, কে যেন বলতেছিল, খুব নাকি কুমড়ো ফলিয়ছু এবার। তা দিয়ে গেলিনি তো এতটা খেতে। তোর বাবা কেমন আছে? ভালো? হ্যাঁ রে, উ-পাড়ার গোবিন্দ সাঁতরার ছেলে কানাইয়ের সঙ্গে তোর দেখা হয়? হলে বলিস, তো একবার দেখা করতে। মোকে একটা বই কিনে দিবে বলেছিল, রামায়ণ না মহাভারত, বলিস তো দেখা হলে।

সে তো এখন কলকাতায়। দেশে আসে ন'মাসে ছ'মাসে একবার।

কেন, ন'মাসে ছ'মাশে আসে কেন? দেশের ছেলে দেশে আসার সময় পায়নি? বুড়ো মা-বাবাকে দেখবার ইচ্ছে করেনি বুঝি? আজকালকার ছেলে-ছোকরারা সব কেমন হয়ে যাচ্ছে। বাপ-মা, দেশ-গেরামের দিকে যেন আর টান নেই। তার বউ কোথায় থাকে? কলকাতায়? ও, ওই হয়েছে কাল।

BanglaBook.org

আজকাল কী স্বভাব হয়েছে জানো তো মানুষের? নিজেরটি হলেই হল। নিজের মাগ-ছেলের পেট ভরলো তো জগৎ জয়। হ্যাঁ রে শশো, আমাদের তারকের বউ দেখেছু? কেমন হয়েছে? শশো... শশো।

শশধরের উত্তর আসে না। তার বদলে নিশিকান্তর কানে আসে একদল কচি-কাঁচা ছেলের কণ্ঠস্বর।

এই ক'দিনে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে নিশিকান্তর স্বভাবে। কাউকে দেখলেই সত কাহন প্রশ্ন। তাদের কাজ থাকে। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। চলে যায়। বুড়ো ডাকে আর ছেলে-ছোকরারা এ মজার দৃশ্যে দাঁত ঝিকিয়ে হাসে। ক্রমে ক্রমে ছেলে-ছোকরারাও বিরক্ত হয়ে উঠল তার এই ডাকাডাকি আর প্রশ্ন করার একঘেয়েমিতে। অনেকে কার্তিকদের ওই বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যেতে ভয় পেত। সোজা-সাপটা পথ জেনেও অনেকে যেত ঘুর পথে। আবার কেউ যেত বেড়ালের মতো নরম পায়ে। তবু শব্দাটা ঠিক কানে এসে যায় নিশিকান্তর।

কে যায়?

আমি হনুমান।

কোনো কোনো পাজি ছেলে বুড়োর মসকরা করে।

হনুমান। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোর বাবার নাম কী বল? বলনা রে।

জাম্বুবান।

খচ্চর ছেলে কোথাকার! বাবা ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলতে শেখেনি। আবার হাসি হচ্ছে। আয় দিকিন আমার সামনে। তোর মাথাটা থেতো করে দি।

রাগে নিশিকান্তর হাড় জিরজিরে শরীরটা ঝোড়ো হাওয়ায় পিদিমের মতো কাঁপে। অন্ধ হলেও কোটরের মধ্যে চোখের থলথলে রক্তহীন সাদা অংশটা থরথরিয়ে কাঁপে।

এই ভাবে দিন কাটছিল নিশিকান্তর। এক দিন দুপুরে ঘটে গেল একটা কাণ্ড। তারকের বউ নলিনী দুপুরের খাওয়া সেরে কাদের বাড়ি যেন গিয়েছিল বেড়াতে। বিকেল বেলার ফিরছিল পাড়ার এক জন মেয়ের সঙ্গে। নিশিকান্ত দেখতে পেল লাল আলোর মধ্যে আরো একটু বেশি লাল কী যেন এগিয়ে আসছে। খানিক পরে মনে হল ছায়ার সংখ্যা দুটো। আর এগিয়ে আসছে তার এই বৈঠকখানার দিকে। হ্যাঁ, ছায়া দুটো তার কাছ দিয়েই চলে যাচ্ছে।

নিশিকান্ত-পায়ের শব্দে বুঝতে পারে মেয়েমানুষ।

কে যায়?

নিশিকান্তর চোখ ঘুরতে থাকে তাদের চলার সঙ্গে। ছায়া দুটো হারিয়ে যায় তার চোখের সীমানা থেকে। কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। সে আরো জোরে একবার চেঁচিয়ে ওঠে।

কে যায়?

কে যায়? উত্তর দিলে জিভে পোকা পড়বে? তবুও উত্তর আসে না। নিশিকান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আজকাল কেউই প্রায় উত্তর দেয় না। বিশেষ করে ছেলে-ছোকরারা। বয়স্করা তবুও কেউ কেউ দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে।

নিশিকান্ত ডাক ছাড়ে, রম্ভা, ও রম্ভা রম্ভা-আ-আ।

রম্ভা, কার্তিকের সেজ ছেলের বউ। গোটা বাড়ির মধ্যে নিশিকান্তর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তারই নজরটা বেশি। রম্ভা সদ্য ঘুম থেকে উঠে উঠোনে শুকোতে দেওয়া ধান তুলছিল। নিশিকান্তর ডাকে সাড়া দেবার মুহূর্তে সে দেখতে পায় নেড়ি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল খিল করে হাসছে। নেড়ি অর্থাৎ নলিনীর সঙ্গে আসছিল যে-মেয়েটি। বাড়ির ক'জন বউ-ঝি তাকে ঘিরে হাসির কারণ জানতে চাইছে।

BanglaBook.org

রম্ভাও কৌতূহল প্রকাশ করে, কী হয়েছে, আরে ও নেড়ী?

নেড়ীর হাসি থামে না। ও-দিকে নিশিকান্তর চিৎকার। নেড়ী শেষ পর্যন্ত হাসি থামিয়ে বলে, আমরা আসতেছিনু। আমি আর বউদি। বুড়ো দাদা আমাদের পায়ের সাড়া পেয়ে যেই না হাঁক দিয়েছে, কে যায়। বউদি করেছে কী ভয় পেয়ে আমাকে জাপটে ধরেছে কোমরের কাছে। আমার কী সুড়সুড়ি লাগতেছিল। বউদিকে বলি ছাড়ো নাগো কোমরটা। বউদি তত জড়িয়ে ধরে। বৌদির ভয় দেখে হাসতেছি।

নেড়ীর কথায় খুব একটা হাসি না পেলও খানিকটা হাসতে হাসতে রম্ভা মাথায় ঘোমটা টেনে নিশিকান্তর কাছে এসে দাঁড়ায়।

কী হয়েছে?

কে গেল ইখেন দিয়ে?

ও তো আমাদের নতুন বউ, নলি, নলিনী।

ওঃ, তারকের বউ? তো, আমি যে জিজ্ঞেস করনু, কে যায়, উত্তর দিলনি তো। ই-রকম অভ্যেসটা তো ভালো নয়। কেন, আমি কি একটা মানুষ নয় নাকি?

উ নতুন বৌ। এই সেদিন বিয়ে হয়েছে, উনি আপনার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়ি দাঁড়ি কথা বলবে নাকি?

রম্ভার হাসি পায়। তবু হাসে না। নিশিকান্তর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি আরো বাড়ে।

কথা বলতে হবে কেন? শুধু তো উত্তরটি দেবে। রাস্তার ধারে পড়ে আছি বলে কি আমি রাস্তার লোক?

আপনি রাস্তার লোক হবেন কেন? রাস্তার লোক শুনতে পাবে বলেই লজ্জায় কথা বলেনি।

তুমি থামো বাপু, মেয়ে মানুষের লজ্জার কথা আর আমাকে বোলো নি। উ আমি অনেক দেখেছি, তোমার দিদিশাউড়ি ছিলেন এক জন। লজ্জাবতী মাথায় দশ হাত ঘোমটা, ই-দিকে যখন কথা বলি নতুন বউয়ের এত যদি লজ্জা, তাহলে অমন খিল খিল করে হাসতেছে কেন? আমি তো ইখেন থেকে শুনতে পাচ্ছি হাসির শব্দ। রাস্তার লোক শুনতে পাচ্ছে।

উ হাসি কি নতুন্ বউয়ের নাকি? উ তো নেড়ী হাসতেছে। জীবনকাকার মেয়ে নেড়ী।

নিশিকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। দম নেয়। রম্ভার কাছে এ-ভাবে হেরে যাওয়াটা তাকে তৃপ্তি দেয় না। সে অন্যভাবে নিজের অভিমান অথবা আক্রমণ সাজায়।

কথায় বলে, তুমি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যায় সঙ্গে, মোর হয়েছে তাই। ঘরে নাতবউ আসবে বলে নিজের ঘর থেকে বেরি এনু। তা সে নাতবউ এমন নবাবের ঘরের বিটি যে, এক দিন এসে এতটুকু সেবা করতে পারে না। ভগবান চোখ কেড়েছেন। মুখটা দেখব, তার তো উপায় রাখেন নি। তা একটু হাতের ছোঁয়া পেলেও তো বুড়ো মানুষের মনটা ভরে, সে-ও তোমাদের ইচ্ছা নয়। তাকে তোমরা ঘেঁষতে দিবে নি মোর কাছে। আমি বুড়ো হয়ে সকলের চোখে বিষ হয়েছি।

নিশিকান্তর চোখে জল ছিল না। অন্ধদের চোখে জল পড়ে না। কিন্তু গলার স্বরটা ভিজে ভিজে। তাতেই রম্ভার মনটা নরম হয়ে যায়। সন্ধের পর বাড়ির লোকজন সবাই ফিরে আসে। রম্ভার মুখ থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে সকলের কানে। কার্তিক বাড়ির কর্তা। সে বলে, নতুন বউকে একবার পাঠিয়েই দিও না ওর কাছে।

ঘুটের আগুনে ভর্তি মাটির মালসা হাতে নিয়ে নলিনী যায় আগে আগে-পিছনে বাড়ির কয়েকটা ছেলে-মেয়ে। তারা যেন একটা মজা খুঁজে পেয়েছে এর মধ্যে। সকলের আগে এক দৌড়ে নন্তু ছুটে গিয়ে নিশিকান্তকে গিয়ে বলে, ও কত্তাদাদা, কে আসিতেছে, দেখো।

কে রে?

BanglaBook.org

দেখো না। নতুন লোক।

শীতে কুঁকড়ানো শরীরটাকে সোজা করে উঠে বসে নিশিকান্ত। পায়ে গরম হাতের স্পর্শ পায় একটু পরে। কম বয়সের শরীরের তাপ আর গরম মালসা বয়ে আনার উষ্ণতা, দুয়ে মিলে নলিনীর হাতটা সত্যিই বেশ গরম ছিল। নন্তু, পচা আর মেনি এক সঙ্গে বলে।

কে তোমাকে পেন্নাম করল বলো তো?

নিশিকান্ত ওদের মুখের দিকে তাকায়।

ফ্যাচ ফ্যাচ করিসনি। কে আমি জানিনি ভেবেছু?

কে বলো না?

উ তো আমাদের নতুন বউ। নলিনী।

কী করে দেখলে গা?

নন্তু, পচা আর মেনি অবাক হয়ে যায়।

তুমি দেখতে পাচ্ছ? কী করে?

আমি তোদের চেয়ে ঢের বেশি দেখতে পাই। বুঝলি?

নন্তু চুপি চুপি মেনির কানে কানে বলে, বাজে কথা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না, আন্দাজে বলতেছে।

তারপর সে ঘুরে তাকায় নিশিকান্তর দিকে।

আচ্ছা, কী রঙের শাড়ি পরে আছে বলো তো।

ডুরে শাড়ি?

সত্যিই ডুরে পরে ছিল নলিনী। নন্তুদের চোখ টোপাকুলের মতো আরো গোল হয়ে যায়। যাঃ বাবা, সত্যিই দেখতে পাচ্ছে নাকি বুড়োটা?

নন্তু বলে, কই বলো তো হাতে ক'খানা চুড়ি?

মেনী বলে, কানে কী গয়না আছে বলো দিক্নি?

নিশিকান্ত মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে হাত নেড়ে খেঁচিয়ে ওঠে, তোরা যা তো ইখান থেকে। ইয়ার্কি হচ্ছে মোর সঙ্গে তাই না? দাঁড়া কার্তিককে ডাকতেছি এখুনি। আমি নতুন বউয়ের সঙ্গে কথা বলব, তোরা এখানে ছারপোকার মতো কিলবিল করতেছু কেন? যা পালা।

নন্তুরা দাবড়ানি খেয়ে একটু সরে দাঁড়ায়, পালায় না। পা টিপে আরাম পায় না নলিনী। পা মানে শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা হাড় ক'খানা। ফাটা চামড়া। সাপের আঁশের মতো রঙ। পা টেপার সময় নলিনী তাই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে।

তোমরা ক'ভাই-বোন, ও নতুন বউ?

নলিনী উত্তর দেয় অস্পষ্ট ভাবে, নিশিকান্ত শুনতে পায় না।

কী বলো?

আবার উত্তর দেয় নলিনী, সাত জন।

বাবা-মা সবাই বেঁচে আছেন তো?

হ্যাঁ।

জমি-জমা ক'বিঘে?

নলিনী অনেকক্ষণ কোনো উত্তর দেয় না। নিশিকান্ত বুঝে নেয়।

জানোনি বুঝি? পুকুর-টুকুর আছে? ক'টা গরু?

এই সময় তারক সেখানে আসে। তারকের সাড়া পেয়ে নলিনী বেঁকে বসে আরো। ঝুঁকিয়ে নেয় মাথাটা। আর সেই সঙ্গে নন্তুরা পালায়। কিছুক্ষণ সে নিজের বউয়ের শরীরের দুলনি দেখে। তারপর কথা বলে।

BanglaBook.org

ওকে একটু বকে দেবেন তো দাদু।

নিশিকান্ত গলা শুনে অনুমান করে নেয় তারক।

কেন র‍্যা, ওইটুকু কচি মেয়েকে বকব কেন? তোর কী ক্ষেতি করছে যে বকব?

তারক মনে মনে ভাবে, ক্ষতির কথা মুখ ফুটে বলা যাবে না। বিয়ে হয়েছে দেড় মাস। কিছুতেই ভালো করে ছুঁতে দেয় না। কাছে টানলেই জালের মাছের মতো ছটফট। আমি ওর ভাসুর। আর বেশি জাপটা-জাপটি করতে গেলেই কান্না। ইট্টওটুকু মেয়ে ওই কান্নায় কাঁদতে পারে। গত ছ'সাত দিন ধরে বায়না ধরেছে বাপের বাড়িতে যাবে। সেখানে যে কী স্বর্গ সাজানো আছে কে জানে। গত বছর মানকের বিয়ে হল। কী ভাব তার সঙ্গে তার বউয়ের। কত গল্প করে রাতের মেলামেশা নিয়ে। তার কপালে এমন এক জন জুটল, যার শরীরে ভালোবাসার এতটুকু আগুন তাপ নেই।

দিনরাত বাপের বাড়ি যাবার জন্য কাঁদে কেন? সেইটে জিজ্ঞাসা করো না।

নিশিকান্ত অনুমান করে নেয় তারকের মনভাব। নতুন বউকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। তার শুকনো মুখে হাসি ফোটে।

আহা! ওইটুকু কচি মেয়ে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যেতে চায় তো দোষের কী র‍্যা।

মাঝে মাঝে? ক'দিন বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে ঘুরে এসেছেন দু-দু'বার। এসেই আবার যাব যাব রব কেন?

আরে পোথম পোথম ও-রকম হয়। পোষ মানার আগে পাখি ও-রমক ডানার ঝাপটি দেয়। তোর দিদিমা, ক'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বল দিকিনি? সে তো এর চেয়েও ছোট। নাক দিয়ে সিকনি ঝরত। শাড়ি পরবে কী, শাড়ি লুটচ্ছে ধুলোয়। আর ওই দিনরাত্তির বাপের বাড়ি যাবার জন্য কান্না। তারপর যেই বড়সড়টি হল, পেটে বাচ্চা এল, আর কি বাপের বাড়িকে মনে রইল? নতুন ঘর-সংসারে মন বসতে একটু সময় লাগবেনি?

ঠাণ্ডা পায়ে নলিনী নরম এবং গরম হাতের স্পর্শ পেতে পেতে নিশিকান্ত ফিরে গেছে তার নিজের কম বয়সে। সব মনে পড়ে না। কিছু মনে পড়ে। ঠিক এই রকমই ছিল হাতের ছোঁয়া। নরম নরম। অন্য সকলের কাছে হাসিখুশি। স্বামীকে দেখলে মুখ ভার। এক দিন আলতা পরাচ্ছিল মা দাওয়ায় বসে। জবা ফুলের মতো পা দুটো দেখে আমার মনটা রাগে গরগরিয়ে উঠেছিল। খুব রাগি মেজাজ ছিল তো আমার। একবার ভাবলাম, ওই পা দুটো ধরে আছাড় মারি উঠোনে। এক ফোঁটা মেয়ে, এত কষ্ট দেয় কেন আমাকে? আর না হয়...।

নিশিকান্তর ঘোর কাটে তারকের রাগ ভর্তি মন্তব্যে, বাপের বাড়ি যদি এত ভালো থাকে সেখানেই গিয়েই থাকুক।

তারক উঠে যায়, লাথি মারার ভঙ্গিতে জোরে পা ফেলে। শব্দটা শুনে নিশিকান্ত হাসে মনে মনে। ছোকরা চটে গেছে। বউ বশীভূত হয়নি বলে। হবে রে, হবে। অত রাগ-গোসা করলে বরং দেরি হয়।

তুই এবার যা। কত্তা রেগে গেছে। যা, মন ভাঙাতে যা।

নিশিকান্ত পা সরিয়ে দেয়, নলিনী সঙ্গে সঙ্গে ওঠে না। ওঠে অনেক ধীরে ধীরে। যেন স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো তাড়া নেই তার শরীরে, মনে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় নিশিকান্তর। এমনিতেই ঘুম তার খুব পাতলা। সামান্য খুটুস-খাটুসে সজাগ হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাত্রি বেলায় সামান্য ছোটখাটো শব্দও স্পষ্ট ও জোরালো হয়ে ওঠে, জগৎ-সংসারের অন্য কোলাহল এই সময় ঘুমিয়ে থাকে বলে। মদ্দা আর মাদি কুকুরে ঝগড়া, তালপাতার ওপর দিয়ে হেঁটে গেল খ্যাঁকশিয়াল খড়খড়িয়ে, ছুঁচো কুটুর কুটুর কী যেন কেটে চলেছে দাঁতে, ইঁদুরের বাচ্চাকে তাড়া করেছে নেউল, উদ্ নেমেছে পুকুরে, তাই পুকুরে ঘাই দিচ্ছে বড় রুইটা,

BanglaBook.org

এ-সব শব্দ নিশিকান্তর চেনা। কিন্তু আজকের শব্দটা ভিন্ন রকম। কে যেন কাঁদছে। ফুঁপিয়ে। থেকে থেকে। সে আপাদ-মস্তক কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। কাঁথাটাকে আলগা করে কান পর্যন্ত নামিয়ে নেয়। শিশির ভেজা এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তার কানের ফুটো দিয়ে সারা শরীরে ঢুকে পড়ে। তার শুকনো হাড়ে কাঁপুনি জাগে। তবুও সে সজাগ হয়, কান্নার শব্দটার হদিশ পাওয়ার জন্য। অনেক সময় সদ্য-বিয়োনো বেড়াল বাচ্চারাও মানুষের গোপন কান্নার মতো শব্দ করে। কিন্তু বৈঠকখানায় বেড়াল আসবে কোথা থেকে! অবশ্য বাড়িতে আছে। কিন্তু সে তো বাচ্চা বিইয়েছে মাস দেড়েক আগে।

আবার কান্নার শব্দ। না, এ তো বেড়ালের কান্না নয়। মানুষের এবং মেয়ে মানুষের।

কে? কে কাঁদছে ইখেনে? উত্তর দে না। যাঃ বাবা। আরে কে কাঁদতেছু বল না।

নিশিকান্ত বিছানায় উঠে বসে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দেয়। কারো স্পর্শ পায় না।

আরে কে রে? মেনি? না ভূতি? না বিন্তি? কে রে? ভালো জ্বালা হল তো!

আরে কে কাঁদে বলবি তো?

নিশিকান্ত নিজের বিছানা থেকে সামান্য এগোয়। অন্ধকারে দিকজ্ঞান হারিয়ে গেছে তার। কোনদিকে দেয়াল, কোনদিকে ছইয়ের বেড়া, কিছুই মনে করতে পারে না। হাত লেগে কী উলটে পড়ল ওটা? ওঃ আগুনের মালসা। ভাঙল নাকি? না, ছাইগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। ভাগ্যিস, আগুনটা নিভে গেছে। নাহলে তো পুড়ে মরতুম রে বাবা। আগুনের মালসাটা এক হাতে সরিয়ে দিয়ে নিশিকান্ত তার ডান দিক ঘেঁষে এগোয়। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গীতে। শরীরটাকে এগোবার আগে আরশোলার শুঁড়ের মতো একটা হাত বাড়িয়ে এ-দিক ও-দিক নাড়াচাড়া করে সামনেটা দেখে নেয়। যাঃ বাবা, আবার একটা মালাস এল কোথা থেকে? কীসের মালসাটা? নিশিকান্ত মালসার ভিতর হাত ঢোকায়। ওঃ, এ তো, কফ্-থুতুর মালসাটা। নিশিকান্ত মালসাটার ভিতর থেকে কফ্-থুতু লাগা চটচটে হাতটা বের করে এনে মাটিতে ঘষে নেয়। আবার এগোয়। একটু এগোতেই হাতে লাগে ছাইয়ের বেড়ায়। যাঃ বাবা, কুন দিকে যাচ্ছি? এখুনি তো পড়ে মরতুম। দেয়ালটা কুন দিকে তাহলে? নিশিকান্ত তার শরীরটাকে উলটো দিকে ঘোরায়।

ছোট বৈঠকখানা এখন যেন তার কাছে এক ব্রহ্মাণ্ড। যেন গোটা ব্রহ্মাণ্ডে সেই-ই একমাত্র জীবিত মানুষ। আর রয়েছে বহু দূরে এক কান্নার শব্দ। গাঢ় অন্ধকার তার চোখের সামনে তুলে ধরে নানা রকম ভ্রম-ছবি। মনে হয় বুঝি গাছপালা, ঘর জঙ্গল। হাত দিয়ে ছুঁতে যায়। হাতে কিছু ঠেকে না। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে নিশিকান্ত এগোয়।

আবার কী উলটে পড়ল রে বাবা? কী এটা? জল? ওঃ বাবা, এই শীতে আবার জল। জল আবার এল কোথা থেকে? হাত ঘোরাতে ঘোরাতে সে জলের ঘটিটাকে স্পর্শ করে। তখন মনে পড়ে রম্ভা তার মাথার সামনে একঘটি জল রেখে যায় বটে। নিশিকান্ত আবার এগোয়। জল লেগেছে পায়ের যেখানটায়, কন কন করছে। যেন ওই জায়গাটায় আর পা নেই, শুধু ব্যথা।

হ্যাঁ, এই দেয়াল, যাঃ বাবা, দেয়ালটা এত দূরে? দেয়ালে বাঁ-হাত ছুঁইয়ে নিশিকান্ত এগোয়। হঠাৎ লাঠির মতো কী একটা তার ঘাড়ে এসে পড়ে, নিশিকান্ত আঁতকে ওঠে। কেউ কি লাঠিপেটা করতে চাইছে নাকি? মাথায় মারলে তো এখুনি শেষ হয়ে যেতুম। নিশিকান্ত মাটি হাতড়ে লাঠিটাকে ছোঁয়। তখন বুঝতে পারে, লাঠিটা তারই। সে আবার এগোতে থাকে।

কী এটা? কোমর? হ্যাঁ, কোমরই তো? নিশিকান্তর রোগা গাঁটওয়ালা পাঁচটা আঙুল সেই কোমর থেকে একেবারে নিচে নামে, আবার ওপরে ওঠা-নামা করে কিছুক্ষণ। তার হাতের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও কেন্নর মতো যে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল, সেটাও বুঝতে পারে নিশিকান্ত।

BanglaBook.org

তবুও শরীরটাকে চারপাশ থেকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। বুকের সঙ্গে মুখটাকে এঁটে রেখেছে কুঁকড়ি মেরে। তবুও মাংসের কোমলতার তারতম্য থেকে সে বুঝে নিতে পারে কোনটা স্তন, কোনটা গাল, কোনটা গলা।

কে তুই? আরে নামটা বল না। কেন কাঁদতেছ? এই শীতে-জাড়ে গায়ে চাদর নেই, মাটিতে শুয়ে আছু কেন? কে তুই? মেনি? না ভূতি, না বিন্তি, কে রে?

অন্ধকারে একটা নারীর শরীরকে ছুঁয়েও নিশিকান্ত বুঝতে পারে না সে কে। অন্ধকারে সব শরীরই তার কাছে এক। যতক্ষণ না কথা বলবে কেউ, তার পক্ষে বিশেষ এক জনকে চিনে ওঠা কঠিন। নিশিকান্ত ক্রমাগত ঠেলা দেয় শরীরটাকে।

আরে কে তুই, বল না মুখ ফুটে। একবার নামটা বলতে পারতেছনি?

হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারেও তার চোখে আলো ফুটে ওঠে। হঠাৎ সে অনুমান করে ফেলতে পারে শরীরটা কার।ই তো নলিনী। মেনি অথবা ভূতিদের হাতে চুড়ি, কানে দুল থাকার কথা নয়। নিশ্চয়ই নতুন বউ!

ওমা, তুই নতুন বউ নাকি? আরে নিজের ঘর ছেড়ে, স্বামী ছেড়ে ইখেনে পড়ে আছু কেন? শীত করেনি তোর। গায়ে একটা কাঁথাকানি চাদর-মাদর কিছুই নেই। মরবি নাকি? কী হয়েছে বলনা মোকে। তারক বকেছে নাকি? ঝগড়া হয়েছে? যা, আর কাঁদিসনি। উঠে যা। কাল সকাল বেলায় খুব বকে দেব ওকে। আর যদি না যাবি তো মোর কাঁথাটা গায়ে দে। আয়, ই-দিকে ঘোর। মোর কাছে আয় দিক্‌নি।

নিশিকান্ত নলিনীর কোঁকড়ানো শরীরটাকে নিজের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। চুড়ি পরা হাতের ঝনঝনানি দিয়ে নলিনী তার হাতটাকে সরিয়ে দেয়। নিশিকান্ত তবুও ছাড়ে না। আবার কাছে টানার চেষ্টা করে। ভারি সুন্দর একটা ঘ্রাণ পায় সে নলিনীর কম বয়সের শরীর থেকে। ভারি মোলায়েম এক রকম স্পর্শের সুখ। নলিনী পা ছুঁড়ে ধাক্কা মারে। টলে পড়ে নিশিকান্তের শরীরটা। আবার সে সিধে হয়ে নলিনীকে কাছে টানে। নলিনীর শরীরটাকে ছুঁচে ছুঁতে তার শরীর থেকে শীত চলে যায়। অদ্ভুত এক উষ্ণ আরাম উপভোগ করতে থাকে তার গোটা শরীর। এবং হাতের দশটা আঙুল।

সহসা নলিনী উঠে বসে। নিশিকান্ত বুঝতে পেরেই জড়িয়ে ধরে নলিনীকে। নলিনী ধাক্কা দেয়। নিশিকান্তও ঝাঁপ দেয় প্রবল যুদ্ধে। মোলায়েম এই সুখটাকে নিশিকান্ত হারাতে চায় না। এই হঠাৎ সুখ চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। সে দেখতে পাচ্ছে দিগ-দিগন্তর, আকাশ, জ্যোৎস্না, নক্ষত্র, গাঁয়ের রাস্তাঘাট, পাল্কি, কার্তিকের মায়ের এক মাথা ঘোমটা, কম বয়সের নিশিকান্ত, শালখুঁটির মতো শক্ত হাত-পা, ভাত খায় একসের চালের, কার্তিকের মায়ের পেটে তখন কার্তিক আসেনি, ঠিক এই রকম এক দিন ঝগড়া হয়েছিল, সে-দিনের রাগী চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনী দিয়েছিল তিনবার, ঠিক এই কান্না। এক দিন আলতা পরছে, মা পরিয়ে দিচ্ছে আলতা, পা দুটো জবা ফুলের মতো, কী ভালো লাগতো তখন কার্তিকের মাকে...।

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল নিশিকান্ত। নলিনী দাঁত বসিয়ে দিয়েছে তার ডান হাতের কব্জিতে। হাতের যন্ত্রণায় কাতরে ওঠার মুখেই উঠে পালিয়ে গেছে নলিনী।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায় বাড়ির কলরবে। রম্ভা এসে জানাল, তারকের বউ পালিয়ে গেছে। নিশিকান্ত শুনে অবাক হয়। তার পিচুটিভরা চোখ দুটো সামান্য নড়ে ওঠে। কোনো কথা বলে না।

বেলা বাড়তে থাকে। বেলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বাড়তে থাকে ডান হাতের ব্যথা। ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ মনে পড়তে থাকে রাত্রির ঘটনা। আর নলিনীর বদলে তার চোখে ভেসে ওঠে কার্তিকের মায়ের স্মৃতি।

BanglaBook.org

মরে যাওয়ার কত কাল পরে কার্তিকের মা হঠাৎ আবার এমন জ্যান্ত হয় কী করে, সেই হিসেব কষতে কষতে নিশিকান্তর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। অন্ধকারে ॥

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসার শেষটা

আমার বিয়ের মাস খনেক আগে পর্যন্ত আমি ঘনশ্যামকে ডেট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর যে-দিন মা'র সঙ্গে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে গড়িয়াহটের মোড়ের শোভা থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেই পছন্দ করে সাদা বেনারসিটা কিনলাম, তখনই ঠিক করলাম, আর না। তাহলে আগামী কালই হোক আমাদের শেষ দেখা।

বেনারসি কেনা হয়েছে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে। যা বোঝার তাতেই বুঝে যাবে। বিয়ের ডেটটা ঘনশ্যামই বারণ করেছে জানাতে। প্রায় হুবহু একই গল্পে দিলীপ মিত্র — তখন ওরা আর জি কর-এ এক হস্টেলে রুমমেট আর ফাইনাল ইয়ারে — ভাগ্নির ফুলশয্যার রাতে ঘাটশিলায় চলে যায় এবং সে-দিনই সুবর্ণরেখার তীরে আত্মহত্যা করে। অশ্বত্থের শাখা থেকে নতমস্তকে ঝুলে ছিল সারাটি রাত। বিয়ের দিনটা আগে থেকে জানত বলেই না!

ওদের অবশ্য ছিল প্রায় ইনসেস্ট অ্যাফেয়ার। মেজদির মেয়ে। পিসতুতো-খুড়তুতো হলেও কথা ছিল। উপায় ছিল না। অবিশ্যি উপায় আমাদেরও নেই। ঘনশ্যামের বউ-বাচ্চা আছে। অন্য কোনো চিন্তাভাবনা থাকলে এত দিনে অন্তত উকিলের কাছে যেত। আর ডিভোর্স যদি হয়ও, পাঁচ আর তিন বছরের দু-দুটো বাচ্চার পরিপ্রেক্ষিতে যে, বিবাহিত জীবনের শুরু, তার ভবিষ্যৎ কি খুব উজ্জ্বল? ভালোবাসার দাম গায়ে-গতরে গত পাঁচ বছর ধরে আমি যথেষ্ট দিয়ে গেছি, এ-ভাবে দিয়েও যেতাম, যদি না রজত এসে পড়ত। হঠাৎ দেখি, আরে!/আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে! এ-দিকে বয়সও তিরিশ ছুঁল বলে। মেয়েদের হিসেবে তো মধ্যাহ্নও নয়, রীতিমতো অপরাহ্ণ! বাথরুমে টুলে বসে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করেছি, পেটের মাংস আমার অজ্ঞাতসারে বোধহয় রাতারাতি, কত উপখাঁড়ি আর খাঁড়িবহুল হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, মিস্ট্রেস হয়ে থাকলে সারা জীবন থাকা যায় এ-ভাবে, তবে সন্তানহীনা মিস্ট্রেস শেষ বিচারে একা মহার্ঘ যৌনপুতুল ছাড়া কী। নায়ক-নায়িকার ভূমিকার অবসানে বাবা-মা'র ক্যারেক্টার রোল পাবার সম্ভবনা সে-চিত্রনাট্যে কোথায়? ওর ছোটভাই বনবিহারী কি আমাকে বউদি বলবে কোনো দিন, নাকি ভাগ্নি মামি বলে ডাকবে? অতএব, যে-দিক দিয়েই ভেবে দেখা যাক না কেন, আমাদের যার-পর-নাই অলাভজনক লগ্নী। যে-দিক থেকেই দেখি, আমার বিবেক বেশ সাফসুতরো। তাছাড়া পাঁচ বছরে একটি বারের জন্যও তো উকিলবাড়িতে গেল না। অবশ্য আমিও চাপ দিইনি। আমার বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা তাই এখন খোলা।

তোমার বিয়ের দিনটা ঠিক করে, আমাকে বলবে না। দিলীপ মিত্রের গল্প বলে ঘনশ্যাম আমাকে বলে রেখেছে, আমি ওটা জানতে চাই না।

ওর মনের জোর দেখে আমি অবাক। ভরসাও পেয়েছি যথেষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, ওর এই স্ট্যান্ডটায় পুরোপুরি আস্থা রাখতে না পারলে রজতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে আমি অগ্রসর

BanglaBook.org

হতেই পারতাম না। তৈরি করা ছাড়া কী? সবটা বানানো। অন্তত আমার দিক থেকে। ঘনশ্যামকে পূর্বাপর ও যথারীতি ডেট দিতে দিতেই আমি রজতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছি। একসঙ্গে দু'ঘাটের জল খেয়ে গেছি যত দিন সম্ভব। প্রথমে চার ফেলে কাছে এনে, তারপর বঁড়শিতে গেঁথে খেলিয়ে একদম ডাঙার কাছে এনে যখন শুধু আর একটি খ্যাঁচ মারার অপেক্ষা, আমি তখনই ঠিক করলাম, তাহলে আর না। বেনারসি কেনা হল।

বিয়ের দিনটা বলতে বারণ করলেও, ঘনশ্যাম আমাদের ব্যাপারটা সবই জানত।

এ নয় যে, লুকিয়েছি কিছু কখনো, ওর কাছে। এমনও হয়েছে, সারা দুপুর রজতের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধেবেলা ছুটে গেছি ঘনশ্যামের কাছে। যে-ভাবে পাখি ফেরে নীড়ে। না না, ভুল। যে-ভাবে দিনান্তে রিপোর্টার ফেরে তার কাগজের অফিসে। নিউজ-এডিটরের সামনে দাঁড়ায়।

আজকের ডেভেলপমেন্ট কী, বলো।

আজ তারা দেখাল রজত।

তারা? দুপুরবেলায়!

হ্যাঁ তারা। দুপুরে তারা দেখা যায় না, নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে কেমন বুঝতে পারল যে, তারামণ্ডলে গিয়েছিলাম আমরা! আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, রজত হলে মাথায় হাতুড়ি মেরে এই সব পেরেক বসাতে হত। তবু রজত। ঘনশ্যামের প্রেম তো আমাকে সারা জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারে না। তা সে যতই সাচ্চা হোক। তাই রজত। হোক শূন্য, কিন্তু সেটাই উত্তর। আমি উত্তরমালা দেখে নিয়ে অঙ্ক কষতে বসেছি।

কী হল ওখানে বলো?

কী আবার হবে?

কিছুই হল না? অত অন্ধকার।

হবে কী করে। মনে হল এই প্রথম মুখ তুলে আকাশ দেখছে। তারা-ফারা বলতে চেনে শুধু চাঁদ আর সূর্য। শুকতারা যে শুক্রগ্রহ, তা-ই জানে না। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে স্ট্রেটলাইন টেনে লুব্ধক দেখাচ্ছি যখন —।

দেখাচ্ছ যখন?

বহুক্ষণ ধরে উশখুশ করছিল। শেষে একবার আমার হাতের ওপর হাতটা রাখল।

তারপর... তারপর? তুমি নিশ্চয়ই হাতটা টেনে নিলে?

সুযোগ পেলাম কই। রেখেই, যেন রাখতে চায় না — হাতে হাত লেগে গেছে — স্যাঁৎ করে টেনে নিল হাতটা। বুঝতে পারি আমার কনট্যাক্ট লেন্স সরে যাচ্ছে গভীর কটাক্ষে, তোমার মতো নাকি সবাই? বিশ্বকর্মা পুজোর দিন প্রথমে দেখা, সপ্তমীর দিন কিস, তা-ও কি শুধু ঠোঁটে, অষ্টমীর দিন ফার্স্ট অ্যাটেম্পট, কিছুতেই পারল না, নবমীর দিন হাতে ট্রফি — ফার্স্ট হাফ অ্যান্ড সেকেন্ড হাফে — দু-দুটো গোল।

সে-দিন আমরা বসেছিলাম পুরনো নিউমার্কেটে, ফ্লুরির ছোট দো-কানটার দোতলায়। প্যাসেজের দিকটায় সিলিং পর্যন্ত গ্লাসপ্যানেল। শাদা-লাল টিউনিক-পরা ওয়েটার। ঘনশ্যাম বলে, বেশ বিলেত বিলেত লাগে। বিলেত বলতে আমেরিকা, ও যেখানকার এম.ডি.। ওখানে ছোট শহরের ড্রাগ-স্টোরগুলো অনেকটা নাকি এ-রকম। অবশ্য ওখানে বই, কফি, সিগারেট, কোল্ডড্রিঙ্কস, কেক-প্যাস্টি মায় বাডসবিয়ার — সব মিলিয়ে এক হরেকরকম্বা।

শীতের সকালবেলা। ন'টা-টটা হবে। সবে মার্কেট খুলেছে। লোকজন কম। তাছাড়া মার্কেটের শব্দ এ দোকানে ঢোকে না। শীতাতপের সঙ্গে শব্দও এখানে নিয়ন্ত্রিত। এই সাত সকালে আমরা

BanglaBook.org

এখানে এসেছি চ্যাপলিনের 'বাই বাই ব্লুজ' নামে ফেস্টিভাল ফিল্মটা দেখব বলে। আমিই টিকিট কেটেছি।

বেনারসি কেনা হয়েছে শুনলে যা ভেবেছিলাম, যা বোঝার তখুনি বুঝল।

দিন ঠিক হয়ে গেছে?

কাঁধ পর্যন্ত মাথা হেলিয়ে আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ওর মুখ থেকে চোখ সরালাম না।

যা আশা করেছিলাম। এক পলক যেন অন্ধকার, কিন্তু তার পরেই পট্ করে আলো জ্বলে উঠল।

বাঃ, ঘনশ্যাম বলল, কে পছন্দ করল? মা না বউদি?

পছন্দ আমিই করলাম। যদিও মা সঙ্গে ছিল।

কী রঙ পছন্দ করলে?

সাদা। পাড়ে রুপোলি কাজ।

রজত সাদা পছন্দ করবে?

তুমি শুনলে অবাক হবে, আমিও তাই হয়েছিলাম, যখন শুনলাম রজতের সাদাই পছন্দ।

চোখের সাদা-ধূসর কনট্যাক্ট মণি ওর প্রতি অকম্পিত রেখে আমি হেসে বললাম, এই যা, রজতের কথা ওঠার তো কথা ছিল না।

ওর একটা বড়সড় প্রশ্বাস পড়ছে দেখে আমি অবাক। এমনও তো কথা ছিল না। তা সব কথাই কি আর অক্ষরে অক্ষরে রাখা যায়, না মানুষ রাখতে পারে?

আমি আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো ধরে জানতে চাইলাম, এই, তুমি কি জেলাস হয়ে পড়ছ?

উত্তরে ঘনশ্যাম কী বলল আমাকে শোনা হল না। কেননা, এই সময় সদ্য খোলা নাহুমের মধ্যে কেক কিনছিল এক মৌন দম্পতি, লাল পশমে মোড়া ওদের ফুটফুটে বাচ্চাটা, টলোমলো পায়ে কাচের দরজাটা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল। মা-বাবা এখনো জানে না কিছুই। এ কী, এ কী, সে যে এই দিকেই আসছে! এখানে বেশি দোকান বন্ধ আর প্যাসেজেও কেউ নেই। কেউ যদি তুলে নেয়? মেয়ে বাচ্চা বলে কথা! আরব কানট্রিজে চালান দিতেই পারে। না না, ওই যে নাহুমের থলথলে মোটা ইহুদি মালিক নিজেই উঠে যাচ্ছেন বিচ্চুটাকে ধরে আনতে।

আগাগোড়া মাস্টার শটে এক সাইলেন্ট পিকচার যেন।

উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমি বসে পড়ি।

অবশ্য বেনারসি কিনেই যে সিদ্ধান্ত নিলাম, তা না-ও হতে পারে। বেনারসি কেন কিনতে হল, আমার কৈফিয়ৎ বরফের ওপর রক্তের ফোঁটার অনেকখানি জুড়ে বরং সেইখানেই পড়ে আছে।

এক দিন রজত আর এক দিন ঘনশ্যাম; এমনকী একই দিনে রজত সেরে তারপর ঘনশ্যাম — এ জিনিস করতে করতে আমি শেষ হতে যাচ্ছিলাম। রজতের সঙ্গে ব্যাপারটা ছিল বরং অনেক স্বস্তির আর সহজ। সে তো ঘনশ্যামের অস্তিত্বের কথা জানেই না। স্বস্তিকর বলেই মিশেমিশেও যাচ্ছিলাম অনেক সহজে। ওর জন্য একটা দুর্বলতা তৈরি হচ্ছে, টের পাচ্ছিলাম। আহা, বাচ্চা ছেলে! (আমার চেয়ে হিসাব মতো বছর দুই ছোট জানাতে বোকাহাবাটা বলল কিনা, তাহলে ও-দিকে দু'বছর পুষিয়ে দিও। শুনে আমি যা বোঝার বুঝেও ওর মুখে শুনতে চাই, আর তাই বোকাসোকা মুখে তাকাই। আর যেই বলেছি, মানে? আমনি খপ করে হাতটা চেপে ধরে, তাহলে দু'বছর পরে রিটায়ার করবে। আমি তখনো ন্যাকা সেজে যেই না বলেছি, চাকরি? অর্থাৎ আমাকে — অমনি পিকিং রেস্তোরাঁয় ঢাকা কেবিনের মধ্যে আমাকে এক ঝটকায় বুকে টেনে নিয়ে যা যা করল — বন্ধ ঘর হলে সে-দিনই শেষ দেখে ছাড়ত।)

ক্লিনিক সেরে, সে-দিন তখন ঘনশ্যাম বসে আছে, আমারই জন্য সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কফিহাউসে। ওখানে ওর বন্ধুবান্ধব আছে, সময় কেটে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বসে তো আছে আমারই জন্য। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হল পৌঁছতে।

এমনটা যাতে না হয় সেই চেষ্টাই করি। কিন্তু রজতের সঙ্গে উঠতি সম্পর্ক, আর সে যদি অফিসে হঠাৎ ফোন করে পীড়াপীড়ি করে যে আজই — না বলতে পারি না। তাছাড়া তার ওপরেই বাকি জীবনের বাজি ধরেছি। কিন্তু সে-দিন হয়তো ঘনশ্যামকেও বলা থাকে আর তা ক্যানসেল করারও উপায় নেই। ঘনশ্যামের কাছে পৌঁছলে সে কতটা বুঝতে পারছে — আদৌ পারছে কি না সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আজকাল যত দেরিই হোক, ঘনশ্যাম অপেক্ষা করে। কফিহাউস বন্ধ হয়ে গেলেও বাইরে একা দাঁড়িয়ে থাকে। আজকাল একটা পাঁচিল উঠছে দু'জনের মাঝখানে। আগে সব বলতাম। আজকাল ও কখনো জানতে চায় না, এত দেরি হল কেন। আমিও তো বলি না। বিয়ের দিনের মতো এটাও যেন বলা বারণ। রজতের সঙ্গে অ্যাপো থাকলে সাজগোজ আমাকে একটু বেশিই করতে হয়। আজকাল তো ঠোঁটে ন্যাচারাল লাগাই, যেটা শুধু রজত যে-দিন। একলা ঘনশ্যামের দিনে একদম দরকার করে না। ঘনশ্যাম পুরনো চাল, ভাতে এমনিই বাড়ে। অথচ একলা যে-দিন পিপিং-কাণ্ড, লেডিজ রুমে গিয়ে যতই ঠিকঠাক করে এসে থাকি, বেশ বুঝতে পারছিলাম অন্তত ঠোঁটটা বেশ লাল হয়ে ফুলে থাকারই কথা এবং আছে — যা রজত সে-দিন টানতে টানতে প্রায় তার কণ্ঠনালি অব্দি টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর আমিও ছাড়াচ্ছিলাম যতটা পারি। আমার ঠোঁটে এখনো একটুও মাংস লাগেনি। এখনো সেই বেলুনের চামড়ার মতো পাতলা। সেই ষোল বছরে যেমনটি ছিলাম।

কিন্তু এ-ভাবে আমি আর পেরে উঠছিলাম না যেন। আর এই আত্মগ্লানি আর দো-টানা, যা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে দিনের পর দিন, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ঘমশ্যাম এটা যে শুধু বুঝেও বুঝতে চাইছে না, তা নয় — দোটানার মাঝখানে দুলতে তার বেশ ভালোই লাগছে। তার দো-টানা বলতে আমি আর ওর স্ত্রী সুপ্রভা। ওর স্ত্রী সুপ্রভা সম্পর্কে আমি যা জানি, সে তো একটা খড়ের কাঠামো। রক্তমাংস নেই। বিছানা-যোগ্যতা যেটুকু ছিল, আমি আসার পর সেটুকুও সে হারিয়ে বেঁচেছে। মাঝে দু-একবার ঘনশ্যামের ট্রাউজারের পকেটে কনট্র্যাসেপটিভ পেয়েও একটি কথা বলেনি। সে কে, কী, কেন, কবে কোথায় — বলবে যে, সে-মুরোদ কোথায়। করুণাই করি আমি তাকে। আমার বিছানা-যোগ্যতা প্রমাণিত এবং পাঁচ বছর ধরে যতবার, ততবার ঘনশ্যাম মুখে না বলেও আমাকে বুঝিয়ে গেছে, যদিও দুই সন্তানের বাবা — নারীশরীর বলতে যা, সে-অভিজ্ঞতা ওর জীবনে এই প্রথম। ওর বউ তো শুনলাম জামাকাপড়ই সব খোলে না। আর আমি? লজ্জা-শরম খুলে তবে খাটে উঠি। এ-দিক থেকে আমি করুণাই করে এসেছি ওর স্ত্রীকে, বরাবর। হিজড়ে, নান ও অযৌন স্ত্রী আমার কাছে একই। কারণ তিন জনেই প্রকৃতির ইচ্ছার বিরোধিতা করছে। তিন জনেই প্রতিবন্ধী।

অথচ স্ত্রী সুপ্রভাকে একটু তাচ্ছিল্য করলেই কত শক্ত হয়ে যায় তার চোয়াল। মুখচ্ছবিই যায় বদলে। ওর স্ত্রী ওর কাছ থেকে যেটা পেয়েছে সেটা আমি কিছুতেই পাচ্ছি না, আমি পদে পদে টের পেয়েছি। ও যখন আমার বিছানা-যোগ্যতার প্রশংসায় মুখর (সে কথায় বা কাজে যাই হোক) — আমার মনে হতে শুরু করল, এই যে রয়াল বেঙ্গলের মধ্যাহ্নভোজন (আমার দুই গুরু নিতম্ব), রবার গাছের কাণ্ডের মতো পিচ্ছিল উরুদ্বয়, বেদীর মতো তলপেট তথা পাকা পোনার পেটির মতো যোনি (অলঙ্করণ ঘনশ্যামের) — এ-সব ওর স্ত্রীর মধ্যে কেন পায়নি, কেন পায় না — এটাই ওর আসল আক্ষেপ। এইসব গেঁড়িগুগলি ও-ঘাটে পেলে আর এ-ঘাটে ঘাই দিত না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, এটাই যেন আমাদের যৌন সম্পর্কের মর্মবাণী — ওর দিক থেকে। আবার এ-ও ঠিক যে, ওর স্ত্রী আর

BanglaBook.org

আমি যেন দুদিক থেকে আসা সমুদ্রের দু'টি ঢেউ, আর ও চাইছিল এ-ভাবেই দুই ঢেউয়ের দোলায় যত দিন সম্ভব দুলে যেতে। ওর এই আত্মপ্রসাদ, এই নার্সিসাস সুখে বাধা দিতেই আমি খোলাচ্ছলে মঞ্চে ডেকে আমি রজতকে।

অবশেষে যে-দিন অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হল, আজ আমার কার সঙ্গে অ্যাপো — রজত না ঘনশ্যাম, ছ'টার সময় আমি কোথায় যাব, পিপিং না কফি হাউস — কিছুতেই মনে করতে পারলাম না যে কে, সে-দিন কান্না পেল। সেদিন ঘেন্না হল। মনে হল, আমি পাগল হয়ে যাব। বা, গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আমার সামনে কোনো পথ নেই।

ঠিক করলাম পিপিং-এই যাই। যদি দেখি রজত বসে আছে, তাহলে ওকে ঘনশ্যামের অস্তিত্বের কথা আজ বলব। লুতাতন্তুময় জালের কেন্দ্রে যে মাকড়সা বসে আছে। যাকে মারতে গেলেই দেখছি, তার বদলে আমি বসে আছি কেন্দ্রে। আমি পারছি না। রজত এগিয়ে আসুক। ছিঁড়ে ফেলুক জাল। বাঁচাক আমাকে। আমাকে অর্জন করুক। নাটকে সিনেমায় এর চেয়ে অনেক কারণে খুনোখুনি হয়। নাটক সিনেমা, এ-সব তো মানুষের কল্পনা, আর্ট। আসলে, ব্যাপারটা তো জন্তু-জানোয়ার লেভেলের। বলশালী কুকুর এসে যে-ভাবে অনুসরণকারী নেড়িদের হঠায় ও কাঙিক্ষতাকে অধিগত করে, সে সে-ভাবে আমার কাছে আসুক। ঘনশ্যামকে সে পাড়া-ছাড়া করুক।

হায় রে, সে-দিন রজত নয়। এক ঘণ্টা কেবিনে বসে থেকে, এক প্লেট চপ স্যুয়ে খেয়ে ভরা পেটে কফি হাউসে গিয়ে দেখি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম সিগারেট খাচ্ছে। শীতের রাত। সে ছাড়া গলিতে কেউ নেই।

ঘনশ্যাম,

যদিও তুমি জানাতে বারণ করেছিলে, ১৩ নভেম্বর রজতের সঙ্গে আমার বিয়ে। সঙ্গে নিমন্ত্রণপত্র। এখনো দিন পনেরো দেরি। নিমন্ত্রণ পত্রে রজতের ঠিকানা রয়েছে।

ওই ঠিকানায় আপাতত তুমি, পত্রপাঠ, আমার ২/১টা ন্যুড ছবি পাঠিয়ে দাও, যা তুমি এক দিন শখ করে তুলেছিলে। তারপর যা হবার তা হবে।

আমি কাল সারা রাত জেগে বসেছিলাম। যত দূর ভাবা সম্ভব, ভেবে দেখলাম। ভেবে দেখলাম, লোকাল অ্যানাসথেসিয়া করে নিজের হাতে নাকের পাটা ফুটো করে তোমার জুয়েলার বন্ধু সি. সরকারের দোকানে নিয়ে গিয়ে যে হীরের নাকছাবি তুমি পরিয়ে দিয়েছ, তা খুলে ফেলার সাধ্য আমার নেই।

আমার সামনে এখন দুটো রাস্তায়। এক, সারা জীবন ধরে রজতের কাছে তোমার নাম লুকনো। অথবা ...রজতের কাছে যাবজ্জীবন জেলখাটার তুলনায়, তোমাকে দেওয়া রজ্জু গলায় বেঁধে আত্মহত্যা। দ্বিতীয়টিই আমার কিছুটা সম্ভ্রান্ত বিকল্প বলে মনে হল।।

তোমার—
দাসী, বাঁদি অথবা রক্ষিতা
কণিকা

প্রফুল্ল রায়

একটি শব্দের মানে

বাস থেকে ক'পা হেঁটে জেব্রা লাইনের কাছে আসতেই চোখে পড়ল ও-ধারের ফুটপাথে জয়তী। সে-ও আমাকে দেখতে পেয়েছিল। হাত তুলে তাকে দাঁড়াতে বললাম।

BanglaBook.org

ট্রাফিক সিগনালে এখন সবুজ আলো। হুড় হুড় করে সামনের রাস্তা দিয়ে মিনি বাস, প্রাইভেট কার, লাল-নীল ডবল ডেকার, স্টেশন ওয়াগন ইত্যাদি ছুটে যাচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত একবার জিপিও-র বড় ঘড়িটা দেখে নিলাম। এখন কাঁটায় কাঁটায় তিনটে। সান্ধুসাহেব সাড়ে তিনটে থেকে পৌনে চারটের ভেতর তাঁর অফিসে যেতে বলেছেন। এখান থেকে ব্র্যাবোর্ন রোডে সান্ধুসাহেবের অফিসে যেতে খুব বেশি হলে মিনিট পনেরো লাগবে। তার মানে আমার হাতে আধ ঘণ্টা মতো সময় আছে।

মনে পড়ল, পাঁচ-ছ'দিন আগে জয়তীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর আর ওর খোঁজখবর নিতে পারিনি। চাকরির জন্য নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয়েছে। যাক, এই অফিস পাড়ায় ওকে পেয়ে ভালোই হল। নইলে ভেবেই রেখেছিলাম সান্ধুসাহেবের সঙ্গে দেখা করে আজ ওদের বাড়ি যাব। ওদের বাড়ি বলতে ওর মামাবাড়ি।

একটু পরে ট্রাফিক সিগনালে সবুজ আলো নিভে লাল আলো জলে উঠল। গাঁক গাঁক করে এখনো যে বাস-ট্রামগুলো ছুটে আসছে, জেব্রা লাইনের কাছে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো সেগুলো থমকে গেল।

রাস্তা পেরিয়ে জয়তীর কাছে চলে এলাম।

জয়তীর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখ ওর, মুখ ডিমের মতো লম্বাটে, চিবুকে সুন্দর একটি ভাঁজ। পাকা গমের মতো জয়তীর গায়ের রঙ। ত্বক মসৃণ, টান টান। সরু কোমর, হাতের আঙুলগুলো দীর্ঘ। চেহারা পাতলা ধরনের, তবে রোগা নয়। গায়ে এক গ্রাম অনাবশ্যক চর্বি নেই। সব চাইতে আকর্ষণীয় ওর গলা, যেন একটা সোনার ফুলদানি।

এখন জয়তীর পরনে ছোট ছোট ময়ূর-ছাপ দেওয়া প্রিন্টেড শাড়ি আর হলুদ জামা, পায়ে স্ট্র্যাপ-দেওয়া জুতো। বাঁ-হাতে ছোট্ট গোল ঘড়ি ছাড়া আর কোনো গয়না-টয়না নেই। ডান হাতে অবশ্য একটি সোনার রুলি রয়েছে।

সাজ-টাজ করতে ভালোবাসে না জয়তী। তবু সরল সাদামাঠা পোশাকে ওকে প্রায় অলৌকিক মনে হয়।

জয়তীকে দারুণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কপালে-ঘাড়ে-গলায় পোখরাজের মতো দানা দানা ঘাম জমেছে।

বললাম, এখানে কোথায় এসেছিলে?

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে জয়তী বলল, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে।

জয়তী পাঁচ-সাত দিন পর পর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আসে। ওখানকার এক ডেসপাচ ক্লার্কের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। ওর নামটা ইন্টাভিউয়ের জন্য কোনো অফিসে পাঠান হয়েছে কি না, মাঝে মাঝে এসে তার কাছে খোঁজ নিয়ে যায়। বললাম, গুড নিউজ কিছু আছে? তোমার নাম কোথাও পাঠিয়েছে?

বিষণ্ণ হাসল জয়তী। আস্তে করে বলল, এখনো পাঠায়নি।

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম। টেলিফোন ভবন ছাড়িয়ে নেতাজী সুভাষ রোডের ওপর দিয়ে এখন আমরা জিপিও-র কাছাকাছি চলে এসেছি।

জয়তী আবার বলল, তুমি এ-দিকে কোথায় এসেছ?

সান্ধুসাহেবের কথা বললাম।

জয়তী অবাক, তুমি এঁর কথা তো আমাকে বলোনি।

বলব কী করে? লাস্ট যে-দিন তোমার সঙ্গে দেখা হল, তারপর তো মিস্টার সান্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

BanglaBook.org

কী করে আলাপ হল?

প্রবীরকে চেনো তো?

তোমার সেই যোধপুর পার্কের ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ। সান্ধুসাহেব প্রবীরের দাদার বন্ধু। ক'দিন আগে যোধপুর পার্কে গিয়েছিলাম। প্রবীরের দাদা আমার ব্যাপারটা জনে, মিস্টার সান্ধুকে আমার চাকরির জন্য রিকোয়েস্ট করে চিঠি লিখে দিয়েছিল।

উৎসুক গলায় জয়তী জিজ্ঞেস করল, ওখানে তোমার চাকরিটা হবে যাবে তো?

এর আগেও অনেকের চিঠি-টিঠি নিয়ে কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছি, চাকরি হয়নি। যতক্ষণ না কিছু হচ্ছে এই সব চিঠির দাম আমার কাছে কানাকড়িও না। এ সম্পর্কে আমার আস্থা বা উৎসাহ খুব বেশি নেই। তবু যে সান্ধুসাহেবের চিঠি নিয়ে ছোটাছুটি করছি তা অন্য কিছু করবার নেই বলে। আগ্রহশূন্যের মতো বললাম, কী করে বলি চাকরিটা হবেই। আজ নিয়ে সান্ধুসাহেবের কাছে সেকেন্ড টাইম যাচ্ছি। এখনো হোপলেস হবার মতো কিছু ঘটেনি। দেখা যাক আলটিমেটলি কী হয়।

জয়তী বলল, সান্ধুসাহেব লোক কেমন?

কী করে বলব, পরশু দিন মোটে পাঁচ মিনিটের জন্য কথা বলেছিলাম। এইটুকু সময়ে একটা লোককে অ্যাসেস করা যায় নাকি?

আরো খানিকটা যাবার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশাল বাড়িটা পেছনে ফেলে কোণাকুণি রাস্তা পার হয়ে আমরা যখন লায়ন্স রেঞ্জে ঢুকেছি সেই সময় হঠাৎ জয়তী বলল, তোমাদের বাড়ির খবর কী?

ভালো না। দাদা তো কবেই বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে রেখেছে। রোজ খ্যাচাখেচি। লাইফ একেবারে হেল হয়ে গেল। ওখানে আর টেকা যাবে না। ইমপসিবল। যাক গে, তোমার বাড়ির খবর বলো।

তক্ষুনি উত্তর দিল না জয়তী। মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটল। পরে বলল, খুব খারপ।

ওর অবস্থাও আমারই মতো। বাড়িতে সর্বক্ষণ একটা বিস্ফোরণের মুখে ওকে থাকতে হয়। জয়তীর মামা-মামি চায় না ও আর তাদের কাছে থাক। বললম, নতুন ঝামেলা কিছু হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

কী?

জয়তী বলল, মামা-মামি ওই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। তার গলার স্বর অল্প ভাঙা, ভারি, তবে চাপা।

চমকে উঠলাম। জয়তী কীসের কথা বলছে বুঝতে অসুবিধা হল না। দু-আড়াই মাস আগে ভবানীপুরে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে আমরা বিয়ে করেছি। বিয়েটা হয়েছে অত্যন্ত গোপনে। জয়তী আর আমার দু-চার জন বন্ধু যারা এ বিয়েতে সাক্ষী ছিল তারা ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ জানেও না। জানাজানি হোক, আপাতত এটা আমরা চাইওনি। ভেবেছিলাম আমার একটা চাকরি-বাকরি হলে বাড়ি ভাড়া করে জয়তীকে নিয়ে নতুন লাইফ শুরু করব এবং এই উপলক্ষ্যে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে ছোটখাটো একটা ফাংশানও করব। তখন যে খুশি জানুক, তা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মামা-মামিকে খবরটা কে দিল?

জয়তী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, জানি না।

একটু ভেবে নিয়ে এবার বেশ ভয়ে ভয়েই বললাম, ওদের রি-অ্যাকশান কী?

বুঝতে পারছ না?

উত্তর না দিয়ে জয়তীর চোখের ভেতর তাকিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

BanglaBook.org

জয়তী বলতে লাগল, মামা আলটিমেটাম দিয়েছে বিয়ে যখন করেই ফেলেছি, তার আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই। যত তাড়াতাড়ি পারি যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

আমার গলার ভেতর থেকে আধফোটা একটা শব্দ বেরিয়ে এল, ও।

সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে চলেছে। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে কলকাতার আকাশ এখন আশ্চর্য নীল। মনে হয় দিগন্তের ফ্রেমে কেউ যেন ঝকঝকে একখানা আয়না টাঙিয়ে রেখেছে। অবশ্য দু-টুকরো সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ এখনো এখানে ওখানে চোখে পড়ে। আমাদের দু'ধারে বিরাট বিরাট সব বাড়ি। পেছন দিকের আকাশে শরৎকালের সূর্য স্থির, অনড় হয়ে আছে। দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়টায় গলানো গিনির মতো উজ্জ্বল টাটকা রোদে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে।

লায়ন্স রেঞ্জ দিয়ে জয়তীর পাশে হেঁটে যেতে যেতে অন্যমনস্কর মতো ভাবছিলাম, দুম করে আমরা বিয়েটা করতে গেলাম কেন? পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত আমি পুরোপুরি বেকার, জয়তীরও কোনো কাজকর্ম নেই। অবশ্য মাঝে মধ্যে আচমকা আমরা দু-একটা টিউশানি পেয়ে যাই, ক'টা দিন মোটামুটি কেটে যায়। এ ছাড়া বছরের পর বছর দু'জনে যে-কোনো একটা চাকরির জন্য অফিস পাড়ার দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাই, একে ওকে ধরি আর এই একরোখা নিষ্ঠুর সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকি।

তবু বিয়ে করার মতো এমন দুঃসাহস আমাদের হল কোত্থেকে?

চারিদিকের উঁচু উঁচু বিশাল বাড়ি, পার্কিং জোনে অগুনতি গাড়ি, জলস্রোত, শরৎকালের তাজা কোমল রোদ — আমি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কয়েক বছর আগের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

আমার বয়স এখন আটাশ। জয়তীর চেয়ে আমি তিন-চার বছরের বড়।

আট'ন বছর আগে ভবানীপুরে আমরা একই কলেজে পড়তাম। কলেজটা অবশ্য কো-এডুকেশনের নয়। সকালে মেয়েদের ক্লাস হত, দুপুর ছেলেদের।

আমার যেবার ফোর্থ ইয়ার সেবারই ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল জয়তী। ওর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার কথা নয়, তবু আলাপটা হয়েই গিয়েছিল। সেবার কলেজের অ্যানুয়াল সোশ্যালের ভার পড়েছিল আমার ওপর। কার কাছে যেন শুনেছিলাম জয়তী ভালো গাইতে পারে। খবরটা পেয়েই ওর কাছে ছুটেছিলাম। ফার্স্ট-ইয়ারে পড়া জয়তীটা ছিল দারুণ মুখচোরা আর লাজুক, কিছুতেই গাইবে না, আমিও ছাড়ব না। শেষ পর্যন্ত জোর করে ওকে গাইয়েছিলাম।

সেই সোশালের পর থেকেই ক্রমশ মেলামেশা, সিনেমায় যাওয়া, রেস্তোরাঁয় খাওয়া, ইডেন গার্ডেনে কি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের নির্জনতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া। এ-সব থেকে যা হয় — প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে আছে, আমার বিএ ফাইনাল হয়ে যাবার পরও তিন বছর সেই কলেজে পড়েছে জয়তী। আর এই তিনটে বছর নিয়ম করে ওর ছুটি হওয়া পর্যন্ত উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থেকেছি।

জয়তী থাকত (এখনো থাকে) টালিগঞ্জের এক জবরদখল কলোনিতে ওর মামার কাছে। জয়তীর বাবা-মা আর একটা ছোট ভাই থাকত পূর্ব পাকিস্তানে (তখনো বাংলাদেশ হয়নি)। মেয়ে বড় হবার পর বাবা-মা মেয়েকে মামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

জয়তীর মামা লাইফ ইনসিওরেন্সে ছোটখাটো কী চাকরি করে। তার ছেলেপুলে একগাদা। ফ্যামিলি প্ল্যানিং, লাল ত্রিকোণ, নিরোধ ইত্যাদিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে চার-পাঁচটি সন্তানের জনক।

দু-চার মাস পর পর জয়তীর বাবা লোকমারফৎ দেশ থেকে কিছু কিছু টাকা পাঠাত, কিন্তু তাতে আর কী হয়! মামার অভাবের সংসারে জয়তীকে নিয়ে সব সময় খ্যাচার খ্যাচার, অশান্তি লেগেই ছিল।

BanglaBook.org

আমার বাড়ির ব্যাপারটা ঠিক ও-রকম নয়। আমরা থাকতাম (এখনো আছি) দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ল্যান্সডাউন রোডের একটা মাঝারি ফ্ল্যাটে। ওটা দাদার ফ্ল্যাট। দাদা স্টেট গভর্নমেন্টে মোটামুটি ভালোই চাকরি করে, সেকেন্ড ক্লাস গেজেটেড অফিসার। আমার বাবা-মা বা অন্য কোনো ভাই-বোন নেই।

দাদার ছিমছাম স্ট্রিমলাইনড ফ্যামিলি । দো আউর তিন বচ্চে'র স্লোগান অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মোটে দু'টি ছেলে তার। দাদা-বউদি এবং দু'টি বাচ্চা। এই চার জনের ফ্যামিলিতে আমি অবাঞ্ছিত। অবশ্য বিএ পাশ করা পর্যন্ত দাদা কিছু বলেনি। কিন্তু তার পরেই নানাভাবে জানিয়ে দিচ্ছিল, তার ফ্ল্যাটে আমার জায়গা হবে না। অর্থাৎ মানুষ করে দিয়েছি, কর্তব্য শেষ, এবার আমার ঘাড় থেকে অনুগ্রহ করে নেমে পড়।

দু'জনের বাড়ির কথা আমারা পরস্পরকে জানিয়েছি। কচিৎ কখনো জয়তী আমাকে টালিগঞ্জে ওর মামার বাড়িতে নিয়ে গেছে ' দু-একবার আমিও ওকে দাদার ফ্ল্যাটে এনেছি। আমার দাদা-বউদি কি জয়তীর মামা-মামি আমাদের অত্যন্ত সন্দেহজনক চোখে দেখেছে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

যাই হোক, জয়তীর সঙ্গে দেখা হলে একবার না-একবার বাড়ির কথা উঠতই। কোনো দিন আমি বলতাম, আর পারা যায় না জয়তী। কী ঝঞ্ঝাট যে চলছে! জয়তী আমাকে শান্ত করতে করতে বলত, কী আর করবে বলো। যত দিন না কিছু কাজ-টাজ হচ্ছে, একটু অ্যাডজাস্ট করে থাকো।

কোনো দিন জয়তী এসে বলত, আর পারি না, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

আমিও ওকে বোঝাতাম, একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এইভাবেই আমাদের দিন যাচ্ছিল। হঠাৎ চার-পাঁচ মাস আগে দু'জনের বাড়ির পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম, এবার একটা কিছু করতেই হয়। দু'জনে একে তাকে ধরে ক'টা টিউশান জোগার করেছিলাম। আমার চারটে, জয়তীর তিনটে, মোট সাতটা টিউশানির ওপর ভবিষ্যতের ভার চাপিয়ে দিয়ে সাঁতার-না-জানা মানুষ চোখ-কান বুজে যে-ভাবে জলে ঝাঁপ দেয়, দুম করে সে-ভাবে আমরা বিয়েটা করে ফেলেছিলাম। বিয়ের পর সস্তা ভাড়ায় যখন বাড়ি-টাড়ি খুঁজছি, হুট করে আমার দুটো আর জয়তীর একটা টিউশানি চলে গেল। কাজেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে এক সঙ্গে আর থাকা হয়নি। আমরা যে যার পুরনো জায়গাতেই এখনো পড়ে আছি।

কতক্ষণ দূরমনস্কের মতো হেঁটেছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ পাশ থেকে জয়তীর গলা শুনতে পেলাম, এই —।

ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, কী বলছ?

সান্ধুসাহেবকে ধরে-টরে যে-ভাবে হোক চাকরিটা নাও।

সান্ধুসাহেবের কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না। চমকে উঠে বললাম, দেখো তো ক'টা বাজে?

কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে জয়তী বলল, তিনটে পঁচিশ।

চট করে ভেবে নিলাম, সান্ধুসাহেবের অফিসে গিয়ে রিসেপশনে জয়তীকে বসিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসব। বললাম, তাড়াতাড়ি চলো।

আমিও যাব?

চলোই না। দশ-পনেরো মিনিট বসবে, তারপর বেরিয়ে এসে এক সঙ্গে কোথাও কিছু খেয়ে নেব। দশটার সময় খেয়ে বেরিয়েছি, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।

ছ-সাত মিনিটের ভেতর ব্র্যাবোর্ন রোডের শেষ মাথায় সান্ধুসাহেবের অফিসে চলে এলাম। লিফটে করে আট তলায় উঠলে প্রথমেই রিসেপশন। আট তলার এই গোটা ফ্লোরটা জুড়ে সান্ধুসাহেবের

BanglaBook.org

অফিস। ওঁদের ইমপোর্ট এক্সপোর্ট-এর ব্যবসা। সান্ধুসাহেব তাঁদের কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। রিসেপশনে স্লিপ লিখে সামনের সোফাগুলোর দিকে যেতে যেতে বিদ্যুচ্চমকের মতো আচমকা একটা দারুণ আইডিয়া আমার মাথায় এসে গেল। একটু আগে যা ভেবেছিলাম, মনে মনে নাকচ করে দিলাম। স্থির করে ফেললাম জয়তীকে এখানে না বসিয়ে আমার সঙ্গে সান্ধুসাহেবের চেম্বারেই নিয়ে যাব। একটি সুন্দরী মেয়ে সামনে বসে থাকলে তার এফেক্ট অন্য রকম।

একটু পরে একটা বেয়ারা আমাকে ডাকতে এল। জয়তীকে বললাম, এসো আমার সঙ্গে।

বিমূঢ়র মতো জয়তী জানতে চাইল, কোথায়?

যে-উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া সেটা সম্পূর্ণ গোপন করে বললাম, কোথায় আবার, সান্ধুসাহেবের কাছে। আলাপটা করো, ফিউচারে কাজেও লাগতে পারে।

কিছু না বলে জয়তী আমার সঙ্গে সান্ধুসাহেবের চেম্বারে চলে এল।

দরজা ঠেলতেই চোখে পড়ল। সান্ধুসাহেব গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে সানমাইকা বসানো ঝকঝকে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপর গোটাতিনেক ফোন, পেপার ওয়েট, সুদৃশ্য টেবল ক্যালেন্ডার, পেন হোল্ডার, ফাইলপত্র ইত্যাদি। টেবিলের এ-পাশে ক'টা ফ্যাশ্যনেবল চেয়ার।

সান্ধুসাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাড়ে ছ'ফুটের মতো হাইট, গায়ের রঙ টুকটুকে। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তাঁর মজবুত শক্ত শরীর। মাংসল ঘাড়, চওড়া কাঁধ — বৃষস্কন্ধ বলতে যা বোঝায় ভদ্র লোক তাই। চোখের তলায়, ঘাড়ে এবং পেটে প্রচুর চর্বি জেমেছে। বোঝা যায় এটা অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত। চুল কাঁচায়-পাকায় দাবার ছক।

ভেবেছিলাম জয়তীকে নিয়ে গিয়ে সান্ধুসাহেবকে ভেজাতে পারব। এখন কিঞ্চিৎ নার্ভাস বোধ করছি, বেশ ভয়ই লাগছে। পারমিশান ছাড়া ওকে নিয়ে আসার জন্য যদি চটে যান।

টেবিলরে ওপর ঝুঁকে কী লিখছিলেন সান্ধুসাহেব। আমরা দরজার কাছে দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মুখ তুলে প্রথমে এক পলক আমাকে দেখলেন, তারপর জয়তীকে। ঘন মোটা ভুরু ঈষৎ কুঁচকে পরমুহূর্তে টান টান হয়ে গেল সান্ধুসাহেবের।

আমি মাথাটা অল্প ঝুঁকিয়ে বললাম, গুড আফটারনুন স্যার।

সান্ধুসাহেবও বললেন, গুড আফটারনুন। বসুন।

আমরা মুখোমুখি বসলাম।

সান্ধুসাহেব প্রথমে জয়তী সম্পর্কে তেমন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। আগ্রহশূন্যের মতো জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

শুনেছি অনেক কাল কলকাতায় আছেন সান্ধুসাহেব। উচ্চারণে সামান্য টান ছাড়া বাংলা ভাষাটা প্রায় নির্ভুলই বলেন। বলতে যাচ্ছিলাম, জয়তী আমার স্ত্রী, আইনত সে তাই। কিন্তু এ-ভাবে জয়তীর পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। তাছাড়া যে কিছুই করে না, পুরোপুরি বেকার, তার একটা স্ত্রী আছে — এটা ডিসকোয়ালিফিকেশন হয়ে যাবে কি না কে জানে। ঢোক গিলে বললাম, আমার আত্মীয়া। তারপর জয়তীকে সঙ্গে আনার কৈফিয়ৎস্বরূপ জানালাম, এখানে আসার সময় রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে এসেছি, স্যার যেন বিরক্ত না হন। জয়তী সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না সান্ধুসাহেব। শুধু বললেন, অল রাইট। তারপর সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন, সার্টিফিকেটগুলো এনেছেন?

আগের দিনেই ওগুলো আনতে বলে দিয়েছিলেন সান্ধুসাহেব। বললাম, ইয়েস স্যার। পকেটে হাত পুরে স্কুল ফাইনাল থেকে বিএ পর্যন্ত সবগুলো সার্টিফিকেট আর মার্কশিট বার করে সান্ধুসাহেবের সামনে সাজিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

মার্কশিট-টিটগুলো দেখতে দেখতে সান্ধুসাহেব বললেন, ভালোই তো রেজাল্ট করেছিলেন।

জড়ানো গলায় বললাম, তবু স্যার কোথাও একটা চাকরি জোটাতে পারিনি। গ্র্যাজুয়েট হবার পর আট-ন'বছর বেকার বসে আছি। বড় আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি স্যার যদি দয়া করে —।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সান্ধুসাহেব বললেন, প্রমিস, আই শ্যাল ট্রাই ফর ইউ। খুব চেষ্টা করব। তবে সবটা আমার হাতে নেই।

বললাম, আপনি চেষ্টা করলেই হবে স্যার। টের পাচ্ছিলাম আমার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত দীনতা ফুটে উঠেছে। সান্ধুসাহেবের পায়ের কাছে নিজেকে যেন বিকিয়ে দিচ্ছিলাম।

সার্টিফিকেটগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে সান্ধুসাহেব ভদ্রতার খাতিরে এবার জয়তীর দিকে তাকালেন, ওই দেখুন আমরাই কথা বলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে কিন্তু আলাপই করা হচ্ছে না। আমার নাম রমেশ সান্ধু, আপনার নাম যেন কী, মিস —।

মিস বলতেই চমকে আমার দিকে ফিরল জয়তী, আমিও দ্রুত একবার ওকে দেখে নিয়ে ইশারা করলাম। ইশারাটা বুঝল জয়তী। খুব সহজ ভাবে বলল, জয়তী — জয়তী চ্যাটার্জি।

স্টুডেন্ট?

নো স্যার। আমি বিএ পাশ করে গেছি। তারপর আর পড়িনি।

আর ইউ ইন সারভিস?

নো স্যার। তবে চেষ্টা করছি।

সান্ধুসাহেব বললেন, আই সী। তারপর একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকালেন, আপনি এক কাজ করুন, আজ টেনথ জুলাই, সেভেনটিন্‌থ একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমাকে এখনই একবার বেরুতে হচ্ছে।

উঠতে উঠতে জয়তী আর আমি এক সঙ্গে বললাম, নমস্কার স্যার।

নমস্কার।

শুধু সেভেনটিন্‌থই না, তারপর বেশ কয়েক বার সান্ধুসাহেবের অফিসে ছোটাছুটি করতে হল। জয়তীকে সেই যা একবারই নিয়ে গিয়েছিলাম, তারপর থেকে একাই গেছি।

যতবারই গেছি, চাকরির কথাই হয়েছে বেশি। তার ফাঁকে অত্যন্ত শোভন ভাবে জয়তীর কথাও জিজ্ঞেস করেছেন সান্ধুসাহেব, আপনার আত্মীয়টি কেমন আছেন? আমি বলেছি, ভালো। এই পর্যন্ত।

দু'মাসে বার পাঁচেক ঘুরবার পর সান্ধুসাহেব আন্তরিক দুঃখের গলায় এক দিন বললেন, আই অ্যাম সরি মিস্টার মিত্র, চাকরিটা আপনাকে দিতে পারছি না।

কলকাতা শহরের বাতাসে এখনো অক্সিজেনের পুরোপুরি অভাব হয়নি, তবু আমার শ্বাস আটকে আসতে লাগল। গল গল করে ঘামতে লাগলাম। টের পাচ্ছি জামাটা ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে। অবরুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ কী হল স্যার?

আপনি তো জানেন এই কাজটা হল পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টান্টের।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাল ডিসাইড করেছেন, কাজটা কোনো মহিলাকে দেওয়া হবে। আমি আপনার হয়ে অনেক বলেছি, কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না।

মরিয়া হয়ে বললাম, স্যার, কোনোভাবেই কি কিছু করা যায় না?

সান্ধুসাহেব বললেন, আই অ্যাম হেল্পলেস। তবে আমাদের ফার্মে নতুন ভেকান্সি হলে আপনার সম্বন্ধে আমি প্রথমে ভাবব। আই মাস্ট কনসিডার ইওর কেস।

BanglaBook.org

রক্তশূন্য মুখে ফ্যাকাশে গলায় বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

দূরমনস্কের মতো কিছু ভাবতে ভাবতে সান্ধুসাহেব বললেন, কী ট্রাবলে যে পড়েছি, দু-চার দিনের মধ্যেই ওই পোস্টটায় লোক নিতে হবে অথচ তেমন অ্যাট্রাক্টিভ পার্সোন্যালিটিওলা গ্র্যাজুয়েট মেয়ে এত তাড়াতাড়ি কোথায় যে পাই, বলতে বলতে আচমকা কি মনে পড়ে যেতে সান্ধুসাহেব আমার দিকে তাকালেন, আরে ওয়েল ওয়েল — আপনার সেই আত্মীয়াটি গ্র্যাজুয়েট না?

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি কি এর মধ্যে চাকরি-টাকরি পেয়ে গেছেন?

না।

ইফ শী ইজ ইন্টারেস্টেড, আমাদের এখানে ওঁকে নেওয়া যেতে পারে।

আমার হচ্ছে না কিন্তু চাকরিটা জয়তীর তো হয়ে যাচ্ছে। দারুণ হতাশার মধ্যেও খানিকটা উত্তেজনা অনুভব করলাম। এখন আমরা দু'জন যে যেখানে আছি সেই গ্লানিকর পরিবেশ থেকে তো বেরিয়ে আসা যাবে। উত্তেজিত ভাবে বললাম, হ্যাঁ স্যার, সে ইন্টারেস্টেড।

তাহলে কালই ওঁকে নিয়ে আসুন।

এক সপ্তাহের মধ্যে সান্ধুসাহেবের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কোম্পানিতে চাকরি হয়ে গেল জয়তীর। তারপর প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই চেতলায় আমরা বাড়ি নিলাম।

সকালবেলা রান্না-বান্না করে খেয়ে-দেয়ে আমার ভাত ঢাকা দিয়ে অফিসে চলে যায় জয়তী। যাবার সময় বেলে, খেয়ে নিও।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমিও বেরিয়ে পড়ি। বিএ পাশ করার পর আট-ন বছর যা করছি, তাই করে যাই। অফিস পাড়ার রাস্তায় রাস্তায় একটা চাকরির জন্য ঘুরে ঘুরে জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করতে থাকি।

জয়তীর চাকরি হয়েছে, এতে আমি সুখী। ওর জন্য নোংরা গ্লানিকর জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছি। তবু ওতে আমি ঈর্ষা করি।

প্রথম প্রথম ক'মাস অফিস টাইমেই বেরিয়ে যেত জয়তী, ছুটির পর ঠিক সময়েই ফিরে আসত। তারপর গোলমাল হতে লাগল। আজকাল বেরুনোটা একই সময় আছে কিন্তু ফেরার কিছু ঠিক নেই। কোনো দিন সে ফেরে আটটায়, কোনো দিন সাড়ে আটটায়, কোনদিন দশটাও হয়ে যায়। ওর জন্য বসে থেকে থেকে একেক দিন খুবই ক্লান্ত লাগে, দারুণ এক শূন্যতা আমাকে যেন ঘিরে ফেলে। জয়তী ফিরলে বলি, এত দেরি হল যে?

দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-টাপড় বদলে আমাকে নিয়ে খেতে বসতে বসতে বলে, ভীষণ কাজের চাপ বেড়েছে।

তাই বলে এত রাত পর্যন্ত অফিসে থাকতে হয়?

কী করব বলো? এক্সট্রা ডিউটি দিচ্ছে।

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করি না।

এইভাবেই আমাদের দিন যায়। এক শীতের সন্ধ্যায় চাকরির খোঁজ-টোজ করে চৌরঙ্গীর বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাড়ি ফিরতে হবে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা গাড়িতে সান্ধুসাহেব আর জয়তী বসে আছে। জয়তী আমাকে দেখতে পেয়েছিল কি না জানি না। আমি ডাকবার আগেই গাড়িটা হুট করে বেরিয়ে গেল।

আমার শিরা-উপাশিরায় রক্তের বদলে তখন আগুন ছুটতে শুরু করেছে। আমাকে বাদ দিয়ে জয়তীকে চাকরি দেওয়া — এটা নিশ্চয়ই সান্ধুর ষড়যন্ত্র। কী মসৃণ ভাবে মাকড়সার মতো জাল

BanglaBook.org

পেতে লোকটা জয়তীকে ফাঁদে ফেলেছে। মনে মনে লোকটাকে দশবার হত্যা করলাম এবং নিজেকেও ক্ষতবিক্ষত করে ফেললাম।

বাড়ি ফিরে জানলার ধারে বসে ক'প্যাকেট সিগারেট খেয়েছি, মনে নেই। এক সময় জয়তী ফিরে এল। অন্য দিনের মতোই বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আমাকে খেতে দিল। নিজেও খাবারের প্লেট নিয়ে মুখোমুখি বসল। দেরি করে আসার জবাবদিহি হিসেবে কিছু বলল, আমি উত্তর দিলাম না।

চুপচাপ খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়লাম। জয়তীও পাশে এসে শুলো। আজ আমার চোখ-মুখ দেখে সে কিছু একটা আভাস পেয়েছিল। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, কী হয়েছে তোমার?

বললাম, কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে সোজাসুজি বললাম, আজ তোমার এক্সট্রা ডিউটির শ্যাম্পল দেখলাম।

জয়তী বলল, তার মানে!

সন্ধেবেলা কার সঙ্গে গাড়িতে করে চৌরঙ্গী দিয়ে যাচ্ছিলে?

জয়তী চমকাল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, দেখেছ তাহলে। সান্ধুসাহেবের সঙ্গে যাচ্ছিলাম।

এটাই বোধহয় তোমার এক্সট্রা ডিউটি?

জয়তী অস্পষ্ট গলায় কিছু একটা বলল।

বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে হঠাৎ বালকের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও জয়তী, প্লীজ ছেড়ে দাও।

আমার চুলের ভেতর ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে চালাতে জয়তী বলল, চাকরিটা ছাড়লে কী হবে ভেবে দেখেছ?

জোরে জোরে অবুঝ শিশুর মতো মাথা নাড়তে লাগলাম, ভাবতেই চাই না, ভাবতেই চাই না।

আমাকে শান্ত করে অনেকক্ষণ ধরে আমার চিবুকে ঠোঁটে কপালে চুমু খেল জয়তী। তারপর ভারি গলায় বলল, যত তাড়াতাড়ি পারো একটা চাকরি জোগাড় করে নাও। তোমার কিছু হলেই আমি চাকরি ছেড়ে দেব। একটু থেমে অনেকটা ঝুঁকে বলল, যত দিন চাকরি না পাচ্ছ মনে মনে এই ব্যাপারটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও প্লীজ।

কিছু দিন আগেই এই কথাটা বলে আমার পরস্পরকে বুঝিয়েছি।

অ্যাডজাস্টমেন্ট — এই নামে কি আমি কোনো সিনেমা দেখেছি কিংবা বই পড়েছি? কথাটার মানে আমি জানি। কিন্তু সেটা যে এত দুঃসহ, এত নির্মম — আগে আর কখনো তা মনে হয়নি॥

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাপোষা মানুষ

ঘুম ভাঙতেই চন্দ্রমাধবের মনে হল, মাথাটা ধরেছে। জল তেষ্টা। সে বিছানা থেকে নেমে জল খেল। আজকাল তার একটু খেলেই সকালের দিকে মাথা ঘোরে। মাত্রা একটু বেশিই হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তার কী যে হয়, ঝোঁকের মাথায় হুঁশ থাকে না। হুঁশ না থাকলে বোধহয় এই হয়। মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

সে এটা কী করল!

আফশোস — সে শেষে বেহুঁশ হয়ে এমন একটা ইতর কাজ করতে পারল! তার বিবেকে বাধল না! সে এতটা অমানুষ! ভাবতে গিয়ে অসাড় হয়ে আসছে শরীর। সঙ্গে আতঙ্ক।

যদি সকালে ঘোর কেটে যায়, আর মেয়েটা ভাবে সুযোগ বুঝে ইজ্জত নিয়েছে, কান্নাকাটি শুরু করে দেয়।

চন্দ্রমাধব অস্থির হয়ে পড়েছে। বাড়িতে বিধবা পিসি, তার দুই মেয়ে। ভাইপো ভাইঝিরা। এবং সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব। এক বিশাল সাম্রাজ্য। সে পায়ে পায়ে হেঁটে এসেছে অনেক দূর। হাঁটতে হাঁটতে এই সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছে। মেয়েটার এক কথায় তার মান-সম্মান রুচিবোধ ফুৎকার আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যেতে পারে।

কী যে করে।

রাত, মধ্যরাত।

গাড়ি থেকে নামার সময়ও এ-সব মনে হয়নি। বরং কত কাল পর, যেন সেই কোন যুগে যে নারী সহবাস করেছিল — মনেই নেই। বিপত্নীক হয়ে যাবার পরও একজন সাধু এবং সজ্জন মানুষ তার মধ্যে কাজ করে গেছে।

হ্যালো চন্দ্রমাধব।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শোনো, তোমার বউদি যাচ্ছেন তোমার সঙ্গে।

ঠিক আছে।

হ্যালো চন্দ্রমাধব।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার এই বিনয় এবং ভদ্রতাবোধে কখনো খামতি ছিল না। এখন কী হবে!

আরে দেখেছ খবরটা! তোমাদের চন্দ্রমাধব শ্লীলতাহানির দায়ে আটক। সকালের কাগজ দেখোনি?

না না, মিথ্যে কথা। মহামান্য আদালতের কাছে আমার অপরাধ কবুল করতে দ্বিধা নেই। সবটা আগে শুনুন।

রাত ক'টায় ফিরেছেন বাড়ি?

খেয়াল নেই।

একা ফিরেছিলেন, না কেউ সঙ্গে ছিল?

গাড়িতে নামিয়ে দিয়েছে। বাকিটুকু হেঁটেই বাড়ি ফিরেছি।

চন্দ্রমাধব ঘামছিল।

বাকিটা হেঁটে ফিরলেন, হুঁশ ছিল না, কেউ বিশ্বাস করবে?

বিশ্বাস-অবিশ্বাস জানি না। হুঁশ থাকলে হত না হুজুর!

আপনার লজ্জা করে না, বুড়ো দামড়া কোথাকার! রিটায়ার করার পাঁচ-সাত বছরও বাকি নেই। একটি কচি মেয়ের ইজ্জত নিতে আটকাল না! বিবেক কি সিন্দুকে বন্ধক রেখেছিলেন? রবিন ভটচাজ আপনার কে হয়?

আমার জানাশোনার মধ্যে এক জন।

মেয়েটিকে আগে চিনতেন?

আগে দু'বার এক সঙ্গে খেয়েছি। রবিনের ফ্যামিলি মেম্বার বলতে পারেন। এক তলায় ভাড়া থাকে। বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে আলাপ করতে এসেছিল। আমরা সবাই সে-দিন খেয়েছিলাম।

BanglaBook.org

মিথ্যে কথা হুজুর। আমার মেয়ে ও-সব ছাইপাঁশ খেতে পারে? দেখুন মুখখানা, কচি কত। বিশ-বাইশ বছরও নয়। আমরা মফঃস্বলে থাকি। বছর দুয়েক হল কলকাতায় এসে উঠেছি। ও নাচগান ভালোবাসে। ভরতনাট্যম শেখে। হুজুর, মফস্বল শহরে কিছু হয় না জানেন?

চন্দ্রমাধব জানলা খুলে মুক্ত বাতাস নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। কতক্ষণে সকাল হবে। দরজা-জানলা খুলে সে ছাদে উঠে গেল। নিশ্চয় পুলিশে খবর দেবে। মউ তো বেশি খায়নি। মেয়েটার নাম মউ। মনে পড়ছে। মাথা ঘোলা ঘোলা, কেমন স্মৃতি থেকে সব মনে করার চেষ্টা করছে। এত রাতে কি পুলিশে খবর দেবে? কিছু হলে রবিন অন্তত ফোন করত। ছি ছি, তুমি চন্দ্রমাধব এত বড় কুলাঙ্গার! কী বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড যে বাধিয়ে বসলে! এখন ঠ্যালা সামলাও। আমি কিচ্ছু জানি না।

আমি কী করেছি!

কী করেছ জানো না? আমি কী করেছি! ন্যাকা! পুলিশে খবর হচ্ছে।

গলা শুকিয়ে কাঠ। কখন টেলিফোন বেজে ওঠে। এত সকালে কেউ ফোন করে না। ফোন বাজলেই মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। সে ছাপোষা গেরস্ত মানুষ, তাকে নিয়ে শেষে এত বড় স্ক্যান্ডাল। চন্দ্রমাধব দেখল, আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। সূর্য উঠব উঠব করছে। সব ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলছে। রান্নাঘরে বড়দি তার অফিস টাইমের ভাত বসিয়ে দিয়েছে। সকাল সাতটায় না বের হলে আটটা পাঁচের লোকাল ধরতে পারে না। বড়দি তো জানেই না — কত বড় বজ্রাঘাত ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ওপর।

চন্দ্রমাধব অশ্লীলতার দায়ে আটক।

চন্দ্রমাধব লোকটাকে শেয়াল-কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেওয়া উচিত।

না না, আগে শুনুন সবটা। আমাকে রবিন জোর করে ধরে না নিয়ে গেলে যেতামই না। বছরে দু-চারবার কোনো অকেশানে সে আমাকে তুলে নেবেই।

কী রে, বসে আছিস! চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

বড়দি, শরীরটা ভালো নেই। অফিস যাচ্ছি না।

কী হল। শরীর খারাপ! দেখি দেখি।

না না, জ্বর-টার হয়নি।

কেন যে ছাইপাঁশ গিলে আসিস, বুঝি না। তুই তো এমন ছিলি না। চোখ-মুখের কী ছিরি হয়েছে। রাতে ঘুমোসনি?

চন্দ্রমাধব বলল, সুজন উঠেছে?

কেন, ডাকব?

চন্দ্রমাধব আবার কেন যে বলল, কাগজ দিয়েছে?

কাগজ? দেখি।

তার পরই চন্দ্রমাধবের মনে হল, এত রাতে থানা-পুলিশ হলেও, কাগজের অফিসে খবরটা যেতে পারে না। তার আগে...।

রাস্তায় অচেনা লোকের ভিড়। মউয়ের বাবা-মা যদি ছুটে আসে! সঙ্গে মেয়েটা! তাকে জোর করে যদি ধরে নিয়ে আসে! বল মউ, কাল এই লোকটা তোকে কী করেছিল? এই যে চন্দ্রমাধববাবু, কোথায় আপনার দিদি, কোথায় ভাইপো-ভাইঝিরা — ডাকুন। সে তা হলেই শেষ।

রবিনকে ফোন করতে পারে। হৈ-চৈ গণ্ডোগোল যদি কিছু হয়ে থাকে। যদি জানাজানি হয়ে যায়! মউ কী করছে? জানালায় একা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, না ফুঁপিয়ে কাঁদছে? ইজ্জত গেলে মেয়েরা

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করতেহ পারে। এক ঘর লোকের সামনে — অবশ্য সবাই মাতাল। রবিনের বউ কিছুটা খায়, গল্পগুজব করে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে। তার আর সাড়া পাওয়া যায় না। সে, রবিন, আর মউ। এক ঘর লোক এল কোত্থেকে। তবে রবিনের মেয়ে-জামাই খেয়েছে। ওরাও আগে উঠে চলে গেছে। ছিল সে আর রবিন। টিভি চলছে। কেউ টিভি দেখছে না। মউ রবিনের পাশে বসে ছিল।

চোখ খোলা থাকলে সব স্পষ্ট দেখাও যায় না। মউকে রবিন আদর করছিল। কাজের মেয়েটা গ্লাস রেখে গেল। একমাত্র সে-ই খায়নি। সোফার পিছনে কিছুটা দূরে বসে টিভি দেখছিল। বাবু-বিবিরা মাতাল — সে মজাও পেতে পারে। মউয়ের সঙ্গে রবিনের কী একটা ঠাট্টার সম্পর্ক আছে। একলা যুবতী মেয়ে পাশে বসে খেলে কার না সুখ হয়। রবিন তো নেশার ঘোরে কিছুটা মউকে জড়িয়ে ধরছিল। মেয়ে-জামাইয়ের ঘরের দরজা বন্ধ। কাজের মেয়েটা — সে-ও বালিকা বলা যায়, ফ্রক গায়ে দেয়, টিভির সিরিয়ালে বশ। আর সে কেন যে মউকে বলল, তোমার ভরতনাট্যম কবে দেখাবে মউ?

মউ পাশে এসে বসতেই সে কিছুটা ঘাবড়েও গিয়েছিল। খুব আনন্দও হচ্ছে। সে কেন যে বলল, পরের গোলটেবিলের খরচ আমার রবিন ম্যাকডাউয়েল। ভিন্টেজ — দুটো বড় হলেই হয়ে যাবে। শালা সারা জীবন ভালোমানুষের মুখোশ পরে থাকতে আর ভালো লাগে না। কী বলো মউ। আমরা কেউ আসলে ভালো নই। তুমি আমাকে খারাপ ভাবছ না তো? এ কী, এত তাড়াতাড়ি খাবে না। চট করে ব্ল্যাকআউট হলে নেশার মজা থাকে না।

রবিন ঢালছে। গব গব শব্দ হচ্ছে।

আমি আর খাব না রবিন।

আরে খাও চন্দ্রমাধব। তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার ভার তো আমার। সারা জীবন দিদির ভয়ে জুজু হয়ে থাকলে। সবাই শালা মাঠে খেলছে, তুমি শালা শেষ জীবনে লাইনসম্যান। বোঝো সেটা।

মউ তার কাঁধে হাত এলিয়ে দিয়েছে। চুলে সদ্য শ্যাম্পু করা গন্ধ। নাকের কাছে চুল ওড়াউড়ি করছে।

মউ সুন্দর সোনালী রঙের স্কার্ট পরেছে। ওর হাঁটুর ওপর স্কার্ট উঠে গেছে।

তোমার বাবাকে দেখছি না?

শুয়ে আছে।

শরীর খারাপ?

না, ভালোই।

মা?

মা রুটি করছে।

তুমি ভরতনাট্যম করছ। ভালো। তুমি সত্যি দারুণ মউ। খুব সুন্দর তুমি। কালনার বাড়িতে কে আছে?

কাকারা থাকেন।

তারাও কলকাতায় চলে আসবে না তো? সবারই তো ভরতনাট্যম লাগে জীবনে। জানো, আমার কিচ্ছু নেই। তুমি কী সুন্দর। বলে কাঁধে হাত রাখতেই মাথা বুকের কাছে। তখনই রবিন ফিস ফিস করে বলেছিল, চিয়ার্স চন্দ্রমাধব। তোমার চিঠিতে কাজ হয়েছে। মউ বলো, সব বলো। তোমার প্রোগ্রাম যে করে দিল, তাকে খবরটা দেওয়া উচিত নয় কি? মউয়ের বাবা মানে বোকা চাটুজ্জে,

BanglaBook.org

সম্পর্কে ভাইপো, তার ইচ্ছে, আর একখানা চিঠি। ওটা হলে রেগুলার হয়ে যাবে। মফস্বল থেকে যখন চলেই এল, বাকিটা আর বাদ থাকে কেন!

না, বাদ থাকবে না। তার যে মুহূর্তে কী হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেকে দমন করতে পারেনি। রবিন কথাটা বলেই বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। চোখ ঝাপসা, মাথা ঝিম ঝিম করছে। কথা কিছুটা জড়িয়ে গেছে। তবু সে বুঝতে পারছিল, হাত তার খেলা করছে, বুকের কাছে। তারপর নিচে, আরো নিচে। মেয়েটার হুঁশ নেই। সে জড়িয়ে বসে আছে — ক্রমে মউ আরো কেমন বোধশূন্য, মউ বড়ই আরাম বোধ করছে। বুঝতে পারছিল, সে তলিয়ে যাচ্ছে। তার ক্রিয়াকর্মে মউ দারুণ সাড়া দিচ্ছে।

পুরুষজাতটা বেজায় খারাপ, না মউ?

মোটেই না।

বাথরুমের দরজা খুলে যেতেই মউ সরে বসেছিল, মনে আছে।

সে যে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছে, এতেই যথেষ্ট প্রমাণ। সে বিড় বড়ি করে শুধু বকছিল, আগামী বারের গোলটেবিলের খরচ আমার। ম্যাকডাউলের ভিন্টেজ দুটো। দারুণ জমবে।

মউ বিড় বিড় করে বলছিল, দারুণ। দারুণ।

এই চন্দ্রমাধব, ওঠো। আর খেতে হবে না।

সে টলতে টলতে বাইরে বের হয়ে এল। সামনে বোকা চাটুজ্জে। আরে চন্দ্রমাধববাবু যে, নমস্কার। ভালো আছেন?

খুব ভালো।

কিন্তু এখন এই সকালে, তার মনে পড়ে গেল, কাজের মেয়েটা সোফার পেছনে। তার হুঁশ ছিল, অবশ্য যথেষ্ট আড়াল ছিল, এবং সিরিয়ালের বশ থাকলে কাজের মেয়েটা কিছুই ধরতে না-ও পারে। সামান্য ঢলাঢলি তো প্রায়ই হয়ে থাকে। এটা চোখে লাগার মতো বিষয় নয়।

মউ, তোমার পিসি কী করেন?

পঞ্চায়েত প্রধান।

হয়ে গেল। আর দেখতে হবে না। হয়তো বোকা চাটুজ্জে সকালের ট্রেন ধরে দেশে চলে গেছে। বোনকে সব খুলে বলেছে। মউ যে মদ্যপান করে এটা অবশ্য কিছুতেই বলবে না। সঙ্গ দিতে পারে ভালো, তা-ও খুলে বলবে না। তবে ইজ্জত নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। মউ যদি মনে করতে পারে কাজের মেয়েটা সোফার পেছনে এবং মউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়, কিংবা ঝোঁকের মাথায় হয়ে গেলেও, বুড়ো দামড়া মানুষটার বেআক্কেল হবে কেন, রাতে নেশার ঘোরে এক রকম, সকালে নেশা কেটে গেলে অন্য রকম, সহজেই শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারে। আমার সব গেল, সব গেল বলে মাথায় করতে পারে বাড়ি। ইতর, অসভ্য, বদমাস গালাগাল শুরু হয়ে যেতে পারে। জানাজানি হয়ে গেলেই মহিলা সমিতি, থানা পুলিশ — সে যে এটা কী করে ফেলল!

কী রে, শুয়ে পড়লি কেন? বাজারে যাবি না?

কাউকে পাঠাও।

রাস্তায় কী দেখছিস?

কাগজ এসেছে?

এসেছে।

সে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সমন মাথার ওপর ঝুলছে — চন্দ্রমাধব, অশ্লীলতার দায়ে আটক।

কেমন পাগল পাগল লাগছে। রবিনকে ফোন — রবিনের বউ ধরেছে।

BanglaBook.org

ওর শরীর ভালো না দাদা। শুয়ে আছে। কিছু বলতে হবে?

না থাক।

শুয়ে আছে। বোকা চাটুজ্জে কি গোপনে শাসিয়েছে? শালা আমাকে বাড়ি ছাড়া করবে! এখন দেখ, কাকে বাড়ি ছাড়তে হয়।

বোকা চাটুজ্জে সবে রিটায়ার করেছে। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে উঠে যাবে, এই কড়ারে দু-চার মাসের জন্য রবিনের এক তলায় একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। কোথাও ঘুণপোকার কামড় আছে, বোকা চাটুজ্জে আর নড়বে না। এই কেচ্ছা আরো জোর বাড়িয়ে দিতে পারে। আতঙ্কে রবিন এখন শুয়ে থাকতেই পারে।

সকাল হলে কাজ, কাগজ, দিন বাড়লে কাজ, সদলবলে বোকা চাটুজ্জে যদি বাড়িতে হামলা করতে আসে। মহিলা সমিতি যদি তাকে নিয়ে পড়ে! আইন আদালত, কাগজ এবং পুলিশ তার কাছে টেরার। খেতে বসলে বমি পায়। শুতে গেলে কান খাড়া থাকে, ডোর বেল কে টিপল, কে এল, কে গেল। তার ঘুম হয় না। চান করে চুল আঁচড়াতে মনে থাকে না। কাগজ দিতে দেরি হয় বলে সকাল সকাল বের হয়ে যায়। কাগজ নিয়ে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। ছাপোষা গেরস্ত মানুষের পক্ষে খুবই অনুচিত কাজ হয়ে গেছে, এটা টের পাবার পরই সে কিছুটা প্রায় উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করেছে। তার তাসের আড্ডা গেছে। কেউ এলে দেখা করতে ভয় পায়। দরজা খুলতে ভয় পায় — এই যখন অবস্থা, সহসা এক দিন রবিনের ফোন।

কে? কে?

আমি রবিন। তোমার সঙ্গে মউ কথা বলতে চায়।

আমার সঙ্গে, মানে... আমি।

হ্যাঁ কথা বলো।

সর্বনাশ।

তার হাত-পা-হাঁটু কাঁপছে।

কী ব্যাপার! একেবারে পাত্তা নেই। ভিন্টেজের কী হল? কবে আসছেন?

তার শরীর থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি কত সহজে যে নিরাময় হয়ে গেল — মাত্র কয়েকটি শব্দ। সঞ্জীবনী সুধার চেয়েও প্রবল এই মোক্ষম বার্তা। শরীর ঝরঝরে, তাজা, মাথায় বোঝা নেই, হালকা। তাহলে কাজের মেয়েটার কাছে তারা কেউ ধরা পড়েনি। কাজের মেয়েটি প্রকৃতই সিরিয়ালের বশ।

সে বলল, হবে। সব হবে।

পৃথিবীসুদ্ধ উজাড় করে দিতে পারি বলতে পারত, তবে বলল না।

ফোন রেখে দিয়ে শুধু ভাবল, শালা পুরুষজাতটা একেবারে নচ্ছার। উঠলে বাই তো কটক যাই। সেই দোষেই সে ডুবতে বসেছিল। আর মেয়েরা নদীর মতো পবিত্র। ডুব দাও, জল ঘোলা যেন না হয়। ঘোলা হলেই কুমিরে খাবে। মেয়েদের বড় সুবিধে, শ্লীলতাহানির দায় নেই। নরকবাস কাকে বলে ক'টা দিনেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কুমিরে খেত, তবে খায়নি। মউ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। জল ঘোলা করেনি। মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসে গেল।

এই বিশ্বস্ত নারীরাই বোধহয় পৃথিবীর আদি এবং অকৃত্রিম জননী — চন্দ্রমাধব এ-ও না ভেবে পারল না॥

BanglaBook.org

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
এক কম্বলের নিচে

মাঝে মধ্যে মাঝ রাত্তিরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ ঝগড়া শুরু হবে, এ তো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

বিয়ের প্রথম দু'বছর বাদ, সে তো একটানা পিকনিক। তারপর যদি একটি দু'টি সন্তান জন্মায়, তখন স্ত্রী তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে কয়েক বছর। বাচ্চারা এই পৃথিবীতে জবরদখল করতে আসে, তাদের দাবিও থাকে অনেক রকম। ইংরিজিতে দাম্পত্য জীবনের সেভেন ইয়ার ইচ বলে একটা কথা আছে, তা নিয়ে একটা চমৎকার ফিল্মও হয়েছিল রূপসী-মোহিনী, মেরিলিন মনরো-কে নিয়ে, বাংলায় বলা যায় এক দশকের গাঁট, সেটা পেরুলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনটা হয়ে যায় নদীর মতো, কখনো প্রবল বর্ষায় খরস্রোতা, কখনো শীতকালের শীর্ণ, নিরুত্তাপ চেহারা।

কখনো ঝগড়া হয় না, সব সময় স্বামী আর স্ত্রীর হাসি-হাসি মুখ, পরস্পরের মন জোগানো কথা, সে-জীবন খুবই কৃত্রিম। আর সন্দেহজনক।

ঝগড়া তো হবেই। তবে, ঝগড়া অনেক রকম। বেশির ভাগ ঝগড়াতেই আগুন থাকে না। আলেয়ার মতো হঠাৎ হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আবার সকাল হতে না-হতেই মিলিয়ে যায়। আগুন-জ্বালা ঝগড়ায় অনেক সংসার পুড়ে যায়। এ গল্প তাদের নিয়ে নয়।

অরূপ আর বিশাখার মাঝে মাঝে আলেয়া-ঝগড়া হয়। সব সময় নিজেদের বাড়িতেই। অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে তারা সামলে-সুমলে থাকে। বিশেষত কোথাও বন্ধু-বান্ধবের কাছে অতিথি হয়ে থাকলে বড় জোড় একটু-আধটু কথা কাটাকাটি পর্যন্ত চলতে পারে, তাছাড়া একেবারে আদর্শ দম্পতির ছবি।

তবু একবার একটু বেশি ঝগড়াই হয়ে গেল।

আগে তার একটু পটভূমিকা দেওয়া দরকার।

অরূপের বন্ধু অগ্নিভ থাকে শিলচরে, ঠিক শহরে নয়, অদূরের চা-বাগানে। অনেক বার সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ঠিক সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এবারে অরূপের অফিসের কাজে মণিপুর যেতেই হল, সুতরাং অতিরিক্ত কয়েকটা দিন বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে আসা যেতেই পারে। বিশাখা কলেজে পড়ায়, তারও এখন ছুটি, ওদের ছেলে পড়ে নরেন্দ্রপুরে, সে হস্টেলে থাকবে।

অগ্নিভ চা-বাগানের ম্যানেজার, তার অতি চমৎকার বাংলো, দু-তিনখানা গাড়ি ব্যবহার করতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও দারুণ। অগ্নিভর স্ত্রী রীতার স্বভাবটাই হাসিখুশি, খুব ভালো গানও গায়। সুতরাং চার জনে মিলে বেড়ানো, আড্ডা, খাদ্য-পানীয়ের সদ্ব্যবহারেই ছুটির কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির তো প্রশ্নই ওঠার কথা নয়। তবু এক রাত্রে, দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল আলেয়া। এ আলেয়াতে বেশ আঁচও আছে।

ঝগড়ার উপলক্ষ একটি কম্বল।

দ্বিতীয় দিনে অগ্নিভ কাছাকাছি চা-বাগানের কয়েক জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিল সন্ধেবেলা। আরো তিনটি দম্পতি। সবাই উচ্চশিক্ষিত, উচ্চচাকুরে এবং উচ্চবংশের মানুষ। কাবাব ও মাছভাজা সহযোগে প্রিমিয়াম স্কচ, চিতাবাঘ শিকারের গল্প (আসলে লেপার্ড), গান ও হাসিঠাট্টায় কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা, তারপর ডিনার। এ-সব জায়গায় এ-রকমই হয়ে থাকে।

অগ্নিভ আর রীতার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সওকত আর রোশেনারা। চেহারার দিক থেকে অন্তত এমন মানানসই স্বামী-স্ত্রী খুব কমই দেখা যায়। সওকত যেমন সুপুরুষ, রোশেনারা তেমনই রূপসী।

BanglaBook.org

যেন সিনেমার নারী-পুরুষ। বস্তুত চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা না হয়ে ওরা দু'জনে কেন চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ জীবন দিন কাটাচ্ছে তা বোঝা শক্ত।

রোশেনারা বসেছিল অরূপের পাশে। কেউ পাশে বসলে তার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলা হয়েই যায়। আবার খনিকটা অস্বস্তিও বোধ করছিল অরূপ, এমন তিলোত্তমার মতো এক নারী তার সঙ্গে বেশি গল্প করছে, এতে অন্য পুরুষদের হিংসে হচ্ছে না তো? বিশাখা কি কিছু মনে করছে? অরূপ তো ইচ্ছে করে রোশেনারার পাশে বসেনি। একটি সুন্দরী মেয়ে পাশে বসলে উঠে যাওয়াটও তো চরম অভদ্রতা।

সওকত ঘুরে ঘুরে গল্প করছে সকলের সঙ্গে, বিশাখার সঙ্গেও কী নিয়ে যেন আলোচনা করল খানিকক্ষণ। অরূপ এক জায়গাতেই বসে থাকে, সেটাই তার স্বভাব। রোশেনারা একবার উঠে গেল, কী যেন কাজের কথা বলল রীতার সঙ্গে, আবার ফিরে এল অরূপের পাশে। অনেক চেয়ার ও সোফা খালি রয়েছে, রোশেনারা তো অন্য কারুর পাশে বসলেও পারত, তবু সে কেন আগের জায়গাতেই ফিরে এল, তা অরূপ কী করে জানবে? মেয়েটির কিন্তু তার রূপের জন্য একটু গর্বের ভাব নেই, ন্যাকামিও নেই, যৌন ইঙ্গিত ছড়ায় না, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে সহজ ভাবে কথা বলে।

রোশেনারা গানও জানে। একটি নজরুলগীতি গাইতে গাইতে সে কথা ভুলে গিয়েছিল মাঝপথে। অরূপের অনেক গান মুখ থাকে, বিশাখা যখন গান গায়, অনেক সময় অরূপ কথা জুগিয়ে দেয়, সেই অভ্যেসে সে রোশেনারার 'কাবেরী নদীজলে কে গো' গানটির দ্বিতীয় স্তবকের বাণী ধরিয়ে দিল, তখন অন্যরা বললেন, আপনিও গান না ওর সঙ্গে, রোশেনারাও মিনতি করল চোখের ইঙ্গিতে।

দু'জনে শেষ করল গানটা। ডুয়েট।

অরূপ রোশেনারের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে, গলা মিলিয়েছে, কিন্তু সে একবারও রোশেনারার হাতও স্পর্শ করেনি।

কিছুটা মদ্যপানের পর অন্য মেয়েদের একটু গা ছুঁয়ে কথা বলার ঝোঁক থাকে পুরুষদের, অরূপ কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে। মাঝে মাঝে তার চোখাচোখি হচ্ছিল বিশাখার সঙ্গে, বিশাখা অবশ্য কোনো রকম রাগের ভাব দেখায়নি। অরূপের মনে হল, তার বউও এখনো বেশ সুন্দর আছে।

ডিনারের পর বিদায় নেবার পালাতেও কিছু সময় কেটে যায়। গাড়িতে ওঠার আগেও থেকে যায় গল্পের রেশ। সবাই দাঁড়িয়েছে বাইরের চাতালে। এখানে উজ্জ্বল আলো থাকলেও একটু দূরেই মিশমিশে অন্ধকার। বেশ শীত পড়েছে। দূরে ডাকছে একটা রাতপাখি।

অতিথিরা চলে যাবার পরেই বিশাখা বলল, আমার খুব ঘুম পেয়ে গেছে, আমি শুতে যাচ্ছি।

অরূপ আর অগ্নিভ একটুখানি কনিয়াক নিয়ে আরো বসল খানিকক্ষণ। অরূপের চোখ ঘুমে ঢুলে এল আগে।

ওদের শুতে দেওয়া হয়েছে ডান দিকের একটি কোণের ঘরে। সে-ঘরটি খুবই প্রশস্ত, সংলগ্ন বাথরুমটিই বৈঠকখানার মতো বড়। জানলা খুললেই দেখা যায় বাগান, দূরে পাহাড়ের পটভূমিকা। পাহাড়ের চূড়ায় একটা মন্দিরের আলো জ্বলে।

ঘরের মধ্যে একটা আবছা নীল আলো জ্বলছে। কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে বিশাখা, সম্ভবত ঘুমন্ত। পা টিপে টিপে এসে, শব্দ না করে পোশাক বদলে ফেলল অরূপ, বাথরুম ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। কলকাতায় ঘুমের আগে কিছু না-কিছু বই পড়া অভ্যেস, এখানে বিছানার পাশে আলো নেই, রাতও হয়েছে অনেক।

রাতপাখিটার ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল অরূপ।

কতক্ষণ পর কে জানে, কীসের যেন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অরূপের। কেউ কি কাঁদছে? কোনো নারীর আর্ত বিলাপ? নাকি এটা স্বপ্ন?

BanglaBook.org

চোখ মেলে দেখল, বিছানার অন্য পাশে হাঁটুতে থুতনি দিয়ে বসে আছে বিশাখা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আপন মনে কী যেন বলছে।

ব্যস্ত হয়ে অরূপ জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে মণি? পেট ব্যথা করছে?

বিশাখা কোনো উত্তর দিল না।

অরূপ গড়িয়ে কাছে এসে বিশাখার একটা হাত ধরে আন্তরিক উদ্বেগের সঙ্গে বলল, কী হয়েছে, কিছু কষ্ট হচ্ছে?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তীব্র গলায় বিশাখা বলল, যাই হোক না, তাতে তোমার কী আসে যায়? আমি মরে গেলেও তো তুমি খুশি হবে!

অরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। প্রত্যেক বার ঝগড়ার সূত্রপাত ঠিক এইভাবেই হয়। বিশাখা নিশ্চিত জানে, এই কথাগুলো অরূপের বুকে বিষের তীরের মতো বিঁধবে। মানুষ যে-দোষ করে না, সেই দোষের অভিযোগ করলে সব চেয়ে বেশি আহত হয়। বিশাখার মৃত্যু হলে কেন খুশি হবে অরূপ, সে কি অতটাই খারাপ লোক? বিশাখার বিরুদ্ধে তার তো তেমন কোনো অভিযোগ নেই। বিশাখাকে এখনো সে ভালোবাসে, হয়তো নতুন প্রেমিকার মতো নয়, কিন্তু স্ত্রী হিসাবে, তার সন্তানের জননী হিসাবে, তার জীবনসঙ্গিনী হিসাবে।

অরূপ আহত হলেও সংযত গলায় বলল, মরে যাবে কেন? কী অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বলো।

বিশাখা বলল, তোমার জানার দরকার নেই। তুমি মদ খেয়ে মাতাল হবে, তারপর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে, তাই ঘুমোও!

এটাও আর একটা বিষের তীর। অরূপ নিয়মিত মদ্যপান করে বটে, কিন্তু বিশাখা ছাড়া তাকে আর কেউ মাতাল বলে না। সবাই বলে, অরূপকে কখনো বেচাল হতে দেখা যায় না। তাতে অরূপ গর্ব অনুভব করে। মাতাল শব্দটি সে অপছন্দ করে। এক-এক দিন হয়তো মাত্রা একটু বেশি হয়ে যায়, শরীর কিছুটা দোলে, কথা বলে উচ্চকণ্ঠে, কিন্তু সে কারুর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে না, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি হারায় না, গালমন্দও করে না। মেজাজ ফুরফুরে হয়। তারপর তো সকলেও ঘুমোয়। সে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়, কে নিঃশব্দে, তা কে জানে? অরূপের নাক-ডাকা সম্পর্কে বিশাখা কখনো তেমন অভিযোগ জানায়নি। আজকাল বিশাখাও পিচ পিচ করে নাক ডাকে, ঘুম না এলে অরুপ তা শুনতে পায়। কিন্তু একবারও সে-কথা বলেনি বিশাখাকে।

অরূপ বলল, আমি মোটেই মাতাল হইনি। তুমিও তো আজ দিব্যি জিন খাচ্ছিলে দেখলাম। দু'বার না তিনবার নিলে।

বিশাখা কণ্ঠস্বরে অনেকখানি ঝাল মিশিয়ে বলল, তুমি দেখেছিলে, আমার দিকে দেখার তোমার সময় ছিল? তুমি তো এক জন সুন্দরীকে নিয়েই মত্ত হয়ে ছিলে।

অরূপের মনে মনে এই আশঙ্কাই ছিল। রোশেনারা। সে কেন অরূপের পাশে বসেছিল সারাক্ষণ, তার জন্য তো অরূপ দায়ি নয়। সে তো মহিলাকে ডাকেনি, টানাটানিও করেনি।

এবার কি একটু ঝাঁঝ এসে গেল অরূপের গলাতেও? সে বলল, মত্ত হয়েছিলাম মানে? এক জন পাশে বসলে কথা বলব না?

বিশাখা বলল, শুধু কথা? চোখ সরাতেই পাচ্ছিলে না। তারপর হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো মাঝপথে গান জুড়লে!

এপর কথার পিঠে গরম গরম কথা। চাপা গলায় ঝগড়া।

এক সময় অরূপ আবার বিশাখার হাত ধরে বলল, এত রাত্তিরে এই সব কথা বলে কোনো লাভ আছে? শুধু শুধু ঘুম নষ্ট। শুয়ে পড়ো। কাল সকালে কথা হবে।

BanglaBook.org

বিশাখা বলল, তুমি ঘুমোচ্ছিলে, ঘুমোও না! কে বারণ করেছে? আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি এতক্ষণ। তুমি নেশার ঝোঁকে কম্বলটা টেনে নিচ্ছিলে বার বার। ওঃ, আমার ইচ্ছে করছে এক্ষুনি কোথাও চলে যেতে। এ-রকম বিছানায় কেউ শুতে পারে? শীতে কাঁপছি! কাল সকাল হলেই আমি কলকাতা ফিরে যাব। তুমি থাকো এখানে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ফস্টিনস্টি করো, আমি এখন দেখতে খারাপ হয়ে গেছি।

অরূপ বলল, মণি, প্লিজ, প্লিজ। তুমি মোটেই দেখতে খারাপ হওনি। আমি তোমাকে আগের মতোই ভালোবাসি।

বিশাখা বলল, বাজে কথা বোলো না। সব পুরুষই স্বার্থপর, কম্বল টেনে নিয়ে নিজে ঘুমোচ্ছ, কার স্বপ্ন দেখছ, এ-দিকে আমি...।

আসল সমস্যাটা কি তাহলে কম্বল নিয়ে?

এ কম্বলটা খুবই অভিনব। খাটটাই মস্ত বড়, অন্তত তিন-চার জন শুতে পারে। চারখানা মাথার বালিশ, দু'খানা পাশ বালিশ, কিন্তু কম্বল একটিমাত্র। এত বড় কম্বল দেখাই যায় না। এবং মখমলের কভার, ভেতরে যে উল আছে তা বোঝাই যায় না, ভারি নরম আর আরামের। এ কম্বলের নিচে অন্তত চার জন শুতে পারে।

চা বাগানের বাংলোয় নিশ্চয়ই আরো অনেক কম্বল আছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জন্য যে এই একটিমাত্র কম্বল দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চয়ই এই কম্বলটার বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

মধ্যরাত্রির বিবাদ এক সময় থেমে যাবেই। স্বামী আর স্ত্রী দু'দিকে ফিরে শোবে, এক সময় ঘুমিয়েও পড়বে।

কিন্তু অরূপের আর ঘুম আসছে না।

মাতাল হবার অভিযোগ তাকে কষ্ট দিয়েছে। একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠে নিজের স্ত্রীকে অবহেলা করার অভিযোগ সে মানতে পারেনি। অবশ্য এ-রকম অভিযোগ সে আগেও কয়েক বার শুনেছে প্রকারান্তরে।

সব চেয়ে বেশি আঘাত সে পেয়েছে স্বার্থপরতার কথা শুনে। সে স্বার্থপর, স্ত্রীকে শীতের কষ্ট দিয়ে সে একা কম্বল উপভোগ করেছে? অরূপের মতো পুরুষরা নিজের স্ত্রীর কাছেও শিভালরাস থাকতে চায়। নিজে কম্বল গায়ে না দিয়ে জড়িয়ে দিতে চায় বিশাখাকে।

এক-এক জন পুরুষের শোওয়াটা বেশ অদ্ভুত ধরনের হয়। ঘুমের মধ্যে তারা সারা বিছানা ঘুরে বেড়ায়। পাশের লোকের গায়ে পা তুলে দেয়। বিয়ের আগে অরূপের এই দোষ খুবই ছিল। এখন শুধরে গেছে, বিশাখা কখনো অরূপের শোওয়া নিয়ে দোষ দেয়নি। কিন্তু কম্বল টেনে নেওয়া? কলকাতায় দু'জনের জন্য আলাদা কম্বল থাকে। বিয়ের পর প্রথম দিকে দু'জনের আলাদা কম্বল, ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। ইদানীং দু'জনে যখন শুতে যায়, মাঝে মাঝে শরীর নিয়ে মত্ততার পরে, ঘুমোয় আলাদা আলাদ কম্বলে। শরীর-সুখের পর ঘুমের সুখ আরো বেশি। আলাদা কম্বলের ঘুমের সুখ অবধারিত।

ইদানীং শরীর নিয়ে মত্ততার রাত্রি ক্রমশ কমছে, বাড়ছে ঘুমের সুখের ব্যাকুলতা। ঘুম বিঘ্নিত হলে বিশাখার খুবই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হয়তো সব মেয়েরই হয়।

এখন বিশাখার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ কম্বল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঝগড়ার পর বিজয়িনী হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিশাখা। শুধু জেগে থেকে ছটফট করছে অরূপ।

এ জাগরণ অন্য রকম।

আমরা অনেক সময় ভাবি, সারা রাত ঘুম আসছে না। আসলে, পুরোপুরি জাগ্রত থাকার বদলে এ এক ধরনের আধো ঘুম। পাতলা পাতলা স্বপ্নের মধ্যে কেটে যায় সময়।

BanglaBook.org

অরূপও আধো-জাগ্রত অবস্থার মধ্যে অনবরত ভেবে যেতে থাকল একটাই কথা, সে স্বার্থপর। সে বিশাখার কাছ থেকে এত বড় কম্বলের অনেকটা কেড়ে নিয়ে নিজে ঘুমিয়েছে। বিশাখার অভিযোগ হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়। সে কি অন্য দিনের তুলনায় আজ বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে? রূপসী রোশেনারা পাশে ছিল বলেই তার শরীর বেশি চনমনে হয়ে গিয়েছিল? এত বড় কম্বল, তবু ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে টেনে নিয়েছিল অনেকখানি? হতেও তো পারে।

আধো-ঘুমের মধ্যে অনুতপ্ত বোধ করল অরূপ। বিশাখাকে তার আরো ভালোবাসতে ইচ্ছে হল। কিন্তু এ-রকম ঝগড়ার পর হঠাৎ ভালোবাসার কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না। মনে হয় যেন মনজোগানোর কথা।

হঠাৎ একটা যুক্তি মাথায় এসে গেল অরূপের।

হতে পারে, সে আজ একটু বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে। হতে পারে, নেশাগ্রস্ত ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে কম্বল টেনে নিয়েছে। কিন্তু তার তো একটা সহজ সমাধানও ছিল। বিশাখা কেন তার দিকে সরে এল না? বিশাখা যদি তাকে জড়িয়ে ধরত, তাহলে তো দু'জনের জন্যই প্রচুর কম্বল থাকত? কেন এল না বিশাখা? সে তো বিশাখার শত্রু নয়, শীত করলে বিশাখা তাকে জড়িয়ে ধরবে না কেন?

এক্ষুনি বিশাখাকে জাগিয়ে এই যুক্তিটা কি শোনানো যায়? কী উত্তর দেবে সে?

কিন্তু বিশাখা এখন দিব্যি ঘুমোচ্ছে। এখন তাকে জাগাবার প্রশ্নই ওঠে না।

অরূপের আধো-ঘুমের স্বপ্নটা ক্রমশ অন্য রূপ নিতে লাগল। সে দেখল, একটা বিশাল কম্বল, শত শত মাইল লম্বা, তার নিচে অনেক মানুষ। এরা কারা? এরা সারা দেশের মানুষ। এক কম্বলের নিচে শুয়ে আছে। কখনো কম্বলটা সরে গেলে সবাই কাছাকাছি এসে জড়াজড়ি করছে, হাসছে, গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরী, সুন্দরবনের মানুষ। কম্বলটা এক দিক থেকে অন্য দিকে বেশি সরে গেলে সবাই হাসাহাসি করে ঠিক করে নিচ্ছে।

শেষ রাতের স্বপ্ন হঠাৎ তো থেমে যায় না, চলতেই থাকে। যারা এ-রকম স্বপ্ন দেখে, তারা জানে, অন্যমনস্ক হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও স্বপ্নটা চলতেই থাকে। অরূপ দেখতে লাগল, সারা আকাশ জুড়ে উড়ছে একটা কম্বল। রঙ বদলাচ্ছে, তবু প্রধানত নীল রঙের।

তারপর অরূপ দেখল, সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে একটা নীল রঙের কম্বল, আকাশের বদলে সেই কম্বলের নিচে পৃথিবীর সব মানুষ। আকাশের সেই কম্বল নিয়ে টানাটানি চলছে, আবার ঠিকঠাক করে নিয়ে খল খল করে হাসছে সব মানুষ, কালো-সাদা, খয়েরি রঙের মানুষ, ঝগড়া হচ্ছে, আবার মিটেও যাচ্ছে। মানুষ কাছাকাছি এলেই ঝগড়া মিটে যায়, দূরত্বই যত গণ্ডগোলের মূল।

আধো-ঘুমন্ত অরূপের ঠোঁটে ফুটে উঠেছে হাসি, সে পৃথিবীর দারুণ একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে আজ। আকাশটাকে সমগ্র মানুষ্যজাতির একটা কম্বল বলে ধরে নিলেই তো হয়। আর কখনো ঝগড়া হবে না।

সকালে যখন অরূপের ঘুম ভাঙল, তখনো বিশাখা ঘুমন্ত, নিজের অজ্ঞাতেই সে জড়িয়ে আছে অরূপকে। শরীরে শরীর, বুকে বুক। অত বড় কম্বলটা পড়ে আছে খাটের নিচে॥

BanglaBook.org

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মাংস

অরিন্দমের হঠাৎ মনে হল শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। মাথাটা ভার ভার। রগের পাশের শিরা দুটো টিপ টিপ করছে। অফিসে তেমন কোনো কাজ ছিল না। অরিন্দম ভাবল তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করবে। চা-টা খাবে। একটু গল্প-গুজব করবে, রেডিও শুনবে। বই পড়বে। বউয়ের সঙ্গে গল্প-টল্প করবে। অর্থাৎ বিকেল আর সন্ধেটা একটু মজায় কাটবে। শীতের সময়টায় অফিসের বড় কর্তারা সাধারণত ট্যুর কিংবা নানা ধরনের পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং তিনটে নাগাদ অরিন্দম তার দপ্তর বন্ধ করে উঠে পড়ল।

অফিসপাড়ার বিশাল বিশাল বাড়ির আড়ালে বিদায়ী সূর্য তখন মুখ লুকিয়েছে। রাস্তায় ছায়া নামলেও বড় বড় গাছের মাথায় তখন সূর্য মাখামাখি হয়ে আছে। বেশ ভালো লাগছিল অরিন্দমের। পশ্চিম থেকে একটা হিমেল হাওয়া রাতে যে আরো শীত পড়বে তারই জানান দিচ্ছিল। অরিন্দম চাদরটাকে ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিল। বলা যায় না ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-টর হয়ে গেলেই মুশকিল।

বাসে বা ট্রামে তেমন ভিড় নেই। মিনিবাস একের পর এক লাইনে দাঁড়াচ্ছে, গন্তব্যস্থলে হেঁকে যাত্রী জড়ো করছে। অরিন্দম একটু আরামে এবং তাড়াতাড়ি যাবার জন্য এক টাকা তিরিশ পয়সার একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলল। মিনিবাসে উঠে একেবারে শেষের দিকে একটা কোণের আসনে বসে পড়ল। অরিন্দম একটু শৌখিন মানুষ। সাজে পোশাকে ছিমছাম পরিপাটি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও বেশ ভোজনবিলাসী।

বাড়ির কাছাকাছি বাস থেকে নেমে তার মনে হল একটু মাংস কিনে নিলে মন্দ হয় না। সকালের খাওয়াটা তেমন জুতসই হয়নি। রাতের দিকে হিটারে প্রেসার কুকায় চাপিয়ে সে নিজেই খাসা একটা স্টু বানাবে। গাজর থাকবে, লম্বা লম্বা আলু, বীন্‌স, বাঁধাকপি আর নামাবার সময় ছোট এলাচ। আজকের রাতটা আহারে, বিশ্রামে, গল্পে, গানে একেবারে আরব্য রজনীর মতো হয়ে উঠবে।

অরিন্দমের মাংস কেনার একটা আলাদ ধরন আছে। বিশেষ কোনো একটি অংশ থেকে সে একেবারে বেশ খানিকটা তুলে নেয়। তারপর নিজের সুবিধে মতো সহজ করে নিজস্ব ঢঙে রাঁধে। যে-কোনো দোকানে অরিন্দমের বেশ খাতির। দর-দস্তুরের বালাই নেই। সেরা জিনিস চাই। পরিমাণে বেশি চাই।

ব্যাগ ছিল না। রুমালেই মাংসের টুকরোটা বেঁধে নিয়ে, এক পাউন্ড রুটি বগলদাবা করে অরিন্দম একটা সাইকেল রিক্‌শায় উঠে বসল। শরীরটা আর তেমন খারাপ লাগছে না। মাথায় নানা পরিকল্পনার ভিড়। প্রথমত অপর্ণাকে চমকে দেবে, দ্বিতীয়ত জমিয়ে রাঁধবে, তারপর সকাল সকাল বিছানায় আরাম করে হেডলি চেজ পড়বে।

রিক্‌শার ভাড়া মিটিয়ে বাড়ি ঢুকে অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। সদর দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলছে, কেউ কোথাও নেই। দোর, তালা সব বন্ধ। সামনের ফ্লাওয়ার বেডে নিঃসঙ্গ কয়েকটা কসমস উত্তুরে শীতের হাওয়ায় কাঁপছে।

অপর্ণা কোথায় গেল, কোথায় যেতে পারে? না বলে বিনা অনুমতিতে তো সে কোথাও যায় না। আশেপাশে কোনো বাড়িতে গেছে হয়তো, সময় কাটছিল না বলে। নাকি কোনো কেনাকাটায়...? কিন্তু কেনার কী থাকতে পারে? বাড়িতে সব কিছুই তো মজুত। অরিন্দম তো কৃপণ নয়। সব কিছুই বেশি বেশি কিনে রাখে। আশ্চর্য ঘটনা! অবশ্য কোনো দিনই সে এত তাড়াতাড়ি ফেরে না। তাহলে

BanglaBook.org

রোজই অপর্ণা এইভাবে তালা ঝুলিয়ে দুপুরের অবসরের সদ্ব্যবহার করে? সিনেমায় যায়? নাকি আইবুড়ো বেলার তাঁর বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি... ?

তুমি ভীষণ সুড়সুড়ি দাও, অপর্ণার শরীরটা এঁকেবেঁকে গেল। বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়ল।

কেন, সুড়সুড়ি তোমার ভালো লাগে না? তোমার কত্তা বুঝি সুড়সুড়ি দিতে জানে না! পার্থ তার লোমশ বুকে অপর্ণার মুখটা চেপে ধরে তার শরীরের এখানে ওখানে যেখানে সেখানে খুশিমতো হাত বোলাচ্ছিল। মধ্য কলকাতার নির্জন একটা ফ্ল্যাটবাড়ির চারদিকে ভারি পর্দা ঝোলানো। বন্ধ দরজা, প্রায় অন্ধকারে একটা ঘরে তখন পরকীয়া প্রেমের লীলা চলছে।

নায়ক পার্থ একটা বিলিতি ওষুধ কোম্পানির সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভ। অপর্ণার এক সময়কার সহপাঠী, প্রেমিক। ছাত্রজীবনে বহু দিন তারা পাশাপাশি ইডেনে, আউটরামে, বোটানিক্‌সে কাটিয়েছে। অপর্ণা আদর খেতে খেতে অনেকটা বেড়ালের মতো ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কী করছ, কামড়াচ্ছ কেন? দাগ বসে যাচ্ছে না! আমার ভদ্রলোকটি দেখলে কী হবে বলো তো!

কী আবার হবে? তুমি বলে দিও অ্যালার্জি হয়েছে।

ঠিক বলেছ। লোকটা একটু বুদ্ধু টাইপের। ঠিক বিশ্বাস করে নিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ কিনে আনবে।

বিয়ের আগে কখনো মেয়েছেলে দেখেনি বোধহয়। বলতে বলতে পার্থ হো-হো করে হাসল।

অপর্ণা একটু ভেবে বলল, যদি আমার মাতৃত্ব দেখা দেয়!

পার্থ নিশ্চিন্ত মনে বলল, তাতে কী? তোমার কত্তার ঘাড়ে দোষ চাপবে। যাকে বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

এবার আমি যাই পার্থ। ওঁর আসার সময় হয়েছে। গুড হাউস-ওয়াইফের কর্তব্য এবার করতে হবে।

পার্থর ঘরের টাইমিং ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল।

অপর্ণা গেট খুলে দেখল, একটা কালো কুকুর বড় একখণ্ড মাংসের টুকরো আয়েস করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিছু দূরে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা একটা রুমাল। ইস্, কার মাংস, কীসের মাংস? কুকুরটা ভীষণ আন্‌সিভিলাইজড হয়ে গেছে তো! অপর্ণা জোরে ধমক দিল, রেক্‌স, কী হচ্ছে কী? খেতে পাস না? কোথা থেকে মরা জন্তুর মাংস এনেছিস?

অপর্ণা একটা গাছের ডাল ভেঙে রেক্‌সকে শাসন করতে গেল। কুকুর কিন্তু শুনল না, রাগে একটা চাপা গর্জন করে তার অবাধ্যতা প্রকাশ করল। অপর্ণা গাছের ডাল দিয়ে রক্তমাখা ছেঁড়া রুমালটা কায়দা করে পাঁচিল টপকে পাশের মাঠে ফেলে দিল। একবারও দেখল না রুমালটার কোণে তারই হাতের কাজ করা সুতো দিয়ে লেখা আছে একটি ছোট্ট 'এ'।

গভীর রাত। অরিন্দম আর অপর্ণা পাশাপাশি শুয়ে আছে। অপর্ণা ভাবছে রেক্‌সটাকে কাল থেকে শাস্তি দিতে হবে। দু'দিন খাওয়া বন্ধ করতে হবে। রাস্তা থেকে মাংসের টুকরো মুখে করে এনে খেয়েছে। চাবুক-টাবুক মারতে হবে। আর অরিন্দম ভাবছে কিছুতেই আজ আর অপর্ণাকে স্পর্শ করবে না। অপর্ণার গোড়ালি ফেটেছে। ল্যানোলিন ক্রিম এনেছিল, নিজে হাতে মাখিয়ে দেবে বলে। তারপর ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠবে। না, সে-সব কিছুই সে আজ করবে না।

আর একটা ফ্ল্যাটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে পার্থ। মুখে তার মৃদু হাসি। মেয়েরা কী বোকা, কী মূর্খ! আমি ডন জুয়ান, বিয়ের কী প্রয়োজন, মাংস তো সব দোকানেই ঝোলে, সব রকমের মাংস। আগলি রাং, পিছলি রাং, শিনা গর্দান॥

BanglaBook.org

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ্। মাথার নিচে হাত, হাতের নিচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভালো নেই ক'দিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভালো লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়ে ছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বউ অঞ্জলিকে। খুব ভীড়ের একটা ডবলডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি।

অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নিচের মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে, পিছনের মানুষেরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারিদিকের লোকেরা কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে, কোনো দিকেই সে যেতে পারছে না। নামতেও না, উঠতেও না। বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি করে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারিদিকে রাগী, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চা নিয়ে অঞ্জলি জাহান্নমে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভীড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুল ভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল, আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে। নামো, শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিসফিসের মতো শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কন্ডাক্টর ডবল ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছে... অঞ্জলির কী হবে!

দুঃস্বপ্ন! চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বউ নয়। মাস ছয়েক আগে মান্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন তার পেটে মাস দুয়েকের বাচ্চা। এত দিনে বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেওনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাত দিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মান্দার। তখনই মাস দুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তাছাড়া অঞ্জলির ব্যাপারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালোবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালোবেসেছিল মান্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোট বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে।

অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন, ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরত দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোট বোনের বিয়ে আর দু'মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই ক'টা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়ব না।

অঞ্জলি ফেরৎ গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু'মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কি ন'মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনো কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায় বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সে-দিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে, অঞ্জলির কথা সে কখনো ভুলে যায়নি। এ-সব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাস। একটা সেকেন্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফ্‌থ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাস বেশি থাকে না। পিইউ-তে এখনো ছেলে ভর্তি হয়নি, পার্ট-টু বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা-দুটো ক্লাস নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে। তার মন ভালো না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এ-সব ক্ষেত্রে একটু-আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ওই ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুব অস্বাভাবিক বোধ করছিল ঠিকই। বোধহয় তার মানসিক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময় — সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ এই দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফ্‌থ পিরিয়ডের ক্লাসটা আজ সে করবে না। অনেক দিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এত দিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত, হয়তো-বা সেই শিশু-শরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিত।

এত বড় জোচ্চুরি যে টেকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোকা কেন ওই কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারা জীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কী-রকম বোকামি এটা? দু'মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে — ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে, রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে-বাস অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পারে কি না কে জানে।

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর, রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভীড়ের ভিতর একটা ডবলডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা তার শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের অভ্যন্তরীণ ময়লায়, ক্বাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গাল ও অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে। স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভীড় থেকে, অপমান, লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনো দিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে, সোজা চলুন, বলে দেব।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার। তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারো কথাই তার মনে পড়ে না, যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও সে ভেবে পায় না, যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকষহীন। গত কয়েক মাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

সে ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এ-দিক ও-দিক ঘোরাল। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিত ভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই। ঘুরেফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধহয় ভালোই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গীর কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঝুম। কয়েকটা দামি বিদেশি গাড়ি এ-ধারে ও-ধারে পড়ে আছে। মন্দার চম্‌কি রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভালো লাগে না, কেন ভালো লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। গত ছ'মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না-হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালোবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারের পাদানির ভীড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোনো মানে না থাকা গত ছ'মাস মন্দার যে সুখী নয়, এটা সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে মনে, ক্রমে সে শান্ত হয়ে আসছে, এবং এই ভাবেই এক দিন হয়তো-বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে ঘরে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলি দেখতে ভালো, অন্য দিকে খুবই সাধারণ। বিএ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রঙ চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাহনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাত দিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল, আমার বাবা এই বিয়ে জোর করে দিয়েছেন, আমি চাইনি।

তুমি প্রেগন্যান্ট কি বলো!

হ্যাঁ।

মাই গুডনেস্! অঞ্জলি তবু কাঁদেনি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধহয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বার বার এই সরে যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

BanglaBook.org

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাতের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর অন্য মনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অঞ্জলির বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাস ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে নিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখো তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে।

আপনি?

আমি মন্দার...।

জানি তো!

একটু দরকারে এলাম, ক'টা কথা বলতে।

কী কথা?

আমার প্রথমা স্ত্রী সম্পর্কে।

সে-ও তো জানি।

ওঃ।

আর কিছু?

না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাড়ি থেকে কিছু জানানো হয়নি।

আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জৌলুস নেই। রঙ ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোট নাক। আল্‌গা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল, কিছু মনে করলে না তো।

নন্দিনী হাসে, এই কথা বলার জন্য আসার কোনো দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

ট্যাক্সিতে এসেছি।

অযথা খরচ।

আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নিচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এত দূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল, আমার এখন অফ্ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাসটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের, ওটা তো না করলেও চলবে।

না করলে চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে, পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে, তাহলে তা তোমার ছুটিই এখন?

মনে করলেই ছুটি।

BanglaBook.org

কোথায় যাবে?

আমি কী জানি। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বউ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা-সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ্য করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্য রকম হয়েছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, এমন এক জন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শ-কাতরতা খুব প্রখর, যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে বলল, আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। কোনো দিন আসব।

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে, আসার তো দরকার ছিল না।

ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

বুঝব না কেন?

আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা কয়েক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিক দূরে হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে সে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পাদানি, ভীড়, টালমাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলির বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সব দিয়েও কিছু কম পড়ল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেই সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ, অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক হলেন।

বাবাজীবন, তুমি?

আমিই।

এসো এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বউ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছাল।

বসবে না? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেন।

মন্দার বসে। জিজ্ঞেস করে, কী খবর?

খবর আর কী? কোনো রকম। বুড়ো গলা খাঁকারি দেন।

আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেন! বলেন, সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন, কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

হুঁ।

যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ বাড়িটা তার শ্বশুড়বাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলেন, ভিতরে বাঁ-দিকের ঘরে আছে।

BanglaBook.org

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুল তুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কি না কে জানে। অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে, কবে হল?

আজ আট দিন।

ভালো আছ?

না। খুব কষ্ট গেছে। আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি, খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ওই চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে?

বলব।

কী?

আমি ভীষণ অসুখী।

হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব?

করো।

তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড় করে অঞ্জলি বলে, প্রেমিক?

ওই বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালোবাসতাম না, সে-ও আমাকে বাসত না।

তাহলে এটা কী করে হল?

হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায়, যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি। তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল, তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

বিয়ে! ভারি অবাক হয়ে অঞ্জলি বলে, তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে। তাছাড়া আমি তা করতে যাব কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এ-ও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে, তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

না। তুমি অনেক দিয়েছ।

কী দিয়েছি?

এই বাচ্চাটার পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে, ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলল, থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল, আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

জানি। করাই উচিত।

BanglaBook.org

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এ-সব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরী কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

তোমার শরীরে রক্ত নেই?

না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েক মাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

তোমার অসুখটা কেমন?

বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

তাই কি হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে। বলে, শ্বশুরবাড়িতে এসেছ, তোমাকে কেউ আদরযত্ন করার নেই। দেখো তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুনি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে, অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জ্বর এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে, তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর। একটা খারাপ হলে আর একটা ভালো হবে কী করে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না। অথচ এ-সব সাধারণ কথা নয়, এ ছাড়া আর একটা কী কথা যেন। মন্দার চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভীতু ভাব। বোধহয় সব সময় ও নিজের অপরাধের কথা ভাবে, আর ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনো না-কোনো দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিজ্ঞেস করল, এ-সব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, তা জেনে কী হবে?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল, আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

জানি।

তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছ, কিন্তু পারছ না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্যি। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভালো হত বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়, মন্দার!

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারি অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলেন, বাড়িতে কাজের লোক নেই, তাই...।

মন্দার বিস্মিত ভাবে বলে, নিজেই করলেন?

আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে থেকে ঘেন্না করে না তো বাবা? তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

BanglaBook.org

আমি কিছু খাব না।

খাবে না! বলে বুড়োমানুষ ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। সাধাসাধি করতে বোধ হয় ভয় পান। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন-বা বুড়ো জানতেন যে, মন্দার এ বাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নিচু করে বলেন, আচ্ছা, তাহলে বরং থাক।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়ে ছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, কলেজ থেকে এলে তো?

হুঁ।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মতো মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে, ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ-বেটিতে খুব অবাক হয়। তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেলেন। মন্দার অঞ্জলিকে বলে, এ-সব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনো তুমি জামাই, বারাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এ-সব সংস্কার তুলে ফেলা ভারি মুশকিল।

মন্দার উত্তর দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে, বাবার আর দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

ও-সব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে, থাকবে কেন। এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশি দিন বাঁচবও না।

কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলী সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ — এ-সব কিছুকেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়...। অঞ্জলি চুপ করে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে, অঞ্জলি, তোমাকে আমি কি একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুবই জরুরী।

বলো।

বললাম তো, মনে পড়ছে না।

একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বোঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু-আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাব? অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

ভাবি।

কেন ভাব?

তুমিই আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

BanglaBook.org

সে তো ঠিকই।

তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালোবাসার কথা সহজে ভোলে, প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পা না।

আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার। আমি তো শেষ হয়ে গেছি।

কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি।

কী শোধ নেবে বলো?

কী জানি, ভেবেই তো পাচ্ছি না।

হায় গো, কী কষ্ট।

খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি

কী-রকম দুঃস্বপ্ন?

ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ করে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডবলডেকারের পাদানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারিদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছতে পারছে ন মন্দার।

বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, অঞ্জলি, আমি হয়তো শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

পাব। তবে এটা আশা করেছিলাম বলে, সয়ে নেওয়া যাবে।

শোনো, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব, এ-রকম বসে থাকব একটু দূরে, কথা বলব কিছু মনে করবে না তো?

মনে করব! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কী ভীষণ ভালো লাগছে।

আসব। কী তোমাকে বলতে চাই, তা যত দিন না মনে পড়ছে তত দিন আসতেই হবে।

এসো। যখন খুশি।

আসব। অঞ্জলি, তত দিন তুমি ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

চারিদিকে বিশ্রী মানুষজন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে, চারিদিকে বিপদ।

কী বলছ?

খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কী তুমি বাস থেকে নামতে পারবে। আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না।

তুমি কি বলছ?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি। একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে?

ছেলে।

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোনো লাভ নেই। সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কত দিনে মনে পড়বে তার কোনো ঠিক নেই।

যত দিন না পড়ে তত দিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিত ভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষেব আর কী করার আছে॥

BanglaBook.org

বুদ্ধদেব গুহ

স্বামী হওয়া

॥ ১ ॥

মহুয়া মিলন থেকে আসা ট্রেনটা টোরী স্টেশনে ঢুকছিল।

স্মিতা এবং আমি নিচু প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজ হাটবার। খুব ভিড় প্ল্যাটফর্মে। নানা জায়গা থেকে হাট করতে এসেছিল ওরাঁও-মুণ্ডা, ভোগতা-কোলহারা।

সুমন স্যুটকেশটা হাতে করে নামল। নেমেই দৌড়ে এল আমাদের দিকে।

এসে স্মিতাকে বলল, কেমন আছ বউদি?

স্মিতা বলল, কেমন করে ভালো থাকি বলো? তুমি এত্ব দিন কাছে ছিলে না।

সুমন হাসল। আমিও হাসলাম।

এরপর সুমন আমাকে বলল, রোল্‌স রয়েসটা এনেছ তো?

এনেছি।

তবে চলো।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আমার লজঝড় অস্টিন গাড়িটার পিছনের দরজা খুলে সুমন উঠে বসল। পাশে স্মিতা। আমি ড্রাইভিং সিটে আসীন হলাম।

বসন্তের দিন। হু-হু করে হাওয়া আসছিল। পড়ন্ত রোদ্দুর সেগুন গাছের বড় বড় হাতির কানের মতো পাতার পেছনে পড়াতে সিঁদুরে-রঙা দেখাচ্ছিল পাতাগুলোকে। মহুয়ার গন্ধ ভাসছিল। ঠোঁট-মুখ চড় চড় করছিল রুখু বাতাসে।

স্মিতা বলল, তারপর? মা-বাবা বিয়ের কথা কী বললেন?

সুমন বলল, ধ্যুত। সে মা-বাবাই জানেন।

আহা! লজ্জায় যেন মরে গেলে তুমি।

ওকে গালে টুশকি মেরে বলল, স্মিতা।

আমি লাতেহারের দিকে মোড় নিলাম। কিন্তু লাতেহারে যাব না।

চাঁদোয়ারই এক প্রান্তে আমার কোয়ার্টার। সুমনেরও। পাশাপাশি। সরকারি চাকরিতে এই রকম জঙ্গুলে জায়গায় যেমন কোয়ার্টার হতে পারে, তেমনই।

কোয়ার্টারে পৌঁছে গাড়িটা খাপরার চালের একচালা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিলাম।

স্মিতা সুমনকে বলল, তোমার বাহন ছোটুয়াকে বলে দিয়েছি কাল ভোরে চলে আসতে। আজ সকালেও একবার এসে ঘর-দোর ধুয়ে-মুছে গেছে। চানুকে টুল পেতে সামনে বসিয়ে রেখেছিলাম। সব সময়। পাছে কিছু খোয়া যায় তোমার।

সুমন উত্তেজিত হয়ে বলল, চানু কোথায়? চানু?

ততক্ষণে সুমনের গলা পেয়ে চানু টাল-মাটাল পায়ে দৌড়ে এল বুধাইয়ের মায়ের হেপাজত থেকে সাড়া পেয়ে। বলল, সুমনকাকু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

সুমন স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখেই চানুকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিয়ে বলল, তাহলে আমি মরেই যাব। তোমার সঙ্গে আড়ি করে কি আমি বাঁচতে পারি? তোমার মা-বাবা পারলেও-বা পারতে পারে। আমি কখনো পারব না।

চানু অত বোঝে না। চার বছর বয়স তার মোটে। সে বলল, আড়ি, আড়ি, আড়ি।

স্মিতা, সুমন এবং আমিও হেসে উঠলাম।

BanglaBook.org

স্মিতা বলল সমুনকে, জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। দুপুরে খেয়েছিলে কোথায়?

দুপুরে আবার কোথায় খাব? যা হতচ্ছাড়া লাইন। এ-সব জঙ্গলের জায়গা তোমাদের মতো কবি কবি লোকের পক্ষেই ভালো লাগার। সাত সকালে বাড়কাকানাতে খাওয়ার খেয়েছিলাম। পথে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে চা, কার্নি মেমসাহেবের দোকানের আলুর চপ। কালাপাত্তি জর্দা দেওয়া পান। গোটা আষ্টেক, সারা পথে।

স্মিতা বিরক্তির গলায় বলল, তাই-ই। ঠোঁট দুটোর অবস্থা দেখেছ কী হয়েছে! এখানের গরমে-ফাটা লাল মাটির মতো।

সুমন বলল, কথা না বলে শিগগিরি খেতে দাও তো!

আমি আমার ঘরে গেলাম। আমার প্রিয় ইজিচেয়ারটিতে বসলাম। আমার সাম্রাজ্যে। আমার বই, বইয়ের আলমারি, গড়গড়া। ছুটির দিনে গেঞ্জি আর পাজামা পরে সারা দিন বই পড়েই কাটে আমার। আমি বড় কুঁড়ে লোক। স্মার্ট, এনার্জেটিক, সামাজিক বলতে যে-সব গুণ বোঝানো হয় তার কোনো গুণই আমার নেই। আক্ষেপও নেই, না-থাকার জন্য।

তবে চাঁদোয়া-টোরীতে সরকারি কাজে বদলি হয়ে এসে পড়ার পরই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। স্মিতার জন্য। আমি তো সারা দিন কাজকর্ম নিয়ে থাকব। অবসর সময়ই বই পড়ব। কিন্তু আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট, সম্বন্ধ করে বিয়ে করা স্ত্রী স্মিতা? তার সময় কী করে কাটবে? ভাগ্যিস চানু হয়েছিল। এখানে যখন আসি তখন চানুর বয়স পনেরো মাস। তবুও একটা নরম খেলনা ছিল স্মিতার। যে-খেলনাকে খাইয়ে-দাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, চোখ রাঙিয়ে ওর সময় কেটে যেত।

সময় তবুও কাটত কি না জানি না, যদি সুমন এখানে বদলি হয়ে না আসত। বয়সে সুমন আর স্মিতা সমানই হবে। পাশের কোয়ার্টারে ও একা এসে উঠেছিল। প্রথম প্রথম হাত পুড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অভ্যেস ছিল না রান্না করার। অচিরে স্মিতার সঙ্গে ওর একটা সখ্যতা গড়ে উঠল। যদিও বউদি বলে ডাকত সুমন স্মিতাকে কিন্তু ওরা যে কত বড় বন্ধু একে অন্যের তা আমার মতো কেউই জানত না। সুমনকে পেয়ে স্মিতার যত ছেলেমানুষি শখ ছিল সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। পলাশ গাছে উঠে ফুল পাড়ত স্মিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে সুমনের সঙ্গে। কুরুর পথে আমঝরিয়ার বাংলোয় মুনলাইট পিকনিক করত। লাতেহারের কাছে বহু বছর আগে পরিত্যক্ত কলিয়ারির আশেপাশে ঘুরে ঘুরে শীতের দুপুরে ছেলেমানুষি প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ চালাত।

কখনো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেত ওরা পীড়াপীড়ি করে। আমি না-গেলে নিজেরাই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত মনে কলকেতে ডালটানগঞ্জের সাপ্লায়ারের দেওয়া অম্বুরী তামাক সেজে গড়গড়ার নল হাতে একটা বই নিয়ে আরাম করে ইজিচেয়ারে বসতাম। ওদের সঙ্গে যেতে যে হল না, এ-কথা ভেবে আশ্বস্ত হতাম।

খাওয়ার টেবিলে ডাক দিল স্মিতা। আমিও এসে বসলাম। ও শিঙাড়া বানিয়েছে। ক্ষীরের পুলি। লাতেহারের পণ্ডিতজির দোকান থেকে শেওই আর কালাজামুন আনিয়েছে।

গব গব করে খেতে খেতে সুমন বলল, আরো দাও, আরো দাও বউদি। তুমি এমন কিপটে হয়ে গেলে কী করে এক মাসের মধ্যে?

স্মিতা কপট রাগের সঙ্গে বলল, কিপটে আমি? মারখাঁনগরের বোসের ঘরের মেয়ে। ওই সব পাবে না আমার কাছে।

সুমন আমাকে বলল, দেখছ রবিদা। ওই শুরু হল। সর্বক্ষণ এমন এনিসি-ক্যাম্প থেকে থেকে আমার হাওড়া জেলার ওরিজিনালিটিটাই মাঠে মারা গেল। বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে বসে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা ছাড়া খেতে পারি না দেখে মা আর দিদির তো চক্ষুস্থির। তোমাদের গল্প করতাম সব সময়। দিদিমা বললেন, সুমন তোকে শেষে ওই রেফিউজিগুলোর আদিখ্যেতায় পেল। ছিঃ ছিঃ।

BanglaBook.org

কী বললে?

স্মিতা এবার সত্যিই বোধহয় রেগে উঠল।

সুমন বলল, আহা রাগছ কেন, কী বললাম তাই-ই শোনো। আমি বললাম, বাঙালদের মন খুব ভালো হয় দিদিমা। খোলামেলা জায়গায় থাকত তো, আকাশ-জোড়া মাঠ, আদিগন্ত নদী, কত মাছ, কত ঘি, কত কী...।

দিদিমা বললেন, থাক, থাক। সব রেফিউজিই জমিদার ছিল। ও-সব গল্প আমাকে আর শোনাসনি। বহু শুনেছি।

সুমন হাসতে লাগল।

ও ছেলেমানুষ। ওর মনে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু ও এ-কথাটা না বললেই ভালো করত। সকলেরই জমিদারি বা সচ্ছল অবস্থা না-থাকলেও যাদের ছিল, এ-রকম কথা শুনলে তাদের বড়ই লাগে।

এখন বোধহয় লাগে না আর। প্রথম প্রথম লাগত। এখন ব্যথার স্থান অবশ হয়ে গেছে। ক্ষত হয়েছে পুরনো।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

বরিশালে আমাদের দো-তলা বাড়ির চওড়া বারান্দায় পূর্ণিমার রাতে বসে আছি ইজিচেয়ারে। থামের ছায়াগুলো পড়েছে বারান্দাতে কালো হয়ে। দিঘির পাড়ের সার সার নারকোল গাছের পাতায় চাঁদের আলো চক চক করছে। সেরেস্তার দরজা-জানলা বন্ধ। কুন্দনলালজি তাঁর ঘরের সামনে চৌপায়ায় বসে দিলরুবাতে বাহারে সুর তুলেছেন। গ্রামের লক্ষ্মীরা সন্ধ্যারতি শেষ করে শাঁখ বাজাচ্ছে। বাতাসে নারকোল পাতার নড়াচড়ার শব্দ। আরো কত কী গাছ। জামরুল গাছ, আমবাগান, লিচুগাছ, জলপাই গাছ, নিচে হাসনুহানা কাঠটগরের ঝোপ। পাশে পাশে হরেক রকমের চাঁপা। আমার দো-তলা ঘরের জানলা অবধি উঠে এসেছে একটা কনকচাঁপার গাছ। গাড়ি ঢোকার পথের পাশে ছিল ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার সারি।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।

স্মিতা বলল, কী হল? তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

সুমন বলল, রবিদাদা, রাগ করলে নাকি?

আমি হাসলাম। বললাম, না রে পাগল।

স্মিতা সুমনকে বলল, আর দুটো শিঙাড়া খাবে?

সুমন বলল, দাও। কত্ব দিন পর তোমার হাতের খাবার খাচ্ছি।

তারপর বলল, আসলে কলকাতায় গিয়ে তোমাদের গল্প, বিশেষ করে বউদির গল্প সকলের কাছে এতই করেছি যে, তোমাদের সকলেই হিংসে করতে আরম্ভ করেছে। বউদিকে তো বেশি করে!

স্মিতা চায়ের কাপটা মুখের কাছে ধরে ছিল। দেখলাম, কাপের ওপর ওর দু'টি টানা টানা কালো চোখ সুমনের ওই কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেই নিথর হয়ে গেল।

চা খাওয়ার পর আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম।

সুমন চানুকে কাঁধে করে স্মিতার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারে গেল। স্মিতা সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে। আগোছাল, একা-লোকের সংসার।

যাওয়ার সময় স্মিতা বলে গেল বুধাইয়ের মাকে যে, একটু পরে এসে যেন চানুকে নিয়ে যায়। খাওয়ার সময় হয়ে যাবে চানুর।

BanglaBook.org

ওরা দু'জনে যখন ফিরল সুমনের কোয়ার্টার থেকে তখন রাত গভীর। আমি এডওয়ার্ড জোস্টিং-এর লেখা হাওয়াই-এর ইতিহাস পড়ছিলাম। ইতিহাস পড়তে পড়তে হাজার বছরের ব্যবধান এত সামান্য মনে হয় যে, ঘণ্টার খবর রাখতে তখন আর ইচ্ছে করে না।

দুপুরেই রান্না সেরে রেখেছিল স্মিতা। বুধাইয়ের মা গরম করে দিল খাওয়ার-দাওয়ার।

স্মিতা খাবার সাজিয়ে ও এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দেখো! সুমন কত কী এনেছে আমাদের জন্যে। এইটা আমার শাড়ি। বলেই চেয়ারের ওপর থেকে শাড়িটা তুলে দু'হাতে মেলে ধরে দেখাল। তারপর বলল, এ-রকম একটাও শাড়ি তুমি আমাকে দাওনি।

আমি বললাম, এ তো দারুণ দামি শাড়ি।

সুমন বলল, বউদি কি আমার কম দামি?

স্মিতা আবার আমাকে বলল, এই যে! তোমার পাঞ্জাবি ও পায়জামা। এই চানুর জামা-প্যান্ট!

আমি রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললাম, করেছ কী সুমন, এই রকম নকশা-কাটা চিকনের পাঞ্জাবি কি আমাকে মানায়? এ তো ছেলেমানুষদের জন্যে।

সুমন বলল, আপনি তো প্রায় তিন বছর কলকাতায় যান না। এখন তো এই-ই ক্রেজ। ঘাটের মড়ারা পর্যন্ত পরছে আর আপনি তো কিশলয় এখনো।

স্মিতা নরম গলায় বলল, এই যে শুনছ, দেখো।

আমি বললাম, কী?

অ্যাই দেখো, আমার জন্য আরো কী এনেছে।

বলেই ছোট দুটো প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। দেখি, একজোড়া বেদানার দানার মতো রুবির দুল আর একটা ইন্টিমেন্ট পারফ্যুম। ছোট্ট।

আমি সুমনকে বকলাম। বললাম, তুমি একটা স্পেন্ডথ্রিপট হয়ে গেছ। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। সারা জীবন পড়ে আছে সামনে। বিয়ে করবে দু'দিন পর। এমন বেহিসাবির মতো খরচ করে কেউ?

স্মিতা বলল, দেখো না, বেশি বেশি বড়লোক হয়েছেন!

সুমন বলল, বড়লোকদের জন্যে বড়লোকি না করলে কি চলে?

খেতে খেতে আমি ভাবছিলাম, সুমন বেশ সুন্দর সপ্রতিভ কথা বলে, যা আমি কখনোই পারিনি। পারব না। স্মিতার যে ওকে এত ভালো লাগে তার কারণ অনেক। চিঠিও নিশ্চয়ই ভালোই লেখে। আমার তো এক লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। আমাকে অবশ্য কখনো লেখেনি ও অফিসিয়াল ব্যাপারের চিঠি ছাড়া। তবে স্মিতাকে প্রায় তিন-চারটে করে চিঠি লিখত প্রতি সপ্তাহে। যত দিন ছিল না এখানে। এখানে ডাক পিওন চিঠি বিলি করে না। আমার অফিসের পিওন ছেদীলাল মাস্টারমশাইয়ের কাছে থেকে ডাক নিয়ে আসে রোজ। ভারি ভারি চিঠি আসত পুরু খামে। সুমনের সুন্দর হাতের লেখায় স্মিতার নাম লেখা থাকত। কোনো দিন ছেদীলাল পোস্ট অফিস যেতে দেরি করলে বুধাইয়ের মাকে পাঠাতে স্মিতা আমাকে মনে করিয়ে দিত, চিঠি আনার জন্য।

যে ক'দিন সুমন ছিল না, লক্ষ্য করলাম স্মিতা কেমন মনমরা হয়ে থাকত। বেলা পড়ে এলে, গা-টা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, শালজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্মিতা বাইরের সিঁড়ির ওপর বসে থাকত। শেষ বিকেলের আলোর মতো নরম হয়ে আসত ওর মুখের ভাব সুমনের চিঠি পড়তে পড়তে। ঘর থেকে আমি ডাকতাম ওকে, ও শুনতে পেত না। কোথায়, যেন কত দূরে চলে যেত ও মনে মনে।

BanglaBook.org

॥ ২॥

সুমন শিগগিরি কলকাতা যাবে। ওর বিয়ে ঠিক করেছেন মা-বাবা। সকালে রাঁচি গেছে ও নতুন স্কুটার ডেলিভারি নিতে।

অফিস থেকে ফিরছিলাম হেঁটেই। আমাদের অফিসটা কোয়ার্টারের কাছেই। দু-ফার্লং মতো। অফিস যাতায়াতের জন্য গাড়ি কখনোই নিই না এক বর্ষাবাদলের দিন ছাড়া। আকাশে তখনো আলো আছে। জঙ্গল থেকে শালফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে মহুয়া এবং করৌঞ্জের গন্ধ। পথের পাশে, জঙ্গলের শাড়ির পাড়ে ফুলদাওয়াইয়ের লাল ঝাড়ে মিনি-লঙ্কার মতো লাল ফুল এসেছে। মাঝে মাঝে কিশোরীর নরম স্বপ্নের মতো ফিকে ফিকে বেগুনি জীরহুলের ঝোপ।

লাতেহারের দিক থেকে একটা ট্রাক জোরে চলে গেল চাঁদোয়ার দিকে। লাল ধুলো উড়ল, মেঘ হল ধুলোর। তারপর আলতো হয়ে ভাসতে ভাসতে পথের দু'পাশের পাতায় গাছে ফিস ফিস করে চেপে বসল।

মিশিরজি আসছিলেন সাইকেল নিয়ে বস্তির দিক থেকে। দেহাতি খদ্দরের নীল পাঞ্জাবি অর ধুতি পরে। হাওয়াতে তাঁর টিকি উড়ছিল। দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন, পরর্‌নাম বাবু।

আমি বললাম, প্রণাম।

হিন্দিটা আমি তখনো যথেষ্ট রপ্ত করতে পারিনি। সে-দিকে সুমন পটু। পানের দোকানের সামনে সাইকেল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জর্দা-পান খেতে খেতে ওর সমবয়সি স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে এমন ঠোঁট মিলিয়ে হিন্দিতে গল্প করে অথবা হিন্দি সিনেমার গান গায় যে, কে বলবে ও স্থানীয় লোক নয়! সব মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতা আছে সুমনের। ওর মধ্যে অনেক কিছু ভালো জিনিসই আছে যা আমার মধ্যে নেই।

মিশিরজি, সাইকেলের টায়ারে কির কির শব্দ করে নামলেন।

বললেন, হালচাল সব ঠিক্কে বা?

আমি বললাম, ঠিক্কেই হ্যায়।

সুমনবাবু কি কলকাত্তাসে শাদি করিয়ে আসলেন এবার?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো!

মিশিরজি অবাক হয়ে বললেন, আভভি যাত্তে দেখা উনকা স্কুটারমে। পিছুমে কই খাবসুরত আওরত থী। বড়ী প্যায়ার সে সুম্মনবাবুকা পাকড়কে বেঠী হুয়ী থী।

আমি অবাক হলাম। বললাম, নহী তো। বিয়ে তো করেনি।

তাজ্জুব কি বাত। তব সুমনবাবুকা সাথমে উও ক'ওন থী?

আমার মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, মেরা বিবি ভি হোনে শকতি। দু'জনের মধ্যে খুব দোস্তী।

মিশিরজি বললেন, অজীব আদমী হ্যায় আপ বড়াবাবু। দোস্তী উর পেয়ার কখনো এক হয়? আর মরদ ঔর আওরতের মধ্যে কি দোস্তী হয় বড়াবাবু? খালি পেয়ারই হোবে।

তার পরই হো-হো করে হেসে বললেন, আপ বড়ী হিউমারাস আদমী হেঁ। নেহী তো, নিজের ধরম-পত্নী কি বারেমে অ্যায়সী মজাক কেউ করতে পারে কভভী?

আমার মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল যে, মজাক করিনি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, স্মিতা সব সময় আমাকে বলে, তুমি খুব বোকা। কোথায় কী বলতে হয় জানো না।

সত্যিই বোকা আমি।

banglabook.org

বাড়ি ফিরেই জানতে পেলাম যে, সত্যিই আমি মজাকী করিনি। রাঁচি থেকে নতুন স্কুটার ডেলিভারি নিয়ে এসেই সুমন তার বউদিকে পিছনে চড়িয়ে টোড়ী থেকে বাঘড়া মোড়ে যে-পথটা চলে গেছে তার মাঝামাঝি জায়গায় গভীর জঙ্গলের মাঝে 'বড়হা-দেও'-এর থানে পুজো চড়াতে গেছে।

চানুটা কান্নাকাটি করছিল। আমাকে বলল বল খেলতে। আমি এ-সব পারি না। তবুও চা-টা খেয়ে বুধাইয়ের মাকে বাড়ির কাজ করতে বলে আদর্শ বাবার মতো চানুর সঙ্গে ওর লাল রবারের বল নিয়ে কোয়ার্টারের পিছনের মাঠে বল খেলতে লাগলাম।

আমার মন পড়ে ছিল হাওয়াইয়ের রাজা কামেহামেহার রাজত্বে। অন্যমনস্ক থাকায় অচিরে বলটা লাফাতে লাফাতে কুয়োয় গিয়ে পড়ল। বালতি নামিয়ে অনেক চেষ্টা করেও ওঠাতে পারলাম না বলটাকে। চানু কাঁদতে কাঁদতে বলল, সুমনকাকা তুলে দিয়েছিল, তুমি পারলে না। তুমি কিচ্ছু পারো না বাবা।

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, সুমনকাকা এসেই তুলে দেবে।

তারপর চানুকে আবার বুধাইয়ের মা'র জিম্মাতে দিয়ে আমি আমার ইজিচেয়ারে শায়িত হয়ে রাজা কামেহামেহার কাছে ফিরে গেলাম।

ওদের ফিরতে বেশ রাত হল। স্মিতার শাড়ি এলোমেলো, ধুলো লাগা বিস্রস্ত চুল। খোঁপায় দলিত জংলী ফুল আর মুখে কী এক গভীর আনন্দের ছাপ।

সুমন বলল, স্কুটারটা খারাপ হয়ে গেছিল বাঘরার জঙ্গলে। কী ভয় যে করছিল, কী বলব। বাঘের জন্যে নয়, পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত হল বলে।

আমি বললাম, ফাজিল।

চানু বলল, এক্ষুনি আমার বল তুলে দাও সুমনকাকু। বাবাটা কিচ্ছু পারে না। বল পড়ে গেছে কুয়োর মধ্যে।

সুমন ওই অন্ধকারেই টর্চ হাতে করে কুয়ো পাড়ে গিয়ে চানুর বল তুলে নিয়ে এল। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেল।

সে-রাতে স্মিতাকে আদর করতে যেতেই ও বলল, আজ থাক লক্ষ্মীটি। আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

ওর সুন্দর, ছিপছিপে, এলানো শরীর, গভীর নিশ্বাস, ওর বুকের ভাঁজে সুমনের দেওয়া ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ সব মিলেমিশে ওকে বিয়ের রাতের স্মিতার মতো মনে হচ্ছিল।

আমি আর কিছু বলার আগেই স্মিতা ঘুমিয়ে পড়ল। চাঁদের আলো একফালি জানালা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছিল। স্মিতার মুখে বড় প্রশান্তি দেখলাম। খুব, খুব, খুউব আদর খাওয়ার পর, আদরে পরম পরিতৃপ্ত হবার পর মেয়েদের মুখে যেমন দেখা যায়।

আমার ঘুম আসছিল না। মিশিরজির দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক। পান খেয়ে খেয়ে কালো হয়ে গেছে সেগুলো। গায়ে দেহাতি ঘামের পুরুষালী গন্ধ। হঠাৎ মিশিরজির ওপর খুব রাগ হল আমার। তাই ইজিচেয়ারে শুয়ে টেবিল-লাইট জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহা ও রানি কাহুমানুর কাছে ফিরে গেলাম। খুব প্রশান্তি।

ইতিহাসের মতো আনন্দের, শান্তির আর কিছুর নেই।

পরদিন চা খেতে খেতে স্মিতা বলল, সুমনের বিয়ের কথা লিখে আবার চিঠি দিয়েছেন ওর বাবা। কাল-পরশু ওর এক কাকা আসবেন রাঁচি হয়ে, ওর কাছে ওই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে। আমি কিন্তু খেতে বলে দিয়েছি তাঁকে। যে-দিন আসবে, সে-দিন রাতে।

আমি বললাম, বেশ করেছ। না বললেই অন্যায় করতে।

BanglaBook.org

সুমনের কাকার চেহারাটা আমার একটুও ভালো লাগল না। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমেই সকালের বাসে এসে নাকি এখানের নানা লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন। সুমনের কাছে যখন অফিসে এসে পৌঁছন, তখন বিকেল চারটে। রাতে যখন খেতে এলেন আমাদের বাড়ি, তখনই তাঁকে দেখলাম। অশিক্ষিত বড় লোকদের চোখে-মুখে যেমন একটা উদ্ধত নোংরা ভাব থাকে, এই ভদ্রলোকের মুখেও তেমন। বালিতে থাকেন। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করেন। কালোয়ার ভদ্রলোক কেবল স্মিতাকে লক্ষ্য করছিলেন। বেশ অভব্য ভাবে।

আমার মনে হল, উনি আসলে সুমনের বিয়ের কারণে আসেননি। এসেছেন স্মিতাকে দেখতে।

খেতে খেতে অসম্মান ও অপমানে আমার কান লাল হয়ে উঠল।

সেই রাতেই আমি প্রথম স্মিতাকে কথাটা বললাম। না বলে পারলাম না। মিশিরজির কথা বললাম। সুমনের কাকার কথা বললাম। বললাম, ছোট জায়গা, অশিক্ষিত অনুদার সব লোকের বাস। বাড়ির বাইরে একটু বুঝে-শুনে চলাফেরা করতে।

স্মিতা চুপ করে আমার কথা শুনল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুই বলল না।

আমি বললাম, তোমার ব্যবহারে সুমনকে যদি তোমার স্বামী বা প্রেমিক বলে ভুল করে বাইরের লোকে তাহলে আমার পক্ষে তা কি খুব সম্মানের হয়?

স্মিতা রেগে উঠল। বলল, আচ্ছা! তুমি কী? স্কুটারে বসলে যে চালায় তাকে না জড়িয়ে ধরে কেউ বসতে পারে?

তারপর বলল, মিশিরজি বা কে কী বলল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তুমি কী বলো সেইটেই বড় কথা।

আমি বললাম, আমি কি কখনো কিছু বলেছি? কিন্তু নিজের সম্মানের কারণে না বলেও তো উপায় দেখছি না এখন। তোমাকে যদি লোকে খারাপ বলে, তা কি আমার ভালো লাগবে?

স্মিতা বলল, নিজের মনের কথাও যে ওই, তা তো বললেই পারো। অনেক দিন আগে বললেই পারতে। নিজের কথা অন্যের মুখের বলে চালাচ্ছ কেন?

আমি স্মিতার কথায় ব্যথিত হলাম। কিছু না বলে, ইজিচেয়ারে, নিরুপদ্রব রাজত্বে ফিরে গেলাম।

তার ক'দিন পরেই সুমনের খুব জ্বর হল। আমি বলেছিলাম ও আমাদের বাড়িতেই এসে থাকুক। ছেলেমানুষ, বিদেশে বেহুঁশ অবস্থায় একা বাড়িতে থাকবে কী করে? তাছাড়া ক'দিন পরেই ওর বিয়ে। কী অসুখ থেকে কোন অসুখে গড়ায় তা কে বলতে পারে?

স্মিতা জেদ ধরে বলেছিল, না। আমাদের বাড়িতে ও মোটেই থাকবে না।

বলেছিলাম, তাহলে ওর সেবা-শুশ্রূষা করো। রাতে না-হয় আমিই গিয়ে থাকব। তুমিও থাকতে পারো ইচ্ছে করলে।

স্মিতা বলল, থাক, এত ঔদার্য নাই-ই বা দেখালে। তোমার মিশিরজিরা কি তাহলে চুপ করে থাকবে?

সারা দিন স্মিতাই দেখাশোনা করল। রাতে আমিই গেলাম সুমনের বাড়ি। ওর শোবার ঘরে ক্যাম্পখাট পেতে, থার্মোমিটার, ওষুধ, ওডিকোলন সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল স্মিতা।

নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না আমার। অনেকক্ষণ জেগে বসে বসে সিগারেট খেলাম। তারপর পাশের ঘরে গেলাম। সুমন তখন ঘুমোচ্ছিল। পাশের ঘরে টেবিলে একটা চিঠি পড়ে ছিল। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা। সুমনের নামের। সুমনের মা'র লেখা চিঠি।

BanglaBook.org

কেন জানি না, ওই নিস্তব্ধ রাতে, ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে আমার মন বলল, এই চিঠির ভিতরে এমন কিছু আছে যা স্মিতা ও সুমনের সম্পর্ক নিয়ে লেখা। টেবিল-লাইটের সামনে চিঠির ভিতরে আঙুল দিয়ে চিঠিটা গোল করে ধরে পড়তে লাগলাম চিঠিটা। যতটুকু পড়তে পারলাম তাই-ই যথেষ্ট ছিল।

সুমনের মা লিখেছেন, সুমনের কাকার চিঠিতে জানতে পেরেছেন তিনি যে, সুমন একটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে। সে এক ভেড়ুয়ার বউ। সুমন জানে না যে, সুমনের কত বড় সর্বনাশ সেই মেয়ে করছে ও করতে চলেছে। সুমন ছেলেমানুষ। মেয়েদের পক্ষে কি করা সম্ভব আর কি অসম্ভব সে-সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই নেই। সুমনের ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কোনো আত্মীয়ের কাঠের ব্যবসা আছে লাতেহারে। তাঁরাও খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, সুমনের কাকা যা জানিয়েছেন, তা সত্যি। পাত্রীপক্ষ বেঁকে বসেছে যে, ওই বজ্জাত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ না-করলে এবং বিয়ের পরেই ওখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসার চেষ্টা না-করলে এ বিয়ে হবে না। এত সুন্দরী ও বড়লোকের মেয়েও আর পাওয়া যাবে না। তাদের দেয় পণের টাকাতেই সুমনের বোন মিনুর বিয়ে হয়ে যাবে। যদি সুমনের তার বাবা-মা, বোন তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তার নিজের সম্বন্ধেও কোনো মমত্ব থাকে তাহলে ওই রেফিউজি ডাইনির সঙ্গে সব সম্পর্ক এক্ষুনি ত্যাগ করতে হবে। সুমনের ট্রান্সফারের জন্যে অথবা সেই ডাইনির ভেড়া স্বামীর ট্রান্সফারের জন্যে পাটনাতে তাঁরা মুরুব্বি লাগিয়েছেন। সুমনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ও তার কচি মাথা ওই ডাইনি কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। অমন ছেনাল মেয়েছেলের কথা ওঁরা জন্মে শোনেননি।

বড় ভুল হয়ে গেছিল আমার। হাওয়াই-এর ইতিহাসটা বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। আমার ঘুম হবে না। কামেহামেহার সঙ্গে থাকলেই ভালো করতাম।

পরে মনে হল, এ চিঠিটা স্মিতাকে দেখানো উচিত, আমার মতো স্বামী বলে কি আমার চোখের সামনে যা নয় তাই করে বেড়াবে? ওদের মধ্যে সম্পর্ক কত দূর গড়িয়েছে তা কে জানে? এই সম্পর্কে সুমনের উৎসাহই বেশি ছিল, না স্মিতার নিজের, তা ভগবানই জানেন। এ সংসারে ভালোমানুষীর শাস্তি এইভাবেই পেতে হয়। ভালোমানুষ মানেই বোকা মানুষ। যে নিজের জরু-গরু শক্ত হাতে পাহারা দিয়ে রাখতে না-পারে, তার মান-সম্মান এমনি করেই ধুলোয় লুটোয়। বড় বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন এই পৃথিবী, এই মেয়েছেলের জাত। এরা কার ছেলে কখন কোলে করে বড় করে, তা আমার মতো ভেড়া স্বামীর জানার কথা নয়।

দা ল্যাম্ব। ভেড়া। সত্যি সত্যিই আমি একটা ভেড়া!

॥ ৪ ॥

সুমনের জ্বর যে-দিন ছাড়ল সে-দিনও লিকুইডের ওপর রাখল স্মিতা ওকে। পরদিন সুমন যা যা খেতে ভালোবাসে সুজির খিচুড়ি, মুচমুচে বেগুনি কড়কড়ে করে আলুভাজা, হট-কেসে ভরে খাওয়ার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এল স্মিতা।

জ্বর ভালো হতেই সুমন এক দিন বলল, রোজ রোজ আমাদের বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া করতে ওর অসুবিধা হয়। এবার থেকে ছোটুয়াই রেঁধে-বেড়ে দেবে ওকে। তাছাড়া, সাত দিন পরে তো ও চলেই যাচ্ছে। বলল, স্মিতার কষ্ট এবার শেষ হবে।

সুমনের বিয়েতে সুমন আমাদের কাউকেই কলকাতায় যেতে বলল না। আমাদের নামে, ওদের বাড়ি থেকে কোনো কার্ডও এল না। সুমনই একটা কার্ডে কালো কালি দিয়ে আমাদের নাম লিখে পাঠিয়ে দিল ছোটুয়ার হাতে।

BanglaBook.org

স্মিতা আমাকে বলল, বিয়ে করতে যাচ্ছেন, ভারি লজ্জা হয়েছে বাবুর। বিয়ে যেন আর কেউ করে না। নিজে হাতে কার্ড দিতে লজ্জা!

সমুন যে-দিন যায়, ও রাঁচি হয়ে গেল। আমরা বাসস্ট্যান্ডে ওকে তুলে দিয়ে এলাম। চানু বলল, কাকিমাকে নিয়ে এসো কিন্তু সুমনকাকু। আমরা খুব বল খেলব।

স্মিতা হেসে বলল, তোমার ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখব, স্টেশনে তোমাদের আনতে যাব আমরা। সে-দিন তোমার বাড়িতে রান্না-বান্নার পাট রেখো না। আমাদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে, থাকবে সারা দিন।

সুমন জবাব দিল না কোনো।

শুধু বলল, চলি।

বাসটা ছেড়ে দিল।

সুমন চলে যাওয়ার পরই আমাদের বাড়িতে আশ্চর্য এক বিষাদ নেমে এল। সুমন এর আগেও অনেক বার ছুটিতে গেছে। কিন্তু এবারের যাওয়াটা অন্য রকম। যে-সুমন বাসে উঠে চলে গেল, সেই সুমন আর ফিরবে না এই টোড়িতে। আমি সে-কথা জানতাম। স্মিতাও জানত। যদিও ভিন্নভাবে।

এবারে গিয়ে অবধি একটাও চিঠি দিল না সুমন স্মিতাকে। আমাকে না জানিয়ে ছেদীলালকে পোস্টাপিসে পাঠাত স্মিতা চিঠির খোঁজে। স্মিতার মানসিক কষ্ট দেখে আমি এক পরম পরিতৃপ্তি পেতাম। যে নিজে কাউকে আঘাত দিতে শেখেনি, দুঃখ দিতে জানেনি, তার অদেয় আঘাত ও দুঃকে যে অন্য জনকে অন্য কোণ থেকে এসে বাজছে, এই জানাটা জেনে ভারি ভালো লাগছিল আমার।

মনে মনে বললাম, শাস্তি সকলকেই পেতে হয়। তোমাকেও পেতে হবে স্মিতা।

স্মিতা আমার সঙ্গে কোনো দিনও সুমনের হঠাৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেনি। সুমনের সঙ্গেও করেছিল বলে জানি না। করলেও তা আমার জানার কথা নয়। ওদের সম্পর্কটা গভীর ছিল বলেই সুমনের হঠাৎ পরিবর্তনের আঘাতটা স্বাভাবিক কারণেই বড় গভীর ভাবে বেজেছিল ওর বুকে।

এ-কথা বুঝতাম।

স্মিতা মুখ বুজে সংসারের সব কর্তব্যই করত। আমাকে খেতে দিত। জামা-কাপড় এগিয়ে দিত। লেখাপড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখত। শোওয়ার সময় মশারি গুঁজে দিত। তারপর নিজে বারান্দায় গিয়ে বসে থাকত।

মাঝ রাতে উঠে বাথরুম যেতে গিয়েও দেখতাম স্মিতা বারান্দায় বসে আছে অন্ধকারে।

বলতাম, শোবে না?

পরে। অস্ফুটে বলত ও।

শুধোতাম, মশা কামড়াচ্ছে না?

ও বলত, নাঃ।

আমি মনে মনে বলতাম, পোড়ো, নিজের কৃতকর্মের আগুনে পুড়ে মরো নিজে।

ব্যাটারিতে-চলা একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল আমাদের বাড়িতে। বিয়ের সময় কে যেন দিয়েছিল। তাতে ওই সময় একটা গান প্রায়ই চাপাত স্মিতা। রবিঠাকুরের গান 'মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়...' ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম লাইন : পুরানো সেই দিনের কথা...।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো আসক্তি নেই, খুব বেশি শুনিওনি। কিন্তু ওই গানটার মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিল। সেটা আমার অসহ্য লাগত।

BanglaBook.org

এক দিন স্মিতা সন্ধ্যাবেলায় পাণ্ডেসাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল চানুকে নিয়ে তাঁর মেয়ের জন্মদিনে। সেই সময় তাক থেকে বই নামাতে গিয়ে আমার হাতের ধাক্কা লেগে রেকর্ডটা মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল।

আমি কি অবচেতন মনে রেকর্ডটাকে ভাঙতেই চেয়েছিলাম? জানি না।

বুধাইয়ের মা শব্দ শুনে দৌড়ে এল। আমি বললাম, বই নামাতে গিয়ে পড়ে গেল। এগুলো তুলো রাখো। বউদি এলে দেখে যে কী করবে, বউদিই জানে।

স্মিতা ফিরে এসে শুনল। ও ভাঙা টুকরোগুলোকে ফেলে না-দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখল। আমাকে কিছুই বলল না। জবাবদিহিও চাইল না।

'আর-একটি বার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়'...।

খেতে দাও বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। কখনোই চেঁচাই না আমি। কিন্তু সে-রাতে চেঁচালাম। কী জানি, কেন!

স্মিতা আমাকে খেতে দিল। চানুকে খাওয়াল।

আমি বললাম, খাবে না?

নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, তোমরা খাও। এই-ই তো খেলাম। খিদে নেই। পরে খাব।

আমি বুঝতে পারছিলাম স্মিতা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

বুধাইয়ের মা বলল, তুমি বিমার পড়বে মাঈজী। কিছুই খাওয়া-দাওয়া করছ না তুমি!

স্মিতা ওকে ধমকে বলল, তুমি চুপ করো তো! অনেক খাই।

আমি আঁচাতে আঁচাতে ভাবছিলাম, সুমন চলে যাবার পর সত্যিই অনেক রোগা হয়ে গেছে স্মিতা। কিন্তু কী বলব, কেমন করে বলব, ভেবে পেলাম না।

শুধু বললাম, নিজের শরীরের অযত্ন করলে নিজেই ঠকবে।

স্মিতা আমার কথার কোনো জবাব দিল না। আমার হাতে লবঙ্গ দিল। রোজ যেমন দেয়। তারপর আমার সামনে থেকে নিঃশব্দে চলে গেল।

॥ ৫॥

কাল সুমনরা আসবে।

স্মিতা আর আমি দু'জনেই গাড়ি নিয়ে রাঁচি গিয়ে ফিরায়েলালের দোকান থেকে সুমন আর সমুনের স্ত্রী অলকার জন্যে আমাদের সাধ্যাতীত প্রেজেন্ট কিনে এনেছি। ফুলের অর্ডার দিয়ে এসেছি। কাল সকালের বাসে টাটকা মাছ, ফুল, রাবড়ি, সন্দেশ সব নিয়ে আসবে বলে বাসের ড্রাইভারকে টাকা এবং বকশিসও দিয়ে এসেছি।

স্মিতার ভাই নেই। আমারও নেই। বেশ ভাইয়ের বিয়ে, ভাইয়ের বিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের।

ভোর পাঁচটা থেকে উঠে পড়েছে স্মিতা। এ ক'দিনে অনেক রোগা হয়ে গেছে ও সত্যিই। কিন্তু চেহারাটা যেন আরো সুন্দর হয়েছে। চোখ দু'টি আরো বড় বড়, কালো, কাজল টানা। বিরহ মানুষকে সুন্দর করে। চোখের সামনেই দেখছি।

অন্যান্য রান্না করতে না-করতেই মাছ এসে গেল। দই-মাছ করেছে, কাতলা মাছের। খুব ভালোবাসে সমুন। মুড়িঘণ্ট। মাছের টক। মুরগির কারি। পোলাউ। সঙ্গে তো মিষ্টি ও রাবড়ি আছেই। রাতের জন্যে আরো বিশেষ বিশেষ পদ। ফিস-রোল।

আমি অফিসে একবার বুড়ি-ছুঁয়েই চলে এসেছি। অফিসে সুমনের সব সহকর্মীও উৎসুক হয়ে কখন ওরা এসে পৌঁছায় তার প্রতীক্ষায় ছিল। আমার এখানেই চলে আসতে বলেছি সক্কলকে সমুনের

BanglaBook.org

'বড়ে-ভাইয়া' হিসেবে। ওদের সকলের জন্যে মিষ্টি-টিষ্টিও এনে রেখেছি। বউ দেখে মিষ্টিমুখ করে যাবে বলে।

স্মিতা রান্না-বান্না এগিয়ে নিয়েই সুমনের কোয়ার্টারে গেল ফুলশয্যার ঘর সাজাতে। নিজের আলমারী খুলে নতুন ডাবল-বেডশিট, বেডকভার, ডানলোপিলোর বালিশ, মায় আমার সাধের কোলবালিশটিকে পর্যন্ত ধোপাবাড়ির ওয়াড়-টোয়াড় পরিয়ে ভদ্রস্থ করে নিয়ে চলে গেছে।

এমনই ভাবে যে, সুমন নতুন বউয়ের সঙ্গে শোবে না তো যেন স্মিতার সঙ্গেই শোবে।

মেয়েদের ভালোবাসার রকমটাই অদ্ভুত!

যে-সময়ে ওদের আসবার কথা, সে-সময়ে ওরা এল না। আমি দু'বার খোঁজ নিলাম অফিসে কোনো ফোন এসেছি কি না রাঁচি থেকে তা জানার জন্যে। রাঁচি এক্সপ্রেস ভোরেই পৌঁছয়। রাঁচি থেকে আসা সব বাসও চলে গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার সব তৈরি, এমন সময় আমাদের অফিসের চৌধুরী এসে বলল যে, সুমন চিঠি লিখেছে যে, প্লেনে আসছে কলকাতা থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আসবে এখানে। বিকেল বিকেল পৌঁছবে। রাঁচির মেইন রোডের 'কোয়ালিটি'তে লাঞ্চ করে। ও আমাকে কিছুই জানায়নি শুনে চৌধুরীও খুব অবাক হল।

স্মিতাকে জানালাম। বললাম, চলো তাহলে, বসে থেকে আর লাভ কী হবে? আমরা খেয়েই নিই।

স্মিতা আমাকে খেতে দিল। কিন্তু নিজে খেল না। বলল, সারা দিন রান্নাঘরে ছিলাম, গা বমি বমি লাগছে।

স্মিতা এই খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ওর আনত চোখে বড় ব্যথা দেখলাম।

সন্ধের মুখে মুখে সুমন আর অলকা এল ট্যাক্সিতে করে। সঙ্গে কোয়ালিটির খাবারের প্যাকেট। রাঁচির কোয়ালিটি থেকে তন্দুরী চিকেন আর নান নিয়ে এসেছে রাতের খাওয়ার জন্যে।

এ খবরটা আমি আর স্মিতাকে দিলাম না।

ওরা যেহেতু আমাদের বাড়িতে এলই না, অপিসের সকলে ওখানেই গেল।

বুধাইয়ের মা এবং আমি নিজে মিষ্টি-টিষ্টি সব বয়ে নিয়ে গেলাম ওর কোয়ার্টারে। সমুনের দাদা হিসাবে সকলকে যত্ন-আত্তি করলাম।

সকলে বলল, বউদি কোথায়? ভাবিজি কোথায়?

আমি বললাম, আসছে।

তারপর আমি নিজেই স্মিতাকে নিতে এলাম। দেখলাম, স্মিতা চান করে সুমনের কলকাতা থেকে আনা সেই সুন্দর লাল আর কালো সিল্কের শাড়িটা পরেছে। কানে সুমনের দেওয়া বেদানার মতো রুবির দুল। গায়ে সুমনেরই ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ।

আমি বললাম, চলো স্মিতা।

স্মিতা বলল, সুমনের স্ত্রী কেমন দেখলে?

আমি বললাম, দেখিনি এখনো।

চানু আগেই বুধাইয়ের মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। আমি আর স্মিতা এগোলাম।

আমাদের দেখে সুমন উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, এই যে রবিদা আর বউদি।

সুমনের স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করল। স্মিতার দিকে ফিরেও তাকাল না।

BanglaBook.org

সুমন ঠাণ্ডা নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, বউদি! কেমন হয়েছে আমার বউ?

স্মিতা মুখ নিচু করে বলল, ভালো, খুব ভালো।

বলেই বলল; তোমরা খেতে, রাতে আমাদের ওখানে যাবে তো?

অলকা কাঠ কাঠ গলায় সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, রাতের খাওয়ার তো নিয়ে এসেছি রাঁচি থেকে। কষ্ট করার কী দরকার ওঁদের।

স্মিতা কিছুই বলতে পারল না।

আমি বললাম, তোমরা যা ভালো মনে করো, করবে।

অফিসের সহকর্মীরা হৈ-হৈ করে উঠল। বলল, ইয়ার্কি নাকি? দাদা-বউদি কাল রাঁচি থেকে বাজার করে আনলেন, সারা দিন ধরে রান্না করলেন বউদি, আর তোমরা খাবে না মানে? এ কেমন কথা?

অলকা আমাকে বলল, তাহলে এখানেই যদি পাঠিয়ে দেন। আমরা বড় টায়ার্ড।

চানু কিছুক্ষণ সুমনের কোলের কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে বুঝল যে, সুমনের ওপর তার যে নিরঙ্কুশ দাবি ছিল তা আর নেই। শাড়ি-পরা এক জন নতুন মহিলা এখন তার সুমনকাকুর অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। সুমনকাকু বল খেলল না, তাকে কাঁধে চড়াল না, তাকে তেমন আদরও করল না দেখে, সে তার মায়ের আঁচলের কাছে সরে গেল। শিশুরা আদর যেমন বোঝে, অনাদরও।

স্মিতা সুমনকে বলল, তাহলে তাই-ই হবে। খাওয়ার সব এখানেই পাঠিয়ে দেব। ক'টায় পাঠাব? ন'টা নাগাদ?

সুমন এই প্রথম বার চোখ তুলে তাকাল। স্মিতাকে দেখল। ওর ভালোবাসায় মোড়া-শাড়িতে, ওর আদরে দেওয়া রুবির দুল-পরা স্মিতা। কিন্তু স্মিতা যে খুব রোগা হয়ে গেছে তা-ও নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়ল। সুমনের চোখ দু'টি এত আনন্দের মাঝেও হঠাৎ ব্যথায় যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্মিতার মুখে তাকিয়ে থেকেই চোখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা বউদি! ন'টার সময়েই পাঠিও।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনের স্ত্রী সুমনের দিকে তাকাল।

স্মিতা চানুকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল। আমি রয়ে গেলাম, তক্ষুনি চলে গেলে খারাপ দেখাত। চেনা-জানা এত লোক চারপাশে।

কত লোক কত কথা বলছিল, রসিকতা, হাসি ঠাট্টা। ওদের শোবার ঘর ভারি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এ-কথা সকলেই বলল।

অলকা কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, কে সাজালেন শোয়ার ঘর?

তিনি বললেন, রবিদাদার স্ত্রী, স্মিতাবউদি।

অলকা বলল, তাই-ই বুঝি?

অতিথিরা একে একে প্রায় সকলেই চলে গেলেন। বুধাইয়ের মা আর ছোটুয়া যতক্ষণ না ওদের খাবার নিয়ে এল ততক্ষণ আমাকে থাকতেই হল। বুধাইয়ের মা এসে বলল বউদির শরীর খারাপ। সারা দিন রান্নাঘরে ধকল গেছে। বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়েছিল। এই খাবার-দাবার কোনো রকমে বেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

তারপর বুধাইয়ের মা সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, বউদি আসতে পারল না।

সুমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

অলকা আমাকে বলল, আপনি তাহলে যান ওঁর কাছে। শরীর খারাপ যখন।

আমি বললাম, আপনারা একা একা খাবেন?

চৌধুরী বলল, আরে দাদা, ওরা তো এখন একাই থাকতে চাইছে। দেখছেন না, আমাদের সকলকে কী-ভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

BanglaBook.org

আমি হাসলাম। হাসতে হয় বলে। তারপর বললাম, আচ্ছা! তোমরা ভালো করে খেও।

দু-এক জন কৌতূহলী, অত্যুৎসাহী মহিলা বাসরে বর-বউকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে রয়ে গেলেন।

সুমন দরজা অবধি এল একা একা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে কী যেন বলবে বলবে করল, তারপর বলল না। শুধু বলল, আচ্ছা রবিদা।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত দশটা বাজে। চানু ঘুমিয়ে পড়েছে। বুধাইয়ের মা একা বসে আছে খাওয়ার ঘরে, মোড়া পেতে, দেওয়ালে মাথা দিয়ে।

বুধাইয়ের মা বলল, দাদাবাবু, আপনি খাবেন না?

বউদি খেয়েছেন?

বউদির শরীর ভালো না। শুয়ে রয়েছেন।

আমি বললাম, আমাকে এক গ্লাস জল দাও বুধাইয়ের মা। আমিও খাব না। শরীর ভালো নেই।

বুধাইয়ের মা জল এনে দিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

আমি চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে। তার চোখেও দেখলাম বড় ব্যথা।

বললাম, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো বুধাইয়ের মা।

বুধাইয়ের মা বলল, আমারও খিদে নেই একদম।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি স্মিতা সেখানে নেই। পাশের ঘরে ঢুকলাম। দেখি, চানুর পাশে স্মিতা উপুর হয়ে সন্ধেবেলায় সেই লাল-কালো সিল্কের শাড়িটা পরেই শুয়ে আছে। ওর হালকা ছিপছিপে সুন্দর গড়নে চানুর পাশে অল্পবয়সি ওকে, চানুর মা বলে মনেই হচ্ছিল না।

আমি কাঠখোট্টা লোক। বুঝি কম। ভাবি কম। কিন্তু কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট আমার ছেলেমানুষ স্ত্রীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম দরজায় দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরে আমি ইজিচেয়ারে শুলাম।

অন্ধকার রাতে তারারা সমুজ্জ্বল। জঙ্গলের দিক থেকে মিশ্র গন্ধ আসছে হাওয়ায় ভেসে। শিয়াল ডাকছে লাতেহারের দিকের রাস্তা থেকে। গোঁ গোঁ করে মাঝে মধ্যে দু'টি একটি মার্সিডিস ডিজেল ট্রাক যাচ্ছে দূরের পথ বেয়ে। আজ বাইরেও রাত বড় বিধুর। রাতের পাখিরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। ঝিঁঝির একটানা ঝিন ঝিন রবের ঘুমপাড়ানি সুর ভেসে আসছে জঙ্গলের দিক থেকে।

ইজিচেয়ারে আমি কত কী ভাবছিলাম। এমন সময় ঘরে একটা মৃদু খস খস শব্দ হল। পারফ্যুমের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। স্মিতা কথা না-বলে সোজা এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার মধ্যে যে খারাপ মানুষটা বাস করে সে বলল, আঘাত দাও ওকে। এমন শিক্ষা দাও যে, জীবনে যেন এমন আর না করে! ওর প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও অনীহাতে আমার মন ভরে উঠল। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আমার মধ্যের সেই আমিত্বময় সাধারণ স্বামী।

কান্নার বেগ কমলে আমি বললাম, কী হল?

ও বলল, আমার জন্যে আজ তোমার এত লোকের সামনে...; আমার জন্যেই। আমি জানি।

আমি চুপ করে রইলাম।

আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

কীসের শাস্তি?

ভুলের শাস্তি।

আমি বললাম, ব্যঙ্গাত্মক স্বরে, ভালোবেসেছিলে বলে অনুতাপ হচ্ছে?

BanglaBook.org

স্মিতা এবার মুখ তুলল। আমার পায়ের কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে বলল, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা...।

আমি বললাম, আমিই কি বললাম? বললাম, আমার কী এমন রূপ-গুণ আছে যাতে তোমার শরীর ও মনে চির দিন একা আমি সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারি? বিশ্বসংসারে এক জন স্বামীরও কী আছে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমার ভাগে যা পড়েছিল তাই-ই তো যথেষ্ট ছিল। সেই ভাগের ঘরে কোনো শূন্যতা তো কখনো অনুভব করিনি স্মিতা! সত্যিই করিনি।

স্মিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল তার বোকা, অগোছাল ভুলোমনের স্বামীর দিকে।

দূরের ঝাঁটি জঙ্গল ভরা মহুয়াটাঁড়ে চমকে চমকে রাতচরা টি টি পাখিরা ডেকে ফিরছিল। হাওয়া দিয়েছিল বনে বনে। কারা যেন ফিস ফিস করছিল বাইরে।

ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে আর এক জন মানুষ সুমন, তার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। স্মিতারই ভালোবাসার হাতে-পাতা বিছানাতে।

সুমন এখন কী ভাবছে কে জানে? কিন্তু যদি স্মিতার কথা সুমন একবারও ভাবে তাহলে আমার মতো সুখী এ মুহূর্তে আর কেউই হবে না।

অনেক বছর আগে, বিয়ের রাতে যজ্ঞের ধোঁয়ার মধ্যে বসে যে-সব সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম তার বেশিরই মানে বুঝিনি। সে-দিন আমি আমার নিজস্ব কোনো যোগ্যতা ব্যতিরেকেই স্বামী হয়েছিলাম স্মিতার, শুধুমাত্র বিয়ে করেই।

স্মিতা কাঁদছিল নিঃশব্দে। আমার বুক ভিজে যাচ্ছিল ওর চোখের জলে। কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগছিল।

স্মৃতিতে হঠাৎই বউভাতের রাতটা ফিরে এল। তখন মা বেঁচে ছিলেন। জ্যাঠামণি, রতনমামা। স্মিতার বাবাও। আরো কেউ কেউ। আজ যাঁরা নেই।

আমার পুরনো বন্ধুরা, কত আনন্দ, কল্পনা সে-রাতে, সুগন্ধ, সানাই।

স্মিতার মাথায় হাত রেখে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হল যে, যে-আমি টোপর মাথায় দিয়ে সমারোহে গিয়ে স্মিতাকে এক দিন তার পরিবারের শিকড়সুদ্ধু উপড়ে এনেছিলাম, তার সঙ্গে যে-মানুষটা তার স্ত্রীর সুখে-দুঃখে জড়াজড়ি করে অনেক অবিশ্বাস ও সন্দেহ পায়ে মাড়িয়ে বিবাহিত জীবনের কোনো বিশেষ বিলম্বিত মুহূর্তে সত্যিই স্বামী হয়ে উঠলাম, তাদের দু'জনের মধ্যে বিস্তরই ব্যবধান।

'বর হওয়া' আর 'স্বামী হওয়া' বোধহয় এক নয়॥

হাসান আজিজুল হক

এক জন চরিত্রহীনের সপক্ষে

অজ পাড়াগাঁয়ে খারাপ পাড়া বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই। মাঝে মাঝে দু'টি একটি হাড়ি ডোম বাউরি কিংবা বাগ্দী মেয়েমানুষ কুল ছিটকে রাণ্ডি হয়ে যায়। সেটা বেশি দৃষ্টিকটু হয়ে উঠলে ছোটলোক পাড়াতেই তার জায়গা নেই। বলে, শালী সতী নয়। রেখে-ঢেকে করলে ভাবনা নেই অবশ্য।

নিজের মুদির দোকানে আধবুড়ো সতীনাথ রাত ন'টার সময় ঝিমোয়। গাঁয়ে ঘরে রাত আটটার মধ্যে খদ্দের আসা বন্ধ হয়। এখন কাউকে আশাও করা যায় না, কেউ এলেও বিরক্তি আসে।

সতীনাথ রাত ন'টার সময় ঝিমোয় আর তেঁতুলগাছের জটলার মধ্যে কুঁড়েটার কথা ভাবে। মেয়েমানুষটা তো থলথলে হয়ে এল। মেয়েমানুষ যে এবার নোংরা মাগী হয়ে গেল। শীতের রাত ন'টায় মর্কটগুলো পড়তে শুরু করেছে। চিৎকার করে, শোরগোল করে পড়া। যা ভাবে তা তো আর প্রকাশ করা যায় না। হয়তো অনেক দিন টাকা দিয়ে আসছে, শাড়ি শেমিজ দিয়ে আসছে, তেলটা নুনটা দিচ্ছে, তাই মেয়েমানুষটার কাছে যা ভাবে, যা করবে বলে ভাবে, যত নোংরাই হোক সে বলতে পারে কিন্তু ছোকরাগুলো এবার সব ম্যাট্রিক দেবে, অর্ধশিক্ষিত মুদি হয়ে সে কেমন করে ওদের মর্কট বলে গাল দেয়। তাকে তাই বলতে হয়, কাল অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছ বাপু তোমরা, অত পড়া পড়ো কী করে গো? ছেলেরা মুচকি হাসে।

অথচ সতীনাথ জানে সন্ধ্যা থেকে হুড়োহুড়ি করে তাস খেলে বিড়ি টেনে ছেলেগুলো অনবরত হল্লা করেছে। দাদুর বিড়ি বলে ছোট ছেলেটা তিনবার বিড়ি নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুড়ো দাদু একটা বিড়ি খেলে গাঁয়ের লোকে ঘুম ভেঙে উঠে বসে, পাশের বাড়ির লোকে ভাবে, আজ রাতেই খামারবাড়ির ঘরে বুড়ো বোধহয় পটল তুলবে। দাদু বিড়ি অত খায় না। খায় ছোঁড়াগুলোই।

আর এই রাত ন'টায় গ্রামের রাস্তাগুলি যখন শীতে আড়ষ্ট ও নিশ্চেতন হয়ে এসেছে, যখন সতীনাথের নিজের টাকায় বানিয়ে দেওয়া কুঁড়ের মেয়েমানুষটার কাছে যাবার ঠিক সময় মনে হয় তখনই ওদের সব ছেড়ে রাত বারোটাতক পড়তে ইচ্ছা করে। সতীনাথ শোনে, ওদের মধ্যে কে বলছে, কর্তা উঠল রে?

না, এখনো ওঠেনি।

আজ কর্তাকে উঠতে দেখে তবে যাব।

গুজ গুজ ফুস ফুস করে ওরা যেন ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। হ্যাঁ, হারামজাদারা কর্তাকে উঠতে দেখে তবে যাবে! কর্তাকে উঠে গাঁয়ের পথে হাঁটতে দেখলে, কর্তা চলে গেলে আলো নিভিয়ে তোরা আর ঘুমুতে পারবি না।

এই জন্যই পড়ার ভান করে ওরা। সতীনাথকে আটকে রাখতে নয়। সতীনাথ সম্পর্কে কুৎসিত কথাটা একবার যাচিয়ে নিতে চায়। কিংবা নিত্য যাচিয়ে নেওয়ার নামে তাকে অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া ভিন গাঁয়ের স্কুলের মাস্টার দত্তবাড়ির একদঙ্গল ছেলের কাকা বিএ ডিসটিংশন নিয়ে পাশ করেছে তো দিগগজ হয়েছে। শনিবারে শনিবারে এসে তার তেজ দেখিয়ে যায়। কারো বাড়িতে তাস পিটিয়ে ন'টায় এসে ওদের ওখানে বসে ঢুলবে আর বারোটা পর্যন্ত খবরদারি করবে। ছেলেগুলো চিৎকার করে মাথামুণ্ডু চেঁচাবে আর মাঝে মাঝে কৌতূহলে নিষ্ঠুর আনন্দে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, চল বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসি। তারপর দু'জন নেমে এসে গোয়ালঘরে ঢুকে ফস করে দেশালাই জ্বেলে বিড়ি ধরিয়ে চোঁ-চোঁ টানতে থাকবে। কী সব বকতে বকতে একবার দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নেবে সতীনাথ আছে কি না। দোকান আগলানোর ভান করে দু'একটা খদ্দেরের আশা করে সতীনাথকে তখন ঘুমে ঢুলতে হবে।

রাত বারোটায় কাকা হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়। সপ্তাহে একবার আসে, রবিবারটা থাকে। দিনে ঘুরে বেড়ায়, মাতব্বরি করে, সন্ধ্যায় তাস খেলে ছেলেদের কাছে এসে বসে। রাত বারোটায় ষোল বছরের বউয়ের ঘরে শুতে যায়। আর সতীনাথ ষোল বছর হল বিয়ে করেছে।

সতীনাথ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অপেক্ষা করে। এবার তার চামড়া-ঝোলা স্থূল কমলির মায়ের কাছে শুতে যাওয়া উচিত। সারা দিন কাজ করে, ঘর, গোয়াল, কিষাণ মুনিশদের তদারক করে সে এখন

BanglaBook.org

ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। একতাল মাংসপিণ্ডের মতো জড়ো হয়ে গুটিয়ে ঘরের বাতাস কাঁপিয়ে সে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। তার পাশে শুয়ে মুখ থেকে আঁচলটা সরালেই সতীনাথের গা ঘিন ঘিন করবে। সন্ধ্যার পান এখনো সে মুখে রেখেছে। দুই কশ বেয়ে লালচে প্যাচপেচে পিক গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে বালিশটাকে রঙিন করে তুলেছে। কমলির মা শিশুর মতো ঘুমের ঘোর হাসতে হাসতে জিভ ঘুরিয়ে চক চক করে সেই লালা খাবে আরাম করে আর ঘুমের ওষুধ খেয়ে মানুষ যেমন ঘুমোয় তেমনি করে নিঃসাড়ে ঘুমুবে। ঘুম ভাঙাতে গেলে মারতে আসবে, বলবে, রাত দুপুরে সং করতে নাগলে!

সতীনাথ আবার ঝিমোতে শুরু করে। এটি আমার দোষ, আমি একটা নোংরা লোক, আমি কমলির মায়ের ঘরে শুতে যেতে পারি না! কোথাও না গিয়ে এই দোকান ঘরে মাদুরের উপরেই দিব্বি কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুতে পারি না, তার জন্য আমি কী করতে পারি? রায়বাড়ির বিধবাটার ওপর আমার চোখ পড়ে গিয়েছে। আর ওই দত্তবাড়ির ছোকরার বউ যখন স্নান করে ভরা ঘড়া নিয়ে ভিজে কাপড়ে কমলা রঙ ফুটিয়ে দোকানের সামনে দিয়ে যায়, আমি খদ্দের বিদেয় করতে ভুলে যাই।

গাঁয়ের শেষে তেঁতুলের দঙ্গলের মধ্যে কুল ছিটকে বেরিয়ে আসা মেয়েটাকে আমিই ঘর বানিয়ে দিয়েছি আদর করে। সে তো নোংরা মাগি হয়ে এল — আমি ঘর কেড়ে নিইনি এখনো। কমলির মার বুক শুকিয়েছে, সে সারা রাত ঘুমোতে পারে। আর আমি, আমি কী করি? ঘুমুতে পারলে শরীর ভালো থাকত, আনন্দে থাকতাম দিনমানে, কিন্তু জেগে জেগে সারা রাত আমি কী করি? ভীষণ ভয়ে চমকে ওঠে সতীনাথ, নিজের কপালে টোকা মারে।

হ্যাঁ, শালারা, নিশ্চয়ই শালারা — ভাইপো হোক আর ভাগনে হোক আর নিজের ছেলেটাই থাকুক ওদের মধ্যে, ওই শালারা কী-রকম বদমাশি আর রেষারেষি আরম্ভ করেছে আমার সঙ্গে।

তাল মেরে হৈ দিয়ে ছেলেগুলো হেসে উঠল। হ্যারিকেনের আলোয় দেয়ালের ওপর বড় বড় ছায়া পড়ে ওদের 'পিচেশ' আর প্রেতের মতো লাগছে। ডাকাত দলের মতো মনে হচ্ছে। টিমটিমে আলোয় সতীনাথের নিজের ছায়াটা? সামনের পেয়ারা গাছটায় ডানা ঝটপট করে বাদুড়টা কাঁচা পেয়ারা চিবুচ্ছে কট কট করে। শালাদের দাঁত আছে — বাচ্চা হয়, স্তন আছে। লোমের ভেতরে ছোট ছোট দুটো স্তন আছে। দেখা যায় না। বোঝা যায় না। রায়বাড়ির বিধবাটার কেমন মেঘের মতো রঙ হয়েছে। ফিস্ ফিস্ করে ছেলেরা পরামর্শ করছে। সতীনাথ কান খাড়া করে শুনতে পায়, চক্কোত্তি বাড়িতে খেজুর রস চুরি করতে যাবি? ঠুটো চক্কোত্তি বাড়িতে রস পেরে আনি গা চল্। রস লুটোক চক্কোত্তিরে।

চল যাই। কাকা তো ঘুমুতে গিয়েছে।

ঘুমুতে না ছাই। কাকার পাশের ঘরে আমি ঘুমোই জানিস?

তাইলে তুই-ও ঘুমুস না ছাই।

হো-হো করে অট্টহাসি হাসে ওরা।

চল চল, ওঠ।

চক্কোত্তি যদি জানতে পারে?

ন্যাংটো হয়ে গাছে উঠব পরনের কাপড় মাথায় বেঁধে। বেশি ইয়ার্কি করলে সেই কাপড়ে ফাঁস লাগাব শুঁটকো চক্কোত্তিকে। তারপর আর এক কাজ করতে হবে — রস খেয়ে হাঁড়িটাকে, বুঝেছিস — সবাই মিলে খল খল। একদম ভর্তি করে যেখানকার জিনিস সেখানেই রেখে আসব। এক রঙ পাবে চক্কোত্তি — খালি সোয়াদ আলাদা, নোনতা।

BanglaBook.org

ভিতরে ভিতরে কী মতলব করছে ওরাই জানে। কিন্তু কত বড় বদমাশ ছোঁড়াগুলো। আচ্ছা বাপু, তাই যা। তাই করতে যা বাপু তোরা।

ছেলেগুলো বেরিয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সতীনাথ। রাত দশটা প্রায় বেজে গিয়েছে। ঠিক তখনই হাঁটতে হাঁটতে ঢুলতে ঢুলতে ছোট ছেলেটা চুপচাপ এসে মেঝের পাতা চটটার ওপর বসে বই খুলে একঘেয়ে জড়িতস্বরে পড়তে শুরু করল। রাগে জ্বলে ওঠে সতীনাথ, খেয়ে এসে আড্ডা দিয়ে বাবু আমার পড়তে বসলেন।

ছেলেটাও তেমনি। বাপের কথার জবাব দিচ্ছে, না নিজের পড়া বলছে বোঝা যায় না, কি মুশকিল, এট্টু পড়তেও পারব না, কী জ্বালা রে! এইটুকু ছেলের কী পাকা কথা! ধমক দিয়ে উঠল সতীনাথ, বক্তৃতা দেওয়ার মতো বলল, বাঁদর, রাত দশটায় পড়ার নামে অ্যার্কি করতে এসেছ? সারা দিন তুমি কী করো আমি জানি না, না? এখন ঢুলতে ঢুলতে হাতি পড়বে! যা শুতে যা।

ছেলেটা তখনো একরোখার মতো একঘেয়ে ঘিনঘিনে গলায় জবাব দিচ্ছে, আমি এখানে শোব আজ।

বোমার মতো ফেটে পড়ল গেঁয়ো মুদির দোকানদার সতীনাথ, শো দিকিন এখানে, গলায় পা দিয়ে যদি মেরে না দি, আমার বাপ দুটো।

লজ্জিত হয়ে বিড় বিড় করে নিজেই আবার সে যোগ করে, এই শীতে হিমে দোকানে শোবে। আমাকে না হয় দোকান আগলাতে হয়।

ছেলেটা শব্দ করে বই বন্ধ করল, তারপর বেরিয়ে গেল।

ঢালু মাঠ বেয়ে, মৃত কঠিন মাটির ওপর দিয়ে কনকনে বাতাস আসছে হু-হু করে। দোকানের চারটে দেয়ালের বাইরে অন্ধকার ঝেপে আছে। এখনই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকবে। কোনো দিন অন্ধকার ঠেকাতে পারেনি সতীনাথ আর এখনো শীত রুখতে পারছে না যেমন পারত পঁচিশ বছর বয়সে। কিন্তু শুধু শীত নয়। পেয়ারা গাছের মাথায়, তেঁতুলের ঘন পাতার, ঘরের চার দেওয়ালের বাইরের মাঠ ঝ্যাঁটানো অন্ধকার হাড়ের মধ্যে ঢুকে বুকের অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে।

এখন তো যাওয়া যায়। ছোট ছেলেটা শুতে গিয়েছে। ছোঁড়াগুলো চক্কোত্তির খেজুর রস চুরি করতে গেল। গাঁয়ের রাস্তা নিথর হয়েছে — মোড়ে মোড়ে কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। এখন দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল খিক খিক হেসে ছেলেরা বলবে না, কর্তা উঠল রে!

দোকানের নুনের খোপ, তেলের টিন আর চালের বস্তার ওপর সতীনাথের ঠাণ্ডা ছায়াটা পড়ে আছে।

কখন শীত শেষ হবে, গরম পড়বে, বসন্ত আসবে? সতীনাথ চিন্তা করল। এ ঘরের চাইতে কত বেশি ঠাণ্ডা গাঁয়ের শেষের কুঁড়েটা? মেয়েমানুষটার লেপ নেই। আর মেয়েমানুষটা কালো। কালো মেয়ের বুক দিঘির মতো গভীর আর শীতল। এখন আবার একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তার লেপ নেই। সতীনাথ কাঁপবে। মেয়েমানুষটার দেহের সবটুকু উত্তাপ স্বার্থপরের মতো শুষে নিতে নিতে নিজের আটচল্লিশ বছরের জিরজিরে বুকের কাঁপুনি মেয়েটার দেহে চালান করে দেবে। আর সে আরো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সতীনাথ তখন আর কোনো উত্তাপ পাবে না, ওর ফেলে দেওয়া নিশ্বাস নিজে নিয়েও না, সীসের মতো ভারি হয়ে উঠতে উঠতে সে বলবে, রোজ রোজ ক্যানে আসেন আপুনি?

সতীনাথ একটা কথাও বলতে পারবে না। সে কাঁপতে থাকবে, কিছুই বোঝাতে পারবে না, কিছুই না।

সে ভ্রষ্টাচরিত্র। আর মেয়েলোকটা নষ্টা। নষ্টা কথাটা শিখেছে যখন তখন ব্যবহার করতে পারার মতো। অভ্যাস করে করে। যেমন করে হাঁটতে শেখে, ভাত খেতে শেখে, রাগতে, হিংসা করতে আর

BanglaBook.org

গালাগালি দিতে শেখে। শিখেছে যখন বাগ্দীরা বলে, মেয়েটা সতী নয়, লষ্ট। কিন্তু ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা শিখেছিল বাবার কাছে। তোলা কাপড়ের মতো কথাটা। যখন তখন ব্যবহার করা যায় না। নিজেকে বিচার করতে গেলে ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা যেন ভালো শোনায়, অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়।

আমি তো ভ্রষ্টচরিত্র! কিন্তু মেয়েটা যে নষ্টা। সেই যখন মেয়েটার বয়স ছিল তখন থেকেই, সতীনাথ গঞ্জে থাকার কালে। যখন সে গঞ্জের দোকানে রাত কাটাত। তখন কুঁড়েঘরটি হয়নি ওর। সে তখনো স্বামী ত্যাগ করে খোলাখুলি ভাবে ঘর ছাড়েনি। দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বুক ফুলিয়ে সে একটা ব্যাটাছেলের মতো চলে আসত, সন্ধ্যার সময়। দূর থেকে দেখত সতীনাথ। রাস্তার মাঝে অশথতলায় কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মুচকি হেসে বলত, গঞ্জে ভদ্দরনোকের বাড়িতে কাজ করি গো! সেখানেই থাকি খাই।

হাসতে হাসতে ঠাট্টা করত মেয়েটা। বিদ্রুপ করত, সেখানেই থাকি আর খাই। সোয়ামি তো ভাত দিতে পারে না। অকম্মা খালি তাড়ি গিলচে। কে জানে, মাঠটা যখন ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে ভরে উঠত, বাঁয়ের শেয়াল ডাইনে গেল বলে শুভলক্ষণের জন্য কেউ মেয়েটাকে দু'আনা চারআনা পয়সা দিত কি না। অশথ গাছটার পেছনেই মেঠো পুকুরটা শুষ্কগর্ভ।

সতীনাথ মাঝে মাঝে বলত, রোজ রোজ আসিস রে তুই।

মেয়েটা হাসতে হাসতে বলে, ভয় লাগে নিকিন্ আপোনার?

হ্যাঁ রে, ভয়ই করে। এক কোশ মাঠ ভেঙে তুই পেত্যেক দিন সঞ্জের সময় গঞ্জে চলে আসিস। মানুষ শুধুলে বলিস, ভদ্দরলোকের বাড়িতে যাচ্ছি কাজ করতে। লোক তো হাবা নেলা নয় রে!

এক দিন কানে এসেছিল শ্যামা গল্প করছে তারিয়ে তারিয়ে: সে-দিন সঞ্জেয়, মুখ আঁধারি রেতে গঞ্জ থেকে আসতে পেছনে কে বলল, তাড়াতাড়ি আয়। কথা শুনে বোঝলাম না লোকটা কে? এট্টু আড়ালে দাঁড়িয়েচি, দেখি সতীনাথ হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেল। একটু বাদে দেখি, শালা ভামিনী রণরঙ্গিণী মা কালীর মতো। কী বলব, আঁচল ছ্যাঁদা করে যেন বুক দুটো বেরিয়ে আসছে।

গল্প শুনে হো-হো করে হেলে উঠেছে আড্ডা জমা পরিচিত মানুষগুলো।

শ্যামা তখনো শেষ করেনি, ভামিনী তো সতীনাথের পেচু নিল, আমি আবার ওদের পেচু নেলাম। অশথ গাছটার কাছে এসে সতীনাথ ভামিনীর কোমর জড়িয়ে শুকনো খালটায় নেমে গেল। যা করবার তা তো করল। আমি শালা চোখ বন্ধ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

খরায় ভারি সুবিস্তা হয়েছে গো, ভারি সুবিস্তা হয়েছে।

তুই মিছে কথা বললি! চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলি?

পাগল, মাঝে মাঝে চোখ খুলে দ্যাকলাম যে! ওঃ ভামিনী কী চামুণ্ডা মাইরি! কাপড়টা খুলে সতীনাথের গলায় ফাঁসি লাগিয়েছে।

গল্প শুনে সতীনাথ অন্য পথে সরে গিয়েছে। শালারা তাকে হিংসে করে। ভয়ানক হিংসে করে। সে যে ভামিনীকে ভোগ করে, এই শালারা তা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সে-দিন সত্যিই ভামিনী তাকে দম আটকে মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল। ভামিনী বলে, আমি যে রোজ আসি, আপোনার ভয় করে কর্তা?

না, ভয় করে না। রোজ রোজ আসার জন্য ভয় করে না। যদিও সে শাড়িটাকে পেঁচিয়ে পরে, রঙিন শেমিজটা শাড়ির ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে উদ্ধত বুকে চোখে কামনার আগুন জ্বালিয়ে একটা রঙ্গিনী দুর্দান্ত সাপিনীর মতো নিঃসঙ্গ প্রান্তর পার হয়ে যেন বুকে হেঁটে আসে; যদিও ফিরতি পথে বিবস্ত্রা হয়ে সতীনাথের গলায় কাপড় জড়িয়ে তাকে বলির পাঁঠার মতো কবোষ্ণ অন্ধকারের ডানায় টেনে নিয়ে যায় এবং দু'জনেই প্রায় আহত হয়ে উঠে আসে, তবু সতীনাথের ভয় করে না।

BanglaBook.org

পানের রঙে দু'ঠোঁট লাল করে সন্ধ্যার সময় সড়ক ছেড়ে হিজিবিজি আলপথ ধরে সে আসত। সকলের চোখের সামনে দিয়ে।

এ জন্য ভয় করে না। শ্যামার গল্পের জন্যও নয়। তবু একটা ভয়ানক আতঙ্ক সতীনাথকে চেপে ধরত। নষ্টা মেয়েমনুষটা তাকে ভ্রষ্টচরিত্র করে ফেলল! খালের মধ্যে অন্ধকারটা যখন দু'জনের জড়ানো দেহকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধত, এই অন্ধকারের চাইতেও হাজার গুণ ভয়ানক, সমস্ত অমাবস্যার নিঃসীম অন্ধকার যখন তাদের প্রাণভরে নিংড়ে নিয়ে বুকের মধ্যে গ্রহণ করতে হত, তখন সতীনাথ যে গাঁয়ের একটা আলোও দেখতে পেত না। নিজের দোকানে টিমটিমে আলোয় সতীনাথ যে অন্ধ হয়ে থাকত।

কমলির মায়ের মুখটা নোড়া দিয়ে থেঁতলে দিয়ে ইচ্ছে হয়। শালী কী যৌবনই না নিয়ে এসেছিল এ বাড়ি। বুড়ো গাইটাকে তার কশাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিতে ইচ্ছে হয়। তুই বুড়ি থুবড়ি হয়ে গেলি। ইদিকে রায়বাড়ির বিধবাটার বুক আমি মন থেকে তাড়াতে পারি না। আমার আর কোনো কাজ নেই, শখ নেই, আমি দোকান দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। অন্য চিন্তা আসে না। বাবা আমাকে ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা ছাড়া আর কিছুই শেখায়নি। কষ্ট করে, থেমে থেমে বানান করে সাবধানে একটা বাংলা বইও পড়ার সাধ্যি নেই। আমার ভালো লাগে না বই পড়তে। আমি মাগি শিখেছি। চাষের জিনিসের নাম শিখেছি — গোটা কতক বেপার নিয়ে চিন্তা করতে শিখেছি। আর কিছুই জানি না। যতক্ষণ জেগে থাকি, বিশ্রী চিন্তা করি। আমি কী করব? আমি মাথা ঠুকছি। এত ছোট, এত নিচে। মাগিটকে ঘেন্নাও করতে পারি না। ছি ছি, আমার ধম্মেও মতি নেই। খোল-কত্তাল বাজিয়ে হরিনামে আমার ইচ্ছে নেই। ভগবানকে ভয় করি। কিন্তু ভয় মনে থাকে না।

সে নিজেকে জ্বরো রোগীর মতো মনে করল। ঝিমনোর ভান করে সে ধুঁকতে থাকে। এবার ছাড়া যায়, নোংরা কাজটা এবার ত্যাগ করা যায়।

স্কুলের ছেলেগুলো অন্য কথা ভাবে। নতুন বয়সের এই শিক্ষিত ছেলেগুলো তাকে হেয় জ্ঞান করে। লজ্জা লাগে।

দোকানে কম্বল মুড়ি দিয়ে কিংবা কমলির মায়ের পাশে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করে সকাল পর্যন্ত ঘুম দেওয়া যায়।

মেয়েটা যে ধাড়ি শুয়োরের মতো হয়েছে। আমি সেখানে রাত জেগে জেগে শীতের দিনে কোনো রকমে একটু গরম না পেয়ে আঁধার ঘরে জ্বরো রুগীর মতো কাঁপি। আমি সেখানে কী করি?

আমি কত কী চেষ্টা করে কী করতে পারি?

আমি গেলাম না। ধুর শালা, সতীনাথ আজ আর গেলই না। সতীনাথ জোরে হাসে। ঠকলি হারামজাদা।

ছেলেগুলো নেই। গ্রামের রাস্তা শীতে নিশ্চেতন। এত সুযোগ, কিন্তু কনকনে বাতাস যে সতীনাথের হাড়ে ঢুকেছে। সতীনাথ আজ আর যাবে না। গেলে নিজেকে আমি বলি, তুমি রুগী। সতীনাথ জানে না, মরা পর্যন্ত সত্যিকার সুস্থ হয়ে থাকা কী করে সম্ভব। আমি চাষ শিখেছি, যে জিনিসগুলো নিয়ে পেট চালায় তাদের নাম শিখেছি।

আমি আর না গেলেও পারি। কিন্তু মেয়েটা তার নিজের মতো বলবে, আপুনি আর আসছ না, ডেরাটা করে দিলেন ক্যানে? আপোনার আর পীড়িত নেই। আমাকে যে আর ভাতারে লেবে না — আমি কী খাই, কী পরি? থুবড়ি হলাম যে কত্তা!

মাগিটা এখন আরাম চায়। তার স্বামী মাঝে মাঝে তাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। সে তাকে ঝাঁটা দেখায়, খেতে পরতে দিতে পারবি মুখপোড়া?

BanglaBook.org

না, খেতে দিতে পারব না শালী বারোভাতারি? বিশ্রী গালাগালি করে শেষ পর্যন্ত চুলোচুলি করে দু'জনে। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে শুয়ে থাকে স্বামীটা। বউয়ের অভাবে বাড়ি খাঁ-খাঁ করে, বুক তার ছটফট করে।

সতীনাথের সঙ্গে দেখা হলে মাথা ঝুঁকিয়ে হেসে সেলাম দেয়।

আজ না গেলে, কাল না গেলে মেয়েটা ওই সব কথা বলবে। তাছাড়া আমি কত দিন ধরে গিয়েছি। কত বছর ধরে। এখন না গিয়ে কী করব? আমার উপায় কী? ভালো লাগে না, কিন্তু একদম অভ্যাস হয়ে গেল যে। আফিমের নেশার মতো যেন।

রাত দুপুরে নিরর্থক আফিম খুঁজতে বেরুনোর মতো মাথা কান চাদরে ঢেকে পা টিপে টিপে সাবধানে ঘর থেকে বেরুল সতীনাথ। দরজায় তালা দিল। ছেলেগুলো নেই, গ্রামের রাস্তা শীতের ঘুমে আড়ষ্ট, শির শির করে হিম ঝরছে আকাশ থেকে।

আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে লিকলিকে ভঙ্গুর পায়ে গ্রামের অন্ধকারে নিষ্প্রাণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে কুকুরগুলির পাশ কাটিয়ে চোরের মতো এক জনের বাড়ির ওপর দিয়ে একা অসহায় সতীনাথ যখন গ্রামপ্রান্তের তেঁতুল বনের দঙ্গলের কাছে এসে পৌঁচেছে, তখন একটা মোটা গাছের গুঁড়ির পাশে অন্ধকার থেকে ভূতের মতো পাঁচ-সাতটা ছায়ার মধ্যে একটা ফিস্ ফিস্ করে বলল, কর্তা শেষে এল রে। চাপা গলায় ভূতগুলো হাসে।

হয়তো সতীনাথের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত কিন্তু রাগে তার গা জ্বলে। শয়তানগুলো রস চুরি করতে যায়নি। কর্তাকে হাতেনাতে ধরতে চায়। অপ্রস্তুত করতে চায়। তাই এই শীতে হিমে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে নিঃশব্দে সতীনাথের পথে ঘাপটি মেরে আছে। তাই অত জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিজেদের রাতের মতলবের কথা সতীনাথের কানে তুলেছে। ভাঁওতা দিয়েছে সতীনাথকে। কী মজা পায় ছেলেগুলো? কত কষ্ট করে সতীনাথকে মেয়েটার ঘরে যেতে দেখতে চায়? কী আনন্দ ওদের? মজা পায়? এত সুখ পায় যে এই শীতের কষ্টও কিছু কম নয়।

কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে। আমি যে যাব বলেই বেরিয়েছি। থাক হারামজাদারা! যা খুশি ভাব। তোরা যা ভাবিস আমি তা করতে পারি না। আমি ভীষণ শীতে জ্বরো রুগীর মতো কাঁপি।

কর্তা কেমন বগের মতো হাঁটছে দেখেছিস?

কর্তার তর সইছে না রে। চল, কর্তার পাশ দিয়ে হৈ হামারি করে ছুটে চলে যাই।

পাঁচ-সাতটা ছায়া উঠল। সতীনাথের পাশ কাটিয়ে ছুটে তারা গাঁয়ের ভেতরে চলে গেল। সতীনাথের তো দু'কান কাটা গিয়েছে। সে নিশ্চিন্ত নয়। ছেলেগুলো না ফিরেও যেতে পারে। বোধহয় সতীনাথকে তারা আরো একটা চাল দিয়েছে। মেয়েটার ঘরে যাওয়ার পরে চারপাশের বেড়া ঘিরে ওরা আড়ি পাততে পারে। বেড়াগুলোর যেখানে সেখানে ফুটো।

কিন্তু ঘরে তো আলো থাকবে না।

সতীনাথ এগুলো সাবধানে পা ফেলে — বকের মতো লম্বা লিকলিকে পা। হোঁচট খেল কয়েক বার গাছের পিঠ বের করা শেকড়ে।

মেয়েলোকটা অঘোরে ঘুমিয়ে গিয়েছে। বেড়ার দরজাটা বন্ধ করা, কিন্তু হুড়কো দেওয়া নয়। সতীনাথ আসবেই। সতীনাথ বানিয়ে দিয়েছে এই ঘর। সে টেনে এনেছে তাকে স্বামীর কাছ থেকে। তাকে শায়াটা শাড়িটা তেল নুন দেয়। সে থুবড়ি হয়ে আসছে। তার পেটের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কর্কশ কালশিটে পড়ে গিয়েছে তলপেটে। মাঘের সাপের মতো সে ঘুমোতে চায়, ঘুম ভাঙিয়ে দিলে বার বার হাই তোলে। কিন্তু সে সতীনাথের পোষা। হুড়কো বন্ধ করলে তার চলে না। এক কালে পরনের কাপড় দিয়ে সতীনাথের গলায় ফাঁস দিয়ে সে বলত, আপোনাকে ছাড়া আর কাউকে জানি

BanglaBook.org

না। এখন যেন সে সতীনাথকে চিনতে ভয় পায়। কাঁসার পাত্রের মতো সতীনাথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর বহু চেষ্টা করে ভামিনী যখন শারীরিক আক্ষেপে জর জর, সতীনাথ তখন হাঁসফাঁস করে। সে খোঁচা খাওয়া বুড়ো চন্দ্রবোড়ার মতো অক্ষম অসহায়, ভামিনী তখন উলটো পথ ধরে।

সতীনাথ নাগের মতো ফিস ফিস করে ডাকে, অ্যাই ওঠ রে। কী ঘুম ঘুমোস তুই?

ভামিনী ওঠে না। সতীনাথ ভাবে, ঢেমনিটা উঠতে চায় না। তাকে মরণঘুমে পেয়েছে। চোখ খুলে সে চাইতে পারে না।

সে আবার ডাকে, উঠবি রে তুই?

ভামিনী চোখ মেলে। বোকার মতো কিছুক্ষণ সতীনাথের দিকে চেয়ে থেকে উঠে বসে, একটা হাই তুলে ঘুম ঘুম হেসে বলে, বড্ড জার লাগছে গো কত্তা। বড্ড জার লাগছে।

তার সাহস হয় না। সে সাহস করে বলতে পারে না, অত ঢঙের কী দরকার কত্তা? মাটিতে তো চ্যাটাইয়ের ওপর ক্যাঁথা পাতাই আছে। একটা বড় ক্যাঁথা তো গায়ে দিয়েই আছি। কি করবে আর কি করতে পার তা-ও জানি। শুয়ে পড়লেই পারো। পিদিমটা নিবিয়ে দিয়ে কাছে টানলেই হয়। কিন্তু সে সাহস করে বলতে পারে না। তাকে এই শীতের মধ্যে সতীনাথের হাত ধরে বিছানায় বসাতে হয়, তার জন্য তামাক সাজতে হয়। দরকার হলে খানিকক্ষণ তার পা টিপতে হয়। অবশ্য আলোটা নিভে গেলে এক বিছানায় দু'জনেই সমান। বরং ভামিনীই সর্বেসর্বা। সতীনাথকেই তার পা ধরতে হয়।

যদি সতীনাথ ওর ঘুম না ভাঙিয়ে সোজা শুয়ে পড়ে কাছে টানত, ভামিনী বোধহয় স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে ওর শরীরটা শির শির করে উঠত মাত্র।

তামাক সাজ রে ভামিনী। সতীনাথ হাসে।

সাজি কত্তা, অত বেস্ত ক্যানে আপুনি।

শীত করছে যে রে।

ভোরবেলায় ফিরবেন কী করে?

ফেরার কথায় সতীনাথ ভীষণ ভয়ে কেঁপে ওঠে।

বিরক্ত হয়ে বলে, সে ভোরবেলায় হবে রে বাপু। এখন তামাক সাজ দিকিন। হুঁকো হাতে দিতে দিতে হঠাৎ মেয়েটা প্রশ্ন করে, আর কত দিন এমনি আসবেন আপুনি?

সতীনাথ চমকায়, কেন বল তো?

তাই শুধুইচি।

তোর কি ভালো লাগে না?

না, তা নয়।

সত্যি করে বল তো ভামিনী, তোর আর ভালো লাগে না, না? মেয়েলোকটা উত্তর দেয় না, অন্য দিকে চেয়ে এক সময় আস্তে আস্তে বলে, ভালো না লাগলে চলবে ক্যানে কত্তা? আপুনি পুষছ যে আমাকে। ভাত-কাপড় দিচ্ছ যে! সোয়ামি লিতে এলে যেতে পারি না, ঘর তুলে দিলে না আপুনি? আর আগে আপুনি কেমন ছিলেন কত্তা!

তুইও তো তেমন নেই রে।

এক দিন তারা কেমন ছিল ভাবতে ভাবতে মেয়েটা ধেনো মদের কথা ভাবল। আকণ্ঠ ধেনো মদ খেয়ে যে নেশা হয় সেই নেশার কথা চিন্তা করল। আজ তারা তেমন নেই জেনেও মেয়েটা ফিরে যেতে পারছে না। কমলির মায়ের কথা ভেবেও সতীনাথ এখানে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

ছেলেগুলো সত্যিই ফিরে গিয়েছে। মাঠের মধ্যে ঘর। ঢালু মাঠে অন্ধকার। বাতাস থেকে গিয়েছে। পাঁকমাখা ধাড়ি শুয়োরের মতো ভামিনী পড়ে আছে। হাঁটু দুটো চিবুকে ঠেকিয়ে শুকনো ভাঙা কাঠি খোঁচার মতো সতীনাথ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন।

BanglaBook.org

বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলল, হেই ভামিনী, দরজাটা খুলবি?

শিউরে উঠে সতীনাথ ভামিনীকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুষ্টু নয়?

ভামিনী বলে, আমি জাগন্ত আছি।

তুষ্টু নয়।

হুঁ। আপুনি ঘুমুলে পেত্যেক রেতে আসে। আমি খেদিয়ে দি! মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আসে। তারপর লড়বড় করে চলে যায়।

বাইরে থেকে মাতাল গলায় তুষ্টু বলে, হেইকে তু বাড়ি চ। তোর সুয়ামি আমি। তোকে ঘরে লোব! হেই রে আমার ঘরে তোকে শুতে হবে না। খালি বাড়ি চ তু। আমি এইখানে মাথা ঠুকি — যাবি না? এই ঢেমনি! উসখুস করে সতীনাথ। আমি এখানে আর কী করে থাকি? লোকটা মাতাল, হাতে টাঙ্গি বল্লম থাকতে পারে। দিনে সেলাম বাজায়। কিন্তু এখন? যদি মেরে পুঁতে দিয়ে যায়? আমি কী করে এখানে থাকি?

সতীনাথ উঠে দাঁড়ায়। তারপর বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে।

সতীনাথকে দেখে যেন খুব অপ্রতিভ হয়েছে এমনি ভাব করে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তুষ্টু বলে, এই যে বাবু, আপুনি এইখানে আছেন আমি বুঝিনি গো। নাগ মুলছি কান মুলছি, আপনি থাকলে আমি আসি? না, তা হয় বাবু? আমি মাগিটাকে ঘরে যেতে বললাম তা আপুনি আছেন আমি জানি না।

সতীনাথ কোনো কথা না বলে এগোয়। পেছনে পেছনে মাতাল তুষ্টু ঘ্যান ঘ্যান করে, আমি ঘাট করলাম, দোষ করলাম? পাঁচটা লোক বলুক আমি সাত জুতো খাব।

কেমন হিংস্র দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বিনীত ভঙ্গিতে তুষ্টু বাগ্দীপাড়ার রাস্তা ধরে।

সতীনাথ ভাবে, কাল যদি না ভামিনীর ঘরটা তুলে দিই, শালীর তুষ্টুর ঘরে পাঠিয়ে না দিই, আর কাল থেকে যদি না কমলির মায়ের ঘরে শুই, তাহলে — প্রাণপণ চেষ্টা করে সতীনাথ তার বাপের মুখটা মনে করে — তাহলে আমার বাপের ঠিক নেই।

কিন্তু চাঁদ উঠতে অনেক দেরি হলে সে আবার ভামিনীর ঘরে আসে॥

বাণী বসু

সুন্দর সুন্দর মেয়ে

বলতে বলতে ঢুলু ঢুলু চোখে সুর তুলল রাহুল। ঢ্যাক করে তারটা নেমে গেল। ভ্যাঁ করে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ বার হল।

সে ভুরু তুলে বলল, দেখলি?

উলটো দিক বসে নীলাঞ্জন বলল, কী দেখব?

ওই, রঙিন নেই, রোম্যান্স নেই, লিকর না, চকোলেট না। গিটারটা সুদ্ধ খেপে গেছে...।

তোমার এই সব ধান্দাবাজিতে আমি নেই বস, নীলাঞ্জন বলল, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। বলি দিশা যখন থাকে তখন তো এই সব রঙিন রঙিন আবদার শুনি না?

রোজগেরে বউ, একটু তো সমঝে চলতে হবেই!

রোজগেরে না হলে কি দু'কান কাটা হয়ে যেতে? এই ঠাকামিগুলো তোর বরদাস্ত করতে পারি না একদম। আমি বুঝি বাবা সোজা হিসেব, জীবনটা সুরে বেঁধেছি, সুর ইজ প্রাইমারি, আর সব সেকেন্ডারি। বউ-ছেলেপিলে-মা-বাবা সব যে-যার জায়গা মতো বসানো থাকলে আকাশে সাঁতার কাটতে সুবিধে হয়, মিছি মিছি জট পাকানোর মধ্যে আমি নেই, যন্তরে ঝড় তুলে দেব, মিষ্টি ঝড়, দুষ্টু ঝড়, সত্যি ঝড়। কালবৈশাখি, আশ্বিনের ঝড়, মিঠে সুরের ঢেউ বইয়ে দেব, ভেসে যাব ইয়ার, সে-দুনিয়ায় তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। শুধু গলায় ঠিকঠাক সঙ্গতটা দিয়ে যাও।

সিন্থেসাইজার-এ সত্যি সত্যি ঝড় তুলল নীলাঞ্জন, চক্ষু বুজে পিয়ানোর রিডে হাত চালাল, অমনি শান্ত নদীর বুকে দমকা হাওয়া বয়ে গেল, থির থির করে লহরি উঠল, বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাহুল আচমকা গেয়ে উঠল, এসেছ, তুমি এসেছ? না না আসিনি তা নানা তানাধিনানা তেরে না, তুমি ফিরে গেলে তবু এলে না... এলে না... একটা দীর্ঘ চিৎকার। তার পরে চুপ।

নিস্তব্ধ ঘরে কেউ বলে উঠল, এসেছিলে তবু আসো নাই, জানায়ে গেলে...।

চমকে মুখ তুলে রাহুল দেখল দরজার এক পাট ধরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, ব্যক্তিটির পরনে লম্বা প্যাচ ওয়ার্কের ঘাঘরা, মাটি মাটি রঙের জ্যাকেট তার ওপরে, ঈষৎ কোঁকড়া চুল খোলা, কানে মস্ত গোল মাকড়ি।

ঘাড় ঘুরিয়ে নীলাঞ্জন দেখল, একটি তরুযুবতী দাঁড়িয়ে, তার মসৃণ গেঁহু রঙের কপালে একটি লম্বা সরু লাল তিলক, সে মুহূর্তের জন্য আটকে গেল। ও-দিকে গলায় লাল পুঁতি আর রুদ্রাক্ষের মালায় হাত চলে গেল।

মেয়েটি বলল, সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে তুমি এসেছিলে...।

তার পরে হেসে বলল, আমি রুদ্রাণী, বসতে বলবেন না?

আরে আসুন আসুন, রাহুল ব্যস্ত হয়ে উঠল, এক পাশে দেয়ালের সঙ্গে ঠাসা কৌচে বসবার ব্যবস্থা, সে সেই দিকে ইঙ্গিত করল, তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে দুম করে পড়ে গেল, ঝিঁঝি ধরেছে প্রচণ্ড।

নীলাঞ্জন বলল, তাতে কী?

কীসে কী?

ওই যে বললেন, এসেছিলে তবু আসো নাই, জানায়ে গেলে/সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে...।

তাতে কী?

কী আবার, কিছুই না। ফুৎকারে উড়িয়ে দিল সব।

তা হলে বললেন কেন?

ইতিমধ্যে রাহুল নিজেকে সামলে নিয়েছে। না নীলাঞ্জন, না রুদ্রাণী নামধারিণী, কেউ তার পড়ে যাওয়ার দিকে তাকায়ওনি, কোনো মন্তব্য করেনি। তারা মশগুল এক প্রতর্কে কেন কেন এবং কেন!

বললাম মনে হল বলে। আমার ইনহিবিশন একটু কম। তাছাড়া ইউ শুড নো।

কে আপনাকে বলল আমরা জানি না?

জেনে শুনে পারমুটেশন কম্বিনেশন করছেন? তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

না, জেনে শুনে নয় ম্যাডাম, শিশু যখন মাকে মাম্মাম ডাকে, মামন ডাকে, সে কি জানে যে সে বিশ্বের আদি ধ্বনি কপচাচ্ছে! ওই ডাকে তার তেমন কোনো বাহাদুরি নেই, অরিজিন্যালিটিও নেই। জানে সে?

BanglaBook.org

আই সি। ঠাকুর কবি আপনাদের আদি ধ্বনিগুলো লিখে রেখে গেছেন, আপনারা মানবশিশু সেগুলোকেই...।

শুনুন শুনুন, পুলক বাঁড়ুজ্যে সারাক্ষণ টেবিলে সঞ্চয়িতা গীতবিতান নিয়ে বসে থাকতেন, পড়তেন আর পড়াতেন, জানেন? কিন্তু এটাও কোনো কথা নয়। কেউ যেন এসেছিল অথচ দেখা না দিয়ে চলে গেল, আমার অনুভবের মধ্যে তার ইশারা পড়ে রইল, এই ফিলিং হয়নি আপনার কখনো? ফিলিংটার কোনো কপিরাইট হয়?

আক্রমণের সামনে থতমত খাবার পাত্রী সে নয়, আস্তে বলল, কী জানি, আমরা কি ফিল করতেই জানতাম!

রাত বাড়ছে। গানটা পুরো হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও হয়তো একটু-আধটু বদলাতে হবে। কিন্তু দু'জনের মধ্যেই একটা অদ্ভুত উন্মাদনা। এক জন বাজিয়ে যাচ্ছে, আরেক জন গেয়ে যাচ্ছে, একই লাইন বারে বারে ফিরে ফিরে আসছে, সুর অল্প অল্প পালটে, তুমুল উত্তেজনা, মাতাল হয়ে গেছে একেবারে। এগারোটা বাজল ঢং ঢং করে সিঁড়ি মোড়ের বাজনা ঘড়িটায়, রাহুল গিটার নামিয়ে রাখল, রিডগুলোকে আলতো হাতে আদর করে থামাল নীলাঞ্জন, তারপর বলল, মেয়েটি কে রে?

আমি কী করে জানব?

মানে? ঘোঁত করে উঠল নীলাঞ্জন, তোর গানঘরে এল, বসাতে গিয়ে মাটিতে উলটে পড়ে গেলি আর বলছিস কে জানিস না? কত ঢ্যামনামোই না দেখাবি!

আমি তো ভেবেছি তোর চেনা!

যাচ্চলে! তার মানে কেউই চিনি না? রবাহূত অনাহূত? উই টুক হার ফর গ্রান্টেড। এখানে আসার ওর হক আছে নিশ্চয়ই! স্ট্রেঞ্জ... আমি রুদ্রাণী! সে তো দেখতেই পাচ্ছি তুমি রুদ্রাণী, কপালে তিলক এঁকেছ, খোলা চুল জটার মতো ফুল আছে। নামাবলি রঙের উড়ুনি গায়ে দিয়েছ, রুদ্রাক্ষের মালা, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এ নিশ্চয়ই তোর চেনা সার্কলের কেউ।

আমিও ঠিক একই কথা ভেবেছি গুরু। এ নীলাঞ্জনের কালেকশন। শিবানী, ভবানী, রুদ্রাণী...।

নীলাঞ্জন কেমন বুঁদমতো হয়ে বসেছিল, বলল, ও শর্মার কোনো কালেকশন নেই, সে তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু গানটা কেমন জমে গেল বলো?

আইসক্রিম!

উঁহুস প্যাশনটা গরম গরম জিনিস।

ঠাণ্ডা আইসক্রিমের ওপর গরম চকোলেট সস ঢেলে দাও ইয়ার, স্পিরিটটা পেয়ে যাবে।

নীলাঞ্জন বাড়ি চলে গেল। রাহুল চারখানা রুটি, বেগুন ভাজা আর এক বাটি অড়হর ডাল খেয়ে, বই নিয়ে তার আরামচেয়ারে কাত হল। এই সময়টা, অর্থাৎ ঘুমের ঠিক আগেটাতে তার মাথাটা প্রথমে খানিকটা রেস্ট খেয়ে নেয়, তারপর সূক্ষ্ম ভাবে জেগে ওঠে এক সঙ্গীত জগতে। নানা সুর চেনা অচেনা আধোচেনা মাথায় ঘুর ঘুর করতে থাকে। তার থেকে অনেক সময়ে মাঝ রাতে উঠেও সে সুর তুলে রাখে। আজ কিন্তু মাথার থেকে চমকটা গেল না, গেল না। একটি অচেনা মেয়ে, তরুণী নয়, কিন্তু পুরোপুরি যুবতীটাও এখন হয়ে উঠতে পারেনি, এসে বলল, আমি রুদ্রাণী তারাও দু'জনে ভেবে ফেলল, এ অন্য জনের চেনা। মেয়েটি কিচ্ছু খুলে বলল না, ভাঙল না কেন এসেছে, কে তাকে পাঠিয়েছে, কী করেই-বা সে তর তর করে একেবারে তেতলার গানঘর অবধি নির্ভুল পৌঁছে গেল। কেন এসেছিল? বেশ খানিকটা তর্ক করে গেল, অনেক জ্ঞান যেন জমে গেছে তার ভাঁড়ারে, কিছুটা ঢেলে দিয়ে গেল। সত্যিই কি তার এর সঙ্গে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল? সে ভুলে গেছে? এগুলো সে মোটের ওপর লিখে রাখে। ভুল যে হয় না তা নয়, কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তো তার কোনো

BanglaBook.org

কারণ থাকবে। সে-সব কিছুই তো বলল না। বলবে তো? ও কি কোনো ফ্যানট্যান? উঁহু, কোনো সমীহ, মুগ্ধতা ছিল না তো ওর ভঙ্গিতে! বলেওনি সে-বাবদে কিছু। তবে?

গানঘরটা অন্ধকারে রাস্তার আলো মেখে নীল ওড়না ঢালা অপ্সরীর মতো এলিয়ে আছে। মৃদু মৃদু উড়ছে লেসের সাদা পরদা। সে অকারণেই ঘুরে এল একবার ঘরটা থেকে, যেন তার প্রশ্নের উত্তরটা ওখানে বসে আছে। রাত্তির একটা নাগাদ নীলাঞ্জনের ফোন এল, কিছু হদিশ পেলি?

কীসের?

একটা গলাগাল দিয়ে নীলাঞ্জন বলল, ওই রুদ্রাণীর?

কেন বস্? ব্যথা খেয়ে গেছ?

আবার একটা গালাগাল দিল নীলাঞ্জন, বলল, ফালতু রহস্য আমার ভালো লাগে না। ইকোয়েশন কোষে এক্স-এর ভ্যালু আমি বার করে নিয়েছি বরাবর। আজই-বা কেন অন্য রকম হবে?

রাহুল বলল, আপাতত খাতা বন্ধ করে দে। আমি শুতে চললাম।

পুজোর সময়ে ঝাঁপতাল বন্ধ ছিল। দু'জন মেম্বার ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। মূল গায়ক অবশ্য রাহুল এবং বাদক নীলাঞ্জন। কিন্তু দোয়ার না থাকলে ব্যান্ড জমে না। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে একটা গণতন্ত্র মেনে চলাটাও জরুরি, নীলাঞ্জন বড় বড় গাইয়ের সঙ্গে বা সম্মেলক প্রোগ্রামে বাজায়, রাহুলও গেয়ে থাকে, কিন্তু প্রথম থেকেই পরিষ্কার করে নেয়, দেখুন দাদা, ঝাঁপতালের গান কিন্তু গাইতে বলবেন না। মান্না দে বলুন, হেমন্ত বলুন, অখিলবন্ধু কি শ্যামল মিত্র বলুন গেয়ে দেব, কিন্তু নো ঝাঁপতাল।

আসল সিজনটা শুরু হয়েছে কালীপুজো থেকে। চলছে চলছে। একটার পর একটা কল শো। সরস্বতী পুজো পার করে সব থকে গেছে। তারপর ক'দিন বিশ্রাম নিয়েই গীতিকার সুরকাররা সব চাঙ্গা। গানঘর, নীল অন্ধকার, ঠাণ্ডা, থেকে থেকে মকাইবাড়ি টি-ব্যাগ, এবং চারটি হাত, দু'টি সুরকাঙাল মাথা।

হেদোর মোড়ে তুমি দাঁড়িয়েছিলে পিছন ফিরে, হা-হা পিছন ফিরে।

দেখবে বলে ট্রাম ঘটাং ঘটাং ঘ্যাং রিকশা ঠুংঠাং ওদের গো হারন।

কৃষ্ণচূড়া তুমি, হারিয়ে দিলে, হারিয়ে দিলে।

এসেছ? না না আসোনি... দেখা না দিয়ে তুমি চলে গেলে...।

হা-হা ধাধানি নানা তারানা সারেগামাপা রে ধা নি... গা মা নি

তুমি আসোনি...

কেন আসো না... তার সপ্তকের ষড়জ থেকে পঞ্চমে বিকট চিৎকার আর মাথা ঝাঁকানো।

যে-পৃথিবী থেকে প্রেম ভায়া বায়োলজি বিদায় নিয়েছে, যে-সমাজে আবেগ একটা বিরক্তিকর অসুখ বলে বিবেচিত ও নির্বাসিত, সেই একই সমাজে মঞ্চগায়ক যখন আকুল হয়ে মাথা ঠোকে, ঠ্যালাগাড়ি ট্রান্সফর্মার আর লাইটপোস্টের সঙ্গে মিলিয়ে প্রেমের গান বাঁধে, গায়, তখন পাবলিক দিওয়ানা হয়ে যায়। পরীক্ষিত সত্য।

সুন্দর সুন্দর মেয়েরা থাকে, আসে উইংসের ধারে, মঞ্চের কিনারে, অটোগ্রাফ খাতা হাতে মুগ্ধমুখ। কারুর চুল ফণা তোলা, কেউ প্রপাত, ঝাপটা মেরে যায়, বিলোলে হেসে বলে, স্যরি। আসলে মোটেই স্যরি না! ইচ্ছে করে ধাপটাটা দিয়েছে, কিংবা ইচ্ছে করে দেয়নি, কিন্তু হরেদরে লেগে যখন গেছেই তখন একটু লাস্য দেখিয়ে নিল। লাস্যটা আগে তারুণ্য আপনা আপনি তৈরি করত, এখন ব্যাপারটা খুব সচেতন হয়ে গেছে। সব্বাই যে যার অ্যাসেট সম্পর্কে সচেতন। কেউ টোলফেলা হাসি কোট-

BanglaBook.org

আনকোট করে হাজির করেহ যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এই সব দেখানেপনার গূঢ় অভ্যন্তরে প্রগাঢ় প্রাকৃতিক প্যাশনের উদ্দীপন আছেই আছে। এত মিথ্যার মধ্যে সেটুকুকেই যদি সত্যি ধরো, এত প্রসাধনের অন্তরে যদি সেটুকুও স্বাভাবিক থাকে তো সেটুকুই তোমাকে মাতোয়ারা করে দেবে। নীলাঞ্জন গুন গুন করতে করতে বাড়ি ফিরবে, গুন গুন করতে করতে পা ধোবে, খেতে বসেও গুন গুন, বিছানায় শুয়েও যখন গুঞ্জন থামে না তখন তার বউ মুনিয়া বলবে, ওঃ, এবার থামাও তো এই মৌমাছিগিরি। নীলাঞ্জন তখন তার দেহে মনে সঞ্চিত যতেক গুঞ্জন মুনিয়াতে সমর্পণ করবে, মুগ্ধ, গদ গদ মুনিয়া বলবে, কীসে যে তোমাকে এমন জাদু করে! নীলাঞ্জন মুনিয়ার লাল ম্যাক্সিমোড়া শরীরে পিয়ানো বাজাতে বাজাতে মনে মনে বলবে, কী জানি, বোধহয় রাহুল ব্যাটাচ্ছেলে যেমন বলে থাকে, সুন্দর সুন্দর মেয়ে...।

আর রাহুল? ঝাঁপতাল-এর মূল গায়েন? গাড়িতে উঠল সঙ্গ-লিপ্সু, অটোগ্রাফ-শিকারিদের চক্রব্যূহ ভেদ করে, কালো কাচ তুলে দিল। তার গলার আর গায়িকার যা দাম, নিছক মুখখানার তো সেই দাম নেই, কিন্তু গানের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে! তাই ফটাফট ছবি, ক্যামেরায় ক্যামেরায়, চোখে চোখে। গাড়ির চেককাটা গদিতে হেলান দিয়ে সে অনুভব করে সারা শরীরটা একটা মদের বোতল হয়ে গেছে। বোতল কি মদের স্বাদ জানে? উঁহু, তবে তো সে মদের বোতল নয়, বোতলের মদ। শুধু একটা তূরীয় ভাবে বুঁদ হয়ে থেকে সে এক সময়ে বাড়ি পৌঁছে যায়, কিন্তু অবশ শরীর তুলতে পারে না। ড্রাইভার রামরতন সাউ গিয়ে মাকে ডেকে আনে, দিশাকে ডেকে আনে।

মা বলে, যাঃ, তুই শেষ পর্যন্ত টলতে টলতে বাড়ি এলি?

রামরতন বলে, নহি মায়ি, সাব তো গানা হি গায়া, বাস ঔর কুছ ভি নহি কিয়া।

দিশা বলে, কী হল রে বাবা, ডাক্তার ডাকব নাকি? মা?

রাহুল গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসে এবার, বলে, নিজের মা ভাবে মাতাল, নিজের বউ ভাবে হাসপাতাল, গায়কের ট্র্যাজেডি মন্দ নয়।

তাতে দোষটা কী হল? ভোম হয়ে বসে থাকলে কী ভাবব? মা গলা বাড়িয়ে বলল।

দিশা বলল, কী জানো মা। গায়কের বউ মায়ের ভাবাভাবির ওপরেও তানপুরোর তার পরানো থাকতে হবে। ভরতের আত্মীয় যত সকলই ভরতের মতো... শোনেনি? সেই বৃত্তান্ত।

মা বলল, তবু যদি তানপুরোটাও ইলেকট্রনিক্স না হত।

তা হলেই-বা, তিনি যেমন যেমন চেঞ্জ করবেন আমাদেরও তেমন তেমন চেঞ্জ করতে করতে যেতে হবে। তোমার কাজ ইতিহাসের অধ্যাপনা। সেটা কিস্যুই না, আমার কাজ লাইব্রেরি ভরতি বইপত্র নথিপত্তর সামলানো, সেটাও কিস্যু না, প্রায়োরিটি হল খ্যাপাটে গান, আর তার আনুষঙ্গিক যা কিছু খ্যাপামি। উনি নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কন্ট্রোল করবেন।

এই তর্কাতর্কির মধ্য দিয়ে সোজা সোজা পায়ে হেঁটে রাহুল তার গানঘরে চলে যাবার সিঁড়ি ধরে, গম্ভীর গলয় বলে, আমার খাবারটা ওপরে...!

গম্ভীর না হয়ে তার কোনো উপায় নেই। এই দু'জন, যারা নাকি তার সব চেয়ে আপনজন, মা আর বউ, তারা তাকে একদম সিরিয়াসলি নেয় না। তাকে না, তার গান না, তার ফাজলামি না, কিচ্ছু না।

নিঃসীম ঘুমিয়ে থাকে শিল্পী। একটু-আধটু অশৈল্পিক নাক যে ডাকে না, তা নয়। নিবিড় ঘুম তো! তখন আর নিজের শ্বাসযন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু শিল্পী ঘুমোলেই তো আর শিল্প ঘুমায় না। সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বাণীর... সে-দিন তো বৃষ্টি ছিল না... নিশি পাওয়া রোদ্দুরে ঝমঝম... গনগনে বৃষ্টি এল... চটা ওঠা সানকিতে ভেজা ভাত, এক মুঠো রগরগে লঙ্কা। ঝরছে ঝরছে, খইয়ের মতো সাদা বর্ষণ ঝরছে...।

ঘুমের ওপর তুষার পড়ে। হালকা, পলকা, চারদিক ঠাণ্ডা জোছনায় ভরিয়ে দেওয়া তুষার, তার তলায় জিয়ন্ত কথারা সব চাপা পড়ে যায়। হয়তো ভোরের দিকে সুর এল। ঘুমচোখে নোটেশন লিখে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কিছু কথা মরে গেল, কিছু বেঁচে রইল। তাই নিয়েই দুই বন্ধু বসে যায়। নীলাঞ্জনের হাতে জাদু আছে, তার বউ যেমন বলে থাকে। কিন্তু ঠিক মতো সুর আর বাণী না পেলে সে রোঁয়া ফুলিয়ে গর গর করতে থাকে।

সেই নীলাঞ্জনই তাকে বলল কথাটা। রাহুল আমরা বোধহয় বড্ড রোম্যান্টিক হয়ে যাচ্ছি, রিয়্যালিটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কমে যাচ্ছে। যতই তুমি মোটরবাইক আর হেলমেট পরাও, যতই কেন শেকল ঝন ঝন করো, মোদ্দা কথাটা রয়ে যাচ্ছে।

কী? মোদ্দা কথাটা?

ওই! ছোট করে বলতে গেলে সুন্দর সুন্দর মেয়ে...।

তাতে অসুবিধা কী? তোমার আমার বউয়েদের অসুবিধে হতে পারে, কিন্তু আমাদের গানের অসুবিধে কী?

আরে ভাই, সুন্দর সুন্দর মেয়ে, এই পথ যদি না শেষ হয়-এর রাস্তা, প্রিন্স চার্মিং, বকুলবিছানো পথ... এ-সব কি সত্যি রে ভাই? এ-সব তো নিশার স্বপন!

ছোট্ট একটা গালাগাল দিল রাহুল, বলল, তুমি শালা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকো, তবলচিদেরও কিছু হাততালি নেওয়ার জায়গা আছে, তোমার নেই, কেমন? তোমার সামনে একটি স্ট্যান্ড, আর তার ওপর তোমার ইয়াব্বড় যন্তর, তোমার ঘাড় নড়ে না, মুখ দেখা যায় না, তোমার রিয়্যালিটি অমনি। তোমার সামনে তারা আসে না, অর্ধেক ম্যাজিক তোমার তৈরি, এ-কথা তারা জানে না, কিন্তু আমার তো আর সে-দশা নয়! আমার সামনে বকুলবিছানো পথ একেবারে স্টেজ থেকে স্বগগে উঠে যায়, ফ্যাক্ট! একটুও বানাচ্ছি না। আর সেই পথের ধারে ধারে... ধারে ধারে... পরিরা অপ্সরীরা নাচে, ফ্যাক্ট ইয়ার... কী করবে বলো, যার যা রোল! যা কপাল!

নীলাঞ্জন শুধু ভুরু তোলে, বলে, তাই! তবে গুরু আমার পয়েন্ট সেটা নয়। বলতে চাইছি, তুমি ক্লেম করছ তোমার গান চাঁদ-তারার গান নয়, তুমি আজকের জীবনসংগ্রামের কথা বলতে এসেছ, আসলে তুমি নতুনের ভানটা নিয়েছ, জীবনসংগ্রামের কথা তুমি বলছ না, বলছ না-আ। ঠিক আছে?

তার হাঁটুতে চাপড় মেরে রাহুল বলে, কী হল? তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন?

ঠিকঠাক গান দাও বস্‌, গোমড়া গলায় নীলাঞ্জন বলে, নইলে আমার যন্ত্র আর বলবে না। কে আসবে না, আসছে না। এটা আমাদের কাছে আদৌ ইম্পর্ট্যান্ট নয়, বাসটা, ট্রেনটা ঠিক টাইমে এল কি না, বাজারে পেঁয়াজে দাম নামল কি না, গরম ব্যাটা কবে যাবে, এগুলো ঢের ঢের বেশি জরুরি।

তাই বলে বাজার দর আর ওয়েদার ফোরকাস্ট নিয়ে গান লিখব? কে শুনবে?

শোনাতে হবে। কোনো এক গাঁয়ের বধূ শোনেনি লোকে? ছিপখান তিন দাঁড় শোনেনি? কাগজের লোকে আমাদের ক্রিম পাউডারের মেয়ে খাওয়াবে আর আমরাও বেমালুম খেয়ে যাব? তার চেয়েও খারাপ... খাইয়ে যাব?

রাহুল থম হয়ে বসে রইল।

গিটার নিজের জায়গায় শুয়ে আছে, থাকে থাকে সিঁড়ি চুপচাপ, মিউজিক সিস্টেমটা ভূতের মতো এক কোণে রকম-বেরকমের বেঢপ ছায়া তৈরি করছে, রাহুল নিচে নেমে এল। মা খাবার টেবিলে মুছছে। দিশা কোথায় গেল?

বা, ভুলে গেলি? ও তো দিল্লি গেল।

শাম্পুর খবর এসেছে?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, এখন ওর ইউনিট টেস্ট চলছে, সেকেন্ড টার্মের, খুব ব্যস্ত। কী হল তোর? হঠাৎ?

কেন? তার মনে হয়েছিল বলে, হঠাৎ কেন? আমি কি তোমাদের কেউ নই? তোমাদের কথা ভাবি না? কিন্তু বলল না, চেপে গেল, ভীষণ খেলো খেলো শোনাবে।

সে থেকে থেকেই বেরিয়ে যায়। গাড়িটা নিয়ে যেতে ভুলে যায়। এসপ্ল্যানেড থেকে দূরপাল্লার বাস ধরে, বর্ধমান কাটোয়া, বহরমপুর...। পুরোটাই যে যায় তা নয়, কখনো যায়, কখনো যেখান-সেখান থেকে ফিরে আসে।

রূপনারায়ণের চরে গিয়ে বসে থাকে, সামনে দিয়ে পাল তোলা নৌকো ভেসে যায়। বড় বিরহ! কী যে হয়েছে নীলুর, সে আসছে না। ফোন করলে বলে, হুঁ, বাড়ি গেলে বলে, আয়, বলে বেপাত্তা হয়ে যায়। মুনিয়ার সঙ্গে গপ্পো করে সে ফিরে আসে।

ছুটি শেষ। ঝাঁপতালের দোহারেরা ফিরে এসেছে, সবার অফিস, স্কুল, কাছারি খুলে গেছে। শনিবার সন্ধেয় সব হানা দেয়। রাহুলদা নতুন গান বাঁধলে? নতুন কিছু? নত্তুন কিছু? রাহুল চুপ।

নীলদা, কী লাগাচ্ছ এবার?

কোথায় নীলদা? নীলাঞ্জন নেই।

মা বলল, হ্যাঁ রে, কী অসভ্য ছেলে তোরা, সে-মেয়েটা কত আশা করে তোদের গান শোনাতে এল, তোরা না শুনলি গান, না তাকে ঠিক করে এক দিন আসতে বললি।

কার কথা বলছ? কে গান শোনাতে এসেছিল? রাহুল অবাক।

রুনি, আমার বন্ধু ইন্দ্রাণীর ছোট মেয়েটা। নিজে গান বাঁধে, গায়।

রুনি? আমি তো তাকে চিনি না? সে কি এসেছিল?

এসেছিল বৈ কী! আমি তাকে তোমার দুয়ার দেখিয়ে দিয়ে কাজে বেরিয়ে গেছি। কাল ইন্দ্রাণী ফোন করেছিল। বলছে রুনিকে নাকি তোরা পাত্তাই দিসনি। হতে পারে আজ একটু নামধাম হয়েছে, তাই বলে আমার বন্ধুর মেয়েকে হতচ্ছেদ্দা করবি?

লাফিয়ে উঠতে গিয়ে রাহুল ঘটির মতো গড়িয়ে পড়ে গেল, পায়ে আচ্ছা ঝিঁঝি ধরেছে, বলল, আমি কোনো রুনি জানি না, রুদ্রাণী বলে একটি রহস্যময় মেয়ে এক দিন এসেছিল বটে, তা সে খানিক তক্কোটক্কো করে কখন কেটে পড়েছে আমি বুঝতে পারিনি, সত্যি বলছি মা, তাকে অবশ্যই ডাকো, প্লিজ ডাকো।

আপনি নাকি গান বাঁধেন?

বাঁধি।

তো সে-দিন কিচ্ছু না বলে চলে গেলেন কেন?

সে দিন আসলে... রুদ্রাণী খালি মিটি মিটি হাসে, কিছু বলে না। আজ সে সাদার ওপর লাল ডুরে পরেছে, লাল টকটকে ব্লাউজ। চুলে বেণি বাঁধা। কপালের লাল তিলকটা ছাড়া গেট-আপ একেবারে পালটে গেছে।

সে-দিন কী?

কিছু না।

কিছু তো নিশ্চয়!

না মানে দু'জনে মিলে এমন হাহাকার করেছিলেন যে, তার তোড়ে আমি ছিটকে গিয়েছিলাম, স্যরি। আবার লাফিয়ে ওঠে রাহুল, আবার হোঁচট খায়, ভ্রূক্ষেপ করে না, ব্ল্যাকবেরিটা টেনে নিয়ে চলে যায় বাইরে, নীলাঞ্জনের নম্বর টোকে।

হ্যালো, গোমড়া উত্তর।

BanglaBook.org

রুদ্রাণী এসেছে।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ। রাহুল ফোন রেখে দেয়। তারপর ঘরে ঢুকে গিটার তুলে নেয় হাতে।

সে-বছর ভোররাতে ভৈরব হাঁক পেড়ে এসেছিল ডাকাতিয়া সুনামি।

ভেসে গেছি বোনো জলে হাড় মাস গলে গলে মিশে গেছে মাতলায় বেনামে।

...তুমি যে আমার মিতে একবার জেনে নিতে

(আহা/যদি) একবার জেনে যেতে মেকানিক, ...বাহাদুর মেকানিক!

বাইপাসে কাজকাম।

ধিংড় তোমার নাম সেই নামে ডেকো মোকে সে নামেই।

মাতলার ঘোলা ফাঁদে।

গুমুরু গুমুরু কাঁদে তোমার মিতের নাম গুমানি...।

গলা দিয়ে তিন রকম সুর বার করতে পারে মেয়েটা। গুরু গম্ভীর, সরু গম্ভীর, শুরু সরু। এই তিনে মিলিয়ে মিশিয়ে সে গানটা গর্জাস গাইল। মাঝখানে নীলাঞ্জন এসে কথা নেই বার্তা নেই দিব্যি বসে গেল। যেন স্রেফ এইটের জন্যই অ্যাদ্দিন গোমড়া মুখে বসেছিল। প্রথমে শুধু ঝ্যাং ঝ্যাং করে ভ্যাম দিয়ে গেল, তার পরে হাত নেড়ে বলল, আরও একবার হয়ে যাক। যেন রুদ্রাণী মেয়েটা বরাবর তাদের দলে ছিল।

দু'জনে মিলে গুমরে গুমরে গাইতে লাগল। তৃতীয় বারের বার রাহুল হুড়ুম করে দোহারকি দিতে দিতে ঢুকে গেল, ভেসে গেছি, গেছি ভেসে ...হাড়মাস গলে গলে... গলে গলে হাড়মাস... ডেকো সে নামেই... সে নামেই... হত্যাকার...। ব্যস, সিজনের নতুন গান রেডি। যাকে বলে নতুন গান!

দিব্যেন্দু পালিত

পেট

প্রথম সন্দেহ করেছিল শর্মিষ্ঠা।

দুপুর আড়াইটে থেকে পৌনে তিনটের মধ্যে ব্রীজের পর থেকে নিচে নেমে আসতে দেখা যায় রন্টুদের স্কুলের নীল বাসটাকে। তার আগেই ন'বছরের ছেলেকে বাড়িতে আনার জন্য পেট্রল পাম্পের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে হয় তাকে। শর্মিষ্ঠা একাই যায় না। এই বিল্ডিঙের রমা দত্তের মেয়ে চন্দ্রলেখা এবং অঞ্জনা ব্যানার্জির ছেলে বিক্রমও পড়ে একই স্কুলে, ফেরে একই বাসে, একই সময়ে। রমাও যায়। অঞ্জনা কোনো কোনো দিন নিজে অপেক্ষা করে, কোনো দিন পাঠায় বাড়ির ঝি মঙ্গলাকে। তিনটি বালক-বালিকাকে নিয়ে এক সঙ্গে একই লিফটে উঠে ঢুকে পড়ে যে যার ফ্ল্যাটে। ছেলেকে আনতে যাবার আগে শর্মিষ্ঠা নিজে খাওয়া সারে, কাজের মেয়ে নয়নতারাকে স্নানে পাঠায়, নয়ন ফিরে এসে খেতে বসতে বসতে আধ ঘণ্টা খানেক সে বিছানায় গড়িয়ে নেয়। তারপর তার বেরুবার সময়।

নয়ন খেয়ে-দেয়ে আড্ডা দিতে যায় নিচে। অনেক দিনই রন্টুকে নিয়ে ফেরার সময় শর্মিষ্ঠা লক্ষ্য করে লিফটের লাগোয়া ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশের চওড়া জায়গাটায় বসে জটলা করছে এর ওর

BanglaBook.org

ফ্ল্যাটের নানা বয়সের ঝি'রা। এ বাড়িতে চাকরের সংখ্যা কম। মাঝে মধ্যে তাদেরও কাউকে কাউকে মিশতে দেখে ওই জটলায়।

বছর পাঁচেক আগে পরাগ ও ছেলের সঙ্গে বহুতল বাড়িতে নিজেদের ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর থেকে শর্মিষ্ঠার মগজে যে-সব দুশ্চিন্তা ঢুকেছে তার একটা এই ঝি-চাকরদের জটলা। কেন বা কী জন্য ঠিক জানে না, তবে তার সন্দেহ, এদের গালগল্পের বিষয় এ বাড়ির চৌষট্টিটি ফ্ল্যাটের যে কেউ। এবং সে ও পরাগও যেহেতু এই যে-কেউদের মধ্যে পড়ে, সুতরাং কোনো না-কোনো ব্যাপারে তাদেরও বাদ পড়ার কথা নয়। সন্দেহ থেকেই এসে গেছে সতর্কতা।

নতুন ফ্ল্যাটে আসার বছর খানেকের মধ্যে এ বাড়িতে তাদের প্রথম ঝি লক্ষ্মী হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবুর নাকি চাকরি গেছে বউদি?

প্রশ্নটা চমকে দেয় তাকে। চাকরি না গেলেও সেটা এমনই একটা সময় যখন অফিসে হয়রান হচ্ছিল পরাগ। কে বলেছে, জিজ্ঞেস করায় লক্ষ্মী বলল, কে বলেছে তা কি মনে আছে ঠিক! নিচে ওরা বলাবলি করছিল।

পরে অনেক গবেষণার পর স্বামী-স্ত্রী ধারণা করে ছ'তলার ডলি বোসের ভাই কাজ করে পরাগের অফিসে, মাঝে মধ্যে আসে এই বিল্ডিঙে, সম্ভবত ওই ফ্ল্যাটের কোনো আলোচনা থেকেই ওদের ঝিয়ের মুখে রটনা হয়েছে কথাটা। সেই থেকে বেশ কিছু দিন লিফটে ওঠার সময় কারুর সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর থাকত শর্মিষ্ঠা, একটা হীনম্মন্যতার বোধ সারাক্ষণ কুরে খেত তাকে।

এ বাড়ির চৌষট্টিটি ফ্ল্যাটের তেষট্টিটিতে ঘটনাটা রটনা হবার আগেই অবশ্য নতুন চাকরিতে জয়েন করে পরাগ এবং হাওয়া পালটানোর চেষ্টায় এক কারণহীন জ্যৈষ্ঠ মাসে লক্ষ্মীকে একটা নতুন শাড়ি কিনে দিয়ে শর্মিষ্ঠা বলে, নতুন অফিসে ডবল মাইনের চাকরি নিয়েছে বাবু। তুমি তো বাড়িরই লোক, তোমাকে এটা দিলাম।

আন্দাজে ছোঁড়া ঢিল, তবু জায়গা মতোই পড়ে। দিন দুয়েক পরে লিফটের সামনে তাকে একলা পেয়ে সাত তলার রত্না কর বলল, কর্তার বিরাট উন্নতি হয়েছে শুনলাম! গাড়িও দিচ্ছে নাকি!

শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে এটা শাড়ি ঘুষ দেবার ফল, ডবল মাইনের সঙ্গে গাড়ি পাবার সম্ভাবনাও জুড়ে দিয়েছে লক্ষ্মী। বাস্তব তা নয়। পরাগের নতুন চাকরিটা আগেরটারই মতো। মাইনের অঙ্কটা কেউ ধরতে পারবে না; কিন্তু গাড়ি দেখা যায়, বানিয়ে বললে ধরা পড়ে যাবে। তখন হাওয়াটা আবার উলটে যেতে পারে। সুতরাং সে জবাব না দিয়ে হ্যাঁ-না হেসে এড়িয়ে যায়।

পরের চার বছর অনেক ফ্ল্যাটের খবর এসে পৌঁছেছে তাদেরও কানে। এর মধ্যে বিখ্যাত ঘটনাটি দো-তলার রেখা মণ্ডলের স্বামী বেরিয়ে যাবার পর দুপুরে ওদের ফ্ল্যাটে কোনো অপরিচিত পুরুষের যাতায়াতজনিত। খবরটা কমলাই এনেছিল। গুজব পাঁচ কানে পাকা হতে না-হতেই এক দিন খবর পৌঁছয় স্বামীকে ছেড়ে আর কারুর সঙ্গে ভেগে গেছে রেখা।

লক্ষ্মীকে নিয়ে গত চার বছরে তাদের ফ্ল্যাটে ঝি বদল হয়েছে চারবার। লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, কমলা এবং কমলা দেশে চলে যাবার পর এই মেয়েটি, নয়নতারা। মাস পাঁচেক আগে কমলাই জুটিয়ে দিয়েছিল। বয়স আঠারো কি কুড়ি, শক্তপোক্ত চেহারা, কাজেও চটপটে। তাদের ফ্ল্যাটে ছাড়াও সকালের দিকে কাজ করে পাঁচ তলার অম্বুজ দাশগুপ্ত এবং সাত তলার পবিত্র ব্যানার্জির ফ্ল্যাটে। বেলা ন'টা থেকে সন্ধে পর্যন্ত নয়নতারা শর্মিষ্ঠাদের জন্য। রান্না করে, সুতরাং খায়ও এক বেলা। সন্ধের পর চলে যায় বস্তিতে। দুপুরে ছেলেকে নিয়ে ফেরার সময় শর্মিষ্ঠা প্রায়ই দেখে নিচের আড্ডায় চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে অন্যদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে নয়নও।

আজ দেখল না।

BanglaBook.org

রন্টুকে নিয়ে ওপরে উঠে এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই শুনল বাথরুমে কেউ ওয়াক্ তুলছে সশব্দে।

দরজাটা আধ-ভেজানো। কাছে গিয়ে বাথরুমের বাইরে থেকেই শর্মিষ্ঠা দেখল, বুকে হাত চাপা দিয়ে মাথাটা বেসিনের ওপর ঝুঁকিয়ে রেখেছে নয়ন। ইতিমধ্যে সে যে ফিরে এসেছে এবং দেখছে তা খেয়াল করেনি এখনো। ওকে আবার ওয়াক্ তুলে বেসিন ভরাতে দেখে গা গুলিয়ে উঠল নিজেরও।

রন্টুকে ঘরের ভিতর টেনে এনে ওর স্কুলের ইউনিফর্ম ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল শর্মিষ্ঠা। ক্রমশ শুনতে পেল সজোরে জল নির্গত হচ্ছে বেসিনের ট্যাপ থেকে।

কিছু বলতে হলে এখনই বলতে হয়। ঘৃণা ও বিরক্তি এতক্ষণে পরিণত হয়েছে রাগে। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে শর্মিষ্ঠা বলল, কী ব্যাপার! বমি করছ!

বমি পেলে কী করব! বেসিন পরিষ্কার করে বেরিয়ে এসে নয়ন তখন আঁচল বুলিয়ে জল মুছছে মুখ, গলা, ঘাড়ের। ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। কয়েক সেকেন্ড শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, খেয়ে উঠে কেমন গা গুলিয়ে উঠল।

নিচে গেলেই পারতে? এখানে কেন!

নিচে যেতে যেতে ঘর ভাসত। বমি চেপে রাখা যায় নাকি!

বিল্ডিঙের ঝি-চাকরদের জন্য আলাদা বাথরুম আছে নিচে। সেখানে যেতে হলে আগে পেরোতে হত ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত দূরত্ব। তার আগেই ছিত্‌রে যেতে পারত। বিরক্ত হলেও শর্মিষ্ঠা ভাবল, ঘরদোর নোংরা করার চেয়ে বেসিন নোংরা করাই ভালো। ফ্ল্যাটের দরজার পরেও আছে তিন তলা থেকে নিচে নামার সিঁড়ি। কম করেও কুড়ি-একুশ ধাপ। সিঁড়িতে কিছু হলে পাঁচ কান হত। এমনও হতে পারে, কেউ দেখে ফেললে বিল্ডিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির অফিস থেকে চিঠি পেত পরাগ। চেয়ারম্যান প্রফুল্ল মিত্তির বেয়াড়া লোক, যে-কোনো ছুতোয় ওয়ার্নিং দেয় মেম্বারদের। তিন-চার মাস আগে তাদের ফ্লোরের দেয়ালে কেউ পানের পিক ফেলায় চিঠি পাঠায় চারটি ফ্ল্যাটেই। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এটা চার ফ্ল্যাটের কারোরই কাজ হতে পারে না। অন্য কেউ ফেলে গেছে। তবে এ নিয়ে চার ফ্ল্যাট থেকেই পালটা জবাব দিতে হয়।

আপাতত খুব খুঁটিয়ে নয়নকে দেখতে দেখতে শর্মিষ্ঠা বলল, আগের দিনও কি তুমিই বমি করেছিলে?

ও মা! না তো! রোজই কি বমি হয় নাকি!

তা জানি না। পরশু বিকেলে বেসিনে ভাতের দানা, পুঁই শাকের টুকরো, লঙ্কার খোসা দেখেছি। বাবু, রন্টু কেউই পুঁইশাক খায় না। তাহলে আমিই করেছি, নাকি!

নয়নের জবাবের অপেক্ষা না করে পায়ের ঠেলায় বাথরুমের দরজাটা খুলে দূর থেকেই বেসিনে চোখ বুলিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, ইস। এখনো নোংরা আছে। পরিষ্কার করো ভালো করে। ফিনাইল ঢালো। দুর্গন্ধে টেঁকা যাচ্ছে না!

ঘরে এসে শর্মিষ্ঠা টের পেল নির্দেশ পালন করছে নয়ন। ঝাঁটার শব্দে শপ শপ করছে ফিনাইলের গন্ধ। রাগ এবং ঝাঁঝও। লক্ষ্য শর্মিষ্ঠাই। মিনিট কয়েক পরে সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল নয়ন।

মেয়েটি চলে যাবার পর রন্টুকে খাবার বেড়ে দিয়ে শর্মিষ্ঠা ভাবল, এর বেশি কিছু বলা সঙ্গত হত না। কাজ ছেড়ে দিলে মুশকিলে পড়বে সে নিজেই। বিল্ডিঙের ঝি-চাকরেরা সব এককাট্টা। গত মাসে ছ'তলার চৌধুরীরা কী এক কারণে তাদের কাজের ছেলেটিকে বিদায় করার পর আর কেউই কাজ নিচ্ছে না ওখানে। বরং এরপর থেকে সে ওয়াচ করবে মেয়েটিকে।

বিকেলে চায়ের সময় নয়ন ফিরে এলে নরম গলায় শর্মিষ্ঠা বলল, দুপুরে বমি করলে। এখন চা না খেয়ে বরং এক গ্লাস লেবুজল খাও। অম্বল হলে কেটে যাবে। শরীর খারাপ লাগলে আগে থেকেই বলবে।

BanglaBook.org

এ-সব বলতে বলতে এবং তার পরে লক্ষ্য করল, গোঁজ ভাবটা কেটে যাচ্ছে মেয়েটার। একটু চুপচাপ থাকলেও কথাবার্তার জবাবও দিয়ে যাচ্ছে ঠিকঠাক।

সন্ধেয় নয়ন ফিরে যাবার পর পরাগের কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করে শর্মিষ্ঠা বলল, ক'দিন দেখছি চোখের কোলে কালিও পড়েছে। আগের দিনও বমি করেছিল।

কী আর করা যাবে! পরাগ বলল, তাহলে তো বাথরুম পাহারা দেবার জন্যও একটা লোক রাখতে হয়।

সে-কথা বলছি না।

তবে?

সন্দেহের কথাটা খোলাখুলি বলবে কি না ভাবতে ভাবতে স্বামীকে লক্ষ্য করল শর্মিষ্ঠা। তারপর বলেই ফেলল।

এগুলো প্রেগন্যান্সির লক্ষণ।

প্রেগন্যান্সি! পরাগ নড়েচড়ে বসল, আনম্যারেড মেয়ে। প্রেগন্যান্ট হবে কী করে!

হয় না!

শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাল না পরাগ। খানিক পরে বলল, তাহলে তো কেলেঙ্কারি!

সেটাই বোঝ।

আর ইউ সিওর?

প্রশ্নটা থামিয়ে দিল শর্মিষ্ঠাকে। সন্দেহ করা এবং নিশ্চিত হওয়া এক ব্যাপার নয়। পরাগ ঝট করে সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত; 'সিওর' বললে এখনই কিছু করার কথা ভাবতে পারে। যদি ছাড়িয়ে দেয়?

হঠাৎ সংশয়ের ছায়া ছড়াল শর্মিষ্ঠার মুখে। এড়িয়ে যাওয়া গলায় বলল, বাচ্চা তো আমারও হয়েছে।

ব্যাপারটা তখনকার মতো ধামাচাপা পড়লেও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কেমন থম মেরে গেল স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। অনেক দিন আগে পরাগের চাকরি যাবার ঘটনায় যেমন হয়েছিল।

পরদিন দেরি করে অফিসে গেল পরাগ। তার আগে নয়নের কাজে আসা এভং শর্মিষ্ঠাকে স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢোকার সুযোগ দিল। এ-সব পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে মাথার দরকার হয়। হিসেব করে পালটে নিতে হয় কণ্ঠস্বর। সুতরাং সুযোগ বুঝে, গলায় যথোচিত দরদ মিশিয়ে সে নয়নকে বসার ঘরে ডাকল এবং দৃষ্টিতে লক্ষ্য ঠিক রেখে খুব কাছ থেকে ওকে তদন্ত করতে করতে বলল, একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। দিবি নাকি?

মেয়েটির স্বাস্থ্য ভালো, চটক আছে, মুখ-চোখও ঢলঢলে। আরো ঘষামাজা করলেই বস্তির মেয়ে বলে চেনা যাবে না। শর্মিষ্ঠার বর্ণনার সঙ্গে যথাযথ হয়ে ছায়া পড়েছে চোখের কোলে। কিন্তু এটা আগেও ছিল কি না কী করে বোঝা যাবে?

ওকে দেখতে দেখতে পরাগ নিজেকেও দেখল। চুয়াল্লিশের চোখে আটত্রিশের শর্মিষ্ঠাকে ভাবলে শারীরিক পার্থক্য সামান্য হতাশাও ঘনিয়ে তোলে বুকে। তবে বস্তির মেয়ে বস্তিরই থাকবে। ইত্যাদি এবং দেখাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে ভেবে সচেতন হয়ে বলল, ভালো করে বানাস।

পরাগের দৃষ্টি লক্ষ্য করে এরই মধ্যে বুকের আঁচল টেনেছিল নয়ন। এরপর অজ্ঞাত কারণে হেসে বলল, বউদিও খাবে নাকি?

জিজ্ঞেস করে নে।

খানিক পরে নয়ন চা দিতে এলে একই দৃষ্টিতে একই ভাবে ওকে খুঁড়তে খুঁড়তে পরাগ লক্ষ্য করল, একই ধরনের মোচকানো হাসি ফুটে আছে মেয়েটির মুখে। চাপা, কিন্তু ভিতর কাঁপানো। এখন তাকেও দেখছে স্পষ্ট চোখে। কিছু ভেবে নিল নাকি?

BanglaBook.org

চোখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিল পরাগ এবং শুনল ছিটকিনি খুলছে বাথরুমের দরজার। তার মানে স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে শর্মিষ্ঠা। এখন তার হাতে চায়ের কাপ, সামনে দেয়াল। গত বছরে কলি ফেরানো বিস্কুট রঙে খোলতাই বেড়েছে যেন। দেয়ালে হুসেনের আঁকা টাটা কোম্পানির ক্যালেন্ডার — আগুনে লোহায় হাতুড়ি পিটছে এক জন সবল পুরুষ। পরাগের নিজেকে দুর্বল লাগল।

চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল পরাগ। নির্দিষ্ট ভাবনা নিয়ে বেডরুমে এসে ঢুকল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে শর্মিষ্ঠা। আয়নায় ওকে দেখতে দেখতে পরাগ জিজ্ঞেস করল, তলপেটে, না কোমর, কোনটা আগে ভারি হয়?

কেন!

কোমর তো একই আছে মনে হচ্ছে। তবে তলপেটটা।

শর্মিষ্ঠা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি দেখলে বুঝি! ছিঃ!

তাকিয়ে দেখতে দোষ কী! অপ্রস্তুত গলায় পরাগ বলল, বুঝতে দিয়ে দেখিনি।

পরাগের অস্বস্তি লক্ষ্য করে শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারল কথাবার্তা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। দোষটা তারই। সে না খোঁচালে এ-সব কথা উঠত না। এখন পরাগকে তিরস্কার করলে বাড়াবাড়ি হবে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সে বলল, নিজের বউকে লক্ষ্য করোনি?

দশ বছর হতে চলল, সব কি মনে থাকে নাকি! তাছাড়া তোমাকে সন্দেহ করারও কারণ ছিল না।

এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। কিছু হলে আমিই বুঝতে পারব।

দিন চারেকের মধ্যে আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটল। সকালে চা খেতে খেতে হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রায় ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নয়ন। ধরনটা সন্দেহজনক। একটিই ঘটনা যেহেতু আরো কোনো কোনো ঘটনা মনে পড়িয়ে দিতে পারে, সুতরাং শর্মিষ্ঠার মনে পড়ল, খানিক আগে বাসন ধুতে ধুতে বড় হাঁ করে হাই তুলেছিল নয়ন, তখন মনে হয় কাজে মন নেই, না করে উপায় নেই বলে করা, শরীর ছেয়ে যাচ্ছে ঘুমের মুদ্রায়। ইদানীং মেয়েটার অন্যমনস্কতা বেড়েছে। গত কাল বিকেলে খুচরো বাজারে পাঠিয়েছিল পরিষ্কার চারটে জিনিস আনতে বলে। চারটেই এনেছিল। কিন্তু লবঙ্গের পুরিয়া ভেবে যেটা খুলল তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গরম মশলা। ক্যান্সারের ভয়ে পরাগ আজকাল সিগারেট খাচ্ছে না, অভ্যাসজনিত অস্বস্তি কাটাতে যখন তখন লবঙ্গ ফেলে মুখে। গরম মশলার চারটে লবঙ্গ একবেলাও যাবে না। বিরক্ত হয়ে সে নিজেই ছুটেছিল লবঙ্গ কিনতে। এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার কারণ কী!

মিনিট পনেরো পরে নয়ন ফিরে আসার পর প্রখর হল শর্মিষ্ঠা।

কোথায় গিয়েছিলে?

নিচে।

উত্তরটা স্পষ্ট ও নির্বিষ। অধিকারবোধ থেকে বলা। কথার ধরনে রাগ হলেও ওকে আর ঘাঁটাবার সাহস হল না শর্মিষ্ঠার। কিন্তু সন্দেহ থেকে গেল।

সে-দিনও সে ঘটনাটা বলল পরাগকে।

ভাবছি ছাড়িয়ে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না পরাগ। শর্মিষ্ঠার চিন্তার ছড়িয়ে পড়ল তারও মুখে। পরে বলল, ছাড়াতে গেলে কারণ লাগে। শরীরটা ওর, পেটটাও। কিছু হয়ে থাকলে দায়িত্ব ওরই। তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন!

এর চেয়ে বুড়ি-টুড়ি রাখলে ভালো হত।

BanglaBook.org

কমলা ঝিমুত। শরীর খারাপের অজুহাতে প্রায়ই কামাই করত। এই মেয়েটাকে পেয়ে তুমি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলে।

তখন কি জানতাম এ-রকম হতে পারে!

পরাগ গম্ভীর হয়ে গেল।

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ কমল না তাতে। বরং বেড়ে গেল আরো, যখন আরো কয়েক দিন পরে এক দিন ন'টা বেজে গেল, দশটা বেজে গেল, কিন্তু কাজে এল না নয়ন। রন্টু এবং পরাগ দু'জনেই বেরিয়ে গেছে স্কুলে, অফিসে। রাতের এবং সকালের এঁটো বাসনকোসন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরে, ছাড়া জামাকাপড় কাচা হয়নি, ঘরদোর পরিষ্কার করা বাকি। এ-সব কি তাকেই করতে হবে নাকি!

সাত-পাঁচ ভেবে নিজেই খবর নিতে বেরুল শর্মিষ্ঠা।

ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বিল্ডিঙে এসে প্রথমেই পাঁচ তলার অম্বুজ দাশগুপ্তের ফ্ল্যাটে যায় নয়ন, ঘণ্টা দেড়েক পরে সাত তলায় পবিত্র ব্যানার্জির ফ্ল্যাটে। অম্বুজ দাশগুপ্তের স্ত্রী বন্দনার সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা আছে তার। ফোন-টোন করার দরকার হলে সে কিংবা পরাগ যে দু'তিনটি ফ্ল্যাটে যাবার কথা ভাবে, দাশগুপ্তদের ফ্ল্যাট তার একটি।

বন্দনাই দরজা খুলল।

আ-রে! এসো, ভেতরে এসো।

নয়ন আসেনি?

না তো! বন্দনা বলল, ওপরে খোঁজ নিয়েছিলাম, সেখানেও আসেনি। আমি তো নিজেই সেরে নিলাম সব।

আমাকেও তাই করতে হবে।

বন্দনাকে নিশ্চিন্ত দেখে চলে যাবে ভেবেও ভেতরে ঢুকল শর্মিষ্ঠা। মাথাটা ধরে আছে, বসতে বললে এক কাপ চা-ও নিশ্চয়ই খাওয়াবে। গত সপ্তাহে এক দিন ওদের শাড়ির এগজিবিশনে যাবার নেমন্তন্ন করতে এসে গল্প করে গিয়েছিল আধ ঘণ্টা। কফিও খেয়েছিল। সে-দিন অবশ্য নয়ন ছিল। আড্ডা দিতে অসুবিধে হয়নি। এখন ফিরে গিয়ে ঝক্কি সামলাতে হবে ভেবে ফিরতেও ইচ্ছে করছে না। সুতরাং সে খানিকক্ষণ বসে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

তোমার তো মেয়ে আছে। কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

হ্যাঁ ভাই, সেটা বলতে পারো। আজ তনুই মাছ রাঁধল। একটু আগে কলেজে বেরিয়েছে। বন্দনা বলল, চা খাবে তো?

স্বস্তি লুকিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, তোমাকেই তো করতে হবে?

রাখো তো! আমার যেন রাঁধাবাড়ার দশটা লোক আছে! বোসো, জলটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।

বন্দনার যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যেও শর্মিষ্ঠা ভেবে নিল, তার সমস্যা হলে বন্দনারও হবে। ওকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

মেয়েটা এল না কেন বলো তো?

এদের কামাই করার কারণ থাকে নাকি! কাল সে একটা ছুতো দেখাবে। মা'র অসুখ কিংবা দিদি হাসপাতালে গেছে।

আমার ধারণা ওর নিজেরই কিছু হয়েছে।

কী হবে!

হতেও তো পারে। অসুখ-বিসুখ বা অন্য কিছু।

তোমাকে বলেছিল কিছু?

BanglaBook.org

বললে তোমার কাছে খোঁজ নিতে আসব কেন!

সেই সময়ে টেলিফোন বেজে ওঠায় উঠে গেল বন্দনা। ফিরে এল চা নিয়ে। তারপর সোজাসুজি শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে ওকে চায়ের কাপ থেকে মুখ তোলার সুযোগ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, অন্য কিছু হয়েছে ভাবছ কেন?

এমনিই। শর্মিষ্ঠা বলল, হতেও তো পারে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দনা হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, কী সন্দেহ করছ বলো তো!

শর্মিষ্ঠা নিজেকে আগলাতে পারল না। ঝুঁকি নিয়েই বলল, প্রায়ই তো দেখি বমি করে!

তুমিও দেখেছ?

কেন! তোমার এখানেও —।

এক দিন করেছিল। আমি দেখিনি, তনু দেখেছে। পিছনের ব্যালকনিতে কাপড় মেলতে গিয়ে ঠোঙায় মুখ লুকিয়ে কিছু ওগরাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করতে বলল, মুখে আমলকি ছিল। ঠোঙাটা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে নি.ে।

খুব মনোযোগ দিয়ে বন্দনাকে দেখছিল শর্মিষ্ঠা। দু'জনেরই অভিজ্ঞতা একহলে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। ভাবল, এর সঙ্গে পবিত্র ব্যানার্জিকে টানতে পারলে একজোট হয়ে ছাড়িয়েও দেওয়া যায়। তার আগে জানা দরকার ব্যাপারটা কী, সে যা ভাবছে বন্দনা তা-ই ভাবছে কি না।

ক'মুহূর্তে অপেক্ষা করে শর্মিষ্ঠা বলল, ওর মা-টা তো এ-দিকে আসে মাঝে মাঝে। ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয় না?

তুমি কি কিছু সন্দেহ করছ?

শর্মিষ্ঠা তাকিয়ে থাকল। জবাব দিল না।

একটা কথা বলতে পারি। গলায় রহস্য টেনে বন্দনা বল, প্রমিস করো কাউকে বলবে না!

বলোই না!

ওপর তলার মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে মেয়েটার কী সম্পর্ক বলো তো?

কেন!

নয়ন নাকি তোমার বাড়ির কাজ সেরে মাঝে মাঝেই ওঁর ফ্ল্যাটে যায়। সন্ধেবেলায়। তুমিও নিশ্চয়ই শুনেছ?

বাজে কথা!

সোফায় পাশাপাশি বসে চা খাচ্ছিল দু'জনে। শর্মিষ্ঠার গায়ে ঠেলা দিয়ে হি-হি করা হাসিতে গড়িয়ে পড়ল বন্দনা।

আপন গড বলছি। ওই ফ্লোরের কেয়াদি নিজে দেখেছে এক দিন।

হাসি থামিয়ে বলল বন্দনা, দরজা খুলে চুপি চুপি বেরিয়ে আসছিল মেয়েটা। লোডশেডিং থাকায় কেয়াদি হেঁটেই উঠছিল, হঠাৎ দেখে ফেলে। মিস্টার ব্যানার্জিও নাকি দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন।

যাঃ! কী দেখতে কী দেখছে! ফ্ল্যাটে ওঁর মা-ও থাকেন।

কোথায় মা! তিনি তো তিন মাস আগে চলে গেছেন ছোট ছেলের বাড়িতে। ছেলেটা শিবপুরে পড়ে, উইক এন্ডে আসে। উনি তো একা।

কথাগুলো শুনতে শুনতে শিরদাঁড়া কেঁপে উঠল শর্মিষ্ঠার। পবিত্র ব্যানার্জি সম্পর্কে তার অবগত তথ্যের মধ্যে আছে বছর দুয়েক আগে, শীতকালে — হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বড়দিনের আগের দিন সন্ধেয় — সেরিব্রাল স্ট্রোকে মারা যায় ভদ্রলোকের স্ত্রী মনীষা। অনেকেই দেখতে গিয়েছিল বলে

BanglaBook.org

সে-ও গিয়েছিল। ফুলহাতা পুলওভার গায়ে থ হয়ে চেয়ারে বসেছিলেন ভদ্রলোক। অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছিলেন মাঝে মাঝে। সে-বছরই শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিঙে ভর্তি হয়েচিল মনীষার ছেলে সম্বুদ্ধ। মনীষার বুকে মাথা ঠুকে আছড়ে পিছড়ে কাঁদছিল মা-মা করে। পাশের ফ্ল্যাটের কেয়াদিই তখন সামলাবার চেষ্টা করে ওকে। ক'দিন পরে ওই সম্বুদ্ধই কাছা পরে তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে পরাগকে বলে, বেস্পতিবার মা'র কাজ। বাবা বললেন — । কথা শেষ করেনি। তরকারি কোটা থামিয়ে স্তব্ধ চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। এর পরেই শোনো এবং দেখে, মিস্টার ব্যানার্জির মা এসে থাকছেন ওদের সঙ্গে। তিন মাস আগে ছোট ছেলের কাছে চলে যাবার খবরটা এখনই শুনল।

মনে মনে হিসেব করে শর্মিষ্ঠা দেখল, সে-রকম কিছু হলে টের পাবার পক্ষে তিন মাসই যথেষ্ট। তার সন্দেহ ভুল হবার নয়। তার পরেই ভাবল, বস্তির মেয়ে, যার তার সঙ্গে শুতে পারে। এর সঙ্গে পবিত্র ব্যানার্জির সম্পর্ক কী! বড় চাকুরে, হ্যান্ডসাম, গাড়ি-টাড়ি আছে, ইচ্ছে করলে যে-কোনো ভদ্রলোকের মেয়েকেই টানতে পারেন। নয়নকে কেন!

যত সব বাজে কথা। সামান্য বিরক্তি মিশিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, কেয়াদি বুঝি এ-সব গল্প করে!

করে না আবার! বন্দনা হেসেই বলল, কী বলছিল জানো তো, পঁয়তাল্লিশের পর পুরুষদের খাঁই বেড়ে যায়। তখন নাকি বাছবিচার থাকে না।

এরপর এই কথাটাই রটবে। ছিঃ!

তুমি রাগ করছ? নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বন্দনা বলল, এ-সব মিথ্যে হলেও গুজব একবার ছড়ালে কে বন্ধ করবে! কেয়াদিই বলছিল, অঞ্জনার ঝি মঙ্গলা নাকি বলেছে নয়নের মিস্টার ব্যানার্জির ওখানে কাজ করা নিয়ে হাসাহাসি হয়েছে।

অঞ্জনা বলেছে?

কেউ না-কেউ নিশ্চয়ই বলেছে। নাহলে কথাটা উঠল কেন।

শর্মিষ্ঠা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

এখন সিরিয়াস লাগছে বন্দনাকে। চায়ের খালি কাপ দুটো নিয়ে উঠে গেল। আবার ফিরে এসে বসতে বসতে বলল, যা-ই বলো ভাই, একা পুরুষের ফ্ল্যাটে ওই বয়সের একটা আনম্যারেড মেয়ের কাজ করা ঠিক নয়। বস্তির মেয়ে, ওদের কোনো চরিত্র আছে নাকি! বানিয়ে বলে ব্ল্যাকমেলও তো করতে পারে।

বন্দনার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়ল শর্মিষ্ঠা। কাজকর্ম পড়ে আছে, এখন তার চলে যাবার সময়। তবু দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে সে আরো কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকল। তারপর উঠতে উঠতে প্রশ্ন করল, ছাড়িয়ে দেবে?

দেখি। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল বন্দনা, মঙ্গলা ওই বস্তিতেই থাকে। কালও না এলে ওকে বলব খবর নিতে। ছাড়াতে হলে মেয়েটার মাকে ডেকে এনে একটা কিছু বুঝিয়ে বললেই হবে। না হয় বলব, তুমি নিজে কাজ করো বাপু। মেয়েটাকে সরাও।

শর্মিষ্ঠাকে দেখে মনে হল না বন্দনার কথায় যুক্তি পাচ্ছে। কিছু ভেবে আচমকা গলায় বলল, আমরা ছাড়ালেও পবিত্র ব্যানার্জি ছাড়াবে কেন! তাহলে তো ওঁর সঙ্গেও কথা বলা দরকার।

রাখো তো! ওঁর ব্যাপার উনিই বুঝবেন। আমরা তো সেফ থাকি।

শর্মিষ্ঠা ফিরে এল এবং এরপর থেকেই স্বভাববিরুদ্ধ গম্ভীর হয়ে গেল। সংসারের দায়িত্ব তার। এর আগেও কখনো কখনো দিনের পর দিন কাজের লোক থাকেনি, তখন নিজেই সামলেছে সব কিছু। হাসিমুখে। আজও সে সবই করল। কিন্তু যান্ত্রিকতা এড়াতে পারল না।

BanglaBook.org

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পরাগ বলল, এক দিন কাজের লোক কামাই করলে এত আপসেট হবার কী আছে!

আপসেট হয়েছি কে বলল!

না বললে বুঝতে পারা যায়। মনের ছাপ মুখেও পড়ে।

গোয়েন্দাগিরি ছাড়ো। শর্মিষ্ঠার গলায় ঝাঁঝ ফুলট, সব সময় তোমাদের মন বুঝে চলতে হবে নাকি!

পরাগ রহস্যেই থেকে গেল।

পরদিন এবং তার পরদিনও কাজে এল না নয়ন। কোনো খবরও পাঠাল না। মঙ্গলাকে দিয়ে বন্দনা ওর মায়ের কাছে খোঁজ নিয়েছে কি না জানা যাচ্ছে না সেটাও। শর্মিষ্ঠা একবার ভাবল, যায় জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সন্দেহ দৃঢ়তর হওয়ায় টের পেল কেমন একটা বাধা আসছে ভিতর থেকে। সামান্য ভয়ও। তখন ভাবল, কোনো খবর থাকলে বন্দনা নিজেই কি জানাত না!

দুপুরে সে গম্ভীর মুখে স্কুলবাস থেকে রন্টুকে ফিরিয়ে আনতে গেল। পেট্রল পাম্পের সামনে অঞ্জনা ব্যানার্জির ঝি মঙ্গলাকে দেখেও জিজ্ঞেস করল না কিছু। বিল্ডিঙে পৌঁছে ঝি'দের জটলায় চোখ পড়ার ভয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় অনাবশ্যক গল্পে মেতে উঠল রন্টুর সঙ্গে।

তিন দিন নিজেকে আড়াল করে রাখার পর সে-দিন সন্ধেয় পরাগ বাড়ি ফিরে এলে নিজেকে আর চেপে রাখতে পারল না শর্মিষ্ঠা। বন্দনার সঙ্গে কথোপকথনের পুরোটাই বর্ণনা করল স্বামীর কাছে।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বিরক্তি ও বিচলিত হবার পক্ষে যথেষ্ট। খানিক চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে পরাগ বলল, এ-সব কুৎসিত গুজবে তোমার কান দেবার দরকার কী! তোমাদের মিসেস দাশগুপ্ত, কেয়াদি না কে, এদেরও কি খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! ঝি-চাকরদের সঙ্গে তফাতটা কোথায় বুঝতে পারছি না!

পরাগের কথার ধরনে দমে গেল শর্মিষ্ঠা। তারপর ভীত গলায় বলল, তুমি বুঝতে পারছ না আমি কী বলছি!

কী বলছ!

শর্মিষ্ঠার চোখে-মুখে অশান্তি স্পষ্ট। এরই মধ্যেও ছড়িয়ে পড়া নিজেকে কোনো রকমে একত্র করে সে বলল, জুন মাসে রন্টুকে নিয়ে আমি সাত দিন মা'র কাছে গিয়েছিলাম। তুমি তখন ফ্ল্যাটে একা ছিলে। নয়ন তখনো আসত!

তার মানে! তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ নাকি!

সন্দেহ নয়। ভয় পাচ্ছি। অদ্ভুত চাপা স্বরে শর্মিষ্ঠা বলল, সকলেই সব খবর রাখে। যদি তোমার নামেও কিছু রটায়!

পরাগ চুপসে গেল। কথাগুলোর অর্থ বুঝতে বুঝতে চোখ ফিরিয়ে নিল স্ত্রীর মুখের ওপর থেকে। কিছু একটা নড়াচড়া করছে শরীরের ভিতরে, কী তা অনুভব করা যাচ্ছে না ঠিক। তবে স্পষ্টই অনুভব করল, দব দব করছে মাথা, মেঝে সরে যেতে চাইছে পায়ের তলা থেকে।

এরপর দু'দিন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল।

তৃতীয় দিন সকালে যথানিয়মে যান্ত্রিক হয়ে সংসারের কাজ শুরু করেছিল শর্মিষ্ঠা। রন্টুর ছুটি। অফিসে বেরুবে বলে বাথরুমে ঢুকছে পরাগ। এই সময় বেল বেজে উঠল ফ্ল্যাটের দরজায়।

কিছু আশা এবং অনেকটা আশঙ্কা নিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে দরজা খুলল শর্মিষ্ঠা।

বন্দনা। একা নয়। সঙ্গে নয়নের মাকেও ধরে এনেছে।

BanglaBook.org

শোনো কী হয়েছে!

কী হয়েছে।

কী বলব, মা! মেয়েটার সব্বোনাশ হয়ে গেছে গো! বলতে বলতে চাপা কান্নায় অস্পষ্ট হয়ে উঠল নয়নের মা, মেয়েটার পেটে মস্ত আব হয়েচে গো। জ্বলে মরছে ব্যথায়। শুধু বমি করছে। ডাক্তারবাবু বলল অপারেশন না করলি বাঁচবেনি। চিকিচ্ছের টাকা কোথায় মা। তোমরা বাঁচাও মেয়েটাকে।

শর্মিষ্ঠা দুঃখিত হবে কি না বুঝতে পারল না। বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকেও দেখল। একটা পাথর যেন নেমে যাচ্ছে বুক থেকে, অনুভব করল, সেই জায়গাটা ক্রমশ ভরে উঠছে স্বচ্ছ হাসিতে।

বন্দনা বলল, আমি এখন একশো দিয়েছি। তুমিও কিছু দাও। কর্তার বন্ধু সেবা প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার, বেড পাওয়া যায় কি না দেখছে। মিস্টার ব্যানার্জির কাছেও পাঠাব একে।

ক'মুহূর্ত বন্দনা ও নয়নের মা'র দিকে তাকিয়ে থেকে হরিণীর ছন্দে ঘরে এসে শর্মিষ্ঠা দেখল, বাথরুমে থেকে বেরিয়ে তৈরি হচ্ছে পরাগ। সেই রকমই গম্ভীর!

তখন তিন দিনের নীরবতা ভেঙে সহাস্য হয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, অ্যাই, শিগগিরি একশোটা টাকা দাও তো!

কী ব্যাপার!

নয়নের মা এসে কান্নাকাটি করছে। ও-সব কিছু নয়। মেয়েটার পেটে অ্যাবসেস না কী হয়েছে। ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার।

স্ত্রীকে হাসতে দেখে গাম্ভীর্যের মধ্যেও কুণ্ঠিত হাসি ফুটল পরাগের ঠোঁটে। আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থাতেই এগিয়ে গিয়ে বেঁটে আলমারির মাথা থেকে ওয়ালেটটা তুলে নিয়ে বলল, একশো কেন! দুশোই দাও। আফটার অল, গরিব মানুষ!

রমানাথ রায়

ভগবানের দান

এক

আমার একটি চাকরি আছে। ভালো মাইনে পাই। এ ছাড়া একটি গাড়ি আছে। গাড়ি করে অফিস যাই। গাড়ি করে বাড়ি ফিরি। ছুটির দিনে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই। আমার অনেক বন্ধু। আমি তাদের বাড়ি যাই। তারা আমার বাড়ি আছে, গল্প করে সময় কেটে যায়। আমার কোনও মেয়ে বন্ধু নেই। কেন নেই তা জানি না। বোধহয় মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে না। কিংবা আমি হয়তো মেয়েদের পছন্দ করি না। ফলে আমার জীবনে কোনও সমস্যা নেই। দিব্যি আছি। ভগবানকে এর জন্য ধন্যবাদ। তিনি আমাকে মেয়েদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে অন্য রকম। তিনি আমাকে সুখে থাকতে দিলেন না।

BanglaBook.org

দুই

বাড়িতে আমি ছাড়া থাকে আমার বাবা-মা। পাঁচ বছর হল বাবা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। ইদানীং বাবার শরীর ভালো যাচ্ছে না। খাওয়া-দাওয়া কমে গেছে। সারা দিন বাড়িতে বসে খবরের কাগজ পড়ে। টিভি দেখে. মা'র সঙ্গে গল্প করে। মা'র শরীরও আগের মতো নেই। ভেঙে পড়েছে। আর সংসারের কাজ করতে পারে না। কাজ করার দরকারও নেই। আমাদের কাজের লোক আছে।

এক দিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই বাবা আমাকে ডাকল। আমি বাবার কাছে গিয়ে বসলাম।

বাবা বলল, আমার বয়স হচ্ছে। শরীরটাও আজকাল ভালো যাচ্ছে না।

আমি বললাম, ভালো ডাক্তার দেখাও। আমার জানাশুনো এক জন ভালো ডাক্তার আছে। যাবে তার কাছে?

বাবা বলল, তার দরকার নেই।

জানতে চাইলাম, কেন?

বাবা বলল, আমার এখন ডাক্তারের দরকার নেই। আমি যে-কারণে তোকে ডেকেছি তা মন দিয়ে শোন।

কৌতূহলী হয়ে বললাম. বলো।

আজ সকালে মুক্তির বাবা এসেছিল। মুক্তি খুব ভালো মেয়ে। তুই মুক্তিকে বিয়ে কর। তুই সুখী হবি।

আমি আঁতকে উঠলাম। বললাম, অসম্ভব।

বাবা রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, অসম্ভব কেন?

একটা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন ঘর করা যায় না। আমার বন্ধুরা বিয়ের করেছে। তারা কেউ সুখে নেই।

আমি কী করে সুখী হলাম? আমি কী করে সারা জীবন তোর মাকে নিয়ে ঘর করলাম?

ওটা তোমার ব্যাপার! আমি বিয়ে করতে পারব না। আমাকে তোমরা শান্তিতে থাকতেদাও। বলে রেগে গিয়ে আমি উঠে পড়লাম।

এ-কথা শোনার পর বাবার কী হল জানি না। এক দিন হার্টফেল করে মারা গেল। আমার কিছু করার নেই। আমি দু'দিন চোখের জল ফেললাম। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গেল। সব আগের মতো চলতে লাগল।

তিন

বাবা মারা যাওয়ার পর মা একা হয়ে গেল। মাকে রোজ বলি, চলো কোথাও ঘুরে আসি। ঘুরে এলে মন ভালো হবে। মা আমার কথা শোনে না। সারা দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকে। কী ভাবে জানি না। বাবার কথা ভাবে বোধহয়।

এক দিন মা বলল, তোর জন্য তোর বাবা মারা গেল।

অবাক হয়ে বললাম, আমার জন্য! আমি কী করেছি?

তুই বিয়ে করলি না বলে মনের কষ্টে তোর বাবা মারা গেল।

সত্যি?

হ্যাঁ! আমিও এবার মরে যাব।

এ-কথা বোলো না। শুনলে খুব কষ্ট হয়।

তাহলে তুই মুক্তিকে বিয়ে কর।

BanglaBook.org

তুমি আমাকে এই অনুরোধ কোরো না। আমি বিয়ে করতে পারব না।

কেন পারবি না?

আমি শান্তিতে থাকতে চাই।

বিয়ে করে শান্তিতে থাকা যায় না?

না।

এটাই তোর শেষ কথা?

হ্যাঁ।

এ-কথা শোনার পর মা'র কী হল জানি না। মা এক দিন হার্টফেল করে মারা গেল। আমার কিছু করার নেই। আমি দু'দিন চোখের জল ফেললাম। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গেল। সব আগের মতো চলতে লাগল।

চার

না, সব কিছু ঠিক হল না। সব আগের মতো চলতে লাগল না। একটা অশান্তি আমাকে পেয়ে বসল। অফিসে গিয়ে শান্তি পেলাম না। বাড়ি ফিরে শান্তি পেলাম না। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে শান্তি পেলাম না। সব সময় মনে হতে লাগল আমার জন্যই বাবা মারা গেছে, মা মারা গেছে। মুক্তিকে বিয়ে করলে বাবা মারা যেত না, মা মারা যেত না। তারা বেঁচে থাকত। নিজেকে আমার অপরাধী মনে হল। হ্যাঁ, আমি অন্যায় করেছি। খুব অন্যায় করেছি। এর প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। আমি মুক্তিকে বিয়ে করব। বিয়ে করলে বাবা-মা'র আত্মা শান্তি পাবে। কিন্তু আমি কি শান্তি পাব? দেখা যাক, মুক্তিকে বিয়ে করে কী পাওয়া যায়।

আমি এক দিন মুক্তির বাবাকে বললাম, আমি মুক্তিকে বিয়ে করতে চাই।

মুক্তির বাবা বলল, খুব ভালো কথা।

তারপর মুক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে বিয়ে করতে তোমার কোনও আপত্তি আছে?

মুক্তি বলল, না।

আমি এবার বললাম, তবে বিয়ের আগে আমাদের একটু মেলামেশা করা দরকার। জানা দরকার বিয়ে করে আমরা সুখী হব কি না। তুমি কি এতে রাজি আছ?

মুক্তি বলল, রাজি আছি।

তাহলে তোমার ফোনের নাম্বারটা আমাকে দাও।

মুক্তি তার ফোনের নাম্বার আমাকে দিল। আমিও আমার ফোনের নাম্বার মুক্তিকে দিলাম। দিয়ে বললাম, ফোনে সব কথা হবে।

মুক্তি বলল, আচ্ছা।

পাঁচ

মুক্তির বাবা আমার বাবার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। মুক্তিকে আমি দীর্ঘ দিন ধরে চিনি। মুক্তি দেখতে খারাপ নয়। শ্যামলা রঙ। টানা টানা চোখ। বাঁকা ঘন ভুরু। সরু চিবুক। মেলামেশা করতে গিয়ে দেখলাম, মুক্তি খুব ফুচকা খায়। আমি ফুচকা খেতে ভালোবাসি না। মুক্তি আইসক্রিম খায়। আমি আইসক্রিম খাই না। মুক্তি চন্দন সাবান ব্যবহার করে। আমি নিম সাবান ব্যবহার করি। মুক্তি ইলিশ মাছ ভালোবাসে। আমি চিংড়ি মাছ ভালোবাসি। মুক্তি দই খেতে ভালোবাসে। আমি রসগোল্লা খেতে ভালোবাসি। মুক্তি মাথায় স্নিগ্ধ তেল মাখে। আমি মাথায় শান্তি তেল মাখি। এই রকম আরও অনেক অমিল আছে। আমি সমস্যায় পড়ে গেলাম। এত অমিল জেনেও কি মুক্তিকে বিয়ে করা যায়?

BanglaBook.org

এক দিন মুক্তিকে কথাটা বললাম।

মুক্তি হেসে বলল, আমাদের মধ্যে আবার অনেক মিলও আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী কী?

মুক্তি বলল, তুমি ভাত খাও। আমিও ভাত খাই। তুমি টিভি দেখো। আমিও টিভি দেখি। তুমি কিশোরকুমারের গান ভালোবাসো। আমিও কিশোরকুমারের গান ভালোবাসি। তুমি ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসো। আমিও ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি। তুমি শীতকাল ভালোবাসো। আমি শীতকাল ভালোবাসি।

আমি এত সব জেনে খুশি হয়ে বললাম, ঠিক বলেছ। আমি এগুলো ভেবে দেখিনি। আমরা তাহলে এবার বিয়ে করতে পারি।

মুক্তি বলল, অবশ্যই।

এবার আমি বললাম, তবে একটা কথা আছে।

মুক্তি জানতে চাইল, কী কথা?

আমি কিন্তু ছেলেপুলে চাই না।

আমি চাই।

তাহলে কী হবে?

আগে বিয়ে হোক। তারপর এ নিয়ে ভাবা যাবে।

ছয়

আমাদের বিয়ে হল। বিয়ের দিন বাবা-মা'র জন্য আমার মন খারাপ করতে লাগল। কেবলই ভাবতে লাগলাম, আজ বাবা-মা বেঁচে থাকলে কত খুশি হত। তারা দেখতে পেত তাদের পছন্দের মুক্তিকেই আমি বিয়ে করেছি। বাসরঘরে বাবা-মা'র জন্য আমি দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললাম।

মুক্তি জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছ কেন?

বললাম, বাবা-মা'র কথা মনে পড়ছে।

মুক্তি বলল, কারও বাবা-মা চিরকাল বেঁচে থাকে না। তোমার বাবা-মাও বেঁচে নেই। তার জন্য বাসরঘরে চোখের জল ফেলার কী আছে?

বললাম, আছে, চোখের জল ফেলার কারণ আছে।

কী কারণ?

তারা চেয়েছিল আমি তোমাকে বিয়ে করি। আমি তখন তাদের কথা শুনিনি। তাই তারা দুঃখে হার্টফেল করে মারা গেছে। আমার জন্য মারা গেছে।

মানলাম এটা খুবই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু আজ তো তাদের কথামতোই আমাকে বিয়ে করেছ। এতে তাদের অতৃপ্ত আত্মা এখন শান্তি পাবে।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তুমি আর চোখের জল ফেলো না। তুমি এখন শান্ত হও।

আমি যে শান্ত হতে পারছি না।

তাহলে আমাকে চুমু খাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

আমি কথামতো মুক্তিকে চুমু খেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সব ঠিক হয়ে গেল।

BanglaBook.org

সাত

বিয়ের পর অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কখনও গেলাম দার্জিলিং, কখনও গেলাম নেপাল। কখনও গেলাম পুরী, কখনও গেলাম গোয়া। একবার সিঙ্গাপুর গেলাম। একবার গেলাম কম্বোডিয়া।

অ্যাঙ্কোরভাটের মন্দির দেখলাম। একবার সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়ালাম। প্যারিস শহরটা খুব ভালো লাগল। আমি অনেক ছবি তুললাম, মুক্তিও অনেক ছবি তুলল। সেই ছবিগুলো এখনও চারটে অ্যালবামে সাঁটা আছে। এখনও মাঝে মাঝে অ্যালবামগুলো খুলি। পাতা ওলটাই। সব মনে পড়ে গেল। সব।

এই ভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। তারপর এক দিন মুক্তির শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল। থেকে থেকে বমি করতে লাগল।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

মুক্তি বলল, কিছু না।

আমি বললাম, বাজে কথা। তুমি নিশ্চয় আজেবাজে কিছু খেয়েছ। হজম হয়নি। তাই বমি হচ্ছে।

মুক্তি হেসে বলল, তাই হবে।

তারপর এক দিন মুক্তি বলল, আমি বাপের বাড়ি যাব। তুমি আমাকে বাপের বাড়ি রেখে এসো। আমি মুক্তিকে তার বাপের বাড়ি রেখে এলাম।

আবার আমি একা। মুক্তি বাড়ি নেই। সারা বাড়ি খা-খা করতে লাগল। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কিছু করার থাকে না। বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে গল্প করতেও ভালো লাগে না। সব সময় মুক্তির কথা মনে পড়ে। জীবন থেকে সুখ-শান্তি উবে গেল। বার বার ফোন করে বলতে লাগলাম, তুমি চলে এসো। আমার একা থাকতে ভালো লাগছে না। মুক্তির এক উত্তর, আমার কিছু করার নেই। আমি এখন যাব না। তবু আমি কয়েক বার মুক্তিকে আনতে গেলাম। মুক্তি কিছুতেই এল না।

আমি বুঝে পেলাম না মুক্তির কী হয়েছে, বুঝে পেলাম না মুক্তি কেন আসতে চাইছে না। আমি রাগ করে মুক্তিকে ফোন করা বন্ধ করে দিলাম। মুক্তির কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

মেয়েদের বোঝা খুব মুশকিল। এই কারণেই আমি বিয়ে করতে চাইনি।

আট

অনেক দিন পরে মুক্তি ফিরে এল। কোলে একটা শিশু। আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এ আবার কেন?

মুক্তি হেসে বলল, একটা শিশু।

কোত্থেকে পেলে?

নার্সিংহোম থেকে?

কী-ভাবে পেলে?

আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। তাই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলাম। এক দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার বিছানার পাশে ছোট একটা খাট। সেই খাটে এ শুয়ে আছে। আমি নার্সকে জিজ্ঞেস কলাম, এই শিশু কার? নার্স বলল, আপনার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে দিল? নার্স বলল, ভগবান। আমি তারপর একে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

কেউ কিছু বলল না?

ভগবান আমাকে দিয়েছে। কারও কিছু বলার নেই।

একে তো এবার মানুষ করতে হবে।

তা হবে।

সে তো অনেক ঝামেলা।

একটু ঝামেলা পোহাতে হবে।

BanglaBook.org

তুমি ঝামেলা তো পোহাতে পারবে?

ভগবানের দান। পারতেই হবে।

আমি আর কিছু বললাম না। মুক্তি জানে না, ভগবানের দান সামলানো খুব মুশকিল। আমাকে সামলাতে না পেরে বাবা-মা হার্টফেল করে মারা গেছে। আমাদেরও হার্টফেল করে মরতে হবে।

নয়

পুত্রসন্তান। কান্নাকাটি কম। শান্ত স্বভাবের। নাম দেওয়া হল শান্ত। আমরা আদর করে শানু বলে ডাকতে লাগলাম। শানু আস্তে আস্তে উপুড় হতে শিখল। হামা দিতে শিখল। দাঁড়াতে শিখল। হাঁটতে শিখল। দৌড়তে শিখল। তার খিল খিল হাসিতে সারা বাড়ি ভরে উঠল। আমার কেমন মায়া জন্মে গেল। সেই সঙ্গে চিন্তা ঢুকে গেল। ছেলেকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে হবে। ঘুরে ঘুরে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করলাম। শুরু হল শানুর পড়াশুনো। শুরু হল শাসন। শুরু বকাঝকা। তবে এক সঙ্গে দু'জনে কখনও বকি না। আবার মুক্তি বকলে আমি ছুটে যাই। বলি, অত বোকো না। এইভাবে শাসন আর আদরের মধ্য দিয়ে শানু বড় হতে লাগল। হতে হতে স্কুল পেরোল। কলেজ পেরোল। চাকরিতে ঢুকল। ভালো মাইনের চাকরি। এবার শানুর বিয়ে দেওয়া দরকার। শানু এখন বড় হয়েছে। আর আমরা বুড়ো হয়েছি। আমাদের চুল পেকেছে। দাঁত পড়েছে। কবে আছি কবে নেই। শানুর বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। একেবারে আমার মতো।

এক দিন শানু বলল, আমি আমেরিকা যাব।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করব। বিদেশি পুঁজি চাই।

দেশি পুঁজি পাওয়া যাবে না?

পাওয়া যাবে। তবে তাতে কাজ হবে না। আমার লক্ষ লক্ষ ডলার চাই।

ব্যবসা করতে এত টাকা লাগবে?

হ্যাঁ।

আমি প্রতিবাদ করলাম না। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। শানু এখন বড় হয়েছে। এখন আমার কথা শুনবে না। ওর মন যা চায় তাই করুক। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কবে যাবি?

শানু বলল, শিগগির।

আমার পাশে মুক্তি বসে ছিল। জিজ্ঞেস করল, কবে ফিরবি?

শানু বলল, পুঁজি পেলেই ফিরব।

মুক্তি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, ফিরবি তো?

ফিরব।

ঠিক বলছিস?

ঠিক।

তারপর এক দিন শানু আমেরিকা যাওয়ার প্লেনে উঠল। আমরা বিমানবন্দর থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এলাম।

BanglaBook.org

দশ

কয়েক মাস পরে শানুর ফোন এল।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখন কোথায়?

আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে।

কেমন আছিস?

ভালো।

পুঁজি পাওয়া গেল?

এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পাওয়ার চেষ্টা করছি।

কবে ফিরবি?

ঠিক নেই।

এর কয়েক মাস পরে আবার শানুর ফোন এল।

বললাম, অনেক দিন হয়ে গেল। এবার ফিরে আয়।

শানু বলল, আমি এখন টোকিওতে। এখন ফিরতে পারব না।

টোকিওতে কী করছিস?

পুঁজির খোঁজে এসেছি।

আর পুঁজির খোঁজ করতে হবে না। এবার বাড়ি ফিরে আয়।

তা হয় না। বিদেশি পুঁজি আমার চাই।

যা ভালো বুঝিস কর। তবে তোর জন্য খুব চিন্তা হয়। তোর ফোন নাম্বারটা দে।

আমার ফোন নাম্বার দিয়ে কী হবে? আমিই তোমাদের খোঁজ করব। আমার জন্য চিন্তা কোরো না।

এর কয়েক দিন পরে আবার শানুর ফোন এল।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখন কোথায়?

বেজিং-এ।

ওখানে কী করছিস?

পুঁজি জোগাড় করতে এসেছি।

এখনও পুঁজি জোগাড় হয়নি?

না।

কবে হবে?

বলতে পারছি না।

তার পরও আরও অনেক মাস কেটে গেল। শানুর আর কোনও ফোন নেই। কী হল শানুর! অসুখ করেনি তো? আমাদের দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেল। ওর ফোন নাম্বারটাও আমাদের দিল না। কেন দিল না জানি না। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার। এরা কী যে চায় জানি না। কী যে বলে বুঝি না।

এক দিন থাকতে না পেরে মুক্তিকে বললাম, তোমার ছেলে অদ্ভুত।

মুক্তি জিজ্ঞেস করল, অদ্ভুত কেন?

অনেক মাস হয়ে গেল। খোঁজ নেই। কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। একটা ফোন করার সময় পাচ্ছে না?

তোমার মতো শানু বসে সময় কাটাচ্ছে না। ওকে পুঁজি জোগাড় করতে হচ্ছে। পুঁজি জোগাড় করা এত সহজ নয়। চিন্তায় চিন্তায় ও কাহিল হয়ে আছে। ওর ফোন করার সময় কোথায়!

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, বাজে কথা। শানু আসলে আমাদের কথা ভাবে না। শানু আমাদের ভুলে গেছে।

BanglaBook.org

মুক্তি আমার কথায় উত্তেজিত হয়ে বলল, অসম্ভব। শানু আমাদের ছেলে। শানু কখনও আমাদের ভুলতে পারে না।

না ভুললেই ভালো। বলে আমি চুপ করে গেলাম।

এর প্রায় এক বছর পরে শানুর ফোন এল।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখন কোথায়?

সিঙ্গাপুর।

ওখানে কী করছিস?

পুঁজি জোগাড় করছি।

এখনও পুঁজি জোগাড় হয়নি?

না।

আর কবে পুঁজি জোগাড় হবে?

বলতে পারছি না।

এগারো

আস্তে আস্তে আমাদের আরও বয়স বাড়ল। আমাদের আরও চুল সাদা হল। আরও দাঁত পড়ল। তারপর এক দিন আমাদের চমকে দিয়ে শানু ফিরে এল। সঙ্গে বউ। মুক্তি ছেলের বউকে দেখে খুব খুশি। বউকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। আমি আর শানু কথা বলতে লাগলাম।

শানুকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, কবে বিয়ে করলি?

শানু হেসে বলল, গত বছর।

আমাদের একবার জানালি না?

বিয়েটা এমন কিছু নয় যে জানাতে হবে। আমি এর আগেও একবার বিয়ে করেছিলাম। তোমাদের জানাইনি।

আমি আঁতকে উঠলাম, কী বলছিস তুই! এটা তোর দ্বিতীয় বউ?

শানু ঠাণ্ডা গলায় বলল, হ্যাঁ। এখন বিয়ে কোনও ব্যাপার নয়। এখন বিয়ে মানে ইউজ অ্যান্ড থ্রো। এই বউকেও পছন্দ না হলে দু'দিন পরে ফেলে দেব।

আমি আর কিছু বললাম না। বলার মতো ভাষা খুঁজে পেলাম না। শুধু একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম, পুঁজি জোগাড় হয়েছে?

কিছুটা হয়েছে। এখনও অনেক বাকি।

এবার এখানে থাকবি তো?

না। কালই বিকেলের ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর যাব। সেখান থেকে যাব সিলিকন ভ্যালি। তারপর যাব টোকিও। সরকার আমাকে রাজারহাটে জমি দেবে বলেছে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে এখানে চলে আসব।

আর কত সময় লাগবে?

জানি না।

তোর জন্য আমাদের ভীষণ মন খারাপ করে।

আমি সেটা বুঝি। আমারও মাঝে মাঝে তোমাদের কথা মনে পড়ে।

আমি কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি মনে পড়ে?

শানু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সত্যি মনে পড়ে।

BanglaBook.org

বারো

বউ নিয়ে শানু চলে গেল। বিমানবন্দরে ওদের পৌঁছে দিয়ে চলে এলাম। আমাদের চোখে জল। আমাদের আর কিছু করার নেই। বারান্দায় দু'জনে চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি বসলাম। দেখতে দেখতে বিকেল পড়ে এল। সন্ধে হল।

মুক্তি এক সময় জিজ্ঞেস করল, আলোটা জ্বালব?

বললাম, না।

তারপর আর কথা নেই। দেখতে দেখতে রাত হল।

এক সময় বললাম, চলো, এবার উঠে পড়ি।

মুক্তি বলল, চলো।

কিন্তু উঠতে গিয়ে উঠতে পারলাম না। শরীরটা ভীষণ ভারি মনে হল।

আমি বললাম, আমার হাতটা ধরবে?

মুক্তি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

আমি উঠতে পারছি না।

মুক্তি শক্ত করে আমার হাত ধরল। আমি মুক্তির হাত ধরে উঠে দাঁড়ালাম। মুক্তি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, শানু কবে ফিরবে?

আমি কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে।

মুক্তি জিজ্ঞেস করল, আজ রাত্রে কী খাবে?

আমি এবারেও কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, শরীরটা ভালো লাগছে না। কাল একবার ডাক্তারের কাছে যাব।

মুক্তি জিজ্ঞেস করল, শানুর বউকে কেমন লাগল?

এবারেও কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, আমার আর কাউকে চাই না। আমি শুধু তোমাকে পাশে নিয়ে বাঁচতে চাই।

তেরো

বাবা আমার জন্য হার্টফেল করে মারা গিয়েছিল। মা-ও আমার জন্য হার্টফেল করে মারা গেছে। এক দিন মুক্তিও শানুর কথা ভাবতে ভাবতে হার্টফেল করে মারা গেল। আমি দু'দিন চোখের জল ফেলালাম। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল।

ছ'মাস পরে শানুর ফোন এল।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছিস?

ভালো।

বউমা কেমন আছে?

তোমার ওই বউমা আর নেই।

কেন?

ওর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমি আবার বিয়ে করেছি।

এবার বউ কেমন?

জানি না।

তুই কবে ফিরবি?

শিগগির ফিরব। রাজারহাটে জমি পেয়েছি। এখন পুঁজি চাই।

BanglaBook.org

এখনও পুঁজি জোগাড় হয়নি?

বিল গেটসের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। দেখি কী হয়।

একটা খারাপ খবর আছে।

কী?

তোর মা মারা গেছে?

কবে?

অনেক দিন হল।

কীসে মারা গেল?

হার্টফেল করে।

আমাকে এখন কী করতে হবে?

কিছু করতে হবে না। শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিস। পারবি তো?

চেষ্টা করব।

চোদ্দো

আমি এখন একা। আমি আর বন্ধুদের বাড়ি যাই না। গ্যারেজে গাড়ি পড়ে থাকে, বন্ধুরা আমার কাছে আসে না। আমি তাদের ফোনও করি না। তারাও আমাকে ফোন করে না। আমি সারা দিন একা বারান্দায় বসে থাকি। খবরের কাগজ পড়ি না। টিভি দেখি না। বারান্দায় বসে রাস্তার লোকজন দেখি। দেখতে ভালো লাগে। শুধু একটা সমস্যা। আমার চোখ দিয়ে খুব জল পড়ে। কার জন্যে পড়ে জানি না। ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তার বলেছে, গ্লুকোমা। হবে হয়তো। তবে এতে মানুষ মরে না। আমিও মরব না। আমার বাবা-মা-মুক্তি হার্টফেল করে মারা গেছে। আমিও হার্টফেল করে মারা যাব। কবে?

শেখর বসু

অন্য রকম খেলা

পৃথিবীর সমস্ত মিষ্টি রোদ বোধহয় এই পাহাড়ের মাথায় বানানো লনে এসে জড়ো হয়েছিল। গাঢ় সবুজ লনের দু-পাশে অসমান্য ফুলের বাগান। পেছনে ছবির মতো হোটেল। আর সামনে যে-সব দৃশ্য আছে, সেগুলো বোধহয় এই ডেকচেয়ারে বসে সারা জীবন ধরে দেখলেও পুরোনো হবে না।

কিন্তু সারা জীবনের প্রশ্ন উঠছে না। মাত্র তিনটে দিন বিজন, সংযুক্তা আর ওদের মেয়ে পিঙ্কি এই হোটেলে থাকবে। তারপর বেড়াবার জন্য চলে যাবে আর-এক জায়গায়। সে-জায়গাটার রূপ-গুণ যতই হোক না কেন, থাকার জায়গাটা কখনোই এত ভালো হবে না, হতে পারে না।

কোথাও বেড়াতে গেলে প্রথম দিকে একটু বেশি বড়লোকি করে ফেলে বিজন, তার ফলে পরের দিকের খরচখরচা বেশ একটু হিসেব করেই করতে হয়। আগে থেকে ঠিক করে রাখা দু-একটা বেড়াবার জায়গায় অনেক সময় আবার যাওয়াও হয়ে ওঠে না। তা নিয়ে বিজনের বিন্দুমাত্র আপশোস নেই।

BanglaBook.org

ওর হিসেবটা অন্য ধরনের। বেড়াতে এলে ওর মুখের একটা প্রিয় বুলি হল — বাঁচলে রাজার মতো বাঁচ, অন্তত পক্ষে দু-চার দিন। সংযুক্তার ঠিক উলটো মত। দু-চারটে দিন রাজার মতো বাঁচার বদলে সারা জীবন বরং সুখী প্রজার মতো বাঁচ।

ছবির মতো সুন্দর এই হোটেলটার বিরাট ভাড়ার কথা সংযুক্তা আগে জানতে পারেনি। আসার পরে জেনেছে, তার পরেই বিগড়েছে। কোনো মানে হয় মাত্র তিনটে দিনের জন্য এতগুলো টাকা খরচ করার!

কিন্তু তিন দিনের বুকিং হয়ে গেছে, এখন থাকো আর নাই থাকো, হোটেলের ভাড়া তোমাকে গুনতেই হবে। সংযুক্ত ব্যাপারটা এ-দিক থেকে ভাবার পরে একটু সহজ হয়েছিল। তার পরেই হোটেলে উপস্থিত বাকি ধনী মানুষদের হাওয়া লেগে গিয়েছিল ওর গায়ে।

এই গায়ে হাওয়া লাগার ব্যাপারটা বিজন ইদানীং প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছে। বড় বড় হোটেলে আচ্ছন্নকর একটা হাওয়া থাকে। ফ্লোরের পুরু কার্পেট, জানলা-দরজার শৌখিন পর্দা, দামি আসবাবপত্র আর ঝকঝকে দেয়ালে সেই হাওয়া বুঝি বইতেই থাকে সব সময়। ওই হাওয়ায় গা ভাসিয়ে পোর্সিলিনের প্লেট থেকে সুখাদ্য মুখে তুললে মনে হয় — যা মনে হওয়া কখনোই উচিত নয়, ঠিক তাই মনে হয়। প্রথম রাতটা কেটেছে বড়লোকদের হোটেলে। সকালে বড়লোক ব্রেকফাস্ট। তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে কয়েক-পা হেঁটে এসে লনের ডেকচেয়ারে বসেছে। সকালের দিকে এই হোটেল ছেড়ে ওরা কোথাও বেরুবে না। কিন্তু এই কয়েক-পা হেঁটে লনে এসে বসার জন্য কত সাজ।

সংযুক্তার পরনে দামি শাড়ি, সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। শাড়ি-ব্লাউজের আধখানা জড়িয়ে রেখেছে গোলাপি ফুল-তোলা সাদা শালে। বিজন পরেছে জিন্‌সের প্যান্ট আর জ্যাকেট, পায়ে জাপানি স্লিপার। পিঙ্কির গায়ে ফারের কোট। যে-বিলিতি পুতুলটা নিয়ে পিঙ্কি এখন খেলছে, সেই পুতুলটা বাড়িতে শো-কেসে সাজোনো থাকে। ওটা ওকে ছুঁতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এখানে বেড়াতে আসার আগে বিজন এক ফাঁকে পুতুলটা বার করে কিট-ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

বিজন আগেই আঁচ করেছি এখানকার এই মস্ত হোটেলের হাওয়া পিঙ্কির গায়েও লাগবে। এখন এই ধরনের দামি বিলিতি পুতুল ছাড়া আর কোনো পুতুলে ওর মন উঠবে না। বিজন যা ভেবেছিল, ঠিক তাই হয়েছে। বড়লোকদের মেয়ের মতো একই সঙ্গে যত্ন আর অবহেলা মিশিয়ে পুতুল খেলছিল পিঙ্কি।

বিজনের হাতে একটা পেপারব্যাক। এমন পরিবেশে এক মনে বই পড়া সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে হাতে একটা পেপারব্যাক থাকা বোধহয় খুব মানানসই। ও অলস ভাবে বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মাঝে মাঝে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ পড়ে নিচ্ছিল।

ডেক চেয়ারে আর একটু আয়েশ করে বসে বিজন সংযুক্তার দিকে তাকিয়ে একটু গাঢ় স্বরে বলল, তারপর?

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক ছিল সংযুক্তা, প্রশ্নটা কানে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত বাদে পালটা প্রশ্ন কর, কী?

কেমন লাগছে? দারুণ না?

হুঁ।

দূরের ওই পাহাড়টা এখান থেকে দুর্ধর্ষ দেখাচ্ছে!

হুঁ।

সংযুক্তা কথার পিঠে কথা জুড়ল না, কিন্তু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল দূরের ওই পাহাড়ের দিকে। ওই পাহাড়ের নিচে দিয়েই সমুদ্র বয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

সমুদ্রের ধারের মানুষগুলোকে এখান থেকে ঠিক লিলিপুটদের মতো দেখাচ্ছিল। বিজন হঠাৎ গলা সামান্য ওপরে তুলে বলল, পিঙ্কি, লিলিপুট দেখবি তো এখানে আয়।

পিঙ্কি মেমসাহেব পুতুল কাঁধে ফেলে ছুটে এসেছিল বাবার কাছে। কী? কী দেখাবে?

লিলিপুট। ওই দেখ।

লিলিপুট কী বাবা?

এ মা! তুই লিলিপুটের গল্প জানিস না?

না তো। গল্পের গন্ধ পেয়ে পিঙ্কি বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

পিঙ্কির চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে বিজন বলল, একটা লোক ছিল তার নাম লিমুয়েল গালিভার। সেই গালিভার একবার জাহাজে চেপে এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যাচ্ছিল। পথে ঝড় উঠেছিল ভীষণ। আর ঝড় উঠলেই সমুদ্র ভীষণ রেগে যায়। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠছিল সমুদ্রে। ব্যাস্ —।

ব্যাস কী?

জাহাজ ডুবে গেল সমুদ্রের মধ্যে।

কবেকার সেই গালিভারের জাহাজডুবির খবর শুনে মনমরা হয়ে পিঙ্কি বলল, ডুবে গেল! তারপর?

ডুবে যাওয়া জাহাজে একটা নৌকো ছিল। সেই নৌকোয় চেপে বসল গালিভাররা। কিন্তু একটুখানি যেতে না-যেতেই সেই নৌকাটাও ডুবে গেল।

বেচারা গালিভারের জন্য পিঙ্কির উদ্বেগের আর শেষ নেই। চোখ বড় বড় করে বলল, নৌকাও ডুবে গেল! তারপর?

গালিভার খুব ভালো সাঁতার জানত, কিন্তু সমুদ্রের অত বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে তো বেশিক্ষণ সাঁতার কাটা যায় না। অনেক কষ্টে জলে ভেসে থাকল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর —।

তারপর আবার ডুবে গেল?

বিজন হেসে ফেলে বলল, না না, বার বার ডুবলে চলবে কেন? এবার ও বেঁচে গেল। ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে গেল। তারপর ও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে দেখে লিলিপুটরা বেঁধে ফেলেছে ওকে। ওই দেশটা ছিল লিলিপুটদের দেশ। খুব ছোট্ট ছোট্ট মানুষদের বলে লিলিপুট। এক-এক জন লিলিপুট আমার এক-একটা আঙুলের সমান।

পিঙ্কি ওর কাঁধের ওপর পড়ে থাকা কোঁকড়ানো চুলগুলো দু'পাশে ঝাঁকিয়ে বলল, যাঃ। মানুষ আবার অত ছোট হয় নাকি!

হয় না? ওই দেখ লিলিপুট। উঁচু পাহাড়ি-এলাকা থেকে দূরের সমুদ্রতীরের ছোট হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর দিকে আঙুল তুলেছিল বিজন।

পিঙ্কি নেচে উঠে প্রতিবাদ জানাল। কক্ষনো না। ওরা সবাই বড় বড়। তোমাদের মতো বড়।

বিজন গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলল, ওরা যদি বড়ই হবে, তাহলে ওদের এত ছোট দেখাচ্ছে কেন?

ছ'বছরের পিঙ্কি এই প্রশ্নের কোনো জবাব খুজে পেল না। কিন্তু পা দাপিয়ে বলে উঠল, মোটেও না। ওরা সবাই বড় — তোমাদের মতো বড়। বড় না মা?

সংযুক্তা ঝলমল করে হেসে উঠে মাথা কাত করেছিল এক পাশে। মায়ের সায় পেয়ে পিঙ্কি জিতে যাওয়ার ভাব মুখে ফুটিয়ে বলল, আমি ঠিক বলেছি, ঠিক বলেছি।

তার পরেই বায়না ধরার গলায় বলল, আমরা এখন সমুদ্র দেখতে যাব। চলো না বাবা।

BanglaBook.org

ঠিক আছে, যাব। তার আগে ছোট্ট একটা মজার খেলা খেলে নিই। দেখি কে জেতে? তুই আমার পাশের চেয়ারটায় বোস।

মজার খেলার কথা শুনে পিঙ্কি পাশের চেয়ারটায় উঠে বসেছিল।

বিজন বলল, এই খেলাটার নাম দেখার খেলা। তুমি আর আমি একটা জায়গা দেখব। সেই জায়গায় বেশি জিনিস যে দেখতে পাবে, সেই জিতে যাবে। যেমন ধর — এই বাগানটা। কী কী আছে বাগানে? আমি আগে বলি, তারপের তুমি বলবে। আমি বলছি, এই বাগানে আছে শুধু ঘাস আর চেয়ার। এবার তুমি বলো।

এ মা! বাগানে কত ফুল আছে, তুমি ফুলের কথাই তো বললে না!

আরে! তাই তো! যাঃ! প্রথম খেলাতেই আমি হেরে গেলাম।

জিতে গিয়ে হাততালি দিয়ে উঠেছিল পিঙ্কি।

সংযুক্তা চেয়ারটা আর একটু কাছে টেনে এনে হাসতে হাসতে বলল, পিঙ্কির এক পয়েন্ট, বাবা জিরো।

আচ্ছা, এবার দূরের ওই পাহড়টা দেখো। আমি আগে বলছি, পাহাড়ের মাথায় বিরাট একটা পাথর আছে।

পিঙ্কি ছটফটে গলায় বলল, আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

না তো!

কেন, কত গাছ আছে পাহাড়ে।

জিভ কেটে বিজন বলল, যাঃ! আবার আমি হেরে গেলাম।

খেলা চলতেই লাগল। ঠিক এইভাবে সমুদ্র দেখা হল, দূরের জাহাজ দেখা হল — সমুদ্রতীর, রঙিন ছাতা কিছুই বাদ গেল না। আর প্রতিটি খেলাতেই পিঙ্কি জিতল, বাবা হারল।

সংযুক্তা একটু চেঁচিয়ে উঠে বলল, পিঙ্কির দশ পয়েন্ট, বাবা জিরো।

প্রতিটি খেলায় জিতে পিঙ্কির উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। ও আরো খেলতে চাইছিল, কিন্তু অদ্ভুত এই দেখার খেলায় দেখার জিনিস আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। চারদিকে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সব কিছু নিয়েই খেলা হয়ে গিয়েছে ওদের।

তবু পিঙ্কি চারদিক আর একবার খুঁটিয়ে দেখার পরে বলল, বলো না, এবার কী দেখব?

দু-হাত তুলে দুঃখী-দুঃখী মুখ করে বিজন বলল, দেখার মত আর তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তুমি এখন বরং পুতুল খেলো। পরে আবার অন্য কোথাও গেলে এই খেলাটা খেলা যাবে।

কিন্তু জেতার নেশা পেয়ে বসেছিল পিঙ্কিকে। ও বলল, না এখনই খেলব। আচ্ছা, ট্রেনের মধ্যে কী কী ছিল বলব আমি?

বলো।

বলতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল পিঙ্কি। না, আগে তুমি বলো। না হলে আমারটা শুনে শুনে বলবে তুমি।

বেশ, আমিই বলছি আগে। এই খেলাটাতেও মেয়ের কাছে হেরে গিয়েছিল বাবা।

পিঙ্কি বলল, এবার বলো, আমাদের এই হোটেলের ঘরে কী কী আছে?

সংযুক্তা নকল একটা ধমক লাগাল মেয়েকে, চুপ কর তো। বকবকানি একবার শুরু করলে আর থামতে পারে না। হোটেলের ঘরের কতটুকু দেখেছিস তুই? ঘুম থেকে উঠেই তো ছুটে বেরিয়ে এসেছিলি বাইরে।

BanglaBook.org

পিঙ্কির মুখে-চোখে অভিমানের ছাপ ফুটে উঠেছিল, কেন, কাল রাত্তিরেও তো ওই ঘরে ছিলাম।

সংযুক্তা হেসে উঠেছিল গলা ছেড়ে। ও! আমার কী থাকা রে! বাবার কাঁধে চেপে ঘরে ঢুকেছিলি, তারপর বিছানায় পড়েই ঘুমে কাদা।

জেদি মেয়ের মতো গলা হয়ে উঠেছিল পিঙ্কির। না, আমি ঘুমোইনি, সব দেখেছি।

বিজন ওকে শান্ত করার জন্য ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, তুমি বলো কাল রাতে হোটেলের ঘরে তুমি কী কী দেখেছ। যদি দেখি তুমি আমার চাইতে বেশি জিনিস দেখে ফেলেছ, আমি আর কিছুই বলব না। তুমি এই খেলাটাতেও তাহলে জিতে যাবে। বলো এবার —।

পিঙ্কি মুখের ভঙ্গি একটুও না-পালটিয়ে অন্য রকম খেলাটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। হোটেলের ঘরে দুটো খাট আছে। কাল রাতে একটা খাটে আমি শুয়েছিলাম। আর একটা খাটে তুমি আর মা।

কথাটা শুনেই চমকে উঠে চোখাচোখি করল সংযুক্তা আর বিজন।

পিঙ্কি মুখস্থ পড়া বলার ঢঙে বলতে লাগল, বাবা ব্যাগ থেকে একটা বড় ওষুধের বোতল বার করল। তাই দেখে মা বলল, তুমি এখন আবার ওই সব খেতে বসলে! তখন বাবা বলল —।

ছিঃ পিঙ্কি! বড়দের কথা শুনতে নেই। আর শুনে ফেললেও বলতে নেই কাউকে। তাছাড়া তুমি খেলার নিয়মটাই ভুলে গিয়েছ। দেখার খেলায় শুধু চোখে-দেখা জিনিসের কথাই বলতে হয়। শোনা কথা বলার কোনো দরকার হয় না।

নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পিঙ্কি বাবার কথা শুনল। তারপর বলল, মা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিল। আর তুমি মায়ের গায়ে হাত দিতেই মা ধাক্কা মেরে হাত সরিয়ে দিচ্ছিল। তারপর —।

বিজন কেমন যেন লাফ মেরে উঠে পিঙ্কিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ওই দেখো, তিনটে সাদা চিল ঠিক প্লেনের মতো উড়ছে আকাশে। তুমি চিলের পিঠে উঠবে?

কথাটা বোধহয় পিঙ্কির কানেই গেল না। ও সেই আগের গলাতেই বলে উঠল, তুমি মায়ের জামা ধরে টানতেই মায়ের জামাটা —।

আঁতকে উঠেছিল সংযুক্তা। চুপ কর তো! তখন থেকে কী বানিয়ে বানিয়ে বলছিস।

অভিমানে ভরাট হয়ে উঠেছিল পিঙ্কির গলা। আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি? একটুও বানিয়ে বলছি না।

পিঙ্কির দুটো গালই ভিজে গিয়েছিল চোখের জলে।

বিজন ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, না না, তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলবে কেন? তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু কাল রাতে তুমি অতক্ষণ জেগে ছিলে কেন? ঘুম আসছিল না? তা, আমাদের কাছে চলে এলেই পারতে, কত গল্প করতাম।

অভিমান গাঢ় হয়ে উঠেছিল পিঙ্কির গলায়। কেন যাব? তোমরা কেন আলাদা শুয়েছিলে? আমি আর কখনো তোমাদের সঙ্গে শোব না।

বিজন মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, আর কক্ষনো এমন হবে না। এক্ষুনি আমি গিয়ে দুটো খাট এক সঙ্গে জুড়ে দেব। তারপর তুমি মধ্যিখানে শোবে, দু-পাশে শোব আমরা।

তোমাদের সঙ্গে আমি আর শোবই না। বলতে বলতে কোনওমতে বাবার হাত ছাড়িয়ে বাগানের দিকে ছুট লাগিয়েছিল পিঙ্কি।

সংযুক্তা এবার বিজনের দিকে তাকিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠেছিল, ছি ছি! কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হল বলো তো! তখনই বলেছিলাম আলোটা নিভিয়ে দাও, তা না —।

রীতিমতো বিব্রত হয়ে উঠেছিল বিজন, আমি কী করে জানব যে ও ঘুমোয়নি!

BanglaBook.org

একটু বাদে সংযুক্তা এক টানে গায়ের শালটা খুলে ফেলে বলল, ভালো লাগছে না। রোদ্দুর বেশ তেতে উঠেছে। আমি ঘরে যাচ্ছি।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েছিল ও। হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সাজানো-গোছানো মস্ত বড় রিসেপশন। ওখানেই ঘরের চাবি রেখে আসা হয়েছে। লম্বা পায়ে ওই দিকেই এগিয়ে গিয়েছিল সংযুক্তা।

বিজন ডেক চেয়ারে আরো একবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। কিন্তু টের পেল, সেই আগের আরাম আর নেই। রোদ্দুরের মিঠে ভাবটাও চলে গেছে। রোদ খানিকটা চড়া হওয়ার জন্য দূরের গাছপালায় মোড়া ওই পাহাড়ের রহস্যও বোধহয় অনেকখানিই উধাও হয়ে গিয়াছে।

ও-দিকের ওই বড়সড়ো পাতাবাহারের গাছের পাশে বসে পিঙ্কি ওর কোলের পুতুলটাকে আদর করতে করতে বিড় বিড় করে কী সব বলছিল। হয়তো সেই সব কথা, যা এখানেও বলতে পারেনি।

তিন দিক ঘেরা ছোট্ট, সুন্দর লন আর বাগান। গেটের কাছে টুলের ওপর বসে আছে এক জন দারোয়ন। বিজন ওর কাছে যেতেই লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বিজন বলল, আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘরে যাচ্ছি, মেয়েটার দিকে একটু নজর রেখো।

দারোয়ান লম্বা করে এক পাশে মাথা নাড়াতেই ঘরের দিকে রওনা দিয়েছিল বিজন।

হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোর পুরু কার্পেটে মোড়া। পা ফেললে পায়ের খানিকটা বুঝি ডুবে যায়। ইনটিরিয়র ডেকরেটরের হাতের জাদুতে চারদিক কেমন যেন মোহময়। কার্পেট সিঁড়ির ফ্লোরেও। সব কিছুই ঠিক আগের মতোই আছে, কিন্তু সেই হাওয়াটা ওর আর গায়ে লাগছিল না। সেই হাওয়া — যা গায়ে লাগলে যে-কেউ বোধহয় পালটে যায় মুহূর্তের মধ্যে।

বিজন পালটেছিল, সংযুক্তা পালটেছিল, এমনকী পিঙ্কিও বোধহয় পালটে গিয়েছিল। না হলে ও বোধহয় একই সঙ্গে যত্ন ও অবহেলা মিশিয়ে ওই দামি পুতুলটা নিয়ে খেলতে পারত না।

ঘরে ফিরে এসেছিল বিজন। কিন্তু এখানেও সেই হাওয়া নেই। সংযুক্তা খাটের এক ধারে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল। দারুণ ভাবে সাজানো ঘরের সব কিছুই ঠিক আগের মতোই আছে। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম সেই হাওয়াটা কিছুতেই আর বিজনের গায়ে লাগল না॥

সমরেশ মজুমদার

যে-নাটকের রিহার্সাল হয় না

স্টেশন থেকে সাইকেলে দশ মিনিট আগে গ্রামে পৌঁছতে অবশ্য ভ্যান রিক্সাও আছে। চার-পাঁচ জনের মাথা পিছু ভাড়া দু'টাকা। জেলার অন্য গ্রামগুলোর থেকে এই গ্রাম অনেকটাই আলাদা। প্রত্যেকের অল্পবিস্তর জমিজমা তো আছেই, সেটা গ্রামের মানুষের সচরাচর থাকে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি পরিবারের এক জন না এক জন রেলে চাকরি করেন। চাকরিতে থাকাকালীন কেউ মারা গেলে তাঁর স্ত্রীকে সরকার সহানুভূতি দেখাতে চাকরি দেন। দেখা যাচ্ছে এই গ্রামের মানুষদের গড় আয়ু চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। ফলে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের বিধবারা পঁয়ত্রিশ-আটত্রিশেই চাকরি পেয়ে যান। রোজ ভ্যান রিক্সা এবং ট্রেনে কলকাতায় যাওয়া-আসা করেন। যিনি ছিলেন একেবারে ঘরোয়া বউ, চাকরি পাওয়ার দু'মাসের মধ্যে তাঁর পোশাক এবং চেহারার পরিবর্তন হয়। যে যত সুশ্রী

BanglaBook.org

তার পরিবর্তন তত বেশি। মৃত স্বামীর পেনশনের সঙ্গে নিজের মাইনে যোগ হওয়ায় তাদের স্বাচ্ছন্দ্য চোখে পড়ার মতো। অন্তত গ্রামের যে-সব বউ সংসার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে তারা মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়।

শোভার বিয়ে হয়েছিল মাত্র ষোলো বছর দশ মাস বয়সে, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েই বিয়ের পর ফল অনুকূলে গেলেও আর কলেজে পড়া হয়নি। পাত্র রেলের চাকুরে, উপরি আছে। পড়াশুনার কোনও প্রয়োজন নেই। স্বামী নিবারণ রোজ বাড়ি ফেরে রাত দশটার ট্রেনে। অফিসের পর শখের রিহার্সাল দেওয়া তার প্রবল নেশা। এই নিয়ে শোভার সঙ্গে তার কম ঝামেলা হয়নি। শাশুড়িও শোভাকে সমর্থন করেন। বিয়ের বারো বছর হয়ে গেছে কিন্তু আজও সন্তান হয়নি। শোভাই জোর করে নিজেদের পরীক্ষা করিয়েছিল। দেখা গেল কারও কোনও খামতি নেই, তবু হচ্ছে না। শোভার সময় কাটতে চায় না।

আজ সকালে ট্রেন ধরতে যাওয়ায় আগে নিবারণ বলে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে, এর আগে অনেক বার বলেছে এ-কথা, শোভা বিশ্বাস করেনি আজ। কিন্তু বিকেলে সাড়ে চারটের সময় পাশের বাড়িতে ফোন এল। কালেভদ্রে ওদের ফোন আসে। ডাক পেতে শোভা ছুটে গেল।

হ্যালো? আপনি কি নিবারণদার স্ত্রী বলছেন?

হ্যাঁ।

বউদি আপনি তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে আসুন, নিবারণদার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। অবস্থা ভালো নয়। আমার নাম সুব্রত, নিবারণদার সঙ্গে কাজ করি। আমরা সবাই হাসপাতালে আছি। দেরি করবেন না প্লিজ। লাইন কেটে গেল।

হাউ হাউ কান্না, পাড়া-প্রতিবেশীরা বোঝাল। এমনকী শাশুড়িও বললেন, ভগবানকে ডাকো বউমা। শোভা বলল, আমি যাব হাসপাতালে।

প্রতিবেশীর ছেলে কিশোর কিন্তু কলকাতার পথঘাট চেনে। ঘরে হাজার দুয়েক টাকা ছিল, তাই হাতব্যাগে পুরে রওনা হল শোভা তার সঙ্গে।

হাসপাতালে যখন পৌঁছল তখন রাত সাতটা পনেরো। চত্বরে লোকজনের ভিড়। দালালরা জুল জুল করে দেখছে। কিশোর পরামর্শ দিল রিসেপশনে গিয়ে নিবারণের খোঁজ করতে। নিবারণ নামটাই তিনটে ছেলেকে কাছে আনল।

আপনি এসে গিয়েছেন বউদি। আমি সুব্রত, নিবারণদার সহকর্মী, আমিই ফোন করেছিলাম। যাক, ঠিক সময়ে এসে গেছেন।

শোভা দেখল ওদের বয়স তিরিশের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন আছেন উনি? ডাক্তার কী বলছে?

দ্বিতীয় জানাল, আজকের রাতটা কাটলে আশা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বুক মুচড়ে কান্না বেরিয়ে এল। সুব্রত বলল, কাঁদবেন না বউদি। আমরা আপনার পাশে আছি। আপনি বরং ওখানে বসুন।

ওরা ওকে জায়গা করে দিল বসার জন্য। চোখ মুছে শোভা বলল, টাকা-পয়সা?

ও-সব নিয়ে এখন চিন্তা করবেন না। আপনি কি কিছু খেয়ে এসেছেন?

মাথা নাড়ল শোভা। সে তখন খাওয়ার কথা ভাবতে পারছে না।

ওরা তিন জন একটু সরে গেল। বারংবার শোভার দিকে তাকাল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ওরা ডাক্তারের কাছে গেল।

BanglaBook.org

শোভার খুব ইচ্ছে করছিল নিবারণকে দেখতে। হয়তো নিবারণ আজ রিহার্সালে না গিয়ে বাড়ি ফিরত। রিহার্সালে যেতে পারবে না ভেবে কি ওর মনে কষ্ট হয়েছিল? তাই থেকে কি বুকে ব্যথা হল? সে কিশোরকে পাঠাল খোঁজ নিতে, এখন নিবারণের কাছে যাওয়া যাবে কি না! কিশোর ফিরে এসে জানাল, এখন দেখা করার সময় চলে গেছে।

রাত এগারোটা নাগাদ ওরা ফিরে এল গম্ভীর মুখে।

সুব্রত বলল, বউদি, বাড়িতে কত টাকা আছে?

বাড়িতে তো নেই, ব্যাঙ্কে আছে। শোভা বলল।

কত? লাখ তিনেক আছে?

ওব্বাবা। না বোধহয়, আমি জানি না।

দ্বিতীয় জন বলল, না না। নিবারণদা ঘুষ নিত না। অত টাকা ব্যাঙ্কে থাকতেই পারে না। নাটকের দলের জন্য চাঁদা দিতে হত প্রতি মাসে।

সুব্রত বলল, সমস্যা হয়েছে বউদি। ডাক্তার বলছে আজকের রাতটা যদি কেটে যায় তাহলে কালই বাইপাস সার্জারি করতে হবে। পরে অফিস থেকে টাকা পেতে পারেন, কিন্তু —।

অত খরচ?

এখানে করতে চাইছেন না। খুব কমপ্লিকেশন আছে। নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য অপারেশন করেলই যে সাকসেলফুল হবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। চান্স নেওয়া আর কী! সুব্রত বলল।

আমি বুঝতে পারছি না কী করব! শোভা কেঁদে ফেলল।

সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন। নার্সিং হোমে গেলে অফিশ টাকা দেবে কি না সন্দেহ আছে। যা করার তা এখনই করতে হবে।

অত টাকা আমি কোথায় পাব!

ঠিক। আর ধার করে খরচ করলেই যে নিবারণদা সুস্থ হবে এমন নয়। মাঝখান থেকে আপনাদের ফ্যামিলি সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। তৃতীয় জন বলল, আমি বলি কী, এখানেই থাক নিবারণদা।

আপনারা একটা কিছু করুন। ও-ই একমাত্র রোজগেরে লোক। ও না থাকলে আমরা না খেয়ে মরব। কেঁদে ফেলল শোভা।

ও-সব নিয়ে চিন্তা করবেন না বউদি! সুব্রত বলল, অফিসে কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়েছেন নিবারণদা। এক্ষেত্রে নিবারণদা না থাকলে আপনার চাকরি হবেই। অবশ্য নিবারণদার চেয়ে কম মাইনে পাবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ছাড়াও প্রত্যেক মাসে পেনসনের টাকা যোগ করলে অনেক বেশি আয় হবে আপনার।

দ্বিতীয় জন বলল, তাছাড়া শুনলাম, নিবারণদার একটা দিক পড়ে গেছে। বাকি জীবন, বেঁচে থাকলেও, বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। সেটা আরও বড় সমস্যা বউদি।

সুব্রত বলল, তাহলে আমরা অপেক্ষা করি। চাকরির জন্য আপনি একদম ভাববেন না। চার জন পঞ্চাশ প্লাস বিধবার অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে। ওটা আমি হ্যান্ডলিং করি। আপনারটা প্রায়রিটি লিস্টের টপে দেব। কদ্দুর পড়াশুনা বউদি?

হায়ার সেকেন্ডারি। ফিস ফিস করে বলল শোভা।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় নিবারণের মৃত্যু হল। নার্সদের কেউ এক জন বলেছেন, আজ সকালের মধ্যে বাইপাস হলে হয়তো বেঁচে যেত। সুব্রত তাকে ধমকেছিল, গ্যারান্টি দিতে পারতেন? পারতেন না। তাহলে এ-সব কথা বলবেন না।

Banglabook.org

শেষ কাজ চুকিয়ে দিতে নিবারণের দেহ নিয়ে আসা হয়েছিল তার গ্রামে। ওর অফিসের ছেলেরা খুব করেছিল। সব শেষ করে রাত্রে ফিরে যাওয়ার সময় ওরা একটা দরখাস্ত লিখে শোভাকে সই করিয়ে নিয়ে গেল। নাহলে ওই কারণে হয় শোভাকে যেতে হত, অথবা ওদের এত দূরে আসতে হত।

এই গ্রামে আর এক জন বিধবা বাড়ল। শেষ বিধবা যিনি, যাঁর স্বামী আট মাস আগে গত হয়েছেন রেলের চাকরি করতে করতে। তিনি এসে পরদিন শোভাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। এক দিন যে জীবন কাটিয়েছ শোভা, আজ থেকে সেটা ভুলে যেতে হবে। রেল নিশ্চয়ই তাকে চাকরি দেবে। তবে চাকরি দিলে যেন শোভা বয়সটা কমিয়ে বলে। তাহলে অনেক বেশি দিন চাকরি করতে পারবে। শাশুড়ি চুপচাপ শুনছিলেন। শেষ পর্যন্ত না বলে পারলেন না, এ কী অন্যায় কথা! ছেলে আমার পেটে হয়েছে, তখন কোথায় ছিল বউমা? তা সেই ছেলে মরে গেলে আমার বদলে বউমা কেন পাবে?

প্রতিবেশিনী বিধবা বললেন, আপনার যে সত্তরের ওপর বয়স হয়ে গেছে। তাছাড়া সরকারি নিয়মে বউকেই চাকরি দেয়। এ তো ভালোই হল। আপনি বাড়িতে আরাম করবেন, ভ্যান, ট্রেন ঠেলে চাকরি করতে যেতে হবে না। ফ্যামিলির আয় তো বেড়ে গেল।

শাশুড়ির মন্তব্য শোভার ভারি অপছন্দ হল। সে মনে পুষে রাখল।

নিয়মভঙ্গের দিন অফিসের লোকজন এল। সুব্রত বলল, একদম চিন্তা করবেন না বউদি। আমি নিজে বড়সাহেবকে দিয়ে সই করিয়ে পাঠিয়েছি হেডকোয়ার্টার্সে আপনার অ্যাপ্লিকেশন। সেখানেও লোক আছে। তার বেশ কয়েক জনকে ডিঙিয়ে আপনাকে আগে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠাবে। তবে তার আগে ইন্টারভিউ দিতে হবে।

ই-ন্টারভিউ! নার্ভাস হয়ে গেল শোভা।

একদম ঘাবড়াবেন না। আমরা তো আছি। শুনুন, যে-দিন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন সে-দিন পারলে সাদা থান পরে যাবেন। চোখ অবধি ঘোমটা টেনে রাখবেন। আর মাঝে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদবেন।

কাঁদব?

ওই এক দিন। না কাঁদলে সিমপ্যাথি পাবেন কী করে! সুব্রত বলল।

চাকরি হয়ে গেল শোভার। তার কান্না শুনে দু-একটা প্রশ্ন করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার যে-দিন ডাকে এল সে-দিনই সুব্রত হাজির, এবার আমাদের খাওয়াতে হবে বউদি।

শোভা হাসল, নিশ্চয়ই। কী খাবেন বলুন?

ওটা আপাতত মুলতুবি থাক। হ্যাঁ, সোমবারে তো জয়েন করছেন। থান পরার দরকার নেই। সাদা শাড়ি, নীলচে পাড় শাড়ি পরবেন। আর একটা কথা।

বলুন।

সুপারভাইজার যখন খাতা এগিয়ে দিয়ে সই করতে বলবে তখন এমন কানায় ভেঙে পড়বেন যেন খাতাটা নষ্ট হয়ে যায়। সুব্রত বলল।

ওমা! কেন?

ক'দিন বাদে খাতায় আমাদের হাজিরা হিসাব করা হবে। যারা পাওনা ছুটির বেশি কামাই করেছে তাদের মাইনে কাটা যাবে, প্রমোশন হবে না। আপনি চোখের জলে খাতা ভিজিয়ে দিলে আমরা বেঁচে যাব। সুব্রত বলল।

কিন্তু অত জল আমি কী করে বের করব? ওর মরে যাওয়ার পর যে কেঁদেছিলাম তাতে শুধু গাল ভিজেছিল। শোভা বলল।

প্রাকটিস করুন বউদি। প্রাকটিস করলে কী না হয়! সুব্রত বলল।

তাই হল। চটি খাতায় সুপারভাইজার দেখানো জায়গায় সই করতে গিয়ে শোভা সশব্দে এমন ভাবে কেঁদে ফেলল যে পাতাটা তো ভিজলই, তার ওপরে সে খাতা তুলে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে মুখে

BanglaBook.org

চাপা দেওয়ায় বাকি পাতগুলোও নষ্ট হল। সুপারভাইজার হা-হা করে উঠে খাতা কেড়ে নিয়ে বললেন, যাঃ। খাতাটা গেল। নিবারণ খুব লাকি ছিল। আমি মরে গেলে আমার বউ এ-ভাবে কাঁদবে না।

ধীরে ধীরে শাড়িতে রঙ লাগছিল বলে চট করে কারও চোখে পড়েনি। তৃতীয় মাসে রঙিন শাড়ি পরে অফিসে আসতে বাধ্য হল শোভা, কারণ দুটো সাদা শাড়ি পরে পরে লাট হয়ে গছে। তার তো আলমারি বোঝাই সাদা শাড়ি নেই। শাশুড়ির কথা ভেবে বাড়িতে সে মাছ-মাংস খায় না। প্রতিবেশিনী বিধবা বললেন, তুমি একটা বোকা। টিফিনে এক দিন মাছ, এক দিন মাংস খেয়ো। আমি তাই খাই।

এখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়। প্রায় দশটা বেজে যায়। সুব্রতকে সময় দিতে হয়। সে রোজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে মোগলাই পরোটা মাংস বা ফিস কবিরাজি খাওয়ায়। ক'দিন পরে সদ্য বদলি হয়ে আসা এক জন অফিসার শোভাকে নিজের সেকশানে নিয়ে নিলেন। এ ব্যাপারে অন্য অফিসারদের আপত্তি নেই, কারণ শোভা এখন কোনও কাজ জানে না তেমনি কাজ শেখার আগ্রহ নেই। ছ'মাস পরে তার চাকরি পাকা হয়ে যেতে সে বুঝে গেছে চুরি করে ধরা না পড়লে চাকরি যাবে না। কিন্তু কখনই সে অফিসারের অবাধ্য হয় না, সহকর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। সে নতুন অফিসারকে বিনীত ভাবে জানিয়ে দিল এখনও কাজ শিখতে পারেনি। অফিসার বললেন, জন্মেই কেউ ম্যাট্রিক পাশ করে না। আস্তে আস্তে শিখে নিও। অফিসের পরে দেখা কোরো, আমি শিখিয়ে দেব।

সে-দিন থেকে সুব্রত আর অফিসারের মাঝে সময় দিতে বাধ্য হল শোভা।

সে-দিন সন্ধের কিছু পরে অফিসারের গাড়ি তাকে স্টেশনে নামিয়ে দিল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায় লোক নেই। স্টেশনটায় শুধু যাত্রীরা। প্লাটফর্মে ঢুকতে গিয়ে সে তিন জনকে দেখতে পেল। তিন বুড়ি। মাথার চুল পাকা, তোবড়ানো গাল, গায়ে কালো কোট। তিন জন টিকিট চেকার। সহসা এগিয়ে এসে বলল, কী রে শোভা, মনে হচ্ছে খুব আরামে আছিস! এ দেখ না, আমাদের চেকিঙে দিয়েছে, ভালো লাগে?

আর এক জন বলল, সত্তর পেরিয়ে গেছে কিন্তু বলতে তো পারি না। অফিসের খাতায় তো এখনও বাহান্ন। মাঝে মাঝেই বদমায়েস অফিসার এই বয়সে এখনও দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

শোভা চিন্তিত হল। তারও তো দশ বছর এফিডেবিট করে কমানো আছে।

বাড়ি ফেরা মাত্র শাশুড়ি ঝাঁপিয়ে উঠলেন, এত রাত হয় কেন? সেই কখন ছুটি হয়ে গেছে? বাড়ির বউ শহরে গিয়ে প্রজাপতি হয়ে উড়ছ?

মাথা নাড়ল শোভা, আশ্চর্য! আপনার ছেলে যখন শেষ ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরত তখন তো তাকে কিছু বলতেন না?

সে তো নাটক করত, রিহাসলি দিয়ে ফিরত!

আমিও তাই করছি। রোজ নতুন নাটক করছি। ব্যাপারটা একই। শোভা বলল॥

Banglabook.org

সুব্রত সেনগুপ্ত
জন্মরোধ কেন

আজ আমার ইন্টারভিউ—চাকরির নয়, প্রেমেব। ইন্টারভিউয়ের কথা শুনে প্রথমে একটু সম্মানে লেগেছিল। এ কী, প্রেমেরও পরীক্ষা দিতে হবে? ভেবেছিলাম পৃথাকে বলব, প্রকৃত প্রেমে সন্দেহের

জায়গা নেই। কিন্তু এ-বকম বোকা বোকা সংলাপ আওড়ালে পৃথা ভাববে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখি। অতএব নিজেকে বোঝালাম, সব কিছু সহজ ভাবে নিতে হয়। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় ভাবতে হবে, কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি খুব চটপটে, বুদ্ধিমান তা প্রমাণ করার জন্য বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই, আবার ঘাবড়াবার দরকারও নেই। সব ঠিক আছে, কিন্তু পৃথার মা-বাবা থাকতে আমার সঙ্গে পৃথার জীবন যুক্ত হলে তার দশা কী হবে তা যাচাই করার ভার ওর মাসি-মেসোর ওপর পড়ল কেন? ঠিক আছে, মেসো নিঃসন্তান, পৃথাকে তিনি মেয়ের মতো দেখেন তবু? একটা কারণ হতে পারে, পৃথার মেসোর বার্ষিক আয় বাবার বার্ষিক আয়ের চাইতে অনেক বেশি। ফলে তার মতামতের গুরুত্বও বেশি।

সে না হয় হল, ওদের পারিবারিক দাঁড়িপাল্লায় যে বাটখারার ওজন যাই হোক আমাকে আবার ওজন-টোজন করা কেন? পৃথাই-বা কী-রকম! কেমন নিরীহ মুখ করে বলল, তুমি রবিবার মাসির বাড়ি আসবে, মাসি তোমাকে দেখতে চেয়েছে। সত্যি আসবে কিন্তু। আর মাসি-মেসো যাই বলুক আমার ওপর রাগ করতে পারবে না কিন্তু।

কেন রাগ করব না শুনি? আমাকে যদি বেশি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা হয় আমি কিন্তু সত্যি রেগে যাব। আমার প্রশ্নমালার সামনে দাঁড়াতে একদম ভালো লাগে না। আমি কেন আমার মতো, আমি কেন অন্য রকম নই — এ-সব কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার একেবারে পছন্দ নয়।

আচ্ছা সত্যি, আমি উত্তর জানি না কেউ এ-রকম প্রশ্ন যদি আমাকে করেন? সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। কত প্রশ্নের উত্তরই তো আমি জানি না। আমার যদি জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম ধ্রুব কেন?

সত্যিই তো আমার নাম বিপিনচন্দ্র বা কৃষ্ণকান্ত, রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথ এমনকী গোপাল হতে পারত। হল না কেন দেখুন, আমার নাম আমি তো রাখিনি। শুনেছি, আমার বাবার এক মামা আমার নাম রেখেছিলেন। মামামশাই নাকি খুব ভালো এসরাজ বাজাতেন। বিয়ে-থা করেননি।

হয়তো ধ্রুপদ-ধামার ভালোবাসতেন, ধ্রুপদ থেকে ধ্রুব? কী জানি। ভদ্রলোক হয়তো আমসত্ত্বও ভালোবাসতেন, আমসত্ত্ব থেকে আমার নাম আমকুমার কিংবা রাম, বলরাম, হরেরাম যা খুশি নাম রাখতে পারতেন। ধ্যুত, অপ্রাসঙ্গিক কথা এসে যাচ্ছে। কিন্তু দেখুন, আমার নাম আমার এত প্রিয়, বলতে গেলে নামটা আমার অস্তিত্বের অংশ হয়ে গেছে, তবু আমার নামের ব্যাপারে আমার কোনও দায়িত্ব নেই। যেমন আমার চেহারা, তা যে-রকমই হোক, আমায় জিজ্ঞেস করে তো আমার নাক-চোখ-মুখ-শরীর তৈরি করা হয়নি! আমার চেহারার ব্যাপারেও আমার কোনও দায়িত্ব নেই। অথচ যে-দুটোর ওপর আমার কোনও হাত নেই, সেই নাম আর দেহ আমি পরম আহ্লাদে বয়ে চলেছি। এ-দুটোই আমার সব চেয়ে প্রিয় জিনিস। আশ্চর্য, দুটোই কিন্তু আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর এই যে পৃথা, দেখলে 'আমার ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বাহিয়া যায়' মনে পড়ে, এত যার অহঙ্কার চেহারার জন্য, নামের জন্য, ওর কিন্তু গর্ব করার কোনও কারণ নেই। ওর নাম বিদগ্ধবালা বা তারাসুন্দরী বা তৃষিতা হলেও বলার কিছু ছিল না। ওর বড় বড় চোখ, জ্যান্ত উন্মুখ স্তন, সরস ঠোঁট, গোল উরু বা ভারি নিতম্বের জন্য ওর প্রশংসা করার কোনও মানে হয় না। তাহলে মাসি মহাশয়া এবং মেসো মহাশয়, ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে! তাহলে আপনাদের পৃথা অকারণে গরবিনী। আমারও সঙ্কোচের কারণ নেই। নেই? তবে আমি যে দু'পায়ের ওপর আমার মাথা-বুক-পেট-হাত-রক্তমাংস বয়ে বেড়াচ্ছি, পৃথিবীর সন্দিগ্ধ বা সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়াচ্ছি, তার কার্য-কারণ — দুর ছাই।

BanglaBook.org

না পৃথা, এ-সব ফাজলামির কোনও মানে হয় না। তোমার মেসো যদি জিজ্ঞেস করেন, ছোকরা তুই হিন্দু কেন রে? তুই বাঙালিই-বা হতে গেলি কেন? কেন হতে গেলাম? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? আমি আন্দামানের নরখাদক ওঙ্গিদের মধ্যে জন্ম নিলেই-বা কে বাধা দিত? আচ্ছা আমি হিন্দু! আমি বাঙালি কেন? না মশাই, উত্তর দিতে পারব না। আমার নাম আর চেহারার মতো এ-সব ব্যাপারও আমার মতামত নেওয়া হয়নি। যেমন আমি মেয়ে না হয়ে পুরুষ কেন তা-ও বলতে পারব না। আমি আরও আগে বা পরে না জন্মে আমার জন্মের তারিখেই-বা কেন জন্মালাম? জানি না। পৃথা, মাইরি আমাকে ছেড়ে দাও।

পৃথা বলল, তোমার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে?

এখনও হয়নি। তবে —।

এ-সব অদ্ভুত প্রশ্ন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে?

করে না, যদি করে?

কখনও না। আমার মেসো-মাসিকে তুমি ভাব কী?

তোমার মেসো-মাসি — আচ্ছা, এই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা তোমার মেসো এবং মাসি না হয়ে তোমার মামা-মামি বা খুড়ো-খুড়ি আবার তোমার কেউ না হতে পারতেন?

কী বকছ আবোল-তাবোল?

আচ্ছা ধরো, এঁরা তোমার না হয়ে রমলার মাসি-মেসো হতে পারত?

কে রমলা?

আমাদের অফিসে চাকরি করে।

ও, আমার না হয়ে মেসো-মাসি রমলার হলে তোমার বুঝি সুবিধে হত?

সুবিধে! সুবিধের কথা আসছে কোথা থেকে!

আসছেই তো। এরপর তো বলবে আমার সঙ্গে না হয়ে রমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারত।

ঠিক বলেছে পৃথা। ওর সঙ্গে না হয়ে রমলার সঙ্গে আমার দৈহিক, মানসিক ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে অনায়াসে হতে পারত। আবার রমলার সঙ্গে না হয়ে কমলা বিমলা অবলা লালা লা যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে আমি বিয়ের মুখে এসে দাঁড়াতে পারতাম। পৃথার দিকে হাত বাড়িয়েছি তার এক মাত্র ব্যাখ্যা: যোগাযোগ। অন্য কারও সঙ্গে একই রকম যোগাযোগ হলে আমি এ-রকম গম্ভীর বিষয় নিয়ে এখন পৃথার সঙ্গে বাক্যালাপ করতাম না। পৃথা বলল, কী, চুপ করে আছ কেন? আমার চাইতে রমলাকে তোমার বেশি পছন্দ?

কী জ্বালা। কোথাকার কে রমলা এত আলোচ্য হয়ে উঠল কেন? রাগ দেখিয়ে বললাম, কী রমলা-কমলা করছ? আমি এ-সব কখন বললাম?

বললে তো, এই তো বললে, আমার না হয়ে রমলার মেসো-মাসি হলে —।

আঃ, থামবে! কী উলটো-পালটা বকছ! কথার মানে বোঝ না!

হ্যাঁ, আমি উলটো-পালটা বলছি! বিয়ের আগেই এই, পরে তুমি না জানি কী করবে!

বুঝলাম, মেজাজ দেখিয়ে এখন কাজ হবে না। পৃথার সুন্দর হাত দুটো ধরলাম। পৃথা রেগে বলল, হাত ছাড়ো।

কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করল না। তার মানে একটু সাধতে হবে, জোর করে আদর-টাদর করতে হবে।

শান্ত হলে আমার কাঁধের ওপর হাত দুটোকে বিশ্রাম দিতে দিতে পৃথা জিজ্ঞেস করল, তুমি বিশ্বাস করো না, আমার জন্য তোমার আর তোমার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে?

BanglaBook.org

আমি চুপ করে থাকি। পৃথা আবার আবেগের সঙ্গে প্রশ্ন করে, আগের জন্ম থেকে তোমার আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, মানো তো, নাকি মানো না?

আমি বলি, আগের জন্মের কথা জানি না, তবে এ জন্মেই তো দেখতে পাচ্ছি অনেক বাধা।

তীক্ষ্ণ গলায় পৃথা জানতে চায়, কী বাধা?

এই যে আমি তোমার উপযুক্ত কি না তার পরীক্ষা দিতে হবে। তোমার মেসো-মাসি যাচাই করে দেখবেন, আমার বিদ্যে-বুদ্ধির ওজন কত?

হতাশ গলায় পৃথা বলে, তুমি একে পরীক্ষা বলছ? ছিঃ, ওরা গুরুজন, তোমাকে একটু দেখতে চেয়েছেন। একটু কথাবার্তা বলবেন।

পৃথা, এক জনকে দেখে, দু'একটা কথা শুনে কিছু বোঝা যায়? আচ্ছা পৃথা মনে আছে, তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিছিলে, আমার সঙ্গে কী-রকম খারাপ ব্যবহার করেছিলে?

পৃথা হাসে, কিন্তু তার দুই চোখ ছল ছল করে। উৎসাহ পেয়ে বলতে থাকি, আমি জানি, আমি এক রকম, আমার চেহারা দেখে মনে হয় একেবারে অন্য রকম। তাছাড়া আমি খুব ভালো কথা বলতেও পারি না। আমার দু-একটা কথা শুনে আমাকে কারও ভালো লেগে যাবে তাও নয়। ধরো, আমাকে দেখে ওদের যদি পছন্দ না হয়, তখন কী হবে?

তখন কী হবে-র উত্তর না দিয়ে পৃথা জেদ করে বলে, নিশ্চয় পছন্দ হবে, কেন হবে না? মাসির তো তোমাকে এর মধ্যেই পছন্দ হয়েছে। মেসো মুখে কিছু বলেনি কিন্তু তুমি আমার মেসোকে জানো না। এত ভালো আর এত ভালোবাসে আমাকে।

তোমার মাসির আমাকে পছন্দ হয়েছে?

হুঁ।

কী করে হল?

কী করে আবার? আমি তোমার কথা মাসিকে বলেছি। মাসিও জিজ্ঞেস করেছে।

কী কথা তুমি বলেছ, কী কথা মাসি জিজ্ঞেস করেছে?

কী আবার, যা সবাই বলে।

যা সবাই বলে! চাকরির দরখাস্তে যা-যা লিখতে হয়, নাম, বাবার নাম, বয়েস কত, কোথায় থাকা হয়, লেখাপড়া কদ্দুর, অভিজ্ঞতা-টতা আছে কি না, থাকলে কত বছর কত মাস কত দিনের? তারপর কোন ধর্মের লোক কোন লিঙ্গ।

আমি মজা করে বলিনি, তবু মজা পেয়ে পৃথা বলল, সবটা না হলেও প্রায় এ-রকমই।

পৃথা শোনো, সত্যি বলছি এ-সব শুনে তোমার মাসি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না।

তবে কী বললে জানতে পারবে? এই যে আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুমি মাঝে মাঝে মদ খাও, এখন আবার নতুন উপসর্গ জুটেছে, কে রমলা না কমলা তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে কি না এ-সব জানাতে হবে?

হায় ভগবান, এই মেয়েটাকে আমি কী করে বোঝাই! কিন্তু হাল ছাড়লেও চলবে না। ওকে কাছে টেনে আনি। আমার কোলের উপর বসিয়ে ওর মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে যেন অবুঝ মেয়েকে শান্ত করতে করতে বলি, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না পৃথা।

পৃথা মুখ তুলে ধরে। আমার ঠোঁটের পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে ওর ভেজা দুই ঠোঁট, আমার বুকের এত কাছে ওর পুষ্ট বুক। ওর চুল থেকে আঙুল বের করে নাকে, গালে, ঠোঁটের কাছে আলতো ভাবে ঘষতে থাকি। শেষে অস্থির আঙুলগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ওর একটা জ্যান্ত স্তনের ওপর আমার হাত রাখতে হয়। পৃথা আচ্ছন্ন চোখ তুলে তাকায়। ওর চোখের মণি আরও কালো হয়ে

Banglabook.org

উঠেছে। ওকে আমি কী বোঝাব? আমার নিজেরই এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে, পৃথার সঙ্গে আমার সম্পর্কও কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়।

পৃথাদের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, সূর্য তখনও মাথার ওপর আসেনি। রাস্তার ওপর আমার পা পড়ছে, প্রথমে ডান পা তারপর বাঁ। আমার পায়ে পায়ে চলছে আমার ছায়া। আমি থামলে ছায়া থামে, আমি চললে চলে। ছায়ার রক্তমাংস নেই, হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড নেই। আমি ছায়ার কথা মনে রাখি না। তবু ছায়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে। আমি চাই বা না-চাই, ছায়া আমার সঙ্গ ছাড়ে না। কেন?

ফুটপাথের পাশে চওড়া কালো রাস্তা, রাস্তা দিয়ে চলেছে ছোট-বড় নানা রকম গাড়ি। তার মধ্যেও একটা ডাবলডেকার গর্জন করতে করতে পাড়া কাঁপিয়ে চলেছে। ডাবলডেকারের পাশে পাশে অসহায় একটা স্কুটার যেন ভয়ে ভয়ে চলছে। আমার আগে চলেছেন এক সুন্দরী। তাঁর খোলা পিঠ, খোলা কোমরের খাঁজ আর কম্পমান গুরু নিতম্ব নিয়ে তিনিও পাড়া কাঁপিয়ে চলেছেন — ওই ডাবলডেকারের মতো। আমার ছায়া নিয়ে দ্রুত মেয়েটির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করি। পারি না। পারি না। সুন্দরীর নরম মাংসল শরীর এঁকেবেঁকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে আমার পথ রোধ করে সরে সরে যাচ্ছে। কী বিপদ! ঠিক আছে, তুমি খুব সুন্দরী কিন্তু আমার কী দোষ? আমাকে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয়?

লাল-হলুদ-সবুজ ট্রাফিক সিগনাল জ্বলছে নিভছে। সুন্দরীদের থামানোর জন্য শহরে কোনও ট্রাফিক-সঙ্কেতের ব্যবস্থা নেই কেন? কোনও দৈনিকের সম্পাদককে একটা চিঠি লিখলে হয়।

শাড়ির দোকনে শোকেসে ভারি সুন্দর শাড়িতে সেজে ডামি-রূপসী থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে সলজ্জ হাসি। আমার আগে আগে যিনি চলেছেন, এখনও তাঁর মুখ দেখিনি। কিন্তু তাঁর মুখে যে অহঙ্কার লেগে আছে, আমি না দেখেও বলে দিতে পারি। ওকে বলব, ডেকে বলব, ওই ডামির মতোই তোমরার চেহারার জন্য তুমি কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পার না। তোমাকে জিজ্ঞেস করে তোমাকে ছাড়াই ছায়া সমেত আমার শরীর বয়ে নিয়ে চলেছি। আমার তথাকথিত পরিচয় বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি?

জানি, পৃথা রেগে যাবে — ও খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়বে, তবু বিকেলে ওর মেসো-মাসির বাড়িতে গেলাম না। তারপর পাঁচ-ছ'দিন কেটে গেল কিন্তু পৃথার কোনও খবর নেই। আশা করেছিলাম, ও না আসুক, অন্তত একবার ফোন করবে। ফোন করে জানতে চাইবে, আমি কেন যাইনি? রাগ এবং অভিমান প্রকাশ করবে। পৃথার ক্রুদ্ধ মুখ মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ক্রুদ্ধ এবং কামার্ত এই দুই পৃথার মুখের পার্থক্য কী? পার্থক্য আছে কি না জানি না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমার প্রেমিকার আরক্ত মুখ সরে গিয়ে তার বিব্রত ম্লান মুখ যেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি কী করব? আমি যে কী করি!

আমাদের অফিসের পুলকেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

এস্টাব্লিশমেন্টের নব-বিবাহিত রাহাবাবু বলেন, কী ব্যাপার, দাড়ি কামাননি? আপনি তো এ-ভাবে কখনও অফিসে আসেন না?

আমি কি অনেক দিন আয়নায় মুখ দেখিনি? এই মুখ ধ্রুব নামে এক ব্যক্তিকে এক জীবনের জন্য ভোগ-দখলের স্বত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শরীর ধ্রুবর। আবার এই নামটাও এই শরীরকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। জন্ম তারিখ, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদি তথাকথিত পরিচয় তথাকথিত ধ্রুবকে এক জীবনকালের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছে। সারা জীবনের বন্দোবস্ত! অতএব আপনার নাম-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-আকৃতি সবই অকস্মিক, সব বাতিল। তুমি তবে কে হে? আকস্মিক ভাবে সূর্য

BanglaBook.org

থেকে উৎক্ষিপ্ত জ্বলন্ত তরল পদার্থ থেকে তৈরি পৃথিবী নামক ঘুরন্ত গ্রহের পিঠের ওপর বিমূঢ় পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ? আকাশের নিচে তোর পরিচয় কী শালা?

আমি এক জন বহনকারী। শববাহকের কাঁধে না চাপা পর্যন্ত সমস্ত জীবন ধরে আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়ের বোঝার আমি বাহক।

পৃথা এসে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী ?

উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি জানতে চাই, তুমি ভেবেছে কী? আমার মানসম্মান বলে কিছু নেই?

তোমার মান — তুমি — তুমি কে? কে গা?

সত্যি বলছি, সব কিছু নিয়ে ফাজলামি ভালো লগে না।

ফাজলামি তো করিনি।

করোনি? একটা সারা জীবনের ব্যাপার।

কার জীবন? আমার না ধ্রুবর? তোমরা না —।

পৃথা বিস্মিত হয়ে বড় চোখে আমাকে দেখে। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে হন হন করে চলে যায়। যাক। পৃথা নিশ্চয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে না।

পরদিন পৃথা দরজা খুলে আমাকে দেখে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে করল না। কোনও কথা না বলে দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ব, না ফিরে যাব? না, ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি। ঠিক আছে, আকস্মিক ভাবেই পৃথার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, তবু পৃথাকে আমার চাই। আকস্মিকতা যেমন সত্যি, ওর সম্পর্কে আমার আবেগও সত্যি — সোনার প্রতিমা জলে ভাসাইও না। সবই তো আমি মেনে নিয়েছি। তবে?

পৃথা নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াচ্ছে, খুলে ফেলছে আবার জড়াচ্ছে। তার মানে ও আমার জন্য অপেক্ষা করেছে। ওর সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলব, প্রেম দাও, সব ভুলতে দাও, দাও, দেহি?

এখন আমার শরীরের নিচে পৃথার জাগ্রত শরীর। এক শরীরের প্রতিটি কোষ অন্য শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে সুখ শুষে নিতে চাইছে।

বিশ্বসংসারে কোথাও আর কিছু নেই। পৃথার মুখ কী-রকম সরল হয়ে উঠেছে। শক্ত করে চেপে ধরা দুই ঠোঁট, ওর দুই চোখ খোলা, কিন্তু চোখ দিয়ে ও বোধহয় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমার বুকের নিচে পৃথার উদার নরম দুই স্তন। ও দু'হাতে আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে। অতীত-ভবিষ্যৎ জাহান্নমে যাক, শুধু বর্তমান বর্তমান। পৃথার শরীর যেন আবেশে গলে যাচ্ছে। এক সময় আমি তীব্র সুখে মনে মনে 'জীবন জীবন' বলে চিৎকার করে উঠি।

এক পা ছাড়িয়ে আর এক পা ভাঁজ করে, হাঁটুতে গাল চেপে পৃথা বসে আছে। ওর চোখে অবসাদ, না অপরাধের ছায়া? হঠাৎ এগিয়ে এসে উপুড় হয়ে আমার কপালে চুমু খায়। মুখ ঝুঁকিয়ে ধ্রুব নামক ব্যক্তির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভেজা গলায় বলে, এই আমার ভীষণ ভয় করছে, যদি কিছু হয়?

না ভেবেই উত্তর দিই, ভয়ের কী আছে?

পৃথা মুখ সরিয়ে বলে, কী জানি। তারপর খাট থেকে নেমে জামা-কাপড়ে শরীর ঢাকে। ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বোধহয় বাথরুমে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, ভয়ের কিছু নেই। আবার এক জন নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাড়া উদাসীন পৃথিবীতে এসে পড়বে। তার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী আমি নিজে। তার পছন্দ বা অপছন্দের কথা নিয়ে ভাবনা ছাড়াই তার অবয়ব তৈরি হবে। যে-কোনও একটা নামের ছাপ দিয়ে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে তাকে আমরা সঁপে দেব।

BanglaBook.org

বিছানা থেকে নেমে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পর্দার ওপরের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। আকাশ অথবা শূন্য। শূন্যে আবছা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোতে ম্লান ওই চাঁদের চাইতে অনেক দূরে — বহু আলোকবর্ষ দূরে ভাসছে এবং ঘুরছে অসংখ্য চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র। মহাজগতে সামান্য একটি গ্রহ পৃথিবী। সেই পৃথিবীর নগন্য জীব মানুষ। মানুষের চাওয়া এবং না চাওয়ার ওপর মহাজগতের এমনকী এই পৃথিবীর কিছুই নির্ভর করে না। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ধ্রুব নামে এক জন নির্বিকার আকাশের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। আবার তাকায় মহাকাশের দিকে। মহাবিশ্বে, নিয়মের রাজত্বে কিছু থেমে নেই। সব চলছে, ক্রমাগত ঘুরছে। কোনও তারার আলো নিভে যাওয়া নিয়মের বাইরের কোনও কিছু নয়। নিরপেক্ষ মহাবিশ্বে তুচ্ছ পৃথিবীগ্রহে অতি তুচ্ছ কীট-পতঙ্গেরে মতো কোনও মানুষের অস্তিত্ব বা বিলোপও কোনও বিশেষ ঘটনা নয়। নগণ্য এক গ্রহের কোটি কোটির মধ্যে ধ্রুবের —।

এই সময় পৃথা ঘরে ঢুকল দাঁত বার করে। ওর শরীরের ভেতরে এতক্ষণে শুক্রকীট আর ডিম্বকোষ মিলিত হয়েছে? আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, জলে স্থলে অসংখ্য পরিচয়হীন কৃমি-কীট-জীব বংশ বিস্তার করে চলেছে কেন? অসংখ্য ধূলিকণা অকারণে উড়ছে। চারদিক ঢেকে ফেলছে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। পৃথা এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরতে তার পিচ্ছিল শরীরের স্পর্শে আমার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যায়। আমার গলায় ভেতর থেকে অস্বাভাবিক চিৎকার বেরিয়ে আসে, বন্ধ করো, পৃথা বন্ধ করতে হবে।

বিহ্বল গলায় সে জিজ্ঞেস করে, কী, কেন?

হাত মুঠো করে প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলি, জন্ম বন্ধ করতে হবে।

পৃথার চোখে প্রথমে ভয় তারপর দুশ্চিন্তা ভেসে ওঠে। ওর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে থাকে। কৃত্রিম কি অকৃত্রিম জানি না, পৃথা কাঁদছে। আমি শুধু নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। আঃ ধ্রব, আমি কাঁদতে পারি না যে॥

শৈবাল মিত্র

চোখের কাজল ধেবড়ে গেলে

ধর্মতলা স্ট্রিটে, শেষ দুপুরে, কান্নায় চোখে কাজল ধেবড়ে যাওয়া মেয়েটাকে দেখে ভৃগুর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কেঁপে ওঠার কারণ ছিল। সে-কাহিনি বলার আগে মেয়েটাকে দেখে ভৃগু কী করল, বলা দরকার। ভৃগুর মনে হল, মেয়েটাকে সে চেনে। তাকে দেখার জন্য দেড় বছর ধরে অপেক্ষা করছে। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ না করে উপায় নেই। আলাপ করতেই হবে।

রাস্তায় যথেষ্ট লোক চলাচল থাকলেও মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, নির্জন রাস্তায় সে একা হেঁটে চলেছে। আশেপাশে কেউ নেই। ব্যস্ত রাস্তার আঁচ তাকে স্পর্শ করছে না। সে সবুজের ওপর হলুদ ডোরাকাটা তাঁতের শাড়ি, হলুদ-ব্লাউজ পরেছে। ছিপছিপে শরীর, ফর্সা রঙ, ভিজে চুলে বাঁধা দুটো লম্বা বিনুনি, পিঠে ঝুলছে। মুখটা গোল, খাড়া নাক, মাঝে মাঝে রুমালে চোখের জল মুছছে। যতবার মুছছে, তত ধেবড়ে ছড়িয়ে পড়ছে চোখের কাজল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ভৃগু বুঝল, মেয়েটা কাঁদছে। চোখের জল, চেষ্টা করেও আটকাতে পারছে না। মাঝ দুপুরে ভিড় রাস্তায়

BanglaBook.org

একুশ-বাইশ বছরের সুন্দরী মেয়েটা, কেন কাঁদছে, ভৃগু জানে। তার জানায় ভুল নেই। তবু যাচাই করতে চায়। যাচাই না করা পর্যন্ত রেহাই নেই। তারও কিছু পাওনা আছে। মেটানোর মতো একটা হিসেব আছে। মেয়েটাকে ভালো করে দেখতে উলটো দিকের বাস স্টপ ছেড়ে তার পেছনে ভৃগু এসে গেল। দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করল। দু'এক জন পথচারী মেয়েটার দিকে তাকালেও তার কান্না নজর করছে না। চোখের কাজল ধেবড়ে গিয়ে মুখে নেমে এলেও অসুন্দর দেখাচ্ছে না তাকে। বরং বালিকা মনে হচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, সৌন্দর্য নিয়ে ভাবার সময় তার নেই। বাতাসে ভর করে সে হেঁটে চলেছে। মেয়েটাকে না নিলেও তার কী হয়েছে, ভৃগু জানে। কিন্তু মেয়েটা যাচ্ছে কোথায় ? সামনে কোথাও হয়তো ওর বাড়ি। তালতলা অ্যাভিনু, ক্রিক রো কিংবা আশপাশে থাকে। নজর কাড়ার মতো করে সে সাজেনি। সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে। মাথায় অনেক চুল থাকলেও পরিপাটি করে বাঁধেনি। সাদামাটা দুটো বিনুনিতে পরিচর্যার ছাপ নেই। চোখে কাজল টেনে পাউডার ছিটিয়েছে শরীরে। ঘাড়ের ওপর পাউডারের ছোপ, ভৃগুর নজর এড়াল না।

শরৎ শেষ হতে চলেছে। গুমোট আবহাওয়া। মেয়েটার সঙ্গে ব্যবধান ভৃগু কমিয়ে এনেছে। কয়েক হাত দূরত্ব রেখে হাঁটছে। মেয়েটার কাছে সে ধরা পড়ে যেতে চায় না। মেয়েটা হাঁটছে নিজের ঘোরে। পেছনে কে রয়েছে, দেখার আগ্রহ নেই। পৃথিবী সম্পর্কে এত উদাসীন যে, পাশাপাশি কেউ হাঁটলেও তাকাবে না। ভৃগু তবু পাশে গেল না। ব্যবধান রেখে হাঁটতে থাকল। মেয়েটার কুচকুচে কালো বিনুনি, শাড়ি ঢাকা পিঠ, কোমর, কোমরের বেড় সে দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটা থেকে থেকে রুমালে চোখ মুছছে। চোখের জলে দৃষ্টি বোধহয় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অন্ধের মতো সে হেঁটে চলেছে। ভৃগু রয়েছে তার পিছনে। সে অনুসরণকারী। অনুসরণ না করে তার উপায় নেই। ঠিক মেয়েকে সে অনুসরণ করছে। দেড় বছর ধরে এ-রকম এক জনকে সে খুঁজছে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। মেয়েটাই এখন চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। ডান দিকের একটা বাড়িতে মেয়েটা ঢুকে পড়তে ফুটপাতের ওপর এক সেকেন্ডের জন্য ভৃগু দাঁড়িয়ে গেল। এত কাছে মেয়েটার বাড়ি, সে ভাবতে পারেনি। আলাপ করার আশা মাটিতে মিশে গেলেও কয়েক পা এগিয়ে এসে বাড়ির দরজায় ভৃগু দাঁড়াল। সাহেব আমলের বিরাট বাড়ি। আর্চের মতো গড়ন, উঁচু গেট। গেটে এক সময় দুটো লোহার পাল্লা হয়তো লাগানো ছিল। এখন নেই। সিমেন্টের চাতাল, গেট থেকে বাড়ির ভিতরে চলে গেছে। চাতালের শেষে একটা ডাকঘর, ভৃগু দেখতে পেল। ডাকঘরের ছাতের ওপর লুটিয়ে আছে সবুজ পাতাওলা আমগাছের ডাল। ডাকঘরের পাশে আমগাছ আছে। আরও কিছুগাছ থাকতে পারে। ফুটপাত থেকে ভৃগু দেখেছে তিন তলা বাড়ি। বাইরের দেওয়ালে ঝোলানো সাইনবোর্ড থেকে বোঝা যায় ভেতরে অনেক অফিস আছে। যাওয়া-আসার পথে হলুদ রঙের যে সাইনবোর্ডটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়েছে, তার ওপরে লাল হরফে লেখা, গভর্নমেন্ট জ্যোতিষী। গর্ভনমেন্ট জ্যোতিষীর মানে ভৃগু বুঝতে পারেনি। গভর্নমেন্ট কি জ্যোতিষের দপ্তর খুলল ? হতে পারে। জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়ে গভর্নমেন্ট চলছে, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। বড় হরফে লেখা গভর্নন্টে জ্যোতিষীর তলায় ছোট হরফে লেখা জ্যোতিষীর নাম, গুণপনার ফিরিস্তি পড়তে ভৃগু কখনও আগ্রহ বোধ করেনি। পড়ার ইচ্ছে আজ জাগলেও সময় নেই। চাতালের শেষ মাথায় বাঁ-দিকে কয়েক ধাপ উঠে মেয়েটা ডাইনে ঘুরল। ভৃগু পৌঁছে গেছে বাঁ-দিকের ধাপে। ডান দিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়িতে আলো কম। সিঁড়ি দিয়ে মেয়েটা দো-তলায় উঠছে। মেয়েটার পেছনে এখন ভৃগু ছাড়া কেউ নেই। দু-এক জন থাকলে ভালো হত। আড়াল পেতে ভৃগু। দো-তলা থেকে দু'জন লোক হুড়মুড় করে নেমে এল। তাদের দিকে মেয়েটা তাকাল না। মেয়েটার সঙ্গে দুটো সিঁড়ির তফাৎ রেখে যতটা সম্ভব কম শব্দ করে ভৃগু ওপরে উঠছে। সিঁড়ি যেন ফুরোচ্ছে না। বত্রিশটি শিঁড়ি ভেঙে মেয়েটা দো-তলায় পৌঁছল। এক

BanglaBook.org

তলা থেকে কয়েক জন উঠে আসছে। দো-তলায় উঠে মেয়েটা বাঁ-দিকে ঘুরতে ভৃগু সেখানে পৌঁছে গেল। ডাইনে-বাঁয়ে অলিগলির মতো করিডর। মানুষের গলা, টাইপরাইটরের খটাখট শব্দ নানা ঘর থেকে ভেসে আসছে। অনেক অফিসঘর আছে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে লোক যাচ্ছে। মেয়েটার পাশে চলে এসে ভৃগু এমন ভাবে হাঁটছে, যাতে তাকে দেখলে তরুণীর সঙ্গী মনে হয়। যতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে অনুসরণ শুরু করেছিল, এখন তা নেই। বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে তা কমতে শুরু করেছে। দো-তলায় উঠে গা ছম ছম করছে। করিডরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে মেয়েটা যদি এখন প্রশ্ন করে, আমাকে ফলো করছেন কেন, তাহলে সে কী জবাব দেবে? বিস্তর লোক জড়ো হয়ে যাবে। কিছু বলার সুযোগ সে পাবে না। তবু মাথার মধ্যে আত্মরক্ষার যুক্তি তৈরি হতে থাকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, গভর্নমেন্ট জ্যোতিষীর কাছে এসেছে। ভৃগু টের পেল কুল কুল করে সে ঘামছে। মেয়েটা তাকাচ্ছে না। ডান দিকে, বাঁ-দিকে দুটো বাঁক ঘুরে মেয়েটা যে-ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, সেখানে দরজার লম্বা পাল্লায়, কাঠের বোর্ডে লেখা রয়েছে, গভর্নমেন্ট জ্যোতিষী। লেখা দেখে ভৃগু চমকে গেল।

দরজার দুটো পাল্লা খোলা। উঁচু কাঠের চৌকাঠের ও-পাশে কাঠের পার্টিশন লাগানো বড় ঘর। লাল মেঝে। চেয়ার, সোফা, কৌচ পাতা সামনের ঘরটা দর্শনার্থীদের জন্য। পার্টিশনের ও-পাশের ঘরটা গভর্নমেন্ট জ্যোতিষীর চেম্বার। বসার ঘরে বেতের সেন্টার টেবিলের ওপর দর্শনার্থীদের নাম-ধাম লেখার জন্য দিস্তে বাঁধা স্লিপ। দর্শনার্থী নেই। দরজার পাশে টুলে বসে সাদা গোঁফওলা দারোয়ান ঢুলছে। মেয়েটার পায়ের শব্দে দারোয়ান জেগে উঠল।

উনি আছেন?

মেয়েটা জিজ্ঞেস করতে দারোয়ান বলল, হ্যাঁ। আপনি চলে যান।

মেয়েটা গেল না। সেন্টার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে স্লিপে নাম লিখতে লাগল। সহবত জানে। মেয়েটার কাঁধের ওপর দিয়ে স্লিপে লেখা তার নাম-ঠিকানা, স্নিগ্ধা সেন, টালিগঞ্জ — ভৃগু পড়ে নিল। বই থেকে স্লিপ আলাদা করে স্নিগ্ধার দু'চোখের পাতা জলে আধভেজা। পৃথিবীর কিছুই দেখছে না। চোখে যা পড়ছে, ছায়াছবি মনে হচ্ছে। ইট, কাঠ, পাথরের থেকে আলাদা লাগছে না। ভৃগুকে দেখে হয়তো কাঠের চেয়ার ভাবছে। স্নিগ্ধা দেখে ফেলতে ভৃগুর ভয় কমে গেল। ভালো করে স্নিগ্ধাকে দেখার সাহস পেল। রাস্তায় তাকে যতটা সুন্দরী মনে হয়েছিল, তার চেয়ে সে বেশি সুন্দরী। বাঁশির মতো নাকের ডান পাশে ছোট একটা তিল, পাতলা দুটো ঠোঁট, মাপা চিবুক, মসৃণ গলা, কোথাও খুঁত নেই। এত রূপসী মেয়ে কেন কাঁদছে ভৃগুর অজানা নয়। তার চোখের কাজল ধেবড়ে যাওয়ার কারণ সে জানে। মেয়েটাকে নিয়ে একটা হিসেব ফয়সালা করার আছে। ভৃগুকে আজই সেটা করতে হবে। স্নিগ্ধার চোখের ধেবড়ে যাওয়া কাজলের দিকে তাকাতে ভৃগুর বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চেম্বারের দরজা ফাঁক করে স্নিগ্ধাকে দারোয়ান বলল, ভেতরে যান।

স্নিগ্ধার সঙ্গে ভৃগু চেম্বারে ঢোকার সময়ে দারোয়ানকে নিচু গলায় বলল, এক সঙ্গে এসেছি।

ঘুমচোখে দু'জনকে দেখে বুড়ো দারোয়ান তাই ভেবেছিল। ভৃগুর কথা সে অবিশ্বাস করল না। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, চোখে চশমা, ছোটখাটো চেহারার গভর্নমেন্ট জ্যোতিষীর মুখোমুখি চেয়ারে, স্নিগ্ধার পাশে ভৃগু বসল। স্নিগ্ধা তাকাল না। প্রবীণ জ্যোতিষী, চশমার ফাঁক দিয়ে ভৃগুকে দেখে তাকে তরুণী ক্লায়েন্টের বয়ফ্রেন্ড ভাবল। ভাবতে অসুবিধে হল না। ভৃগুর বয়স এমন কিছু নয়। ত্রিশের মধ্যে চেহারা, মুখ-চোখ দেখে ভদ্রসন্তান না ভাবার কারণ নেই। ভৃগুকে জ্যোতিষী পাত্তা দিল না। স্নিগ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, আবার কী হল?

BanglaBook.org

কথা বলতে গিয়ে কান্নায় আটকে গেল স্নিগ্ধার গলা। সন্দিগ্ধ চোখে ভৃগুর দিকে এক সেকেন্ডে তাকিয়ে স্নিগ্ধাকে জ্যোতিষী বলল, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। ছকটা দেখি।

চামড়ার ব্যাগ খুলে ভাঁজ করা একটা হলুদ কাগজ জ্যোতিষীকে দিল স্নিগ্ধা। কাগজটা খুলে আতস কাচ দিয়ে কয়েক মুহূর্তে দেখে জ্যোতিষী বলল, রবির গোচরে শুক্র রয়েছে। কালসর্পযোগ কেটে গেল! আর ভয় নেই।

অভয় দিতে জ্যোতিষী একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে স্নিগ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গীর কি কিছু জানা আছে?

জ্যোতিষী কিছু বলল না। তার টেবিলে পেপার ওয়েটের তলায় দুটো দশ টাকার নোট রেখে স্নিগ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পেছনে ভৃগু। কালসর্পযোগে কেটে গেছে শুনেও স্নিগ্ধা বিষাদে ডুবে আছে। ভৃগুর দিকে তাকাল না। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে চাতাল পেরিয়ে রাস্তায় এসে এসপ্ল্যানেডের দিকে হাঁটতে থাকল। পাশে ভৃগু। সে বুঝতে পারছে সময় ঘনিয়ে এসেছে। চোখে কাজল ধেবড়ে গেলে এক জন মেয়ে যেমন আচরণ করে, স্নিগ্ধা তাই করছে। আচরণের পরের ধাপগুলো ভৃগু জানে। পরিচয়ের প্রাথমিক ঝুঁকি কেটে গেছে টের পেয়ে গুড় গুড় করছে বুক। রাস্তায় লোক বাড়ছে। স্নিগ্ধা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। ভৃগুর দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন ফলো করছেন আমাকে?

প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিল ভৃগু। জিভের ডগায় জবাবটাও ছিল। চোখে কাজল ধেবড়ে যাওয়া একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাতে দেড় বছরের বেশি অপেক্ষা করছে, বলল না। স্নিগ্ধার প্রশ্নে থতমত খাওয়ার ভান করে বলল, তোমার চোখে জল দেখে মনে হল, তোমার পাশে থাকা উচিত।

কথাটা শুনে তার দিকে স্নিগ্ধা তাকিয়ে থাকল। জিজ্ঞেস করল, সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ।

পথচলতি কেউ কেউ দু'জনকে দেখছে। আরও নির্ভুল বলতে হলে, স্নিগ্ধাকে দেখছে। দু'জনের কথা শোনার চেষ্টা করছে। ভৃগুর দিকে এক পা সরে গেল স্নিগ্ধা। ভৃগুর কথা শুনে তার চোখ দুটো আবার ছল ছল করছে। বলল, আমার বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। একটা ট্যাক্সি ধরে দেবেন?

ধর্মতলা স্ট্রিটে এই সময়ে খালি ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন জেনেও ভৃগু বলল, চলো।

এ-রকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ভৃগু। ট্যাক্সিতে স্নিগ্ধাকে একবার তুলতে পারলে যে কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। গ্র্যান্ড স্ট্রিট ধরে এস এন ব্যানার্জি রোডের দিকে হেঁটে চলেছে দু'জন। স্নিগ্ধার চোখে জল নেই। চিন্তায় ডুবে আছে। কী ভাবছে সে? ভৃগুর দিকে অন্যমনস্কের মতো দু'একবার তাকাল। স্নিগ্ধার ব্যথার জায়গাটা ভৃগু জানে। তার মুখ দেখে অনুমান করেই পিছু নিয়েছিল। স্নিগ্ধার চোট যা ভেবেছিল, তার চেয়ে বেশি। ভৃগুর ভাগ্য ভালো। একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ট্যাক্সির দরজা খুলে সরে দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধাকে উঠতে দিল। স্নিগ্ধা সিটে বসতে তাকে জিজ্ঞেস না করে ভৃগু ট্যাক্সিতে ঢুকে পড়ল। স্নিগ্ধা যেন জানত এ-রকম হবে। সামান্য সরে গিয়ে ভৃগুকে বসার জায়গা করে দিল। ভৃগু বলল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

ভৃগুর দিকে স্নিগ্ধা এমন ভাবে তাকাল, যেন সে তার অনেক কালের সখা। কৃতজ্ঞতায় জড়িয়ে যাচ্ছে দু'চোখের পাতা। চরম মুহূর্তটা এসে যাচ্ছে, বুঝতে ভৃগুর অসুবিধে হল না। উত্তেজনায় তড়বড় করছে বুক। ট্যাক্সি চলছে। স্নিগ্ধা বলল, বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না। পাড়ার লোক দেখবে। টালিগঞ্জ ব্রিজের তলায় নেমে যাব।

নরম চোখে ভৃগুর দিকে তাকিয়ে আছে স্নিগ্ধা। পরিপূর্ণ ভাবে তাকে দেখছে। পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। কালো চুল তামাটে দেখাচ্ছে। স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম?

BanglaBook.org

ভৃগু নাম বলল। স্নিগ্ধা চুপ। মনে মনে নামটা হয়তো উচ্চারণ করল। ভিড় রাস্তা ছেড়ে ট্যাক্সি রেড রোডে ঢুকেছে। সবুজ ময়দানের দিকে তাকিয়ে ফিশ ফিশ করে স্নিগ্ধা বলল, তাড়া না থাকলে এখন বাড়িতে যেতাম না।

এই মুহূর্তটার জন্য ভৃগু প্রতীক্ষা করছিল। আসল কথাটা এখনই বলার সময়। আধ ঘণ্টার জন্য কোথাও বসে চা খাওয়ার কথা বললে স্নিগ্ধা অরাজি হবে না। আধ ঘণ্টার জন্য নিয়ে গিয়ে এক-দেড়-দু'ঘণ্টা অনায়াসে কাটানো যায়। স্বেচ্ছায় থেকে যাবে স্নিগ্ধা। সময় কাটানোর মতো একটা ঠিকানা থাকলে এখনই তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। সে-রকম ঠিকানা ভৃগু ভেবে পাচ্ছে না। বিকেলের গোলাপি আলো ট্যাক্সির ভেতরে চকিতে ঢুকে পড়ে পরক্ষণে সরে যাচ্ছে। স্নিগ্ধা কিছু শোনার জন্য তাকিয়ে আছে ভৃগুর মুখের দিকে। চোখে কাজল ধেবড়ানো মেয়েটাকে দেখে যা যা ঘটার কথা ভৃগু ভেবেছিল, সব মিলে যাচ্ছে। স্নিগ্ধাকে নিয়ে এক-দু'ঘণ্টা সময় কাটানোর মতো একটা ঠিকানা তার জানা নেই। জায়গা ঠিক না করে এই অভিযানে নেমে ভুল করেছে। ভুল শোধরাতে হলে আরও একবার স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। স্নিগ্ধাকে নিয়ে তোলার মতো একটা জায়গা পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে জোগাড় করতে হবে। স্নিগ্ধার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে ভৃগু তুলে নিল। কী নরম, নিটোল হাত। স্নিগ্ধা হাতটা টেনে নিল না। বরং সমর্পণের ভঙ্গিতে এলিয়ে দিল। স্নিগ্ধার কব্জিতে কালো চামড়ার স্ট্র্যাপ লাগানো সোনালি ঘড়ি, সোনার চুড়ি। দু'জনের মাঝখানে ফাঁক ভরাট করতে স্নিগ্ধার দিকে ভৃগু একটু সরে বসল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কী দুঃখ তোমার?

স্নিগ্ধার দু'চোখ আবার ছল ছল করে উঠল। বলল, এক জন ভুল বুঝেছে আমাকে। তার ধারণা আমি যথেষ্ট নিষ্ঠাবতী নই। সে সন্দেহ করে আমাকে। তিন মাস আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না। কেন এমন ভাবল আমি জানি না। দু'মাস আগে গভর্নমেন্ট জ্যোতিষীর দেওয়া বশীকরণ তাবিজ পরেছি। সবুজ রুমাল ব্যবহার করছি। সবুজ, হলুদ কাপড় পরছি, কোনও কাজ হয়নি। বিষ খেতে হবে আমাকে।

স্নিগ্ধার দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে। চোখের জল দেখে ভৃগুর নরম হওয়ার কথা নয়। তবু সে নরম হল। দু'হাতে ধরা স্নিগ্ধার হাতের পাতায় আস্তে চাপ দিল। জিজ্ঞেস কর, কে সে? তার পেশা কী?

স্নিগ্ধা বলল, তার নাম দেবনাথ। স্কুলে পড়ায়।

সেই এক ঘটনা। প্রেমে ব্যর্থ একটা মেয়ের ভেঙে পড়ার কাহিনি। এ বিবরণ সে জানে। ব্যর্থ প্রেমের হৃদয়বিদারী কান্না তার অচেনা নয়। দেড় বছর ধরে সেই কান্না তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। চোখে কাজল ধেবড়ানো একটা মেয়েকে আজ মুঠোর মধ্যে পেয়ে নিরাপদ ডেরার অভাবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। আজ না পারলেও কাল পারবে। চোখের জলে ভিজে গেছে স্নিগ্ধার মুখ। ডান হাত দিয়ে তাকে বুকের কাছে ভৃগু টেনে নিল। রুমালে সন্তর্পণে তার দু'চোখ মুছে দিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। ঘন কালো চোখের পাতা বুজে স্নিগ্ধা স্থির হয়ে আছে। ঠোঁট সরাচ্ছে না। ট্যাক্সির যুগলমূর্তিকে রাস্তা থেকে ছুঁয়ে যাচ্ছে কৌতূহলী নজর। পলকের দেখা স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবার পরেও দু'এক জন ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে থাকছে। ফিস ফিস করে স্নিগ্ধা বলল, জীবন থেকে কিছু হারায় না। দেবনাথ গেল, ভৃগু এল। তুমি ছেড়ে যেও না আমাকে।

টালিগঞ্জ ব্রিজের তলায় স্নিগ্ধাকে ট্যাক্সি থেকে ভৃগু নামিয়ে দিল। ট্যাক্সিতে তোলার মতো, ট্যাক্সি থেকে নামানোর সময়েও খোলা দরজা ধরে সে দাঁড়িয়েছিল। চেনা লোকের চোখে পড়ার ভয় থাকলেও ট্যাক্সি থেকে নেমে স্নিগ্ধা নড়ল না। ট্যাক্সিতে উঠে ভৃগু চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল। চলন্ত ট্যাক্সি থেকে ব্রিজের নিচে দাঁড়ানো স্নিগ্ধাকে যতক্ষণ দেখা যায় ঘাড় ঘুরিয়ে ভৃগু দেখল।

সেই বিকেলে থেকে ছিপছিপে, ফর্সা, সুন্দর পোশাক পরা, মধ্য ত্রিশের অচেনা এক জন লোকের সঙ্গে ভৃগুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। লোকটা স্নিগ্ধাব প্রেমিক দেবনাথ নয়। সে আর এক জন লোক।

BanglaBook.org

তাকে ভৃগু দেখেনি। অথচ তার অস্তিত্বে সে মিশে আছে। দেড় বছর ধরে তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভৃগুর কাছে দেবনাথের কোনও গুরুত্ব নেই। স্নিগ্ধার প্রেমকাহিনিও জোলো। স্নিগ্ধাকে নিয়ে ভৃগুর অন্য হিসেব আছে। গত পাঁচ দিনে হিসেব মেটানোর আয়োজন পাকা করে ফেলেছে। আজ পঞ্চম দিনে বালিগঞ্জ লেকে লিলিপুলের ওপর বিকেল তিনটেয় স্নিগ্ধার সঙ্গে তার দেখা হবে। ট্যাক্সি থেকে নামার আগে সেই বিকেলে ভৃগু ঠিক করে নিয়েছিল দিনক্ষণ। পাঁচ দিনের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট ভৃগু জোগাড় করে ফেলেছে। সাত দিনের জন্য পাঁচশো টাকা আগম দিয়ে ফ্ল্যাটটা বেনামে নিয়েছে। অফিসের কাজে বাইরে যাওয়ার নাম করে একটা নতুন সুটকেসে কয়েকটা প্যান্ট, শার্ট ভরে পরশু বিকেল থেকে সেই ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে। দু'রাত সেখানে কাটানো হয়ে গেছে। স্নিগ্ধাকে আজ ফ্ল্যাটে আনবে। একটা দুপুর, দুটো-তিনটে দুপুর কাটিয়ে স্নিগ্ধার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। ছিপছিপে ফর্সা লোকটা যা করেছিল, ভৃগু তাই করবে। ঝিমলির জীবনে যা ঘটেছিল, স্নিগ্ধার তাই ঘটবে। বাইশ বছরের ঝিমলির মতো রান্নাঘরে ঢুকে শাড়িতে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে স্নিগ্ধা আত্মহত্যা করবে। ঝিমলির মতো মা-বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা বলার ব্যবস্থা স্নিগ্ধা নিশ্চয় করে যাবে। প্রাক্‌মৃত্যু চিরকুট লিখে রেখে যাবার বদলে অবিবাহিতা মেয়েটা এটুকু করে। ছোট বোন ঝিমলির লেখা কোনও চিরকুট তার মৃত্যুর পরে পাওয়া না গেলেও তার বইখাতা ঘেঁটে খয়েরি চামড়ার মলাট দেওয়া ছোট একটা ডায়েরির ভৃগু উদ্ধার করেছিল। দিনপঞ্জি লেখার ডায়েরি নয়। কিছু বইয়ের তালিকা, কয়েক জন সহপাঠিনীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সেখানে লেখা ছিল। ডায়েরিতে আরও কিছু তথ্য ছিল। সেই তথ্য হাতড়ে ছিপছিপে ফর্সা এক জন লোকের ভূমিকা বুঝতে ভৃগুর অসুবিধে হয়নি। ঝিমলির মৃত্যুর পরে পাঁচ-সাতবার ডায়েরির পাতায় চোখ বুলিয়ে যা বুঝেছিল, গত পাঁচ দিনে পঞ্চাশ বার পড়ে তার বহু গুণ বেশি বুঝেছে। দেড় বছরের ব্যবধানে বুঝতে পেরেছে ঝিমলির লেখা শব্দগুলোর তলায় একের বেশি অর্থ আছে, অর্থের আড়ালে আছে রহস্য আর সঙ্কেত। ঝিমলির ডায়েরি পড়ার আগে জেনেছিল, চোরা কাঁটায় মেয়েটা জড়িয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বাইশ বছরের ঝিমলিকে বছর দুই আগে কাজল ধেবড়ানো ভিজে চোখে বাড়ি ফিরতে দেখে ভৃগু অবাক হয়েছিল। সন্ধের চাপা আলোয় তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঝিমলি ঢুকে গিয়েছিল। সিঁড়িতে দাদার মুখোমুখি হবে ভাবেনি। দাদার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে কয়েক দিন পরে তাকে শুনিয়েছিল নিজের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়া প্রেমিক বছরভর তার সঙ্গে মেলামেশা করে প্রেমিকা বদলেছে। ঝিমলিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ভৃগু টের পেয়েছিল, তার ব্যর্থ প্রেমের ক্ষত ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। সে নতুন প্রেমিক পেয়ে গেছে। ঘটনাটা জেনে ভৃগু খুশি হয়েছিল। নতুন প্রেমিকের চেহারা, স্বভাব নিয়ে দু'একটা কথা বললেও তার নাম ঝিমলি জানায়নি। বাকি বিবরণ তার মৃত্যুর পরে ডায়েরি পড়ে ভৃগুকে জানতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাঝদুপুরে বাড়ি ফেরার পথে চোখে কাজল ধেবড়ে যাওয়া ঝিমলিকে বঁড়শিতে গেঁথে সেই লোকটা কী-ভাবে ডাঙায় তুলেছিল, সে-বিবরণ ডায়েরিতে ঝিমলি লিখে রেখে গেছে। ঝিমলিকে লোকটা চিনেছিল তার চোখের কাজল দেখে। অনায়াসে তাকে টোপ গেলাতে পেরেছিল।

ডায়েরিতে খুঁটিনাটি নানা তথ্য ঝিমলি রেখে গেছে। ছিপছিপে লোকটা বলেছিল, তার বোনকেও চোখের ধেবড়ে যাওয়া কাজল দেখে রাস্তা থেকে অচেনা এক জন লোক তুলে নিয়েছিল। সেই লোকটাও তার বোনকে নিয়ে একই কাহিনি শুনিয়েছিল ঝিমলির অজ্ঞাতপরিচয় প্রেমিকের বোনকে। ঝিমলি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যেতে ভাড়াটে বাসা ছেড়ে লোকটা উধাও হয়। আন্দাজে দু'একটা ঠিকানায় তার খোঁজ করেছিল ঝিমলি। পায়নি। ঝিমলিকে ষোলোআনা আশ্বাস দিয়ে লোকটা বাতাসে মিলিয়ে গেল। তার মারাত্মক কিছু তথ্য ডায়েরিতে ঝিমলি নথিবদ্ধ করেছে। ঝিমলিকে সে কয়েক বার বলেছে, তোমার দাদাও এখন এই খেলায় মেতে আছে। প্রত্যেকে বুঝে নিচ্ছে নিজের হিসেব।

BanglaBook.org

ঘটনা যে অঙ্কের নিয়মে এগোচ্ছে, ঝিমলিকে অভয় দিতে এক-থা সে বলত। দু'মাসে সাতবার নিজের ফ্ল্যাটে ঝিমলিকে সে নিয়ে গিয়েছিল। ঝিমলির ডায়েরিতে সেই সাতটা তারিখ ঘিরে লাল কালিতে হরতন চিহ্ন আঁকা আছে। হরতন মানে, হার্ট। লোকটার নাম, ঠিকানা ডায়েরিতে ভৃগু পায়নি। পেলে কী করত জানে না। তবে সেই থেকে চোখে কাজল ধেবড়ে যাওয়া একটা মেয়েকে খুঁজছে।

তিনটের আগে লেকে লিলিপুলের কাছে ভৃগু চলে এল। লিলিপুলের পশ্চিম দিকে একটা গাছে মোটা গুঁড়ির আড়ালে এমন ভাবে বসল, পুলে আসার রাস্তাটা সে দেখতে পেলেও সেখান থেকে তাকে দেখা না যায়। ঝাঁকড়া গাছ। ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে তলায়। দূর থেকে যতটা নির্জন মনে হয়েছিল, কাছে এসে দেখল তা নয়। ঝোপের পাশে, গাছের গুঁড়ির পেছনে কয়েক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা বসে আছে। নিজেদের নিয়ে তারা মশগুল। অন্য দিকে তাকাচ্ছে না। মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলেছে আকাশে। মুহূর্তে পালটে যাচ্ছে গাছপালার রঙ। সবুজ কখনও ঘন, কখনও হালকা হচ্ছে। তিনটে বাজার পাঁচ-সাত মিনিট পরে সাদার্ন অ্যাভিনুর দিক থেকে স্নিগ্ধাকে আসতে দেখল ভৃগু। রীতিমতো সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে। সোনালি পাড়ের ফিকে লাল তাঁতের শাড়ি পরেছে। সেই রঙের ব্লাউজ। পরিপাটি করে খোঁপা বেঁধেছে। লম্বা গ্রীবা আরও চকচকে লম্বা দেখাচ্ছে। চোখের তলায় কাজলের রেখা। এই স্নিগ্ধা, চোখে কাজল ধেবড়ে যাওয়া সেই স্নিগ্ধা নয়। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েও ভৃগু দাঁড়িয়ে পড়ল। স্নিগ্ধাকে এ চেহারায় সে দেখতে চায়নি। কালিঘাটের ফ্ল্যাটে একে নিয়ে যাওয়া যায় না। অসুবিধে কী? প্রশ্নটা মনে জাগলেও ভৃগু জবাব পেল না। তার একটা হিসেব আছে। হিসেব বুঝে নেওয়ার এমন মওকা আর না-ও পেতে পারে। মওকা পেলে কাজে লাগানোর মতো অবস্থা থাকবে কি না সন্দেহ। কোথায় ফ্ল্যাট পাবে তখন? অফিস থেকে ছুটি নেওয়া কম ঝামেলা নয়। অফিসের বাহানা দেখিয়ে কয়েক দিন বাড়ির বাইরে কাটাতে হবে। স্নিগ্ধার জন্য এতা ঝকমারি সয়ে এখন পিছিয়ে যাওয়া যায় না। কেন পেছবে?

গুড় গুড় করে মেঘ ডাকল। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। ঝড় উঠতে পারে। বৃষ্টি নামা অসম্ভব নয়। সাদার্ন অ্যাভিনু ছেড়ে লেকের মধ্যে স্নিগ্ধা ঢুকে পড়েছে। গাছের পাশ থেকে ভৃগু নড়তে পারছে না। অথচ তাকে বেরোতে হবে। লিলিপুলের ওপর না দেখে দু'পাশে একটু ভালো করে তাকালে স্নিগ্ধা দেখতে পাবে তাকে। ধরা পড়ে যাওয়ার আগে গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ। লিলিপুলে স্নিগ্ধা পৌঁছনোর আগে সেখানে তার হাজির থাকা উচিত।

ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি নিয়ে কালিঘাটের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। পৃথিবী ভেসে গেলেও তাদের খোঁজ করতে কেউ সেখানে আসবে না। তার সঙ্গে ফ্ল্যাটে ঢুকতে স্নিগ্ধা আপত্তি করবে না। মনের দিক থেকে তৈরি হয়ে সে এসেছে। চোরের মতো লুকিয়ে তাকে দেখতে ভৃগুর লজ্জা করছে। গাছের আড়াল থেকে বেরোনোর মুহূর্তে মাথায় এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতে ভৃগু দাঁড়িয়ে গেল। বৃষ্টি নামতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। ভৃগুর হঠাৎ মনে হল কালীঘাটের ফ্ল্যাটে না গিয়ে স্নিগ্ধাকে নিয়ে এখন বাড়িতে গেল কেমন হয়? স্নিগ্ধাকে দেখে মা-বাবা অবাক হবে। খুশি কম হবে না। ভাববে, ঝিমলি এল কোথা থেকে? হারানো মেয়েকে কাছে পেয়ে তারা হয়তো ছাড়তে চাইবে না। তাকে আদর করে মা পাশে বসাবে। বাড়ির ঠিকানা নেবে। তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে বলবে, আপনাদের মেয়েটিকে আমরা চাই। আমাদের একটা ছেলে আছে। তার নাম ভৃগু, সে ইঞ্জিনিয়ার। ভালো চাকরি করে। ছেলে হিসেবে খারাপ নয়।

তারপর? গাছের পাশ থেকে বেরোতে গিয়ে ভৃগু দেখল, ছাতা হাতে, ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক গম্ভীর যুবক হন হন করে স্নিগ্ধার দিকে এগিয়ে আসছে। তার চোখে মোটা কাচের চশমা। উচুঁ গলায়

নাম ধরে স্নিগ্ধাকে সে ডেকে উঠল। স্নিগ্ধা তাকাল। ঘাড় ঘুরিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। চশমা পরা গম্ভীর মুখে হাসল। কত বয়স মানুষটার? ভৃগুর মনে হল, তার সমান, দু'এক বছরের বড় হতে পারে। স্নিগ্ধার দিকে গম্ভীর-মুখ দ্রুত এগিয়ে আসছে। রাস্তার মাঝখানে গাছের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধা। মাটিতে আটকে গেছে। লিলিপুলের দিকে এক পা এগোতে পারছে না। পোশাক আর চশমা দেখে মানুষটা যে দেবনাথ, চিনতে ভৃগু ভুল করল না। চেহারা, পোশাক, হাবভাবে ষোলো আনা শিক্ষক। দেবনাথের হাসি দেখে ভৃগু বুঝতে পারল, তার রাগ পড়ে গেছে, স্নিগ্ধাকে নিয়ে সন্দেহ আর নেই। ভৃগুর মনে হল, গাছের আড়াল থেকে এখনই তার আত্মপ্রকাশ করা উচিত। দেবনাথের হাতে স্নিগ্ধাকে সে তুলে দিতে পারে না। তার অস্থির শরীর কাঁপছে। তবু সে সামলে নিল নিজেকে। চোখে কাজল ধেবড়ে যাওয়া যে-মেয়েটাকে পাঁচ দিন আগে দেখেছিলে, আজ সে নেই। ভৃগু কেমন নিস্তেজ বোধ করল। স্নিগ্ধাকে দেবনাথ কিছু বলছে। অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এলেও কথাগুলো ভৃগু শুনতে পাচ্ছে না। নিশ্চয় স্নিগ্ধার মন ভাঙাতে চাইছে দেবনাথ। বলছে, কী-ভাবে লেকের ধারে তার হদিশ পেল। তার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে যাওয়ার পথে বাস থেকে তাকে দেখতে পেয়ে সাদার্ন অ্যাভিনুতে নেমে পড়েছে।

ভৃগু অনুভব করল, ধীরে ধীরে খালি হয়ে যাচ্ছে তার বুক। জোরে সে শ্বাস টানতে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। ছাতা খুলে হাতের পাশে স্নিগ্ধাকে কাছে টেনে নিল দেবনাথ। অঝোর বৃষ্টির আড়ালে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে একটা ছাতা, ছাতার নিচে দুটো শরীর। গাছের পাশ থেকে ভৃগু বেরিয়ে এল। বৃষ্টিভেজা এই অন্ধকারে পেছনে তাকালেও স্নিগ্ধা এখন তাকে দেখতে পাবে না॥

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

শঙ্খচূড় ও তুলসী

মুহূর্তে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন শঙ্খচূড়, অবশ হয়ে গেল সমস্ত শরীর। কাল মধুমাস। মলয় সমীরণ বইছে ধীরে। বদরিকাশ্রমের প্রতিটি বৃক্ষে বসন্তের প্লাবন এসেছে ফলে, ফুলে, নতুন পল্লবে। ফুলের ওপর মধুকরের নিবিড় গুঞ্জরণ। গাছে গাছে বিভিন্ন পাখির কূজন। মাথার ওপর নীলাকাশ। শান্ত প্রকৃতি বসন্তকে বরণ করার জন্য উপস্থিত। এমন সময়ে শঙ্খচূড় কেন যে বদরিকাশ্রমে এলেন, তিনি নিজেই জানেন না। কিন্তু আসার পর বুঝতে পারছেন এখানে আসা তাঁর সার্থক। এমন একটি রমণীরত্নের সাক্ষাৎ পাবেন বলেই তপশ্চর্যায় দেব ও দানব বিজয় করার অভয়মন্ত্র লাভ করার পর এই বরণীয় আশ্রমে তিনি আসতে যাবেন কেন! অতুল ঐশ্বর্য দিয়ে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন তাঁর নগর। সেখানে প্রত্যাবর্তনই তো ছিল প্রত্যাশিত।

প্রথম আবেগের তরঙ্গ সামান্য প্রশমিত হতে দ্বিতীয় বার ভালো করে দৃক্‌পাত করলেন শঙ্খচূড়।

আগে শুধু সুন্দরই মনে হয়েছে, এখন মনে হল এই নারী ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ কামনার ধন। যে-কোনো দেবতাও স্বর্গসুখ ত্যাগ করে এর সঙ্গ কামনা করবে অনায়াসে।

আঁখিপল্লব মুদ্রিত সেই নারীর। মুখমণ্ডল শরৎকালের চন্দ্রের মতো মনোরমা, চোখ দু'টি পদ্মকলির মতোই সুন্দর। সুপক্ক, বিম্বফলের মতো রক্তিম তার অধরোষ্ঠ। হাত এবং পায়ের পাতাও রক্তিম। নিম্ননাভি, অসাধারণ দেহভঙ্গিমা। গায়ের রঙ গোলাপের মতো, একরাশ কুঞ্চিত কালো কেশ মুখমণ্ডলকে

BanglaBook.org

আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কেবল চন্দনের সুরভিতেই যে সে নিজেকে মোহময়ী করে তুলেছে তাই না, গায়ে রত্নালঙ্কারও তার কম নেই। বহুমূল্য মকরাকৃতি এক রত্নহার তার রতিনিন্দিত স্তনযুগলের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। কেয়ূর, কাঞ্চন আর অঙ্গুরীয়তে নিজেকে সে অপরূপা করে তুলেছে।

শঙ্খচূড় অবশ পায়ে ধীরে ধীরে সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, আবিষ্ট স্বরে বললনে, কে তুমি রমণী। এই অরণ্যে প্রবেশ করেছ কী কারণে?

চোখ মেলে চাইল নারী। যেন চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারা প্লাবিত করে দিল শঙ্খচূড়ের সমগ্র চেতনা। এক রমণীয় কামমেদুরতায় কম্পিত হচ্ছিল সারা দেহ। উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিলেন, কিন্তু উত্তর দেবার মতো অবস্থায় যে নেই সেই নারী, সে-কথা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। অরণ্যে এসেছিল সে তপস্যা করতে, ছিল একটা আবেগের মধ্যে, অকস্মাৎ চোখ খুলে যাঁকে দেখেছে তাতে বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছিল না তার।

দেবতা? কিন্তু কোন দেবতা? তাঁদের কল্যাণে অনেকেরই তো দর্শন সে পেয়েছে, কিন্তু এমন অপরূপ সুন্দর কান্তি আগে কোনো দিন প্রত্যক্ষ করেছে বলে তো মনে পড়ে না। আহা, কী অনিন্দ্যসুন্দর দেহ! শক্তিমত্তা এবং লাব্যণ্যের যুগল সম্মিলন যেন। সাদা চাঁপাফুলের মতো গায়ের রঙ, নানা অলঙ্কারে সজ্জিত। গণ্ডদেশে রত্নকুণ্ডল, গলায় পারিজাত ফুলের মালা, সারা দেহে কস্তুরী এবং কুমকুম। চন্দনের সুগন্ধ এঁর সর্বাঙ্গে।

আমি তোমাকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শঙ্খচূড় বললেন মৃদুভাষে। তার আগে আপনার পরিচয় জানাই কি আমার উচিত নয়! ফুল্ল অধরপুট ঈষৎ পৃথক হল সেই নারীর, বলল, অরণ্যে একাকিনী নারীর সান্নিধ্য কামনা কি শোভন?

তোমাকে এমন অরণ্যে প্রত্যাশা করা যায় না বলেই এ প্রশ্ন করেছিলাম, শঙ্খচূড় বললেন, কোনো অসদুদ্দেশ্য আমার ছিল না।

নিঃসন্দেহ নই আমি। আমি তো বিপন্ন হয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিনি।

তাহলে আমার উদ্দেশ্য তুমি অনুমতি দিলেই ব্যক্ত করতে পারি।

তার পূর্বে আপনার পরিচয় ব্যক্ত করবেন কি?

অবশ্যই। আমি দানব বংশের অধিপতি শঙ্খচূড়। আমার মনে একটি সুপ্ত বাসনা ছিল। সেই বাসনা যাতে পূর্ণ হয় সেই কারণে ঋষি জৈগীষব্যের কাছে আগে লাভ করি কৃষ্ণমন্ত্র, তারপর পুষ্কর তীর্থে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে দেবতা-দানব বিজয়ী এই সর্বমঙ্গল কবচ লাভ করি যা তুমি আমার মধ্যে দেখছ। ব্রহ্মার কাছে আমার বাসনাপূর্তির বর লাভ করেই আমি এসেছি এই বদরিকাশ্রমে।

কী সেই বর, অনুগ্রহ করে বলবেন?

তোমাকে গোপন করার মতো কিছুই নেই আমার, শঙ্খচূড় বললেন, ব্রহ্মার কৃপায় আমি জাতিস্মর। পূর্বজন্মে আমি ছিলাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বান্ধব সুদামা। রাধার এক প্রধানা সহচরীর প্রতি আমি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ি। এতে রাধা আমার প্রতি কুপিত হয়ে আমাকে যে অভিশাপ দেন তার ফলেই মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করতে হয় আমাকে। ব্রহ্মা আমাকে বর দিয়েছেন সেই গোপিনীকেই আমি স্ত্রী হিসাবে লাভ করব।

তাহলে আপনি আমার সান্নিধ্য কামনা করছেন কেন?

জানি না সুন্দরী, যে মুহূর্তে তোমাকে দর্শন করেছি, আমার সমস্ত তপস্যা, সব সংকল্প কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না প্রিয়ে।

জানি না বিধির এ কী নির্বন্ধ, নারী বলল, পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন না? আমি রাজা ধর্মধ্বজের কন্যা, তুলসী। আমিও বদরিকাশ্রমে এসেছিলাম তপস্যা করতেই। উদ্দিষ্ট স্বামীলাভই ছিল আমার

BanglaBook.org

ব্রত। ব্রহ্মার বরে পূর্বজন্মের কথা আমিও স্মরণ করতে পেরেছি। আমি ছিলাম গোলোকে ভগবান কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। জানি না সেই কারণেই কিনা, রাধা আমাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করবার জন্য। এই জন্মেও কিন্তু আমি কঠোর তপস্যা করেছি এবং ব্রহ্মা আমাকে বর দিয়েছেন, স্বয়ং নারায়ণকেই আমি পাব আমার স্বামী হিসাবে।

হায় প্রিয়ে! আমাদের দু'জনেরই অভিলাষ তবে আমাদের অভীষ্ট স্বামী ও স্ত্রী লাভ কারার! অথচ এমনই অদৃষ্ট, আমরা বাঁধা পড়েছি এমন এক প্রণয় ডোরে যা ছিন্ন করা অন্তত আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার পক্ষেও সম্ভব নয় বোধহয়, তুলসী বলল, অথচ ব্রহ্মার বর বিস্মৃত হতে না পারলে আমি সাধ্বী স্ত্রী হব কী করে!

নারীর চোখে অশ্রুবিন্দু মুক্তার মতো থক থক করছিল। শঙ্খচূড় বললেন, না প্রিয়ে, আমার তপস্যার ধন আমি বিসর্জন দিতেও রাজি, কিন্তু তোমার অদর্শন আমার সহ্য হবে না। তোমাকে না পেলে সারা জীবন তোমার ধ্যান করেই আমি অতিবাহিত করব। তোমাকে ভালেবেসে ফেলেছি বলেই এ-কথা তোমাকে বলতে পারব না যে, স্বয়ং নারায়ণকে স্বামী হিসাবে পাবার বর প্রত্যাখ্যান করে তুমি আমাকে গ্রহণ করো।

কিন্তু আমি যে আমার মনপ্রাণ আপনাকেই সমর্পণ করেছি। তুলসীর কপালে চন্দন সুরভিত স্বেদবিন্দু ভোরের শিশিরের মতো থক থক করছে, হাত জোড় করে ব্রহ্মাকে স্মরণ করে বলল, এ কী পরীক্ষায় তুমি আমাকে ফেললে প্রভু! আমার প্রিয়তমকে ফিরিয়ে দিয়ে যদি স্বয়ং নারায়ণের কাছেও আমি যাই, আমি তো দ্বিচারিণী হব দেব!

শঙ্খচূড়ের মাথা নত আসন্ন বিচ্ছেদের কথা কল্পনা করে। তুলসীর পেলব কপোলে দুর্লভ মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু। দু'জনেই জানেন, দু'জনের আরাধ্য অন্য কেউ, অথচ এই মুহূর্তে পরস্পরের বিচ্ছেদ অপেক্ষা মৃত্যুও অধিকতর কাম্য। এই কঠিন সমস্যায় ভারাক্রান্ত দুই হৃদয় যখন বিসীর্ণ বেদনায় কাতর, সহসা এই অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

বদরিকাশ্রমের আকাশ-বাতাসে ধ্বনিত হল মধুর বীণাধ্বনি, সেই সঙ্গে স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর, নারায়ণ! নারায়ণ!

পর মুহূর্তেই নারদ উপস্থিত হলেন ব্রহ্মাকে সঙ্গে করে।

সমগ্র বনানী আলোয় উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। চতুরানন ব্রহ্মা স্মিত হাস্যে তাঁর কমণ্ডলু থেকে শান্তিবারি প্রক্ষিপ্ত করলেন শঙ্খচূড় ও তুলসীর মস্তকে। শঙ্খচূড় ও তুলসী শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম করে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বললেন।

ব্রহ্মা বললেন, তুলসী, তুমি কি জানো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? দেবতা ও দানবত্রাস রাজা শঙ্খচূড়ের তুল্য পুরুষরত্ন মর্ত্যধামে এখন আর এক জনও নেই। আর শঙ্খচূড়, তুমিই কি জানো তুলসীর পরিচয়? নারীসমাজে তুলসীর তুল্য রমণী দেবতাদের কাছেও ঈর্ষার কারণ। তোমরা উভয়ে উভয়কে দর্শন করেছ, উভয় উভয়ের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমাসক্ত, তার পরও পরস্পরকে গ্রহণ করতে তোমাদের দ্বিধার কারণ কী?

দ্বিধার কারণ তো আপনার অগোচর নেই দেব, শঙ্খচূড় বললেন, গোলোকে যে গোপবালাকে কামনা করার অপরাধে আমাকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের অভিশাপ স্বীকার করতে হয়েছিল, আপনার আশীর্বাদ কি ব্যর্থ হতে পারে প্রভু?

ব্যর্থ হয়েছে, সে-কথা তুমি ভাবছ কেন! ব্রহ্মা নারদের মৃদু হাস্য একবার অবলোকন করে নিলেন, তারপর কৌতুকস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, গোলোকে সেই গোপবালাই এ জন্মে ধর্মধ্বজ ও মাধবীর কন্যা তুলসী হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

BanglaBook.org

কী বলছেন প্রভু! এই নারীই তবে —।

হ্যাঁ, গোলোকে তোমার প্রেমিকা। জন্মান্তরের সাধনায় তুমি তাকে অর্জন করেছ।

সীমাহীন পুলকের উচ্ছ্বাস সংবরণ করা প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠছিল শঙ্খচূড়ের, কিন্তু তা প্রতিহত হল তুলসীর কথায়। তুলসী ব্রহ্মাকে বলছিল, ইনিই জন্মান্তরের সুদামা জানতে পেরে আমার হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হচ্ছে দেব, কিন্তু আপনি যে বর দিয়েছেন স্বয়ং নারায়ণকে আমি পাব।

অবশ্যই পাবে।

কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হবে প্রভু! এঁকে স্বামীত্বে বরণ করে নিলে —।

স্তব্ধ হও তুলসী, এতক্ষণ পরে কথা বললেন নারদ, বললেন, কী করে কী হয়, কেমন করে কোন ঘটনা ঘটে সে তো দৈবাধীন ব্যাপার, তোমার তো তা জানার প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার অকৃত্রিম প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হও।

হ্যাঁ, সতী তুলসী, সেই অনুমতি দেবার জন্যই এখানে অবিভূর্ত হয়েছি আমি। কোনো সংশয় রেখো না মনে — যেমন হিমালয়ের সঙ্গে মেনকা, অত্রির সঙ্গে অনসূয়া, বশিষ্ঠের সঙ্গে অরুন্ধতী, কর্দমের সঙ্গে বেদহুতি, তেমনি তোমরাও দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হও, তাতেই আমার বর সার্থক হবে।

এরপর কি আর সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ কোনো বাধা মানে!

ব্রহ্মার নির্দেশ মতো গান্ধর্বমতে বিবাহ হয়ে গেল তুলসী ও শঙ্খচূড়ের। স্বর্গে বেজে উঠল দুন্দুভি। আকাশ থেকে বর্ষিত হল পুষ্পবৃষ্টি।

প্রেমের জোয়ারে শুধুই ভেসে চলা এরপর। নিজের প্রাসাদে ফিরে এসেছিলেন শঙ্খচূড়, কিন্তু এই দুর্লভ সাধনার ধনকে গৃহকোণেই শুধু মিলনে সীমিত রাখলে এই অপরূপ রূপমাধুরীর অবমাননা করা হবে, এই ভেবে নিয়ে গেলেন তাকে সর্বপ্রকার বিলাসের সামগ্রীসজ্জিত তপোবনে। কখনো জনপ্রাণীশূন্য রমণীয় কুটিরে, কখনো ফুলচন্দনের বায়ুতে সুরভিত শয্যায় গ্রহণ করলেন তাকে। নিবিড়তম আনন্দে তাঁদের পার্থিব চৈতন্যই যেন লুপ্ত হয়ে গেল। কত দিন, কত দীর্ঘ সময় উভয়ে এই নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন, কেউ তা বলতে পারবেন না।

অবশেষে একসময় শয্যা ত্যাগ করলেন তাঁরা। শঙ্খচূড়ের নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তুলসী কুমকুম ও চন্দনের তিলক এঁকে দিল তাঁর কপালে। সর্বাঙ্গ লিপ্ত করে দিল গন্ধদ্রব্য দিয়ে। সুগন্ধি তাম্বুল, আগুনের মতো উজ্জ্বল দু'টি বস্ত্র, পারিজাত পুষ্প ও পারিজাতের মালা, অতি দুর্লভ তিনটি মণি এবং এক অনুপম অঙ্গুরীয় শঙ্খচূড়কে দান করে তাঁকে প্রণাম করল, বলল, আমি তোমার দাসী।

জড়িয়ে ধরলেন শঙ্খচূড় তাকে প্রশস্ত বক্ষদেশে। গভীর আশ্লেষে পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠে একটি গাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করে বললেন, আমারও যে কিছু বলার আছে তোমাকে।

সেই রকমই আগুনের মতো উজ্জ্বল দু'টি বস্ত্র পেয়েছিলেন বরুণ দেবতার কাছ থেকে, সেই বস্ত্র, তাঁর কাছেই উপহার পাওয়া রত্নহার, স্বাহার কাছে পাওয়া নূপুর, ছায়ার কাছ থেকে আনা কেয়ূর, রোহিনী, রতি ও বিশ্বকর্মার কাছ থেকে পাওয়া দুর্লভ দ্রব্যসামগ্রী তুলে দিলেন তার হাতে। নিজে হাতে তার কপালে এঁকে দিলেন সুগন্ধি চন্দন দিয়ে তিনটি চাঁদের রেখাযুক্ত চিত্রিত পাতা। দুই পায়ে যত্ন করে এঁকে দিলেন অলক্তক রেখা, তারপর চরণ দু'টি নিজের বুকে চেপে ধরে বললেন, আমি তোমার দাস।

দু'জনের নিবিড় মিলন যেন হয়ে উঠল অন্তহীন। তুলসীর রমণীয় সান্নিধ্য ছাড়া শঙ্খচূড়ের যেন আর কিছুই কাম্য নেই জীবনে। তৃপ্ত হওয়া দূরে থাক, তৃষ্ণা যেন কেবল বাড়তেই লাগল বক্ষজুড়ে। কখনো চলে যান মলয় পর্বতে, কখনো সিন্ধুতীরে, কখনো-বা নন্দনকানন সদৃশ কোনো পুষ্পবনে।

BanglaBook.org

মনে তখন অনন্ত বসন্ত বিরাজিত। তুলসীর কাছে শঙ্খচূড়ময় এই জীবন, শঙ্খচূড়ের কাছে তুলসীময় সংসার। একবার ফিরে এলেন শঙ্খচূড় নিজের নগরে। রাজ্যশাসনের কাজকর্ম হয়ে পড়েছে শিথিল, মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, আপনারা বুদ্ধি বিবেচনা মতো যা কর্তব্য মনে করেন করুন। কুল-পুরোহিত ছুটে এলেন, পূজা-অর্চনা যাগযজ্ঞ যে প্রায় বন্ধ হয়ে এল! শঙ্খচূড় হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, আমি দেবতাজয়ী রাজা, দেবতাদের পূজা করার কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্ত রকমের পূজা, হোম বন্ধ করে দিন। তাঁদের বাসস্থান আমি অধিকার করে নেব, ভিখারির মতো তাঁরা ঘুরে বেড়াবেন মুনিদের আশ্রমে। তুলসীর রমণীয় সান্নিধ্য ছাড়া এখন আর কিছুই উপভোগ করতে চাই না আমি।

দেবতাদের এই দুর্দশার খবর চলে গেল ব্রহ্মার কাছে। দেবতারা আশ্রয়চ্যুত, তাঁদের তেজ অপহৃত হতে শুরু করেছে। দেবতা-দানবত্রাস শঙ্খচূড় তাঁদের খাদ্য পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। এই অবস্থা বেশি দিন চললে দেবতারা পটে আঁকা ছবির মতোই তেজশূন্য হয়ে পড়বেন। এর আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হল, প্রতিবিধান হবে কেমন করে! স্বয়ং নারায়ণ শঙ্খচূড়কে দান করেছেন সর্বমঙ্গল কবচ, এই কবচ ধারণ করলে জগৎ-সংসারে পরাভূত করার মতো কেউ থাকে না, কোনো দেবতাও তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আবার তুলসীর সতীত্ব। এ-রকম সাধ্বী স্ত্রীর স্বামীর কোনো ক্ষতি করা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব।

ব্রহ্মা এলেন মহেশ্বরের কাছে, দু'জনে গেলেন বিষ্ণুর কাছে। উপায় একটা তো বার করতেই হবে, নতুবা দেবতাদের সমূহ বিপদ। দেবতারা সম্মিলিত ভাবে অনুরোধ জানাতে পারতেন শঙ্খচূড়কে, কিন্তু নিজের অসীম শক্তি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন, জীবনযাপনে সর্বদাই সাত্ত্বিক আচরণ করে থাকেন, কাজেই তিনি যে কোনোভাবেই এতে সম্মত হবেন না, নিশ্চয়ই করে বলা যায়। তার চেয়েও বড়ো কথা, জীবনে তিনি যে মহানন্দের সন্ধান পেয়েছেন তাতেই তিনি এমন উন্মত্ত যে কোনো রকম মন্ত্রণা করার সময়ই তাঁর এখন নেই।

তবু উপায় তো একটা বার করতেই হবে, বিষ্ণু শেষ পর্যন্ত সেই পথের সন্ধান দিলেন। নিজের অমিত তেজসম্পন্ন শূল মহেশ্বরকে দান করলেন, বললেন, এই শূল আপনি বিদ্ধ করবেন শঙ্খচূড়ের দেহে। তার আগে অবশ্যই যুদ্ধে আহ্বান করবেন।

আপনার সর্বমঙ্গল কবচ থাকতে কোনো অস্ত্রই তো তাঁকে বধ করতে পারবে না।

কাজেই সে দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে।

আর সতী তুলসী। তার কথা চিন্তা করেছেন?

বিষ্ণু হাসলেন। তিনি সব কথাই চিন্তা করেন। মানুষের সমস্ত দুর্বলতার কথা তিনি জানেন, তাকে নিপুণ ভাবে ব্যবহার করেই তো জগতের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন তিনি। শুধু জগতের নয়, ত্রিলোকের।

তাই নাকি! শিবের এখন যুদ্ধসাধ হয়েছে! হেসে উঠলেন শঙ্খচূড়। তুলসীকে ছেড়ে অধিকক্ষণ থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। শুধু অত্যাবশ্যক রাজকীয় কাজকর্মের জন্য প্রভাতকালে সামান্য কিছুটা সময় রাজসভায় আসতে হয়, তার মধ্যেও দূত পুষ্পদন্তের মুখে এ-কথা শুনে ভয়ের পরিবর্তে কৌতুকই অনুভব করলেন তিনি, বললেন, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন। তিনি কোথায়?

চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বিশাল বটবৃক্ষের নিচে তিনি অপেক্ষা করছেন।

উত্তম। কাল প্রভাতেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।

অচিরকাল পরেই তুলসীর নিবিড় সান্নিধ্যে ফিরে এসে শঙ্খচূড় বললেন এ-কথা তুলসীকে। কথাটা শুনেই তুলসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। মনের ভয় গোপন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শঙ্খচূড়ের

BanglaBook.org

কাছে তা গোপন থাকল না, তিনি বললেন, কী আশ্চর্য, তুমি ভীত হয়ে পড়লে! স্বামীর পরাক্রম তুমি জানো না প্রিয়ে?

জানি প্রিয়তম, কিন্তু শেষরাত্রে আমি এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নই আমাকে ভীত করে তুলেছে।

আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখবার সময় দিয়েছি প্রিয়ে, সে-জন্য আমি দুঃখিত। দু'জন দু'জনের মনোরঞ্জনের মগ্ন থাকব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, এই ছিল আমার বাসনা। যা হোক, তুমি আশঙ্কা ত্যাগ করো, কাল সকালেই মহেশ্বরের যুদ্ধসাধ আমি মিটিয়ে দিয়ে আসব। গৃহে তোমার মতো সতী যার আছে, তার কোনো অমঙ্গলই কেউ করতে পারবে না।

তবু যদি আর একবার চিন্তা করতে প্রিয়তম —।

কথা শেষ করার আগেই তুলসীকে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে শঙ্খচূড় বললেন, চিন্তা করার চেয়ে এই কাজটিকে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি প্রিয়ে।

তুলসী এর মধ্যেই কিছু বলার চেষ্টা করছিল, তাকে থামিয়ে দিল শঙ্খচূড়ের কামনা-তাড়িত আগ্রাসী ওষ্ঠাধর।

পরদিন প্রভাতেই শুভকর্মাদির মাধ্যমে দিন শুরু করে শঙ্খচূড় এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে। মহেশ্বর অপেক্ষা করছিলেন তাঁরই জন্য। মহেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে শঙ্খচূড় বললেন, আপনি আমাদের প্রণম্য। কিন্তু পূজা পেতে আপনি আসেননি, এসেছেন রণহুঙ্কার তুলে, তাই আমার পরাক্রমের যথাসাধ্য দৃষ্টান্ত আপনাকে দেখতে হবে, সে-জন্য মার্জনা করবেন।

আমি বিষ্ণুর আজ্ঞাবহ মাত্র, কাজেই এ সংগ্রাম তাঁরই অভিপ্রায়। সুতরাং তুমি অগ্রসর হতে পারো।

শুরু হয়ে গেল প্রবল সংগ্রাম। এক পক্ষে স্বয়ং মহেশ্বর, অন্য দিকে দেবতা-দানবত্রাস অমিত শক্তিধর শঙ্খচূড়। সুতরাং শীঘ্র এই সংগ্রাম সমাপ্ত হবে, এমন কোনো লক্ষণ ছিল না। বর্ষকালব্যাপী সংগ্রামের পর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য থামলেন দু'জন।

যুদ্ধক্ষেত্রেই তৃণভূমিতে শয়ন করে সামান্য নিদ্রার উদ্যোগ করছিলেন শঙ্খচূড়, এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন সামনে, বললেন, আমি তৃষ্ণার্ত, পীড়িত ব্রাহ্মণ, কিছু ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে।

এ তো যুদ্ধক্ষেত্র! এখানে আমি কী ভিক্ষা দিতে পারি আপনাকে? ভিক্ষার প্রয়োজন হলে নগরে যান।

আমি যাতে প্রলুব্ধ হচ্ছি তা তোমার কাছেই আছে।

কী চান আপনি? সাধ্যের মধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই দেব আমি।

তোমার গলার ওই বহুমূল্য হার।

সর্বনাশ! এ তো সর্বমঙ্গল কবচ! এই কবচ দান করার অর্থ নিজের বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু কথা দিয়েছেন ব্রাহ্মণকে, অসাধ্য না হলে দেবেন। একটু ইতস্তত করে শঙ্খচূড় বললেন, উত্তম। এই নিন আপনি হার।

মহেশ্বর উল্লসিত হয়ে উঠলেন এ দৃশ্য দেখে, কারণ ওই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেউ নন। ইঙ্গিতে নারায়ণ তাঁকে জানালেন, এবার তিনি অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন।

নারায়ণ নিজেও অবশ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন না, আরো কিছু কাজ তাঁর বাকি ছিল। পুনরায় তিনি ফিরে গেলেন শঙ্খচূড়ের প্রাসাদে, এবার তিনি গহণ করলেন শঙ্খচূড়েরই রূপ।

BanglaBook.org

আনন্দে বিহুল হয়ে গেল তুলসী শঙ্খচূড়কে দেখে। এক বর্ষকাল অপেক্ষা, তার মনে হচ্ছিল সহস্র বর্ষ সে যেন অপেক্ষা করে আছে। স্বামীকে নিভৃতে পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল যুদ্ধের ফলাফল। স্বয়ং মহেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন, এ-ও কি সম্ভব!

না, তা হননি প্রিয়ে, — শঙ্খচূড়রূপী নারায়ণ বললেন, স্বয়ং ব্রহ্মা এসে সন্ধিস্থাপন করে দিলেন আমাদের মধ্যে। দেবতাদের অধিকার আমি ফিরিয়ে দিলাম, মহেশ্বর চলে গেলেন শিবলোকে।

ভালোই হয়েছে প্রিয়তম, নিদারুণ উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি তোমার জন্য।

স্নানাহার পর্ব সমাধা হবার পর তুলসীর তনু কামাবেগে অবশ হয়ে পড়ছিল, স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করল।

ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফলে তখন দেবতাদল উল্লসিত। মহেশ্বরের নিক্ষিপ্ত শূল ভেদ করেছে শঙ্খচূড়ের দেহ। প্রাণহীন সেই দেহকে ভস্মসাৎ করে ফিরে এসেছে শূল পুনারয় মহেশ্বরের হাতে।

বিশীর্ণ বেদনায় আর্তনাদ করে উঠল তুলসী! রমণক্লান্ত দেহে অকস্মাৎ যেন জেগে উঠে বলল, কে তুমি। তুমি তো আমার স্বামী নও! কে তুমি মায়াবী রাক্ষস — আমার সতীত্ব হরণ করে গেলে মায়াবলে?

দুই চক্ষু দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছিল তুলসীর, দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শান্ত করার জন্য নিজমূর্তি ধরলেন নারায়ণ, বললেন, মায়াবী রাক্ষস নয় তুলসী, স্বয়ং নারায়ণ তোমাকে সঙ্গ দিয়েছেন।

স্বামী ভিন্ন অন্য কাউকে আমি চিনিনা, স্বামীর অবর্তমানে তুমি আমার সতীত্ব নাশ করেছ, ছলনাদ্বারা আমাকে বিভ্রান্ত করেছ। তোমাকে আমি অভিশাপ দেব।

স্বামী তোমার জীবিত নেই তুলসী, মহেশ্বরের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন।

কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে পড়ে গেল তুলসী। শয্যায় নারায়ণ পরম স্নেহে তার শুশ্রূষা করে তার চেতনা ফিরিয়ে আনলেন, বললেন স্বামীর জন্য দুঃখ করো না, তিনি তাঁর স্বস্থান গোলোকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। শঙ্খচূড়ের অস্থি দিয়ে সমুদ্রে সৃষ্টি হয়েছে পবিত্র শঙ্খের। এর মধ্যেই আমি বিরাজিত থাকব, মহেশ্বর ছাড়া প্রত্যেক দেবতার পূজাতেই শঙ্খের জল হবে অতি পবিত্র।

স্বামীর কথা শুনলাম, কিন্তু আমার প্রতি যে নিকৃষ্ট আচরণ করা হল তার জন্য আমি অভিশাপ দেব না কেন!

অবিবেচকের মতো কথা বলো না, প্রাক্তনের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। শঙ্খচূড় তপস্যা করেছিলেন তোমাকে পত্নী হিসেবে পাবেন বলে, আমার বরে তা সফল হয়েছে। তুমি তপস্যা করছে আমাকে স্বামী হিসাবে পাবে বলে, শঙ্খচূড়ের মৃত্যুর পর তাই তো তুমি পেলে।

কিন্তু ছলনার দ্বারা, প্রতারণার দ্বারা। স্বামী জেনে আমি নারয়ণকে পাইনি। তাই স্বয়ং নারায়ণ হলেও আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, যে পাষাণহৃদয় আচরণ তুমি করলে আমার সঙ্গে, তাতে আজ থেকে তুমি পাষাণ হয়ে থাকবে।

সতীর অভিশাপ, একে বিনষ্ট করার ক্ষমতা নারায়ণের ছিল না, বললেন, উত্তম তাই হোক। তবে আমি যে তোমাকে প্রতারণা করিনি, যে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিয়েছিলাম তা রক্ষা করার জন্যই যে এ কাজ আমাকে করতে হয়েছে, তার প্রামাণ হিসেবে আমি তোমাকে বলছি, তোমার সঙ্গে আমার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই ত্রিভুবনে জ্ঞাত হবে। দেহত্যাগের পর তোমার দেহ থেকে উৎপন্ন হবে গণ্ডকী নদী। এই নদী হবে অতি পবিত্র এবং মানুষকে তা পুণ্য দান করবে। তোমার কেশ থেকে উৎপন্ন হবে মহাপবিত্র গাছ তুলসী। যে-সব পুষ্পপত্রে দেবতার পূজা হয়, তুলসীই হবে তার মধ্যে প্রধান। তুমি আমাকে শিলা হতে অভিশাপ দিয়েছ, এই শিলার সঙ্গে লেগে থাকবে তুলসীপত্র, তাতেই বোঝা যাবে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া।

BanglaBook.org

তুলসী সত্যই সেই থেকে সংযুক্ত নারায়ণশিলার সঙ্গে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া গণ্ডকী নদী পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে। শঙ্খ দেবপূজার অচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে রয়েছে আজও।

কণা বসু মিশ্র

কেষ্ট আর ভোমরা

বালিগঞ্জ ইস্টিশনের প্ল্যাটফর্মে কাল সারাটা রাত জড়াজড়ি করে কাটিয়ে দিল কেষ্ট আর ভোমরা। ওদের একটু দূরেই নেড়ি কুকুরের ঝগড়া আর মৈথুন, ভিখিরিদের কুকুর কুণ্ডলী হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্যগুলো কেষ্ট ও ভোমরার সঙ্গমের ইচ্ছেটা বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু ইস্টিশন চত্বরে নিয়ন আলো। ফাটকা খেলা কিছু মস্তানের জোরালো আড্ডা, আরো কিছু জেগে থাকা মানুষের আনাগোনার উপদ্রবে ওরা কিছুতেই নির্লজ্জের মতো ইচ্ছেটাকে পূরণ করতে পারেনি। অথচ বুকের মধ্যে ভূমিকম্প, আশমানির চাঁদ ধরার বাধ ওদের চোখ বুজে ঝিমোনটুকুও মাটি করে দিল। শেষ রাতের ট্রেনের হুইসেল বাজল। মাইকটা গম্ গম্ করে উঠল। শেয়ালদা থেকে দৈত্যের মতো রেলগাড়ি এসে পৌঁছল। মুহূর্তে ব্যাপারীদের ভিড়ে ভরে গেল প্ল্যাটফর্ম। সবজিঅলা মাছঅলাদের চেঁচামেচির মধ্যেই ফের হুইসেল পড়ল। রেলগাড়ির কামরাগুলো খালি হয়ে গেল। দু-চার জন যাত্রীর মধ্যে কেষ্ট আর ভোমরা জানলার দিকের একটা সিট বেছে নিল।

ভোরের কুয়াশা গায়ে জড়িয়ে ওরা চারটের লোকাল ট্রেন থেকে নামল। ভোমরার হাতটা আলগোছে ধরে প্ল্যাটফর্ম পেছনে ফেলে পুব বরাবর হাঁটতে লাগল কেষ্ট। ইস্টিশনের দু'পাশে লোহার রেলিং। মধ্যিখানে ইঁটের গাঁথুনি দেওয়া কিছুটা চওড়া পথ। উচুঁ পথের নিচের দু'দিকে গাছগাছালির মধ্যে ফিকে অন্ধকারের প্রলেপ কুয়াশার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে। কাক ডাকছে। ভোরের গাম্ভীর্য চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে কাকের চেঁচানি। ডান দিকে পুকুরের পাড় ঘেঁষে সদ্য গজিয়ে ওঠা চালাঘরের বেড়ার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। চায়ের দোকানটার চুল্লীতে আগুন দিয়ে তার চারিদিকের ভাঙা বেঞ্চি ঘিরে বসে আছে কেউ কেউ।

কেষ্টর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারছিল না ভোমরা। ও কেবলই পিছিয়ে পড়ছিল। ওর নতুন ঢিলেঢালা হাইহিল জুতোটা থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ উঠছিল। ফোস্কাও পড়েছিল। সেই ফোস্কা চাপে চাপে গলে জল।

রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে রঙের কাজ করে এক মাসের পুরো রোজগারটাই শেষ হয়েছে কেষ্টর ভোমরার শখের প্লাস্টিকের শাঁখা, চুড়ি, নতুন নাইলনের শাড়ি আর জুতো কিনতে। কলসির মতো ভরা মন আজ খালি। কালকের বিয়ে করা বউটা কেষ্টর কাছে আজ একদম পুরোনো হয়ে গেছে। শিকার চোখের সামনে রেখে কাল সারা রাত মিউ মিউ করল বেড়াল। লোভী চোখে তাকাল। অথচ ছুঁতে পারল না। শুধু বউয়ের কাচের চুড়ির শব্দ আর শাড়ির খস্ খস্ শব্দই শুনে গেল।

গতরাতে কালীঘাট থেকে শেষ ট্রাম ধরে ওরা যখন বালিগঞ্জ ইস্টিশনে পৌঁছয়, তখন চারিদিকের সোরগোল থেমে গেছে। ফুটপাথে কাতারে কাতারে ভিখিরিদের ভিড়। ঘুমে কাদা মানুষগুলোর পাঁজর বেরিয়ে থাকা, কঙ্কালসার বুকের মধ্যে নির্লজ্জের মতো ধুপপুক করছিল প্রাণটা। কেষ্টর মনে পড়ছিল নিজের বাপ-মায়ের মুখ। তারাও তো ভিখিরি ছিল। ওই ফুটপাথের বাসিন্দা ছিল কেষ্টও।

ভিক্ষের থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওই ফুটপাথ থেকেই সে এক দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। এর ওর পেছনে ঘুরে অনেক কষ্ট করে খেটে খাওয়া মানুষদের এক জন হল। সেই সঙ্গে তার মনের মধ্যে উঁকি মারল ঘর-বাঁধার লোভ।

টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ার অভ্যেস নেই কেষ্টর। ধরাও পড়েছে কতবার। মারধোর খেয়েছে। থানা লক-আপে ঢুকতেও হয়েছে! একবার তো চেকার তার পায়ের এক পাটি চপ্পল খুলে নিয়ে কান দুটো মুলে ছেড়ে দিয়েছে। তবু সেই বদ অভ্যেসে ভাটা পড়ল কাল। নতুন বউ নিয়ে রেলে চড়ার আগে কেষ্ট সুড় সুড় করে দাঁড়াল টিকিট কাউন্টারে। অত রাতে পাবলিকের লাইন কোথায়? একদম ফাঁকা। কয়েক জন রিক্সাঅলা গুলতানি মারছিল আর খইনি টিপছিল। দুটো নেড়ি কুকুর এক টুকরো রুটি আর কিছু কলার খোসা নিয়ে কামড়াকামড়ি করছিল। কুকুর দুটোকে দেখে কেষ্টর খুব রাগ হচ্ছিল। সে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারতেই ওরা খাবার ফেলে ছুটে পালাল। একটু দূরে গিয়ে লক্‌লকে জিভটা বের করে হাঁপাতে লাগল। লালা গড়িয়ে পড়ছিল জিভ থেকে। তবু কেষ্টর মায়া হল না।

টিকিট ঘর থেকে টিকিট নিয়ে ওভারব্রিজে পা দিল কেষ্ট। মাত্র কিছু সময়ের মামলা। ইলেকট্রিক ট্রেনে এই সময়টুকু পেরোতে কতক্ষণ? তার পরই তো ভাড়া করা ঘরখানায় শুরু হবে কেষ্ট আর ভোমরার পাতা সংসারের নতুন খেলা। ভোমরার সদ্য সিঁদুর ঢালা সিঁথি, কপাল কেষ্টর বুকে মোচড় দেয় ফের। এত দিন যে-মেয়েটাকে নিয়ে খেলেছে কেষ্ট, এবার পুরোপুরি জানবে তার রহস্য। কেষ্টর মাথার ভেতর ইলেকট্রিকের শক মারছিল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে এসেই সব গোলমাল হয়ে গেল। মাইকের ঘোষণার খবর হল আর এক রকম। কেষ্ট বলল, আজ রাতে হেথায় থাকতে হবে রে ভোমরা।

কেন?

রেল চলবেনি। শ্যায়লদা ইস্টিশনে কী সব ঝামেলা হইচে।

ভোমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় কেষ্টর দিকে। কেষ্টর চোখ দুটোও বোকা বোকা হয়ে যায়। দুটো দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে ওরা দু'জনে থপ করে বসে পড়ল সিমেন্টের বাঁধানো লাল বেঞ্চির ওপরে। কেষ্ট আড় চোখে ভোমরার দিকে তাকাল। ভোমরার গোলগাল ভরাট মুখখানার মধ্যে ডাগর এক জোড়া চোখ। চ্যাপটা নাকের ওপরের দুপাশে জোড়া ভুরু। বাবুদের বাড়ি কাজ করতে করতে ভোমরা তাদের বউ-মেয়েদের মতো শন্‌ দিয়ে ভুরু প্লাক করতে শিখেছে। ভদ্দরলোকের মেয়েরা যা করে, সেই-বা তা করবে না কেন? ঠিক মতো সমান করতে না পারায় ওর চওড়া ভুরুর কোথাও কোথাও পাহাড়ের মতো এবড়ো খেবড়ো হয়ে আছে। তবু যৌবনের ঢলঢলে লাবণ্যে অতি সাধারণকেও অসাধারণ লাগছে। ভোমরার কপালে লেপটে থাকা সিঁদুর, রাতজাগা ঢুলু ঢুলু চোখ দুটো নিয়ে সে কেষ্টর দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসল। কেষ্টর বুকেও ফের ঢেউ ভাঙল। সে-ও হাসল। জরির ফিতে দিয়ে জড়ানো খোপাটা ভোমরার পিঠের ওপর ভেঙে পড়েছে। পরনে সস্তার লাল নাইলন শাড়ি। তার ভেতর সোনলি খড়কে ডুরে। কেষ্টর গায়ের রঙ নিটোল কালো। কেষ্টর মনে হয়, কালো রঙেই ও সুন্দর। ফর্সা এখন ওর কাছে বিচ্ছিরি। কেষ্ট হাঁটতে হাঁটতে ভোমরার গা ছুঁয়ে ওকে একটু আদর করে। ওর আঁচলের তলায় হাত চালিয়ে নিষিদ্ধ জায়গাগুলো খোঁজে। ভোমরা বলে, লোকজন দেইকখে রে কেষ্ট।

কেষ্ট বলে, মুই উপোস কাক রে ভোমরা।

তাই বলে লোকজনের সামনে? মোর লজ্জা করেনে?

কেষ্ট বলে, লজ্জা কীসির? মোর ইস্তিরির শরীল ছুঁইয়ানি?

উঁঃ! ইস্তিরি। ভোমরা চোখ নাচিয়ে আহ্লাদি হাসি হাসে।

কেষ্ট বলে, ইস্তিরি লয় তো কী? মুই কাল রাতের থিকে তোর সোয়ামি।

BanglaBook.org

ওদের সারা মুখে মশার কামড়ের লাল দাগ। ছোট ছোট গোটার মতো টিপলি হয়ে আছে। কেষ্ট বলল, ইস। তুকে মশা কেমড়েছে রে ভোমরা।

ভোমরা বলল, ইস! তুকেও খুবলে খেইছে রে। নাল হই রইচে।

কেষ্ট বলল, কী কইরব বল? ঘর ঠিক করলুম। তা না ইস্টিশনে পড়ে রইলুম সারারাত। আর ঠাস্ ঠুস্ মশা মারলুম।

বাসি ঠোঁট ভেঙে দু'জনেই হাসল। ভোমরার হাসির শব্দটার জোর বেশি। সেই হাসির সঙ্গে গলা মেলাতে গিয়ে কেষ্টও টেনে টেনে আর একবার হাসল। কিন্তু তাল কেটে গেল। উঁচু পথ শেষ হল। ওরা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল। এক ঝলক মেঠো বাতাসের এলোমেলো ঝাপট খেয়ে ওরা একে অন্যের বুকের সঙ্গে মিশে গেল। কিছুক্ষণ এক জন আর এক জনের বুকের ধুকপুকুনি শুনল। রেল ব্রিজের নিচে এখন লোকজন তেমন ওঠেনি। কাঁটাঝোপের পাশ দিয়ে একটা জলা জমি এঁকেবেঁকে গেছে। ও-পারে ইটের তৈরি কিছু অসমাপ্ত ঘরবাড়ি। কিছু বাঁশের ঝুপড়ি, গোটা দুয়েক টিনের ঘর। একটা নতুন জনবসতি গজিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি হবে। সরকারি রাস্তা। মাটি কাটার কাজ চলছে। জায়গাটা ভোমরার কাছে নতুন। কেষ্ট আঙুল দিয়ে জায়গা দেখিয়ে বলে, হোথা মুই ঘর বাঁধব রে ভোমরা। ভোমরা আশ্চর্য ভাবে তাকায়।

জমি কিইনেছিস?

কিনতি কতক্ষণ?

মোর পাকা বাড়ি চাই রে কেষ্ট।

হোবে হোবে। পাকা ঘর হোবে। কলকাতার বাবুদের ঘরের মতো ঘর হোবে।

সত্যি! ভোমরা হেসে গড়িয়ে পড়ে কেষ্টর গায়ের ওপর।

কেষ্ট বলে, আজ মিস্তিরির কাজে নেইগেছি রে। বাড়ি বানানোর মালমশাল্লা জুগাড় করতি আর কী কষ্ট?

নতুন জুতো থেকে ফোস্কা পড়েছে ভোমরার দু'আঙুলে। ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। রেল ব্রিজের তলা দিয়ে যেতে যেতে ওদের মাথার ওপর দিয়ে আর একটা লোকাল ট্রেন চলে গেল। তার ঝম্ ঝম্ শব্দ, দাপিয়ে ছোটায় ওদের পায়ের তলার মাটি কাঁপতে লাগল। ভারি মজা পেয়ে ভোমরা হাঁ করে ব্রিজের ফুটোর দিকে তাকাল।

হ্যাঁ রে কেষ্ট, রেলের ডেরাইভার হলি কেমন হত। টেরেনে চেপে মুই কত দেশ ঘুরতি পারতুম।

কেষ্টর পৌরুষে বাধল। ও গম্ভীর হয়ে বলল, ডেরাইভারের থিকে রাজমিস্তিরি ঢের বড়ো জানলি ভোমরা। পেরথমে মানুষির কী দরকার বল তো? বাসস্থান। আগে ঘরে বাস কইরবে, তবে রেলে চইড়বে। দেশ দেহখতি বেরুবে।

ভোমরা এবার অন্য বায়না তুলল, মোকে দেশ বেড়াতে নে যাবি কেষ্ট? কেষ্ট ওর থুতনিটা নেড়ে বলল নে যাব, নে যাব। আমার কন্ট্রাক্টরবাবু মেমসায়েবিকে বিলাইত নে গেছেন সাহেব।

মোকে পিলেন উই যে আকাশে উড়ে, উয়াতে চাপাবি?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

তুই পিলেনের ডেরাইভার হবি রে কেষ্ট?

রাত জাগা লাল চোখ দুটো তুলে কেষ্ট বলল, মুই পিলেন ভেইঙে যদি ধপাস হই? মোর হাড় গোড় নে বসে বসে তুই কাঁদবি রে ভোমরা।

কথাটা বোধহয় বোধগম্য হল না ভোমরার। সে অবাক চোখে আকাশ দেখল। হালকা চালে ভেসে যাচ্ছিল কয়েক টুকরো মেঘ। নীল জমির আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ

BanglaBook.org

দেখতে দেখতে গোড়ালি ভেঙে পড়ে গেল ভোমরা। কেষ্ট তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, কী রে, পা হড়কে পইরে গেলি? ভদ্দরলোকের মেয়ে-ছেলের মতো উঁচু জুতো পারার সাধ রইচে বেশ।

ভোমরা ব্যথা সামলে জলভরা চোখে তাকাল। বলল, তা রইচে। দিলি কেনে কিনে? উহু হুরে। ভোমরা কঁকিয়ে উঠল। কেষ্ট হাসল। বলল, হাইচে হাইচে আর অগাড় করিসনি। তোর মুখি আজ যা জেল্‌লা খেলতেছে না মাইরি! কেষ্ট ওর থুতুনিটা ধরে ফের নাড়ল।

কেষ্টর পরনে হাঁটু পর্যন্ত গুটোনো টেরিকটনের প্যান্ট। গায় গোলাপি রঙের নাইলনের শার্ট। কাঁধের কাছটা ছেঁড়া। সেখানে ভোমরার যত্নের লাল সুতোর সেলাই। ওদের গলায় এখন ঝুলছে গাঁদা ফুলের বাসি মালা দুটো। মালাটার গায়ে হাত বুলিয়ে কেষ্ট বলল, পাণ্ডা ঠাকুর টোপরটা দিলে না মাইরি। ভোমরা বলল, কেন দেবে? ওটা ভাড়া করা টোপর নয়? পঞ্চাশ টাকায় বিয়েও সাইরবে, টোপরাটাও নে যাবে?

কেষ্ট তবু বকে গেল। বলল, বিয়ে শেষ হবার তর সয় না। সাত পাকে ঘুইরে শুভদিষ্টির সময় সবে নতুন বউর দিকি একটু চেইছি, অমনি পাণ্ডা ঠাকুর বইললে, অতক্ষণ চেয়োনি গো। ঘরে গিয়ে ঝেতক্ষশ খুশি বউর মুখির পানে চেইও। দেখতেছ না আর এক পার্টি দেইড়ে রইচে। রাত দশটা বেজে গেল। এখনো দু'পার্টির বিয়ে বাকি।

ভোমরা খিল খিল করে হাসল। বলল, ওর নাম কালীঘাটের বে। কত সময় দেবে গো।

কেষ্ট ইস্টিশনের পানের দোকানের জ্বলন্ত দড়িতে একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। বিড়িটা জ্বলতে জ্বলতে প্রায় শেষ হয়ে আসছে। নিভন্ত বিড়িটায় ফুঁক ফুঁক বার কয়েক টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল কেষ্ট। পাণ্ডা ঠাকুরের ওপর কেমন এক আক্রোশে ওর চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

ঘর দেখে ভোমরার মাথায় হাত। বাঁশের ঘর। ওপরে সনের ছাউনি। চালটা এত নিচু, মাথায় প্রায় ঠেকে আর কী। সেই চালা ঘরের আশেপাশে আরও অনেক ঝুপড়ি। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। ঘরের ভেতরে সকালে রোদ্দুরের কোনো উঁকিঝুঁকি নেই। সেখানে দম বন্ধ করা বিষণ্ণ বাতাস। ভোমরা নাক সিঁটকে বলে, মোকে কোথা নি এলি রে কেষ্ট?

অপ্রস্তুত কেষ্ট মাদুরটা নিয়ে এল। গত কাল ও কিনে রেখেছিল। কেষ্ট নিজেই তাড়াতাড়ি মাদুরটা পেতে দিল মাটির মেঝেতে। ভোমরাকে বুকে পিষে আদর করতে করতে কেষ্ট বলল, মুই যে-ঘরে সে-ঘরেই তোর আলো রে ভোমরা। ভোমরার চোখে মুখে ত্যারছা হাসির বান ডাকল। কিছু সময় কোনো কথা নেই। ঘরের ভেতর শব্দ, গরম গরম চাপা নিশ্বাসে, দু'টি যুবক-যুবতির আদিম কামনার আগুন। সে-আগুনের জ্বালা নিভতে সময় লাগল।

পাশের ঘরের ভাড়াটে এক ভিখিরি অন্ধ বুড়ি নাতির হাত ধরে সারা দিন ভিক্ষে করে বেড়ায়। বুড়ি গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দেয়। শুকিয়ে বিক্রি করে। বেশ চলে যায় ওদের সংসার। বুড়ির সঙ্গে ভোমরার ভারি ভাব। ভাবটা স্বার্থের। বুড়ির নিভে আসা উনুনে নতুন করে কয়লা দেয় ভোমরা। তারপর কেষ্ট আর নিজের জন্য ভাত ফুটিয়ে নেয়।

ভোমরার এ-সব অনেকটাই সয়ে গেছে। বাবুদের বাড়ির হালচাল সে ভুলতে বসেছে। কেষ্ট বলেছিল, আর ক'টা দিন সবুর কর। তোকে উনুন কিনে দোব রে ভোমরা।

ভোমরা চোখ ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকায়। বলে, শুধু উনুন? ঘর বাঁধবনি?

বাঁইধব বাঁইধব।

পানায় ভরা পুকুর পাড়ে বসে বুড়ির এঁটো বাসন মাজে ভোমরা। তার বদলে বুড়ির হাঁড়ি, কড়াই, বাসন-কোসন ধার পায়।

BanglaBook.org

কেষ্ট মাঝে মাঝে রঙের কাজে যায়। গড়িয়া স্টেশনের নিচে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা রাজমিস্ত্রিদের পেছন পেছন জোগাড়ে যায়। এই করেই ঘরভাড়াটা আর দু'টি পেট চলে যায়।

এক দিন ভোমরার পায়ের এক জোড়া মল এনে দেয় কেষ্ট। রুপোর নয়। নকল। কিন্তু অবিকল রুপোর মতো দেখতে। সেই মল পায়ে দিয়ে ভোমরা কোমর দুলিয়ে পুকুর ধারে যায় কলমি শাক তুলতে। কেষ্ট বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি ফুঁকতে থাকে।

যখন জোছনায় ফেটে পড়ে আকাশ, সেই আকাশের গায়ে ছিটের মতো অসংখ্য তারা, কেষ্ট তখন ভোমরাকে আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে পাঁজাকোলা করে ছুটতে থাকে। বস্তির মানুষজন অঘোরে ঘুমোয়। গাছপালা, মাঠঘাট, পুকুর পেরিয়ে কেষ্ট যেন দূরে বহু দূরে ভোমরাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। পালোয়ানের মতো স্বাস্থ্যবান কেষ্টর চওড়া লোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ভোমরা ভাবে — আহা! কত সুখ। আহ্লাদে সে যেন উপচে পড়ে। পাছে সুখ-পাখি পালিয়ে যায়, ভোমরা সেই সুখটুকু ধরে রাখতে চায়। সে প্রাণপ্রণে দু'হাতের শক্তি খরচ করে কেষ্টর গলা জড়িয়ে ধরে।

কেষ্ট।

উঁ।

মোকে ফেলে পেইলে যাবি?

দূর! পাগলি। তুই মোর যন্তর মাইরি। তুই ছাড়া বাঁচবনি রে ভোমরা।

চাঁদনি রাতে রতিক্রিয়ার পর কেষ্ট আর ভোমরার স্বপ্ন দেখার সাধ বাড়তে থাকে।

এক দিন গোবর ছড়া দিয়ে ঘর নিকোতে নিকোতে কেষ্টর গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাল ভোমরা। কেষ্ট ভোরবেলা বেরিয়েছিল ইস্টিশনের দিকে। বাবুদের নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে, তার রঙের কাজে। কথা ছিল বাজার করে ফিরবে সন্ধেয়। ভোমরার চোখে হাসির ঝিলিক। সে ফিরে তাকাল।

ওমা। ও আবার কে গো?

কালোপানা মুখ। লম্বাটে গড়ন। সিঁথিতে ধাবড়ানো সিঁদুর। কপালে কাচপোকার টিপ। ওরই বয়সি আর এক জন মেয়েছেলে। কেষ্ট দাঁত বের করে হাসছে। ওই মেয়েটা বাঁকা চাউনি ছুঁড়ছে ভোমরার দিকে।

কেষ্ট বলল, তোর সতীন রে ভোমরা। ওকে নে এলাম।

সতিন! ভোমরা বিড় বিড় করল। ওর মাথার মধ্যে যেন খর খর ঘুরতে লাগল একটা গুবরে পোকা। ভূমিকম্পের মতো দুলছে এই চালাঘর, বাঁশের দরজা, তার সোয়ামি কেষ্ট আর ওই হারামির বেটি। ভোমরা দুর্বোধ্য চাউনি ছুঁড়ল কেষ্টকে। কেষ্ট বলল, এ মোর বে করা বউ রে ভোমরা।

ভোমরার সতীন কটমট করে দেখছিল ওকে।

বলল, হ্যাঁ, আমি পেরথমে এইচি। সোয়ামি আমারে আগে বে কইরেছে। হাঁ করে দেখতিছিস কী?

ভোমরা ঢোক গিলল। কেষ্ট বলল, ঝটপট ভাত-ফাত চাপা। উনুন, হাঁড়ি-ফাড়ি সব কিইনে এনিছি। বুড়ির কাছে তোর-আর ধার চাইতে হোবেনি রে ভোমরা। এই দেখ দিকিনি। কুচো চিংড়ি আর নাউ এনিচি।

কী হল রে ভোমরা? নির্লজ্জের মতো হাসল কেষ্ট। দমকা ঝড়ে ভোমরার বুকের বাতি নিভল যেন। ও দম নিয়ে আর একবার তাকাল সোয়ামির দিকে। ওর সতীন কোমরে আঁচল গুঁজে তেড়ে এসে বলল, মোর সংসার মুই বুঝে নোব।

সতীন তাড়াতাড়ি উনুন ধরানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হ্যাঁ গো। ঘুঁটে কই? কয়লা কই?

BanglaBook.org

কেষ্ট ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল প্রথম পক্ষের হুকুম তামিল করার জন্য। ভোমরা প্লাস্টিকের পুতুলের মতো ড্যাব ড্যাব করে দেখছিল বিশ্বাসঘাতক কেষ্টর আর এক রূপ। ও চেঁচিয়ে বাধা দিতে চাইল। গলায় আওয়াজ নেই। হাত-পা ছুঁড়তে চাইল। কিন্তু পারল না। সব যেন খিল ধরে গেছে। নিজের আচল শরীরটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল ভোমরা।

কেষ্ট আর তার প্রথম পক্ষ রাঁধছিল। হাতা-খুন্তির আওয়াজ উঠল টুংটাং। ভোমরার মনে হল, ও যেন স্বপ্ন দেখছে। ক'দিন ধরে রাত করে বাড়ি ফিরছিল চাঁদু। ওর গায়ে, মুখে ভক্ ভক্ করছিল তাড়ির গন্ধ। কেষ্ট তো বরাবরই নেশাখোর। মাঝখানে নেশায় ভাটা পড়েছিল। ওর নেশার জিনিস কেড়ে ভোমরা যখন নেশা হয়েছিল। এত দিন কোথায় যেত কেষ্ট? রাত করে বাড়ি ফেরার মানেটা কি এই? ওই ডাইনি কি সত্যিই ওর সতীন? ও কি কেষ্টর প্রথম পক্ষ? না দ্বিতীয়। ভোমরার কুটিল চোখ দুটো নাচছিল সাপিনির মতো।

কেষ্ট যে কালও ওকে বলেছিল, সে দিঘায় লঞ্চ চালাবে? সেই লঞ্চে চেপে ভোমরা সমুদ্দুরে মাছ ধরা দেখতে যাবে।

ভোমরার রুক্ষ চুলগুলো সাপের ফণার মতো বাতাসে নাচতে লাগল। ওর বুকের আঁচল খসে পড়ল। ওর চোখ ফেটে আগুন বেরোচ্ছিল। ও ছুটে গেল দাওয়ার কোণে, সেখানে কেষ্ট আর ওর সতীন রসের লীলায় বিভার। সতীনের হাতে খুন্তি। উনুনের কড়াইয়ে লাউঘণ্ট। কেষ্ট ভোমরাকে বোঝানোর মতো অবিকল ওই একই ভাবে ওর সতীনকে বোঝাচ্ছে, দিঘায় লঞ্চ চালাতে যাব, মাত্তর কটা দিন। তার পরই তুকে নে যাব রে অতসী।

বটে। বটে। তু ভেবেইচিসটা কী হারামি? বেইমান।

আচমকা গালাগাল খেয়ে ভড়কে যায় কেষ্ট। ভোমরা ঝড়ের বেগে ধাক্কা মারল কেষ্টকে। সতীনের চুলের মুঠি ধরে ওর হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিল। উনুনের গনগনে আগুনে উলটে গেল লাউয়ের কড়াই। ভোমরা সতীনের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, মোর ঘর, মোর সোয়ামি, ভাগ। সতীনের চোখ দুটোও লাট্টুর মতো পাক খেতে লাগল। সে কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে হাত নেড়ে চেঁচাল, মুই পেরথমে এইচি। তু কে র‍্যা? দুই সতীনের চুলোচুলিতে কেমন এক নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করছিল কেষ্ট। ভোমরার সঙ্গে পেরে উঠল না অতসী। ভোমরার এক লাথিতে সদ্য কিনে আনা মেটে হাঁড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। বস্তির লোক উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। ভিড় বাড়ছিল। সবাইকে ভাগিয়ে দিয়ে কেষ্ট বীরের মতো দাঁড়িয়ে রইল যুদ্ধক্ষেত্রে।

কেষ্ট বলল, মোর পরিবার, মুই দেখব, তুরা ভিড় করতিছিস কেনে?

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

১০ মিন্টো লেন

১০ মিন্টো লেন কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছের মতো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেও হঠাৎ কখন জায়গা মতো নেমে আসবে। ভুরু ঠেলে ওপরে চাইবার প্রয়োজন নেই, কপালই জানান দেয় সেখানে চুল পড়েছে।

BanglaBook.org

১০ মিন্টো লেন গলির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ তলার এক পুরনো, লাল-ইটের ম্যানসন। কয়েক যুগ ধরে এজমালি সম্পত্তি। পাঁচ তলা জুড়ে পনেরোটা ফ্ল্যাটেই ভাড়া বসানো। কিন্তু কে কাকে ভাড়া দেয় কেউ জানে না। ভাড়াটেরাই জানে না পাশের ফ্ল্যাটের মালিকানা কার। তাদের অনেকেরই মনে নেই শেষ কবে ভাড়া গুনেছে।

১০ মিন্টো লেনের পাঁচ তলার ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দাটাই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছার মতো। ওই বারান্দার পাশে আরও যে কতকগুলো একই চেহারার বারান্দা আছে, তার নিচে যে আরও চার-চারটে তলা আছে তা চোখে ধরা দেয় না।

১০ মিন্টো লেনের সমস্ত সত্তা মুছে গিয়ে একটা ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দা হয়ে আছে। সাত-সাতটা বছর।

যবে থেকে ডিকির বউ হয়ে এসে দুপুরে, সন্ধেয় বারান্দায় এসে দাঁড়ানো শুরু করল শীলা — লাল কিংবা তুঁতে শাড়িতে জড়ানো এক ঝলক সূর্যরশ্মিই যেন — কখনও পান, কখনও লিপস্টিকে এমন লাল ঠোঁট যেন স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা। এক রত্তি গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দার স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা।

আর পাড়ার সমস্ত উঠতি যুবক যার দর্শক, যার ফ্যান।

গত সাত-সাতটা বছর নীতিন গলির রাস্তাটুকু হেঁটে পার করতে পারেনি একবার অন্তত ওই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের মতো ওই বারান্দার দিকে এক ঝলক না তাকিয়ে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কতবারই না মনে হয়েছে পাড়ায় আর একটিও বাড়ি, একটিও দরজা, একটি জানলা নেই। আছে শুধু একটা বারান্দা, আর তার ওপর একটা থির বিজুরি রক্তমাংসে বাঁধা।

সাত বছর আগে স্কুলে যাওয়ার পথে নীতিন প্রথম দেখে দৃশ্যটা। হয়তো সে-দিন পরীক্ষা ছিল, তাই বেশ হরবড়িয়েই হাঁটছিল নীতিন ট্রামরাস্তার দিকে। খান তিনেক ফাউন্টেন পেনের ভরে বাঁ-দিকের বুক পকেটে হেলে পড়েছে, ডান হাতে খান চারেক মোটাসোটা বই। একটা মুখস্থ করা উত্তরের শুরুর বাক্যটাই হয়তো মনে মনে রগড়াচ্ছিল, ফলে চোখ ছিল চিন্তার ভারে মাটির দিকেই। তখন কোত্থেকে এক ফোঁটা জল এসে পড়ল চশমার কাচে।

কাচের ওপর ঝাপসা ফোঁটাটা যে জল তা প্রথমে বুঝতেই পারেনি নীতিন। ও দেখল বাঁ-চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। নাকি ডান চোখের? না দু'চোখেরই? ও কী হয়েছে বুঝতে মাটির থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে চাইল। অমনি আরও কয়েকটা ফোঁটা হাওয়ায় উড়ে এসে চশমার দুই কাচে পড়ল। আর তখন নীতিনের প্রথম খেয়াল হল যে আকাশে মেঘ করেছে, নীলচে অন্ধকার একটা ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে, বেশ জোরে হাওয়া বইছে আর বৃষ্টির উড়ো ফোঁটাও ঝরছে এখানে-ওখানে।

আর ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা চশমা দিয়েই নীতিন দেখে ফেলল ১০ মিন্টো লেনের ছোট্ট, গোল বারান্দায় লালা শাড়ি বিদ্যুৎটিকে।

পাড়ার সব ছেলের মতো নীতিনেরও হিসেব আছে পাড়ার কোন বাড়ির কোন বারান্দার কোন মেয়ে দাঁড়ায়। আর সকলের মতো নীতিনেরও ছকা আছে কোন বারান্দায় কার দাঁড়াবার সময়টা কী। ১০ মিন্টো লেনের ওই বারান্দায় কোনও মেয়ে দাঁড়ায়নি কোনও দিন। ওটা মস্তান ডিকি গোমেসের বারান্দা, যেখান থেকে ক্বচিৎ কখনও মাঝরাত্তিরে মাতালের হুঙ্কার শোনা যায়। কখনও-সখনও মাতালদের কোরাস গান। যখন সারা পাড়া টের পায় জাহাজের মশালচি ডিকি গোমেস মোটা কামিয়ে মাস দুয়েকের মতো ডাঙার বাসিন্দা হল।

BanglaBook.org

নীতিন ভাবল, মেয়েটি কি তাহলে ডিকিদার বউ? ভেবেই চমকে উঠল ভেতর ভেতর। ডিকিদা ডাঙায় থাকে গড়ে চার মাস, যার দু'মাস যায় পার্টি করে, ফুর্তি করে, পয়সা উড়িয়ে। বাকি দু'মাস যত্রতত্র ধারকর্য করে। দু'মাস স্যুট-বুটে দুরস্ত ভাবে, দু'মাস নোংরা, আকাচা জামায় মদো-মাতাল চেহারায়। দু'মাসে ডিকি মস্তান পাড়া শাসন করে উঠতি রুস্তমদের চড়-চাপ্টা টিকটাক মেরে শিব করে রেখে, অন্য দু'মাস ওদেরই পয়সায় বাংলা চোলাই, কাঁচি-ক্যাপস্টান খেয়ে, গালাগলি করে রোয়াকে বসে।

ধুর্! ও লোকের ও বউ হয় না। নিজের মনে জোরে জোরে বলতে বলতে নীতিন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েও ফের তাকাল পাঁচ তলার ওই বারান্দার দিকে। রক্তমাংসে বাঁধা বিদ্যুৎটিও কখন জানি গোল বারান্দার গোল রেলিং ধরে ঘুরে গেছে ট্রামরাস্তার দিকে। আর, ঝাপ্‌সা কাচেও নীতিন আবছা ভাবে দেখল শাড়ি জড়ানো বিদ্যুৎ নিচে তাকিয়ে ওর দিকেই।

এরপর হয় বৃষ্টির আশঙ্কায়, নয়তো জীবনের প্রথম এ-রকম সঙ্কোচ নীতিন প্রায় দৌড়তে থাকল ট্রামের জন্য।

সন্ধেবেলায় পাড়ার রোয়াকে বসতেই ভুল শুধরে গেল নীতিনের। লাল-শাড়ি বিদ্যুৎ বাস্তবিকই ডিকির নবপরিণিতা স্ত্রী। 'মাইরি' বলে আঁৎকে উঠেছিল নীতিন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিছুটা নিশ্চিন্তও হয়েছিল। মহিলাকে তাহলে মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা যাবে। পাড়ার একটা প্রকৃত কালেকশান হল তাহলে।

পরদিন স্কুলের পথে ফের ওপরে তাকাল নীতিন। কিন্তু বারান্দা খালি। যাচ্চলে! এর কি বারান্দায় দাঁড়ানোর কোনও নিয়মকানুন নেই? কিছুটা পথ পেরিয়ে ফের মাথা ঘোরাল নীতিন। শুধু থমথমে মেঘ দেখল আকাশে। আকাশে বা বারান্দায় কোথাও কোনও বিদ্যুৎ নেই।

সাত-সাতটা বছর কিন্তু খুব কম সময় না, ভাবল নীতিন। এর মধ্যে চার-চারটে বছর ডাক্তারি পড়া হয়েছে। নারী ও পুরুষের অ্যানাটমি সম্পর্ক কত জ্ঞান বেড়েছে নীতিনের। সহপাঠিনী কুমকুমের ঠোঁটের চুম্বন পেয়েছে, শরীরের ঘ্রাণ পেয়েছে, স্পর্শ করেছে ওর নরম সাদা ত্বক। চোখের সামনে দেখেছে ডিকি জাহাজের ডিউটিতে জয়েন করলে বন্ধু সুবিমল, কাতু, রঞ্জিত, সুজয়, টমি, অ্যান্থনি, রবিন নিয়মিত যাতায়াত করছে পাঁচ তলার ওই রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। হয়তো রবিনই প্রথম বলেছিল চার্মিনার ধরিয়ে ইডেনের ঘাসে শুয়ে, অসাধারণ মেয়েছেলে রে! তুলনা হয় না। একেবারে পার্ফেক্ট নিম্ফোমেনিয়াক।

কড়াৎ করে বাজের মতো কথাটা এসে বুকে আছড়ে শিরা, রক্তনালী ফুঁড়ে পেটের মধ্যিখানে কোথাও এসে দাপাতে লাগল। নীতিন বুঝল, ওর পেটের মাঝখানটা লাফাচ্ছে। ভয়ে, লজ্জায়, সম্পূর্ণ হতাশায়। ওর গলার আওয়াজ ধরে গেল। ও বলতে চাইল, সত্যি? কিন্তু গলা ভেঙে গেল। মেয়েটা নয়, ওর ঘৃণা হল রবিনের প্রতি। কাঁপা কাঁপা হাতে চার্মিনার ধরাতে গিয়ে চোখে একটু যেন ঝাপসাই দেখল। আকাশের দিকে মুখ তুলে বুঝতে গেল কাচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল কি না। কিন্তু কোথাও বৃষ্টির চিহ্নই দেখল না।

এরপর কোনও এক দিন হয়তো অ্যান্থনি বলছিল, কিংবা সুবিমল, কিংবা সুজয়, কিংবা ... কী এসে যায় কে সেটা? কিন্তু কেউ এক জন ছবি বর্ণনা করার মতো করে বর্ণনা করেছিল শীলার শরীর। সোনালি তামাকের রঙের টান টান, চাবুক শরীর। কিছুটা রোমশও, আবার তা সত্ত্বেও মসৃণ। বড় উষ্ণ শরীর, একটা পর্যায় নদীর মতো ঘামে। তখন চোখ দুটো এত বড় হয়, যেন তা মানুষের চোখের কোটরে বাঘিনীর আইবল্। তখন কপালের টিপটাও যেন শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো ফড় ফড় করে বাড়তে থাকে। আর বুকেব...

BanglaBook.org

নীতিন আর শুনে উঠতে পারেনি বাকিটুকু। হঠাৎ বাথরুম করতে যাওয়ার বাহানায় উঠে গেছে। তারপর পাড়ার বারোয়ারি টয়লেট ফণীদের গ্যারেজ পাশের দেওয়ালের সামনে অকারণ থুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এই মাত্র শোনা কথাগুলোর মানে নিয়ে। আসলে নিজের মনে দেখতে লাগল সোনালি তামাকের রঙের শরীরটাকে। যার সঙ্গে ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দায় দাঁড়ানো শরীরটাকে মেলানো বেশ কঠিন। একই শরীর, অথচ পরিবেশ ও স্থানবিশেষে কত আলাদা। বহুক্ষণ এ-ভাবে দেওয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে শেষে বাড়ি চলে গেল নীতিন।

আর সেই রাতেই প্রথম আধা-ঘুম, আধা-জাগরণে শীলাকে দেখল নীতিন। ওর মনে হল ওর বন্ধুরা শুধু ডিকি গোমেসকেই নয়, ওকেও ঠকিয়েছে। এক মূর্খের পায়ের তলায় তো হামেশাই কোনও জমি নেই, শুধু জল; আরেক মূর্খের মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই, মেঘ নেই, আকাশ নেই, শুধু একটা বারান্দা।

মেডিক্যালের ছাত্র হবার প্রথম দিনগুলোর উত্তেজনায় বন্ধুদের মনে মনে ক্ষমা করে দিল নীতিন। ওর তখন বেশ কিছু সহপাঠিনী। কারও শাড়ি, কারও সালোয়র কামিজ, কারও লং স্কার্ট ওর ভালো লাগে; কারও হাসি, কারও রাগী, গোমড়া মুখ, কাও ফ্যালফ্যালে চাউনি ওর চোখ টানে। কিন্তু সন্ধেকালে রোয়াকে বসে ওর শোনা চাই রবিন নয়তো সুজয় নয়তো টমির মুখে শীলার কথা, শীলার বর্ণনা। কোনও দিন দুপুরে কাকে ভুনাকারি রেঁধে খাইয়েছে, কাকে পর্ক বিন্ধালু খাওয়ানোর কথা দিয়েছে, কাকে চুরি করে খাইয়েছে ডিকির আনা স্কচের বোতল থেকে এক পেগ জনি ওয়াকার। এরা সবাই এখন ডিকির ন্যাওটা। মস্তান ডিকি এখন ঘুষোঘুষি কমিয়ে পাড়ার এই সব কলেজ-করা ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটায়। জাহাজ থেকে ফিরে পার্টি জমায় এদের সঙ্গে। মাল টেনে বারোদুয়ারিতে বেহুঁশ হয়ে পড়লে এরাই কাঁধে করে তুলে দিয়ে যায় পাঁচ তলার আস্তানায়। টান টান করে শুইয়ে দেয় বিছানায়। তখন চোখবোজা ডিকি টিপিকাল সাহেবি অ্যাকসেন্টে বলে দেয়, থ্যাঙ্ক ইউ ব্রাদার, থ্যাঙ্ক ইউ।

নীতিন বুঝেছিল জাহাজি ডিকির পক্ষে শীলার ওপর বারোমাসি দখল রাখা অসম্ভব। ডিকি নিজেও জানত যে, ও আসলে এক জন পার্টটাইম স্বামী। খোলসা করে বলতে গেলে — এক জন সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান পার্টটাইম স্বামী।

এই ডিকিদা কাল বলতে গেলে জোর করে নীতিনকে টেনে নিয়ে এসেছিল ওর রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। সদ্য জাপান ট্যুর করে ফিরেছে জাহাজ। ডিকিদার পকেটভর্তি লাকি স্ট্রাইক সিগারেট। গায়ের র‍্যাংলার জ্যাকেটে উগ্র সেন্টের গন্ধ। মুখে হুইস্কির সোঁদা ঘ্রাণ। বোঝাই যায় ট্রিপের টাকা এখন উথলে উঠেছে পকেটে। তবু শেষবারের মতো মিনতি করল নীতিন, ডিকিদা থাক না। আরেক দিন হবে'খন।

হাত ছাড়েনি ডিকি। কবজিতে এখনও দেদার জোর। চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, আর কবে হবে নীতু? দেখছ না কত পাক ধরেছে চুলে? দাড়িও পেকেছে। এক দিনও তো বউদির সঙ্গে দেখা করতে এলে না। জানি ডাক্তার হচ্ছ শিগগির, তা বলে মুখ্যু দাদাদের ভুলে যাবে? তোমাকে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছিল কে?

হে ভগবান, তাই তো নীতিনের মনে পড়ল কবেকার সেই দিনগুলো। লাহাদের বড় ছাদে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়ানোর হাতে-খড়ি হয়েছিল এই ডিকিদার কাছেই। তখন চশমা হয়নি নীতিনের, কাচে জল লাগার সম্ভবনা ছিল না। কিন্তু ঘুড়ি উড়িয়ে একাগ্র চিত্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাসেরও শুরু সেই। তার অনেক দিন পর একবার চশমায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে ওপর চেয়ে এক নতুন খেলা শিখল নীতিন। গত সাত বছরে ফলে আর বিশেষ একটা বারান্দার দিকে নজর না তুলে ওর কিছুতেই মিন্টো লেন পার হওয়া হয় না।

BanglaBook.org

সেই থেকে কপালের ওপর এক গোছা চুলের মতো ঝুলে আছে একটা বারান্দা।

নীতিন ডিকির পিছন পিছন উঠে গিয়েছিল ১০ মিন্টো লেনের পাঁচ তলার ওই ফ্ল্যাটে।

গত কাল খুব দূরের ঘটনা নয় — নীতিন ভাবল একবার মনে মনে। খুব স্কচ খাইয়েছিল ডিকিদা, কিন্তু সন্ধেটা মন থেকে মুছে যায়নি। ওর গেলাসে মদ দিতে দিতে বলেছিল ডিকি, দিস ইস জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল নট রেড। এর জাতই আলাদা।

মদে ঢোক দিতে দিতে এক নজরে নীতিন দেখছিল শীলাকে। কে বলবে সাত-সাতটা বছর কেটে গেছে এর মধ্যে। তিন-তিনটে মিসক্যারেজ হয়েছে। ফলে মহিলা এখনও মা হননি। তার বেদনা কি কোথাও বাসা বেঁধেছে মুখে? নীতিনের ডাক্তারি চোখ কিছুতেই খুঁজে পেল না।

হঠাৎ নীতিনের প্লেটে কাবাব ঢালতে ঢালতে ডিকি বলল, জানো নীতু, আজ আমার বউয়ের জন্মদিন। শি ইজ থার্টি টুডে। কিন্তু আমি শালা তোমাদের বন্ধুদের কাউকে ইনভাইট করিনি। ওরা সবাই ব্রিটেয়ার। কেউ আমার পাশে দাঁড়ায়নি কখনও। শুধু পার্টি করতে এসেছে যখন আমি মোটা মোটা ক্যাশ নিয়ে এসেছি। যখন ফের জাহাজে গেছি সব শালা সুখের পায়রা উড়ে গেছে যার যেখানে খুশি। তোমার বউদির কোনও সুবিধে-অসুবিধে কেউ আসেনি দেখতে। শালা...।

একটা কাবাবের টুকরো গোটাই সেঁধিয়ে যাচ্ছিল নীতিনের কণ্ঠনালীতে। ডিকিদার অনুপস্থিতিতে কেউ আসেনি মানে! তখনই তো আসল মোচ্ছব চলত এ বাড়িতে। নীতিন প্লেট থেকে চোখ তুলে চাইল শীলার দিকে। দেখল শীলাও সেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে ওকে। ওর যে-দৃষ্টি প্রথম দেখেছিল সাত বছর আগের মেঘলা সকালে।

শীলার হাতে স্কচের গেলাস। কিন্তু আসল মদটা ওর চোখে। নীতিন চোখ নামিয়ে দিল। ডিকি ফের ওর গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, তুমি বড্ড স্লো যাচ্ছ ব্রাদার। কুইক। কুইক! শীলার জন্মদিনে আজ, আজ বটম্‌স আপ হতেই হবে।

বটম্‌স আপই হল। কিন্তু মেঝেতেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ল ডিকি। বোতলের সত্তর ভাগ একাই ধ্বংস করার সাক্ষাৎ প্রতিফল। ওকে ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে ফেলল শীলা আর নীতিন। স্বামীকে শোয়ানোর পর কী ভেবেই যেন ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল শীলা। বোধহয় রাতের আকাশের তারা দেখতে।

একটু পর ওর পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল নীতিন। শুনল ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বলছে শীলা, কাল দুপুরে একবারটি আসবে এখানে? অসুবিধা হবে?

অনেক দিন পর ফের গলা ভেঙে গেল নীতিনের ছোট্ট বাক্যটা বলতে, না না, আসব। কোনও অসুবিধে নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সাতটা বছরকে মাত্র সাতটা দিনের মতো ধরে ফেলতে পারছে নীতিন। আবার সবই ফসকে ফসকেও যাচ্ছে। আসল বস্তুটি যত কাছে আসছে স্মৃতিগুলো চশমার কাচে বৃষ্টির ফোঁটার মতো হয়ে পড়ছে। নীতিন কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল। নিশ্চয়ই ওর আসার ওপর বারান্দা থেকে নজর রেখেছে শীলা। হে ভগবান, শেষে এই দিনটাতেই ও চোখ তুলে এই কপালের ওপর চুলের গোছার মতো ঝুলে থাকা বারান্দাটাকে দেখতে ভুলে গেল।

শীলার পরনে কি সেই প্রথম দিনের লাল শাড়ি? অতশত বুঝতে পারল না নীতিন। শাড়ি নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। শীলা বলল, সকালে মাথা-টাথা ধরেনি তো?

নীতিন লজ্জায় হেসে ফেলল, না ও রকম আমার হয়-টয় না।

শীলা সম্ভবত ঠাট্টার ছলেই বলল, কী হয়-টয় তোমার?

বেশ ঝাঁঝের মাথায় নীতিন উত্তর করল, আমার কিছুই হয় না।

BanglaBook.org

সবজান্তা ভাব করে শীলা বলল, তা আমি জানি। সাত-সাতটা বছর দেখছি তো।

তার মানে! তুমি আবার কী দেখলে?

কেন, রাস্তা থেকে চোখ তুলে তুমিই শুধু দেখো। বারান্দা থেকে নিচে চেয়ে আমি কিছু দেখতে পাই না বুঝি?'

ও তাই। তা কী দেখতে পাও?

গুমোর! বাবু গুমোর!

গুমোর। নীতিন আকাশ-পাতাল হাতড়ে হদিশ পেল না ওর কোথায় কী গুমোর। কেনই-বা। শীলার সঙ্গে ওর কী টক্কর। ও আস্তে আস্তে গিয়ে বসল একটা মচমচে বেতের সোফায়। আর বলল, তাহলে ডেকে এনে কেন এ-কথা বলোনি আগে?

ফোঁস করে উঠল সেই আদি অকৃত্রিম থির বিজুরি, কী বলিনি? রবিন, সুজয়, টমি তোমাকে বলেনি আমি ডেকেছি?

মাথায় ওই গোল বারান্দাটাই ভেঙে পড়েছে বোধহয় নীতিনের। এত জনকে ডেকে খবর দিয়েছে, কিন্তু হারামিরা কেউ একটা জানায়নি ওকে। এত নিচ ওই তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেগুলো? ওর তথাকথিত বন্ধুগুলো?

কিন্তু মুখ দিয়ে নীতিনের বেরোল, হ্যাঁ, তা বলেছিল। পরাস্ত কণ্ঠে শীলা বলল, তাই না শেষে দাদাকে দিয়ে পাকড়াও করে আনতে হল।

একটা হালকা রোমাঞ্চ বোধ করল নীতিন। ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞ বোধ করল বন্ধুদের প্রতি। নাই-বা খবর দিয়েছে। না হলে এইভাবে, এই সমাদরে হয়তো আসা হত না সোনালি তামাকের রঙের...। নীতিন মনে মনে শীলার গোটা শরীরটাই দেখতে শুরু করেছে। হোক না পরের বর্ণনায় জানা, কল্পনাটা তো নিজের। চাইলেই তো এখন মিলিয়ে দেখা যায় বাস্তব আর কল্পনাকে। নীতিন বেতের সোফা ছেড়ে উঠে এসে বসল শীলার পাশের খাটে। একটা মৃদু চাপ দিল হাতে। চাপটা ফিরিয়ে দিতে দিতে শীলা বলল, তুমি তো ডাক্তার। একটা উপকার করবে?

কী উপকার বলো?

ক'টা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাবে এসে ক'দিন?

ইঞ্জেকশন! কী হয়েছে শীলার? প্রশ্ন তো নয়, কতগুলো চাপা উৎকণ্ঠা। যা মুখ গলে বেরোয় না।

শীলাই ফের বলল, তোমার দাদাই ধরে আনে রোগটা বাইরে থেকে। আর আমাকে দেয়। এই নিয়ে তিনবার হল। আমার আর ডাক্তারের কাছে যাবার মুখ নেই গো। গতবারই ওয়ার্নিং দিয়েছে এ-ভাবে চললে বিশ্রী কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ফের ধরেছে, লজ্জার কথা আমি কাকে বলব বলো তো?'

নীতিন শীলার হাত থেকে হাত তুলে নিয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কেন, বলেছ তো এক জনকে অন্তত। আমি কাল ওষুধ আর সিরিঞ্জ এনে ইঞ্জেকশন দিয়ে যাব তোমাকে। তবে তোমার আগের প্রেসক্রিপশনটা পেলে ভালো হয়।

শীলা বল, আছে। এই নাও — বলে ব্লাউজের হাত গলিয়ে বুকের ভেতর থেকে বার করে আনল একটা দলা পাকানো কাগজ। নীতিন বুঝল রবিন হোক সুজয় হোক টমি হোক বা সুবিমল ভুল বলেনি। যদিও কোনওটাই প্রমাণ নেই যে তারা বানিয়েও বলেনি। সুডোল কুমারী স্তন শীলার, সোনালি তামাক রঙের ত্বকও কুমারীর মতো অবয়সি, আপন উষ্ণতায় ও স্বেদে ভিজিয়ে ফেলেছে কাগজের টুকরোটাকে॥

BanglaBook.org

ভগীরথ মিশ্র

সম্পর্কপুরাণ

॥ ১॥

বার বার বলাৎকার বলছিস কেন? সহসা খেপে ওঠে হ্যারি, আর কতবার বলব তোকে যে, আমার কোনও দোষ নেই, নেহাত পাকেচক্রে পড়ে...।

পাকেচক্রে পড়েই তো ফেঁসে যায় সবাই। আমি হ্যারির মেজাজ দেখানোকে পাত্তা দিই না। বলি, জবরদস্তি মেয়েমানুষকে ভোগ করতে গেলে এমন পরিণতিই তো হয় অনেকেরই।

কী আশ্চর্য! হ্যারি খুব অসহায় চোখে তাকায় আমার দিকে, জবরদস্তিটা করলুম কখন? ওই মেয়েই তো বরং সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকত। এক দিন ওর বিছানায় না গেলে মুখ একেবারে হাঁড়ি হয়ে যেত ওর।

বলতে বলতে আমি লক্ষ্য করলাম, হ্যারির সারা মুখ পাকা আপেলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। সেটা অংশত অপমানে, অংশত কড়া হুইস্কির গুণে।

কী আশ্চর্য! আমার কাছে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল, তাহলে বলাৎকারের অভিযোগে তোর সাত বছরের জেল হল কেন?

সেটা তুই-ই মাথা খাটিয়ে বের কর। হ্যারি কাটা কাটা জবাব দেয়।

হ্যারির কেসটা বাস্তবিক ভারি গোলমেলে। মেয়েটা যাকে নিজের থেকেই বিছানায় টানত, তাকেই বলাৎকার করবার অভিযোগে কেন সাত সাতটা বছর জেল খাটল বেচারা! ভাবতে গিয়ে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায় আমার। মাথাটাকে সাফ করবার জন্যই আমি গেলাসে তৃতীয় বারের জন্য হুইস্কি ঢালি। পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে হ্যারির কেসটাকে নিয়ে দ্বিতীয় বার ভাবতে বসি।

প্রায় চল্লিশ বছর বাদে আচমকা দেশে ফিরে এসেছে হ্যারি, প্রায় মাসটাক আগে। ততক্ষণে তার সমস্ত অপকীর্তির খবর কীর্তিপুরের হাওয়ায় ভাসছে।

কীর্তিপুরের পাশের গ্রাম নৃসিংহপুর। সেই গ্রামের কুঞ্জ বোসের ছেলে আমেরিকার লাস ভেগাসে হ্যারির পাশের পাড়ায় থাকে। বৎসরান্তে বাড়ি আসার সময় সে-ই বয়ে এনেছিল খবরটা, কী না, হ্যারি নামক পাষণ্ডটি এক জন মহিলাকে বলাৎকার করবার দায়ে সাত বছর ধরে জেল খাটছে।

কথাটা শোনামাত্রই বিশ্বাস করল সবাই, কেন কি, হ্যারির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু না জানলেও ওর বাপের কীর্তির কথা তো সবাইয়েরই জানা। কাজেই, বাপকা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া/কুচ নহি তো থোড়া থোড়া — শাস্ত্রের এই বচনটিকে শিরোধার্য করে সবাই ষোলআনা বিশ্বাস করল কথাটা। সবাই ছিঃ ছ্যাঃ, ধিক্কারে সোচ্চার হল হ্যারির অজান্তেই। তারও প্রায় বছরটাক বাদে হ্যারি ফিরল দেশে।

হ্যারির পিতৃদত্ত নাম হরিপদ। ওর বাপ বঙ্কুবিহারী ছিল চিরকেলে ভবঘুরে। পায়ের তলায় সর্ষের দানা ছড়ানো থাকত ওর। তিলমাত্র ঘরে না থেকে দিন-রাত বিশ্বভুবন চষে বেড়াত। কখনও কীর্তন দলের সঙ্গে, কখনও যাত্রাদলের সঙ্গে। সুযোগ পেলেই সে আকাশের বেসামাল ঘুড়ির মতো ভো-কাট্টা হয়ে যেত। একবার নাকি হজযাত্রীদের সঙ্গে মক্কা যাবারও তোড়জোড় করছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে মৌলবিরা জেনে ফেলায়, মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছে। বিয়ে করেছিল ঠিক সময়ে। রাঙা টুকটুকে বউ। গাদাগুচ্ছের কাচ্চাবাচ্চাও হয়েছিল। কিন্তু বাইর যাকে অবিরাম টানছে তাকে বেশি দিন ঘরে আটকে রাখা তো মুশকিল। তার ওপর, গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল, পাশের চক্কোত্তিপাড়ার এক মাঝবয়েসি পৃথুলা মেয়ের সঙ্গে লটরপটর জুড়ে দিয়ে সে

BanglaBook.org

এক কেলো! যে শোনে, সে-ই ছিঃ ছ্যা করে। ছেলে-মেয়েগুলো লজ্জায় স্কুলে অবধি যেতে পারে না। রাঙা টুকটুকে বউ বার-দুই সিলিং ফ্যানে ঝুলতে ঝুলতে ঠিক সময়ে নামিয়ে নেওয়ায় বেঁচে গেল। চতুর্দিক থেকে বন্ধু-স্বজনের ধিক্কারে অতিষ্ঠ হয় এক দিন বঙ্কুবিহারী দেশ ছাড়ল। তার বাড়ি-পালানোটা সবাইয়ের কাছে এমনই জলভাতের তুল্য ছিল যে, ওই নিয়ে কেউ বড়ো একটা তাজ্জব হল না। তাজ্জব হল তখনই, যখন মাস ছয়েক বাদে বঙ্কুর চিঠি এল খোদ আমেরিকা থেকে। ওই চিঠির থেকেই জানা গেল, কোন এক জাহাজে কুলির কাজ জুটিয়ে নিয়ে বঙ্কু সটান আমেরিকায় গিয়ে হাজির হয়েছে।

বঙ্কুর ছোটো ছেলে হরিপদ ছিল আমার শৈশবের বন্ধু। আমরা ছেলেবেলায় একত্রে অনেক দুষ্টুমি করেছি। এক ধরনের ভবঘুরে ব্যাপার ছিল হরিপদর মধ্যেও। এমনিতে বাপের থেকে এলোমেলো ঘুরে বেড়ানোটা হরিপদর রক্তে মিশেছিল। তার ওপর বাড়ির কর্তা না থাকায় তার হয়েছিল পোয়াবারো। সারাক্ষণ টো-টো ঘুরে বেড়ানোতেই ছিল তার আনন্দ। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে যেত। আবার হপ্তাটাক বাদে ফিরে আসত। এক দিন, তখন হরিপদর বোধ করি বছর পনেরো বয়েস, ওর বাপটা ফিরে এল। কোট-প্যান্ট পরে, বাহারি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখে সে তখন পুরোপুরি সাহেব। তাকে দেখে গোটা কীর্তিপুরের মানুষ তো থ।

তবে সে-যাত্রা বেশি দিন নিজের বাড়িতে থিতু হয়নি বঙ্কুবিহারী। যেমন হঠাৎই এসেছিল, হঠাৎই চলে গেল। তবে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল ছোটো ছেলে হরিপদকে। আগে থেকে কিচ্ছুটি জানায়নি কাউকে। পাছে বউ কেঁদে বুক ভাসায়। যাবার বেলায় একটা চিঠি রেখে গেল বালিশের তলায়। কী না, আর কোনও দিন দেশে ফিরব কি না ঠিক নেই। যদি ও-দেশেই আমার দেহান্ত হয়, তবে ওই গরুখেকোদের দেশে আমার মুখে আগুন দেবে কে? ম্লেচ্ছদের দেশে থাকলেও নিজের ধম্মকে তো পরিত্যাগ করতে পারিনে। তাই হরিপদকে নিয়ে চললাম। দেহান্তে ও-ই আমার মুখে আগুন দেবে। হরিপদর সম্পর্কে কীর্তিপুরের মানুষ বলাবলি করল, কী না, জানতাম ও যাবেই। বাপের রক্ত থেকে পাওয়া উড়ে বেড়াবার স্বভাবটা যাবে কোথায়? বাপ না নিয়ে গেলে ও ছেলে নির্ঘাত নিজেই কোনও দিন গৃহত্যাগী হত।

তো, বাপের রক্তের দোষের প্রমাণ করে সেই যে এক দিন বাপের সঙ্গে গৃহত্যাগী হল হরিপদ, আর ফিরল না। বছরটাক বাদে ওর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। ওই চিঠির থেকেই জেনেছিলাম, বাপের সঙ্গে হাজির হয়েছে সে আমেরিকায়। ওই চিঠিতেই হরিপদ লিখেছিল, বাপ তার নাম বদলে রেখেছে হ্যারি। হরির জায়গায় হ্যারি। ওই চিঠিতেই সে আরও জানিয়েছিল, সে আর কখনওই দেশে ফিরবে না। কেন কী, আমেরিকা দেশটাকে তার নাকি খুবই ভালো লেগে গিয়েছে। তার মতে, দেশটা নাকি সব দিক থেকেই ভারি মজার। যে-কেউ যাকে তাকে যখন তখন বিয়ে করতে পারে। বিয়ে না করেও এক সঙ্গে থাকতে পারে আজীবন। এ-দেশের মতো অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই ও-দেশে। ও হরি, ও-দেশে গিয়ে তবে ওই মধুতে আটকে গিয়েছে আমাদের হরি। কীর্তিপুরের মানুষ ভাবল। তা, এমন মধুতে কাত সে হতেই পারে। বাপের রক্ত যাবে কোথায়?

কিন্তু পাক্কা চল্লিশ বছর বাদে এক দিন আচমকা দেশে ফিরল হ্যারি। তখন তার শরীর জুড়ে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। মাথার চুলগুলোকে রঙ দিয়ে করে তুলেছে বাদামি। ওর অপকীর্তির কথা কুঞ্জ বোসের ছেলের থেকে শুনেছিলাম বছরটাক আগেই। কিন্তু সব সংশয়ের অবসান ঘটল, যে-দিন হ্যারি এক দিন একান্তে আমার কাছে নিজমুখে স্বীকার করল ব্যাপারটা।

বাস্তবিক, ছেলেবেলায় আমিই ছিলাম হ্যারির অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এত কাল বাদে দেশে ফেরার পরেও দেখলাম, ওই বয়েসের বন্ধুত্বের কথা সে ভোলেনি এক তিল। বরং দেশে ফিরে আসার পর

BanglaBook.org

সে ওই বন্ধুত্বটাকে পুনরায ঝালিয়ে নিতে চাইছে। যদিও প্রথম সাক্ষাতে ওকে হরি বলে ডাকায় সে খুবই বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল, হরি নয় ভাই, আমার নাম হ্যারি।

তত দিনে আমারও পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়েস। ছেলেবেলার সেই অন্ধ আবেগ আর নেই। এখন আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়ে মেপে মেপে পা ফেলি। কাজেই, হ্যারির সঙ্গে আবার পূর্ববৎ মেশামেশি করতে গিয়ে আমি এক পা এগোই তো দু-পা পেছোই। কেন কী, যে-লোক বিদেশে গিয়ে মেয়ের ইজ্জত লোটার দায়ে জেল খেটেছে, তার সঙ্গে মেলামেশা জুড়লে এলাকার মানুষ নির্ঘাত নাক সিঁটকোবে।

কিন্তু হ্যারি অতশত বুঝতে চায় না। সে যেন-তেন-প্রকারেণ আমার ঘনিষ্ঠ হতে চায়। ইদানীং সন্ধের পর দু'জনে গিয়ে পানশালায় বসি। তার মোটামুটি দুটো কারণ। এক আমেরিকা-ফেরত হওয়ার সুবাদে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হ্যারিই পানশালার খরচটা মেটায়। দুই, পানপাত্রে মজিয়ে দিয়ে ওর পেটের থেকে আসল কথাটা বের করতে চাই আমি। মদের নেশায় চুর হয়ে যদি ও ওর অপকীর্তির কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ ব্যাখ্যা করে শোনায় আমাকে।

আমার প্রথম উদ্দেশ্যটা রোজদিনই পূরণ হচ্ছিল। দ্বিতীয় কারণটাও বুঝি পূরণ হতে চলেছে আজ।

॥ ২ ॥

বিকেল থেকেই হ্যারিকে কেমন জানি অস্থির লাগছিল। কেমন জানি মনমরা লাগছিল ওকে। সন্ধের পর পানশালায় গিয়ে দু'পাত্র পেটে পড়তেই সে একেবারে হেদিয়ে পড়ল। এক সময় ছিপিখোলা সোডার বোতলের মতো হুড়মুড়িয়ে বেরোতে থাকল তার আক্ষেপগুলি।

মনটা একেবারেই ভালো নেই রে ভোম্বল।

কেন? আমি গলায় দরদ মিশিয়ে শুধোই, বেশ তো হেসে-খেলে কাটাচ্ছিস।

না রে, মোটেই ভালো নেই আমি। বলতে বলতে হা-হুতাশ জুড়ে দেয় হ্যারি, বেশ ভালোই ছিলাম ও-দেশে। পাকেচক্রে এমন একটা কাণ্ড না ঘটে গেলে —।

আমিও তো সেটাই ভাবছি ক'দিন। এতক্ষণে আমি আসল কথাটা পাড়বার সুযোগ পেয়ে যাই, বেশ তো বউ-বাচা নিয়ে বহালতবিয়তেছিলি ও-দেশে। আচমকা একটা মেয়ের ইজ্জত লুটতে গেলি কেন? সুখে থাকতে ভূতে কিলোল কেন তোকে?

তা ঠিক। সুখেই ছিলাম। বিড় বিড় করে স্বীকার করে হ্যারি, বউটা আমাকে বড়োই ভালোবাসত।

তাহলে এমন মরণদশা কেন ধরল? আমি সরাসরি শুধিয়ে বসি।

তখন বুঝি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পাত্র চলছে হ্যারির। চোখ দুটো সামান্য ঢুলু ঢুলু। গলাটা সামান্য জড়ানো। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবে কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। এক সময় বলল, বলতেই তো চাই, কিন্তু তুই যে কী-ভাবে নিবি ব্যাপারটাকে।

বলতে বলতে কেমন জানি একটু একটু করে নিভে যাচ্ছিল হ্যারি। পানের মাত্রাটা সহসা বাড়িয়ে দেয়। এক সময় মৃদু গলায় বলে, কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই, ইচ্ছে করে আমি কোনও যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়াইনি। স্রেফ পাকেচক্রে...।

আচ্ছা — আমি ওকে সরাসরি প্রসঙ্গে আসার জন্য প্ররোচিত করি, যাকে বলাৎকার করবার অপরাধে তুই জেল খাটলি, সে কি পাশের অ্যাপার্টমেন্টেই থাকত? নাকি দূরে কোথাও?

আরে, না না। সে থাকত আমাদেরই বাড়িতে।

তোদের বাড়িতে? কেন? তবে কি সে তোর কোনও আত্মীয় ছিল?

আত্মীয় বৈ কী।

BanglaBook.org

কে? তোর সঙ্গে কী সম্পর্ক তার?

মুখটাকে মাটির দিকে নামিয়ে খুব অপরাধী গলায় হ্যারি বলে, সে ছিল আমার দিদিমা। অর্থাৎ আমার মায়ের মা।

তোর মায়ের মা! আমি তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকি ওর মুখের দিকে, ও — তার মানে, তোর বাপটা আবার ও-দেশে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল? তারই মা? আর, তাকেই কিনা তুই — । ওরে তার বয়েস তো না-হোক...।

না না। হ্যারি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তুই যতটা ভাবছিস, অতটা নয়। তাছাড়া তার শরীরেও বাঁধুনিও ছিল দেখার মতো।

সে না হয় হল। আমি একটু করে ধাতস্থ হই, কিন্তু তোর দিদিমা তোর বাড়িতে থাকত কেন? ওর স্বামী ছিল না বুঝি? দু'দিকে লম্বা করে মাথা নাড়িয়ে হ্যারি বলে, ওর স্বামী মারা গিয়েছে সেই কবে।

বুঝেছি। সেই থেকে মহিলা তোদের কাছেই ছিল। বলতে বলতে দু'চোখ কপালে উঠে যায় আমার, আর সেই মহিলাকে কিনা... তুই তো... তুই তো... তুই তো একটা পাষণ্ড রে। বলতে বলতে থেমে যাই আমি। কটমট করে তাকাই হ্যারির দিকে। এক সময় একান্তে গলায় শুধোই, খুব সুন্দরী বুঝি?

আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয় না হ্যারি। কেবল সমর্থনের মুদ্রায় মাথাটা দোলাতে থাকে। আর সেই মুহূর্তে তার সারা মুখে এমন এক জাতের মুগ্ধ মুগ্ধ ভাব ফুটে ওঠে যে, মহিলার রূপটা তাতেই বুঝি আঁকা হয়ে যায় চোদ্দআনা।

ওর মুগ্ধতাকে বড়ো একটা পাত্তা দিই না আমি। খুব ক্যাটক্যাটে গলায় বলি, তা হোক, যত সুন্দরীই হোক, তাই বলে নেহাত পশু না হলে দিদিমাকে কেউ বলাৎকার করে!

সে-কথায় কেমন অসহায় চোখে তাকায় হ্যারি, ভেজা গলায় বলে, বার বার বলাৎকার বলছিস কেন? বলছি তো, ও-ই সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকত। ওর একেবারে পূর্ণ সম্মতিতেই —।

তা হোক। আমার সংস্কারবদ্ধ মন কিছুতেই সায় দিতে চায় না ব্যাপারটাতে। বলি, স্বামী-হারা একটি মেয়ের মতিভ্রম ঘটতেই পারে। তাই বলে কোন আক্কেলে এমন সম্পর্কের এক জন মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করতে গেলি তুই! নাঃ, এমনটা স্রেফ ভাবা যায় না।

তুই ঠিক বুঝতে পারছিস না ভোম্বল। গাঢ় বেদনায় কঁকিয়ে ওঠে হ্যারি। এক সময় সে সোজা হয়ে বসে। ঢুলু ঢুলু চোখ দুটোকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে তোলে। এক সময় বলে, তাহলে তোকে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলতে হয়। শুনবি তুই? শুনতে চাস?

কী শুনব বল দেখি? খুব হতাশ গলায় বলি আমি, বুঝতে পারছি, তুই তোর অপকর্মের সমর্থনে কিছু যুক্তি পেশ করতে চাইছিস। এমন একটা জঘন্য কাজকে জাস্টিফাই করতে চাইছিস।

আহা! মাঝ পথে আমাকে থামিয়ে দেয় হ্যারি। বলে, পুরোটা শোন তো আগে।

এক সময় শুরু করে হ্যারি।

ওখানে থাকতে থাকতেই আমি এক সুন্দরী বিধবার প্রেমে পড়লাম। একমাত্র সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে সে একাই থাকত। তার রূপে আমি এমনই পাগল হয়ে গেলাম যে, এক দিন ওকে বিয়ে করে ফেললাম। অকালে স্বামীকে হারিয়ে একেবারে অকূল সাগরে পড়েছিল। আমাকে পেয়ে বুঝি বর্তে গেল। তো, বিয়ের পর তার সুন্দরী কন্যাটিও চলে এল আমাদের কাছে। সৎমেয়ে হলেও সে ছিল আমার নিজের মেয়ের মতো। খুবই ভালোবাসতাম ওকে। এমনই ছি তার রূপ, যে দেখত, সেই-ই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত।

BanglaBook.org

কিছু দিন বাদে বুঝতে পারলাম, আমার বাবাই ওর প্রেমে পড়েছে। তুই তো বোধ করি শুনেছিস, ও-দেশে পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশাতে কোনও বাধাই থাকে না। রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্য জায়গায় মেয়ে-পুরুষ গলা-টলা জড়িয়ে চুমু-টুমু খায় অবলীলায়। এমনকী প্রকাশ্য পার্কে শত জনের সামনেই জোড়ায় জোড়ায় জড়াজড়ি করে লটর-পটর জুড়ে দেয়। কেউই ওই নিয়ে মাথা ঘামায় না। কাজেই আমার সৎমেয়ের সঙ্গে বাবার লটর-পটর নিয়ে কেউই তেমন মাথা ঘামাল না। তার কিছু দিন বাদে অবশ্য আমার বাবাই ওর মেয়েকে বিয়ে করে বসল।

সে কী! একটা মেয়ের বয়েসি মেয়েকে?

সে-কথায় হ্যারি আলতো হাসে, ও-দেশে ওটা আকছার হয় রে। পঁচাশি বছরের বুড়ো পঁচিশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করছে, ও-দেশে ওটা নেহাতই জলভাত।

বুঝেছি। প্লেটোনিক লাভ।

কী লাভ বললি?

প্লেটোনিক লাভ। বুড়োটাকে নিয়ে তোর মেয়ের কচি বয়সের প্লে, আর মেয়েটা তোর বাপের বুড়ো বয়েসের টনিক। দুয়ে মিলে প্লে-টনিক। যাগ্‌গে। আসল কথায় আয়। তোর বাবা যা করল, তা তো শুনলাম। কিন্তু অমন অপকর্মটা করলি কেন?

সেটাই তো বলতে যাচ্ছি। সবটা শোন আগে। তো, বাবা আমার সৎমেয়েকে রাতারাতি বিয়ে করবার ফলে ওই মেয়েটি হয়ে গেল আমার সৎমা। হল কি না?

তা তো হলই। আমি বিস্ফারিত নেত্রে বলে উঠি, কিন্তু তুই যে সেই বেতাল পঞ্চবিংশতির গপ্পো জুড়লি রে!

কে বেতাল? কী তার গপ্পো? হ্যারি বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

বলি, গপ্পোটা ওরিজিন্যালি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের। আর, বেতাল নামে একটা ভূত রোজ ওঁর ঘাড়ে চেপে ওঁকে কিছু ক্যানটাংকারাস প্রশ্ন শুধোত। তারই একটা গল্পে রয়েছে এমনটা। সেখানেও এক রাজা ও তার ছেলে এমনিতর কাণ্ডই করেছিল। মাকে বিয়ে করেছিল রাজপুত্র, আর মেয়েকে বিয়ে করেছিল রাজা। এই গল্পেও এমনিতর ক্যানটাংকারাস ব্যাপার-স্যাপারই ঘটেছিল।

আমার কথাগুলো প্রায় গোগ্রাসে গিলছিল হ্যারি। এক সময় আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, বিচারে কি ওই রাজপুত্তুরের জেল হয়েছিল?

না না, জেল হবে কেন?

হয়নি তো? বলতে বলতে বহু কষ্টে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে হ্যারি, এ-দেশে থাকলে হয়তো আমারও হত না, কিন্তু ও-দেশের আইনকানুন যা কড়া না!

বলাৎকারের সাজা সব দেশেই কড়া।

আবার বলছিস বলাৎকার! হ্যারি প্রায় খেপে ওঠে, পুরো কাহিনিটা শোন তো আগে। যা বলছিলাম, বাবাকে বিয়ে করবার পর আমার সৎমেয়ে যে কেবল আমার সৎমাই হল তাই নয়, সে মেয়ে হল কিনা ওর নিজের মায়ের শাশুড়ি। অর্থাৎ আমার বউ হল ওর পুত্রবধূ। আর আমি হলাম আমার বাবার শ্বশুর। আমার স্ত্রী হল ওর নিজের শ্বশুরের শাশুড়ি। বলতে বলতে করুণ হয়ে আসে হ্যারির চোখ-মুখ, ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস ভাই?

পারছি বৈ কী। ভারি বিদঘুটে ব্যাপার।

বিদঘুটের এখন হয়েছে কী। এর পরের ঘটনা শুনলে তোর পিলে চমকে যাবে।

BanglaBook.org

কিন্তু তোর বিদঘুটে সম্পর্কের গপ্পো শুনে আমার লাভ কী? আসল কথায় আয় না জলদি। নিজের দিদিমাকে কেন...।

তোর দেখি সবুর সয় না এক তিল। হ্যারি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়। সামলে নেয় দ্রুত। শুরু করে ফের, এর পরে কী হল জানিস, এক দিন আমার সৎমেয়ের মানে সৎমার একটি ছেলে হল।

গুড, আমি এমন শুভ ঘটনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবার জন্যই বলে উঠি।

গুড না তোর মুন্ডু! এখন বল দেখি, ওই ছেলেটি সম্পর্কে আমার কী হল ?

ইয়ে... তোর ভাই-ই হবে।

হ্যাঁ, আমার বাবা আর সৎমায়ের ছেলে যখন, ভাই তো হবেই। কিন্তু আমি তো তত দিনে আমার বাবার শ্বশুর হয়ে বসে আছি। কাজেই, আমার সৎমেয়ের ছেলে হওয়ার সুবাদে সে হল আমার নাতিও। অর্থাৎ কিনা, আমি হলাম ওর দাদু। হলাম কি না?

তা ... ইয়ে... তোকে ওর দাদুও বলা যায়।

বলা যায় মানে? হ্যারি সহসা খেপে উঠল, আমাকে দাদু আর আমার বউকে দিদিমা বলে ডাকেনি বলে সৎমেয়ের কী হম্বিতম্বি ওর ওপর! কিন্তু এরপর যা হল, তা এই সব কিছুর কাছে নস্যি।

আবার কী হল? আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি।

কিছু দিন বাদে আমাদেরও একটি ছেলে হল।

বাঃ। আমি তারিফ করি।

তুই বাঃ বলছিস?

বাঃ, বিদেশে তোর পুত্রলাভ হল, বাঃ বলব না?

পুত্রলাভের হ্যাপাটা শোন তো আগে। আমার ছেলে আমার বাবাকে ঠাকুরদা আর আমার (সৎ) মাকে ঠাকুমা বলতে গিয়েই হোঁচট খেল। কেন কী, আমার সৎমা গাল ফুলিয়ে বলে উঠল, ঠাকুমা বলছিস যে বড়ো? তুই না আমার ভাই। আমার মায়ের পেটেই না জন্ম তোর?

বোঝো ঠ্যালা! আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

ঠ্যালার এখন হয়েছে কী? এখন তো সবে কলির সন্ধে। হ্যারি চোখ মটকায়, সবটুকু শোন তো আগে। তো, আমাদেয় ছেলে হল আমার সৎমেয়ের সৎভাই। অর্থাৎ আমার সৎমেয়ে হল তার সৎবোন, আবার ঠাকুমাও বটে। সেটা এমন কিছু নয়, কিন্তু শুনে তুই আঁতকে উঠিস নে ভাই, আমার ছেলেটি হল আমার বাবার শালা।

কী করে?

কী করে মানে? বউয়ের ভাইকে কী বলে?

শালা।

আমার ছেলে আমার বাবার বউয়ের কে?

ভাই। এতক্ষণে বুঝেছি। এঃ হে,এ যে একেবারে কেলেঙ্কেরিয়াস ব্যাপার।

সবুর ধর বন্ধু, এর চেয়েও কেলেঙ্কেরিয়াস ব্যাপার রয়েছে। আচ্ছা, গোটা ব্যাপারটা এবার একটুখানি সাম-আপ করি। আমি আমার বাবার শ্বশুর কেন কী, সে আমার সৎমেয়েকে বিয়ে করেছে। আর আমার ছেলে হল গিয়ে আমার বাবার শালা। অর্থাৎ কিনা আমার বাবা হল গিয়ে আমার ছেলের ভগ্নীপতি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস তো?

এতক্ষণে আমি করজোড়ে বলে উঠি, আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে ভাই।

এতেই মাথা ঘুরতে লেগেছে তোর? হ্যারির সারা মুখে ফুটে ওঠে তাচ্ছিল্য।

BanglaBook.org

হ্যাঁ ভাই। তুই আর বেশি এগোলে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি। তার চেয়ে তুই সরাসরি পয়েন্টে আয়। একটুখানি খোলসা করে বল, কেন তুই নিজের দিদিমার ইজ্জত লুটলি?

সেটাই তো বলছি। আমার ব্যাকুলতাকে তিলমাত্র পাত্তা না দিয়ে হ্যারি বলে চলে, আচ্ছা বল তো, আমার সৎমায়ের মা আমার কে?

তোর দিদিমা।

রাইট। আমার দিদিমার স্বামী আমার কে?

দাদু।

ভেরি গুড। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস, আমি স্বয়ং হলাম আমার দাদু।

অ্যাঁ! এ তুই বলছিস কী হ্যারি? আমার দু'চোখ ততক্ষণে কপালে উঠেছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। বলি, তুই নিজেই তোর দাদু হবি কী করে? তাই আবার হয় নাকি? কোনও মানুষ নিজেই নিজের দাদু হতে পারে?

হলাম তো। তোর সামনেই তো ঘটল ব্যাপারটা।

আমার সামনে আর ঘটল কই? আমি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলি, বিদঘুটে ব্যাপারটা তো ঘটেছে আমেরিকায়। আমার সামনে ঘটলে কি আর আমি এই অনাসৃষ্টির ব্যাপার ঘটতে দিই?

যাগ্‌গে। দু'হাতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে হ্যারি, আচ্ছা, এবার বল দেখি, আমার দিদিমা কে?

তোর সৎমায়ের মা।

সে ওরিজিন্যালি আমার কে?

তোর ব-ব-ববউ...।

আরে বউ তো বটেই, কিন্তু (সৎ) মায়ের মা হওয়ার সুবাদে সে আমার দিদিমাও কি না?

একটুখানি ভেবে নিয়ে বলি, হ্যাঁ, তা-ও বটে।

এবার বল তো, দিদিমার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আমি কী অন্যায়টা করেছি? সে তো আমার বউ, নাকি?

আমি ততক্ষণে একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছিলাম। ফ্যাল ফ্যাল চোখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলি, ঠিকই তো আছে। তুই তো হরে-দরে তোর বউয়ের সঙ্গেই সহবাস করেছিস। এতে দোষটা কোথায়?

দোষের কিছু নেই তো? কিন্তু সেটা কোর্টকে কে বোঝায়!

কী আশ্চর্য, কোর্টকে তুই বোঝাতে যাবি কেন? নিজের বউয়ের সঙ্গে সহবাস করবার জন্য কোর্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে লাগে নাকি?

কিন্তু আমাকে দিতে হয়েছিল। চরম বিরক্তিতে ভেঙে যায় হ্যারির ঠোঁট জোড়া।

কী বোকা! আমি দু'চোখ দিয়ে ভর্ৎসনা করি হ্যারিকে, কোর্টে তুই গেলি কেন?

আমি কোন দুঃখে যাব? কোর্টে তো গেল আমার বউ।

কেন?

সে তত দিনে আর একটি ভোমরার প্রেমে পড়েছে। কাজেই ঠুকে দিল ডিভোর্সের মামলা।

সে কী! তোর বিরুদ্ধে চার্জটা কী আনল?

এমনিতে কোনও ভ্যালিড চার্জ তো আনতে পারে না, কিন্তু সব দেশের উকিলই তো একই ধাতুতে গড়া। বানিয়ে নিল নিজের মতো পয়েন্ট। কী না, আসামি তার গ্র্যান্ডমাদারের সঙ্গে শোয়।

ইস্, যাহোক একটা বানিয়ে নিলেই হল? তুই কোর্টে বুক ফুলিয়ে বললিনে কেন যে, তুই তোর বউয়ের সঙ্গেই সহবাস করিস।

কেমন করে বলব? হ্যারির মুখটা দুঃখে এতটুকু হয়ে আসে, কোর্টে উকিল আমাকে সে-সুযোগ দিল কই? জেরা করবার সময় আমাকে শুধোল, মি. হ্যারি, আপনি বলুন তো, আপনি আপনার

BanglaBook.org

গ্র্যান্ডমাদারের সঙ্গে সহবাস করেন কি না? এক কথায় জবাব দিন। ইয়েস অর নো। বুঝতেই পারছিস, সত্যের খাতিরে আমাকে ইয়েসই বলতে হল। যেই না বলা, অমনি রায় লেখা হয়ে গেল, আমার সাত বছরের জেল। বলতে বলতে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকায় হ্যারি। বলে, তোর ওই গল্পের রাজারও কি জেল হয়েছিল?

নাঃ। গেলাসের মালটুকু এক নিমেষে শেষ করে আমি উঠে দাঁড়াই।

তাহলে? দু'চোখে রাজ্যের আকুতি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে হ্যারি, তবে কি ফাঁসি?

নাঃ। আমি আলগোছে জবাব দিই।

তবে?

বেতালের সহায়তায় তিনি জম্বুদ্বীপ ও পাতাল-সহ সমগ্র পৃথিবীর রাজা হলেন।

যাঃ। কী যে বলিস!

কেবল রাজাই নয়, তিনি হলেন রাজ চক্রবর্তী।

অ্যাই, তুই নির্ঘাত গুল মারছিস।

আর ওই সঙ্গে পেলেন শিবের থেকে দিব্য খড়গ।

কী বলছিস তুই! একই অপরাধে এক জনের এত এত পুরস্কার, আর অন্য জনের সাত বছরের জেল!

কী আর করা যাবে! যস্মিন দেশে যদাচার।

এই, একটা কথার জবাব দিবি? হ্যারি প্রায় হামলে পড়ে।

কী?

রাজা বিক্রমাদিত্যের উকিলটা কে ছিল জানিস?

জানি বৈ কী।

এই, বল না রে নামটা।

শিবদাস।

শিবদাস কী? উকিলের পদবি একটা রয়েছে তো।

না, তাঁর নাম শুধুই শিবদাস।

কোথায় থাকেন?

আমার তখন খুব নেশা হয়ে গিয়েছে। হ্যারির প্রশ্নের জবাবে ডান হাতের তর্জনীটা ওপরের দিকে তাক করি।

বলিস কী! এই বাড়িরই দো-তলায়। চক চক করে ওঠে হ্যারির চোখ দুটো, ইস, আগে নামটা জানলে কী উপকারই না হত আমার।

কী উপকার হত শুনি? জড়ানো গলায় শুধোই আমি।

ওকেই এ-দেশ থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মামলাটা লড়তাম। এঃ হে, নিজের দেশে এত বড়ো উকিল থাকতে খামোখা সাত সাতটা বছর জেল খাটলাম আমি!

বলতে বলতে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ায় হ্যারি। বলে, চল তো, একটি বার দেখা করি ভদ্রলোকের সঙ্গে।

আমি নেশার ঘোরে আলতো হাসি, এখন আর দেখা করে কী হবে? সাত বছর তো জেল খাটা হয়েই গিয়েছে।

তা হয়েছে, তবে বলা যায় না, এত বড়ো উকিল যখন, কোনও একটা আইনি বুদ্ধি ফেঁদে ফেলতেও পারে। বড়ো বড়ো উকিলরা তেমনটা পারে, বুঝলি। এমনকী আমি শুনেছি, মক্কেলের ফাঁসির অর্ডার

BanglaBook.org

হলেও তারা বুক বাজিয়ে বলে, আমার ফি-টা আগাম মিটিয়ে দিয়ে তুমি ফাঁসিকাঠে ঝুলে পড়ো, আমি তোমার হাড় নিয়ে হায়ার কোর্টে লড়ে যাব। চল, চল।

হ্যারির যেন আর তিলমাত্র তর সয় না। বলে, সন্ধান যখন পেলাম, আলাপটা সেরে রাখি। বলা যায় না, ও-দেশে ফিরে গিয়ে আবার যদি এমনতর প্যাঁচে পড়ি, তখন ওঁকেই নিয়ে গিয়ে মামলা লড়াতে পারব॥

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

উজান

এক

মন যে কখন কী চায়, মনহ কি জানে! এই যে প্রতিবার পুজোর ছুটিতে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে নন্দিতা, অথচ বাইরে এসে ক'দিন যেতে না-যেতেই কলকাতায় জন্য মন উথাল-পাথাল, আবার এই যে ফেরার পথে বুকের ভিতর আরেকটা অন্য রকম দানা দানা কষ্ট, এ-রকম কেন হয়! এ-সব সময়ে নন্দিতার স্নায়ু বড় বেশি টান টান হয়ে থাকে। একটু টোকা পড়লেই বিস্ফোরণ। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

শেষ মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোচ খুঁজে সিট বার্থের দখল নেওয়ার আগেই ছেড়ে দিয়েছিল ট্রেনটা। একটু আগের চাপা ভিড় অনেকটা হালকা হয়ে এলেও, এখনও এ-দিক ও-দিক ঘুরছে যাত্রীরা, নিজেদের মালপত্র সামলাচ্ছে।

শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নন্দিতাও স্যুটকেস, হোল্ডঅল, খাবার প্যাকেট সব তুলে রাখছিল বাঙ্কের উপর, এমন সময় হঠাৎই পাশে রাখা স্যুটকেসটার গায়ে চোখ আটকে গেল তার। ছাই রঙ স্যুটকেসের গায়ে কালো-সাদা স্টিকারে জ্বল জ্বল করছে নামটা। রাকা রায়। নামটা বড় চেনা চেনা না। নন্দিতা পলকের জন্য থমকাল। পলকের জন্যই। পরক্ষণেই মন চলে গেছে অন্য দিকে। তাদের জানলার ধারের সিটটায় বসে আছে এক অবাঙালি তরুণ। গাঁট্টাগোট্টা। বছর চব্বিশ বয়স। ছেলেটা এখানে কেন! এ সিটটা তো নন্দিতাদের। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার নিজেদের বার্থ নাম্বারগুলো মিলিয়ে নিল নন্দিতা। একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ। ঠিকই আছে। জানলার সিটটা তাদেরই। ছেলেটাকে উঠে যেতে বলবে। ভাবতে গিয়েই নন্দিতার খেয়াল হল, রিমলি পাশে নেই। গেল কোথায়! এই তো ছিল। নন্দিতা ছটফট করে উঠল, রিমলি, রিমলাই-ই...।

নন্দিতার মেয়ে সাড়া দিল পাশের কুপ থেকে, এই যে মা, আমি এখানে।

ওখানে কী করছিস তুই!

কিছু না। জানলার ধারে বসে আছি।

ওখান থেকে কোথাও যেও না যেন।

নন্দিতা অবাঙালি ছেলেটার পাশে বসে ওয়াটার বটল খুলে দু'ঢোক জল খেল। জানলার বাইরে বিকেলের রোদ এখন ঝকমকে পিতলবরণ। সেই রঙ মেখে দ্রুত পিছনে যাচ্ছে দিল্লির শহরতলি। হারিয়ে যাচ্ছে। নন্দিতার বুকটা আবারও হু-হু করে উঠল। কোনও কিছু ফেলে যাওয়া সব সময়ই বড়

BanglaBook.org

কষ্টের। সবারই কি এ-রকম খারাপ লাগে। নাকি শুধু নন্দিতারই। জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নন্দিতা নিজেদের কুপটায় চোখ বোলাল আর একবার। নন্দিতা আর শ্যামলেন্দুর মুখোমুখি সামনের সিটে, অল্পবয়সি এক স্বামী-স্ত্রী। দেখেই বোঝা যায় নতুন বিয়ে হয়েছে। একটু ঘন হয়ে বসে এর মধ্যেই পরস্পর মগ্ন হয়ে গেছে কথায়। খুব ঝলমলে একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে মেয়েটি, হাতভর্তি এত কাচের চুড়ি। ওদের পাশে, জানলার ধারের মহিলাটি নন্দিতারই সমবয়সি প্রায়, রীতিমতো সুন্দর। টকটকে ফর্সা রঙ। চোখ দুটো বেশ বড় বড় টানা। কানে দুল নেই। গলায় ইমিটেশন মফচেন। সিঁথির সিঁদুরটা ভীষণ সুক্ষ্ম। হাতের সরু সরু শাঁখা-পলা বলে দেয় ভদ্রমহিলা বাঙালিই। ইনিই কি রাকা রায়! নামটা আগে কোথায় শুনেছে নন্দিতা? কোথায় যেন?

নন্দিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল, কলকাতা যাচ্ছেন?

মহিলা হাসল ভারি সুন্দর করে, হুঁ।

একা?

হ্যাঁ। সঙ্গে দাদার আসার কথা ছিল, আসতে পারল না।

দিল্লিতেই থাকেন?

উহুঁ। কলকাতায়। দিল্লি এখন আমার বাপের বাড়ি। দাদা থাকে। মাকে নিয়ে।

আমার দাদাও কিছু দিন দিল্লিতে ছিল।

কথাটা বলেই দুম করে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে নন্দিতা। দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা হঠাৎই কেমন চিড় খেয়ে গেল। অথচ এক সময় তাকে কী ভালোই না বাসত দাদা! সে-ও তো। একটা বয়স অবধি দাদাই তো নন্দিতার একমাত্র আইডল্। কেন এমন হয়! ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিঁড়ে যায় বিশ্রীভাবে। নাকি সব সম্পর্কের বেলাতেই নিয়ম এক! স্বার্থ এসে পড়লে সব সম্পর্কেরই ভিত নড়ে যায়। তা সে-সম্পর্ক ভাই-বোনেরই হোক, কি স্বামী-স্ত্রীর। কিংবা বাবা-মা, ছেলে-মেয়ের। অথবা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর। অবাঙালি যুবক এখন এমন ভাবে ঝুঁকে বসেছে যে, বাইরের পৃথিবীটা প্রায় চোখের আড়াল। নন্দিতার খুব খারাপ লাগল। কিছু কিছু মানুষ এমন স্বার্থপর হয়। কেমন অন্যের জায়গা জুড়ে নির্বিকার বসে আছে দেখো! সামনের মহিলা মুখ ফিরিয়ে দিব্যি বাতাস মাখছে মুখে, নন্দিতা কনুই দিয়ে আলগা খোঁচা দিল শ্যামলেন্দুকে, ওই ছেলেটাকে উঠে যেতে বলো।

শ্যামলেন্দুর হাতের কাজ সেরে যথারীতি একটা পেপারব্যাক খুলে বসেছে। নন্দিতার কথা প্রথমটা ঠিকমতো ধরতেই পারল না।

কাকে?

চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছ না? বিরক্ত হলেও নন্দিতা বেশ নিচু স্বরেই বলছিল কথাগুলো, জানলার ধারের সিটটা আমাদের।

শ্যামলেন্দু পাত্তা দিল না, ও এমনিই বসেছে। বসুক না। উঠে যাবে।

নন্দিতার গলা উঠল, হ্যাঃ, সবাই তোমার মতো উদার কি না।

আস্তে বলো। শ্যামলেন্দু ত্রস্ত চোখে চারপাশটা দেখে নিল। ভাবটা এমন যেন নন্দিতাই লোকটাকে উঠতে বলে কোনও গর্হিত আচরণ করে ফেলেছে।

নন্দিতা গুম মেরে গেল। এ-সব মুহূর্তে তার নিজেকে বড় অসহায় লাগে। শ্যামলেন্দু তার কোনও কথাই সহজে বুঝতে চায় না। এই যে এখন জানলার ধারে বসে প্রচণ্ড হাওয়ায় মাখামাখি হয়ে বুক ভরে একটু দম নিতে চাইছে নন্দিতা, এটাও মুখ ফুটে খুলে বলতে হবে। নতুবা শ্যামলেন্দু কিছুই বুঝবে না।

BanglaBook.org

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে নন্দিতা শেষে রিমলিকেই ডাকল, রিমলি, এবার এ-দিকে চলে এসো।

রিমলি তক্ষুনি দৌড়ে এসেছে, ও-দিকের পাঞ্জাবিগুলো কী ভালো বাংলা বলে মা।

ছিঃ, নন্দিতা মেয়েকে শাসন করল, ও কী কথার ছিরি, আঙ্কল বলতে পারো না?

রিমলি ঢোঁক গিলল, সরি। সরি। আঙ্কল। ওই আঙ্কলরাও না কলকাতাতেই থাকে মা।

ঠিক আছে। আঙুল চালিয়ে মেয়ের চুল ঠিক করে দিল নন্দিতা, এবারে এখানে বোসো।

না, আমি জানলার ধারে বসব।

তোমার বাবাকে বলো।

জানলা দখলকারী যুবক রিমলির দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকলেও নির্ঘাত এক বর্ণ ভাষা বুঝছে না। না হলে একটু লজ্জা তো পেল নিশ্চয়ই।

ও মা...।

আমি কী জানি, বললাম না বাবাকে বলো।

সামনের জানলায় বসা মহিলা হুট করে বলে বসল, তুমি এখানে বসবে? এসো। বসো।

রিমলি মাথা নাড়ল, দূর, ও-দিকে হাওয়া নেই। ওটা তো উলটো দিক।

নন্দিতারও ইচ্ছে নেই মেয়েকে সোজাসুজি হাওয়ায় বসতে দেওয়ার, তবু সে চুপ।

রিমলি শ্যামলেন্দুকে ঠেলে দিল, বাবা, ও বাবা...।

শ্যামলেন্দুকে বই বন্ধ করতেই হল। নন্দিতার দিতে তাকিয়ে হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকেছে। বিনীত গলায় বলছে, মাফ করনা ভাইসাব, ও সিট শায়েদ হামারা হ্যায়।

ম্যায় কানপুরমে হি উতর্ যাউঙ্গা।

শ্যামলেন্দু পাশে বিগলিত হয়ে পড়ে, নন্দিতা তাড়াতাড়ি হাল ধরে নিল, হামারা লেড়কি উঁহা বৈঠেগি। আপ দুসরা কোই জগাহ্ ঢুঁড় লিজিয়ে।

শ্যামলেন্দু বলে উঠল, নেই, নেই আর ইধর ভি বৈঠ সকতে হেঁ।

নেহি, ঠিক হ্যায়। আপলোগ আরামসে বৈঠিয়ে।

নন্দিতার কথার রুক্ষতায় ছেলেটি আহত হয়েছে বোঝা যায়। নন্দিতার ইচ্ছে হল ছেলেটিকে নিজে একবার বসতে বলে, পারল না। আরও মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল তাতে। মাঝে মাঝে কী যে হয়ে যায় তার! লাগাম টেনেও মনের রাশ ধরতে পারে না। সামনের ওই দম্পতি, ওই হাসিমুখ মহিলা নিশ্চয়ই তাকে খুব দুর্মুখ ভাবছে। ইশ্‌শ্। রিমলি জানলার ধারে বাবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে সামনের মহিলার সঙ্গে, তুমি একা একাই যাচ্ছ? তোমার বুঝি ভয় করে না?

উঁহু।

আমাকে মা একা কোথাও যেতে দেয় না। মা খুব ভিতু।

নন্দিতা কথা বলে সহজ করতে চাইল নিজেকে, মেয়ের কথা শুনেছেন? সব সময়ে এ-রকম পাকা পাকা কথা।

পাকা পাকা কোথায়! বেশ মিষ্টি তো।

মিষ্টি না ছাই। একটু পরেই আপনাকে পাগল করে ছাড়বে।

না না, পাগল করবে কেন? মহিলা হাত বাড়িয়ে গাল টিপে দিল রিমলির, চকোলেট খাবে? বলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাঙ্ক থেকে স্যুটকেসটা নামাল। রাকা রায় লেখা স্যুটকেসটা।

নন্দিতা থমকেছে নতুন করে। এই তবে রাকা রায়! রাকা রায় কার নাম? রানুদির জায়ের নাম? সিদ্ধার্থর বউয়ের নাম? ওফ্, মনে পড়েছে। রাকা তো অরুণের বউয়ের নাম। হ্যাঁ, রাকাই তো। অরুণ রায়ের বউ রাকা রায়। নন্দিতার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। এই রাকা রায় কি সেই রাকা রায়? দূর, তার

BanglaBook.org

দিল্লিতে বাপের বাড়ি হতে যাবে কেন? নন্দিতা যত দূর শুনেছে, অরুণ যাকে বিয়ে করেছে সে শ্যামবাজারের মেয়ে। সুমিতা সে-রকমই রিপোর্ট দিয়েছিল। না না, এ সে নয়। একই নাম দুটো মেয়ে থাকতেই পারে। তবে সে-ও তো শুনেছে বেশ সুন্দরী। তা বলে কি আর এত সুন্দর?

মনে মনে হাজার যুক্তি সাজিয়েও কে জানে কেন কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছিল না নন্দিতা। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করতেও বুক ঢিপ ঢিপ করছে। সত্যি যদি সেই রাকাই হয়! শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের কাছে দ্বিধা হার মানল।

আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। কলকাতায় কোথায় থাকেন বলুন তো আপনি?

সাউথে! ভবানীপুর।

ভবানীপুরের কোথায়?

পূর্ণ সিনেমার কাছে।

পূর্ণ সিনেমা! নন্দিতার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো এবার এক সঙ্গে ঝন ঝন করে বেজে উঠেছে। আর কোনও সন্দেহই নেই। সে। সে-ই।

আপনারা কোথায় থাকেন?

রাণিকুঠি। নন্দিতা আড়ষ্ট উত্তর দিল। হৃৎপিণ্ডের পাগলা ঘণ্টিটা বেজেই চলেছে।

রাকাও কি চিনতে পারছে তাকে? মুখ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এমন হতে পারে, মেয়েটা খুব নিখুঁত অভিনয় জানে। হয়তো প্রথমেই তাকে চিনেছে। হয়তো ইচ্ছে করেই...। হতে পারে, হতেই পারে। নন্দিতার কি কোনও ছবিই নেই অরুণদের বাড়িতে! আর কারও কাছে না থাক, অরুণের অ্যালবামে থেকে যেতে পারে এক-আধটা। অরুণ কি আর নন্দিতার সব ছবিই ফেলে দিয়েছে। এমনও হতে পারে, রাস্তাঘাটে কোনও দিন দূর থেকে রাকাকে দেখিয়েছে অরুণ, ওই দেখো, এই যে যাচ্ছে, ওটাই নন্দিতা। নন্দিতা হয়তো দূরমনস্ক ছিল সে-সময়। অরুণ বা রাকাকে সে খেয়ালই করেনি।

রাকার সঙ্গে কোনও রকমে দু-একটা দায়সারা কথা বলে নন্দিতা বাথরুমে যাবার নাম করে উঠে গেল। শহরতলি ছাড়িয়ে এসে ধাবমান এ.সি এক্সপ্রেসের গতি এখন উদ্দাম। বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে খোলা বাতাসের সঙ্গে এখন তার অসম লড়াই। পর্যুদস্ত বাতাস আছাড় খেয়ে পড়ছে বার বার। মাথা কুটে মরছে। সংকীর্ণ প্যাসেজটা ধরে, পর পর পরিপূর্ণ কুঠুরিগুলো পেরিয়ে টলমল পায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল নন্দিতা। বাথরুমে এসেও কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। পায়ের তলার জমি থর থর কাঁপছে। টাল সামলাবার জন্য নন্দিতা বেসিনের পাশের রকটাকে আঁকড়ে ধরল। আয়নায় ক্রমাগত কেঁপে চলেছে আরেক নন্দিতা। কাঁপছে? না হাসছে হি হি করে?

কী রে, বোকার মতো ঘাবড়ে-গেলি কেন?

অরুণের বউ যদি আমাকে চিনে ফেলে?

ফেললে ফেলবে, তাতে তোর কী?

আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

অস্বস্তি হওয়ার কোনও মানেই হয় না। ওই অসভ্য বুনো দানবটা কাকে বিয়ে করল না-করল, সেই বউ তোকে চিনল কি-চিনল না, তাতে কী এসে যায়। তুই তো কোনও দিন কোনও অন্যায় করিসনি! ভয়টা কীসের?

সেটা ঠিক কথা। আমার জীবনটা অরুণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। মারধোর, অত্যাচার। অন্যায় রকম গার্জেনগিরি...।

তবে? সামলে নে নিজেকে। তোর এখন নিশ্চিত জীবন। স্বামী, মেয়ে...।

BanglaBook.org

নন্দিতা মুখ-চোখে জল দিয়ে বেরিয়ে এল। গোটা কম্পার্টমেন্টের লোকজন বৈকালিক আলস্য গায়ে মেখে শুয়ে বসে আছে এখন। ঝিমোচ্ছে। গল্প করছে। তাস খেলছে। একটা কুপে অসংখ্য টিফিনবাক্স সাজিয়ে খেতে বসে গেছে এক অবাঙালি পরিবার।

প্যাসেজের দিকের সিটে একটি মেয়ে উদাস চোখে আকাশের দিতে তাকিয়ে। নন্দিতাদের প্যাসেজের সিটের বয়স্ক ভদ্রলোক দু'জন কী যেন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নন্দিতা শ্যামলেন্দুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কী গো, বই মুখে করে বসে থাকলেই হবে? সেই কখন ভাত খেয়েছ। এগারোটার আগে। খিদে পায়নি?

শ্যামলেন্দু বই বন্ধ করল, হ্যাঁ দাও। কিছু খেতে-ফেতে দাও।

খাবার টুকরিটা বাঙ্ক থেকে নামাতে নামাতে নন্দিতা এক পলক দেখে নিল রাকাকে। রিমলির সঙ্গে বক বক করে চলেছে মেয়েটা। নন্দিতা মেয়েকে বলল, আয়। খেয়ে নে আগে।

গুম গুম শব্দ তুলে কোনও এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পিষে মাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছুটন্ত ট্রেন। স্টেশনে দাঁড়ানো একটি লোকের মুখও পরিষ্কার বোঝার আগে সোজা এক সর্ষেক্ষেতে পৌঁছে গেছে। শেষ বিকেলের আলোয় হলুদ ফুলে লালচে আভা।

নন্দিতা বুঝতে পারছিল না, রাকাকে কিছু খেতে বলার অনুরোধ করাটা উচিত হবে কি না। নতুন বিয়ে হওয়া ছেলে-মেয়ে দুটোর সঙ্গেও তবে ভদ্রতা করতে হয়। ছেলে-মেয়ে দুটো দু'জন দু-জানলার দিকে তাকিয়ে এখন। রাকার চোখও বাইরের হলুদ প্রান্তরের দিকে।

রিমলি এক মুখ সন্দেশ নিয়ে সামনের ছেলেটির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল, কাকু, ও কাকু, তোমরাও কি কলকাতায় যাচ্ছ?

শ্যামলেন্দু বকল মেয়েকে, ও কী! মুখে খাবার নিয়ে কথা বলছ কেন? কাকুর গায়ে পড়বে যে!

রিমলি সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ওয়াটার বটল মুখে লাগিয়ে জল খেয়ে নিয়েছে, এবার কথা বলি?

রিমলির চোখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে ছেলে-মেয়ে দুটো হেসে কুটিপাটি। রাকা আর শ্যামলেন্দুও। ছেলেটি কাছে টানল রিমলিকে, নাম কী গো তোমার?

রিমলি। না না, প্রজ্ঞাপারমিতা আচার্য।

ওরে বাবা। তুমি স্কুলে পড়ো?

নিশ্চয়ই।

কোন ক্লাস?

নার্সারি টু। রিমলি উত্তর দিয়েই উলটে প্রশ্ন ছুঁড়েছে, এটা বুঝি তোমার নতুন বউ?

কী করে বুঝলে?

বা রে, নতুন বিয়ে হলেই তো এতটা করে সিঁদুর পরে। আমার পিসিও পরত।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল, এখন বুঝি আর পরে না?

কই আর পরে। বলতে বলতে রাকার দিকে হাত দেখাচ্ছে, ওই আন্টিটার মতো পরে। সরু করে। একটু।

নন্দিতা মেয়ের মাথায় চাঁটি মারল, অনেক হয়েছে। এবার চুপ করো।

আহা বলুক না। ছেলেমানুষই তো বলছে। রাকা হেসেই চলেছে। এ-রকম কটকটি বাচ্চা আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমার মেয়েটা আবার কথা বেশি বলে না। গুণ্ডামি করে। ভয়ানক গেছো।

অরুণের মেয়ে হল কবে? এ খবরটা তো জানা ছিল না। অবশ্য জানার উপায়ও নেই আর। সুমিতাটা বিয়ে করে সেই ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। ওর কাছ থেকেই অনেক খবরাখবর পাওয়া যেত

BanglaBook.org

অরুণের। নন্দিতার দৃষ্টি স্থির হল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। রাকা কি মেয়ের খবর ইচ্ছে করেই শোনাল তাকে? না শুধুই কথার কথা?

মুখ ফসকে নন্দিতা জিজ্ঞাসা করে ফেলল, কত বড় মেয়ে আপনার?

এর থেকে বড়। পাঁচ পুরে এবার ছয়ে পড়বে। এই নভেম্বরে। তবু এখনও এত...। নন্দিতা দ্রুত হিসেব করে নিচ্ছিল। ডিভোর্স হওয়ার পর পরই বিয়ে করেছিল অরুণ। মানে বছর সাতেক আগে। রাকা বলছে রাকার মেয়ে ছয় হয়ে যাবে। তার মানে এবার আর বিয়ের পর তর সয়নি অরুণের। অথচ তাদের বিয়ের পর নন্দিতার কোনও কথাতেই অরুণ কান দেয়নি, এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা হলে লাইফের আর রইল কী?

কেন? যাদের বাচ্চা হয় তাদের বুঝি লাইফ থাকে না?

বাজে বোকো না তো। এখন তো ফুর্তি করার সময়। তা না, এখন থেকেই চ্যাঁ-ভ্যাঁ, আমূল স্প্রে, গ্রাইপ ওয়াটার...। তাছাড়া বাচ্চা হলে মেয়েদের ফিগার নষ্ট হয়ে যায়।

আমি ফিগার নিয়ে মাথা ঘামাই না।

আমি ঘামাই। লোকে কী বলবে? অরুণের বউটা একটা কুমড়ো পটাশ, হ্যাঃ। আমার বউ হবে দেখার মতো। বুক ফুলিয়ে দেখাব সকলকে।

বউ কি দেখানোর জিনিস?

তাছাড়া কী! সব সময় সেজেগুজে টিপটপ থাকবে।

অরুণ ছিল ওই রকমই। সারা দিন ধরে শুধু উদ্দামতা, আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা। বন্ধু-বান্ধব আর খেলার মাঠ নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকা। নিয়ম করে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেই মাঠে দৌড়াত। প্রাকটিস থেকে ফিরেই স্নান-খাওয়া সেরে অফিস। খেলা থাকলে অফিস থেকে মাঠ সেরে একরাশ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাড়ি ফিরত। তারপর সন্ধে থেকে রাত অবধি তাদের আসর। খেলা যে-দিন থাকত না সেদিন বাইরে আড্ডা মেরে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। সে-সব দিন মুখে আবার হালকা মদের গন্ধ। সব কিছুর পর রাত্রে আরেক প্রস্থ ভালোবাসার খেলা। সেই খেলায় নন্দিতার কোনও আলাদা ভূমিকা থাকতে পারবে না। ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকবে না। শুধু একপেশে নির্মম বাসনা মিটিয়ে যেতে হবে তাকে। মাগো, আর কিছু দিন অরুণের সঙ্গে থাকলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরেই যেত নন্দিতা। নন্দিতার বন্ধুরা বলত, ইশ্, কী দেখে যে তুই পছন্দ করেছিলি অরুণকে? তোর সঙ্গে কোনও কিছুতেই তো মিল নেই। না শিক্ষা, না রুচি...।

নন্দিতা বোঝাতে পারত না, ভালোবাসার জোয়ার এলে শিক্ষা, রুচি, বিচার-বিবেচনা সব খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। অরুণকে তো সত্যি সত্যি এক সময় ভালোবেসেছিল নন্দিতা। অরুণের ঝোড়ো আবেগ চুম্বকের মতো টেনেছিল তাকে।

রাকার সঙ্গেও কি অরুণ বিছানায় সেই একই রকম আচরণ করে?

পুরনো দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে নন্দিতা কুঁকড়ে গেল বিতৃষ্ণায়।

হেমন্তের বিকেল দ্রুত মরে আসছে বাইরে। কামরার ভিতরেও বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে তরল অন্ধকার। জানলার দিকে পিছন ফিরে বসে থাকা রাকার মুখে সেই অন্ধকারের ছায়া। রাকা কি এখনও চিনতে পারেনি নন্দিতাকে? বোধহয় না। স্বামীর আগের পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে কেউ কি এত সহজ ভাবে কথা বলতে পারে?

কাগজের কাপে কফি বিক্রি করতে এসেছে একটা লোক। ছেলে-মেয়ে দুটো কফি খাচ্ছে। শ্যামলেন্দু আবার ডুবে গেছে বইয়ের পাতায়। লোকটা সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকতে কী ভালোই না বাসে। বাড়িতেও সারাক্ষণ মোটা মোটা বই। সংসারের কোনও খোঁজখবরই রাখে না। সংসার তো

BanglaBook.org

দূরের কথা, মেয়ে-বউয়েরও না। নন্দিতার এক-এক সময় মনে হয়, সে বা রিমলি যদি সাত দিন বাড়িতে না-ও থাকে, সেটাও বোধহয় টের পাবে না শ্যামলেন্দু। নন্দিতা রাকাকে জিজ্ঞাসা করল, কফি খাবেন?

রাকা মাথা নাড়ল, ও তো চিনি দেওয়া কফি।

আপনি বুঝি চিনি খান না?

খুব কম। বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছি।

নন্দিতা হেসে ফেলল, কোথায় মোটা। বলতে বলতে চোখ নাচাল, কত? ওজন কত?

ছাপ্পান্ন কেজি। তাতেই আমার বর আর দেওররা যা খেপায়!

কথাটা ঠং করে বাজল নন্দিতার কানে। বউ সম্পর্কে স্লিম স্লিম বাতিক এখনও তবে যায়নি অরুণের। এই বউ নিয়ে আদিখ্যেতাও নিশ্চয়ই অনেক বেশি। তার মতো তো আর মাজা গায়ের রঙ নয়, নাক-চোখও অনেক তীক্ষ্ণ, ফিগারটাও ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতর আচমকা একটা পিঁপড়ের কামড় অনুভব করছিল নন্দিতা। সুন্দরী বউ পেয়ে অরুণ তাহলে সুখেই আছে। তার উপর এমন স্বামী-সোহাগিনী বউ। স্বামীর আড়ালেও মোটা না হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেই গ্রাম্য দেওরগুলোও নিশ্চয়ই বউদি বলতে অজ্ঞান এখন। তরুণ, বরুণ, প্রকাশ। সারা দিন ধরে তিন জন শুধু হা-হা করে চিল্লোত, সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির চারবেলা একগলা করে ভাত গিলে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে যেত ফুটবল ক্রিকেট হকি যা হোক একটা কিছু নিয়ে, গোটা পাড়া মাত করে রাখত। এই শান্ত সভ্য মেয়েটা কী করে মিলেমিশে আছে তাদের সঙ্গে!

গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। দু'পাশে এখন ঘন জনপদ। শ্যামলেন্দু বাইরের দিকে উঁকি দিল। ঘড়িও দেখল একবার, টুণ্ডলা আসছে বোধ হয়।

নন্দিতা একটু স্বামীর গা ঘেঁষে বসল, এখানে ভালো রাবড়ি পাওয়া যায় না?

শ্যামলেন্দু আড়মোড়া ভাঙল, সে ইটাওয়াতে ভালো পাওয়া যায়।

স্টেশন এলে একবার নেমে দেখো না বাবা। আর আমাকে উপরের ব্যাগটা একটু নামিয়ে দাও। দুটো মাফলার বার করব।

তেমন তো একটা ঠাণ্ডা নেই।

তা হোক। একটুতেই তোমার আর তোমার মায়ের যা গলা ফুলে যায়।

শ্যামলেন্দু কথা বাড়াল না। এ-সব ক্ষেত্রে সে কথা বাড়ায়ও না। সংসারের ব্যাপারে কিংবা শ্যামলেন্দু রিমলির ব্যাপারে, নন্দিতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সিমলা থেকে কেনা দুটো নতুন মাফলার কিটব্যাগ থেকে বার করল নন্দিতা। সঙ্গে একটা পাতলা চাদরও। রিমলি যে-কোনও মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। তখন লাগবে। টুণ্ডলাতে ট্রেন থামতেই শ্যামলেন্দু ব্যস্তসমস্ত হয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

রাকা জিজ্ঞাসা করল, আপনার স্বামী খুব কম কথা বলেন, তাই না?

ভীষণ। শব্দটা উচ্চারণের সময় হঠাৎই এক ধরনের অহঙ্কার ফুটে উঠল নন্দিতার গলায়, ওর স্টুডেন্টরা বলে, স্যার নিজেই নাকি একটা জ্যান্ত বই। বইয়ের মতোই নিঃশব্দ, কিন্তু...

উনি কলেজে পড়ান?

আগে পড়াত। আমি যে-কলেজে পড়াই সেখানে। এখন ইউনিভার্সিটিতে চলে গেছে। পড়াশুনো ছাড়া পৃথিবীর কিছুই বোঝে না। নিজের কানেই নিজের কথাগুলো সুর হয়ে যাচ্ছিল নন্দিতার। সে কি রাকাকে শোনাতে চাইছে কথাগুলো? না নিজেকেই শোনাতে চাইছে, অরুণের চেয়ে অনেক বেশি গুণী, মার্জিত এক প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে ঘর করে সে এখন?

BanglaBook.org

শ্যামলেন্দু কোলাহল ঠেলে, ভিড় পেরিয়ে, রাবড়ির ভাঁড় হাতে নিয়ে ফিরে আসছে। সঙ্গে কয়েকটা শালপাতার ঠোঙা।

রিমলি দেখেই লাফিয়ে উঠল, আমি খাব। আমি খাব। আমাকে দাও। নন্দিতার ভুরু কুঁচকে গেল। এ-রকম আদেখলেপনা তার একদম পছন্দ নয়। তাছাড়া রাকার সামনে...।

নন্দিতা গম্ভীর মুখে বলল, অসভ্যতা কোরো না। তোমাকে ঠিক দেওয়া হবে। তবে তুমি আর এরপর জানলার ধারে বসবে না। ট্রেন ছাড়লেই গলায় মাফলার জড়াবে।

না, আমি জানলার ধারে বসব।

না, বসবে না।

রাকা রিমলিকে ভোলাতে চাইল, তুমি জানলার ধারে বসতে চাও তাই তো? ঠিক আছে, তুমি এ-দিকে এসে বসো, আমি ও-পাশে যাচ্ছি। তোমার মায়ের পাশে। জানলার ধারেও বসা হবে, হাওয়াও লাগবে না। খুশি?

নন্দিতা বিরক্ত হল। বেশ তো উলটো দিকে বসে ছিল, পাশে কেন এসে বসতে চায়।

দুই

আপনি কি খুব হৈ-হুল্লোড়, বন্ধু-বান্ধব ভালোবাসেন?

উঁহু। না তো।

গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে শুধু ফুচকা আলুকাবলি ভেলপুরি খেয়েই চলে আসেন?

না। একদমই না।

হঠাৎ হঠাৎ ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে যেতে কেমন লাগে আপনার?

এটা ভালো লাগবে। যদিও যাইনি কখনও।

একা একা বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগে?

দারুণ।

রাকাকে একের পর এক প্রশ্ন করতে করতে নিজের প্রশ্নগুলো নিজেই উপভোগ করছিল নন্দিতা। রাকা বুঝতেও পারছে না, তার স্বামীর প্রতিটি পছন্দ-অপছন্দ এখনও মুখস্থ আছে নন্দিতার। বিয়ের পর প্রথম প্রথম, হঠাৎ কোনও লক্ষ্য ছাড়াই নন্দিতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত অরুণ। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠে ক্যানিং কিংবা ডায়মন্ডহারবার। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অরুণ নিজের মনেই বেসুরো গলায় গান ধরত। একবার বাসন্তী যাওয়ার পথে ভুটভুটিতে উঠে খুশিতে চুমুই খেয়ে ফেলতে যাচ্ছিল নন্দিতাকে। লোকজন সব হাঁ করে দেখছে, অরুণের ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই, আমার বউকে আমি আদর করব, কার বাবার তাতে কী? ফেরার পথে সেবার ক্যানিঙের মাছের আড়ত থেকে একগাদা চিংড়ি কিনে ফেলল। সেই চিংড়ি সেই রাতেই রান্না করে খেতে হল বাড়ির সবাইকে। সর্ব সময় লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, হৈ-হৈ চিৎকার করে যাচ্ছে। একবার ডায়মন্ডহারবারে নদীর ধার ধরে দৌড়তে দৌড়তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ভাঙা লাইটহাউসের আড়ালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য একই ভাবে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল, দেখেছ তো, একটুও দম কমেনি। বন্ধুরা বলে, আমি নাকি হাফটাইমের প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছি।

সেই লোকটার সঙ্গে এই মেয়েটার মেলে কী-ভাবে।

নন্দিতা আবারও জেরা করল রাকাকে, আপনি কি হিন্দি সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন? মানে বাজারে যে-সব মারপিট-নাচগানের ছবি চলে আর কী।

খুব একটা বাসি না। দেখি মাঝে মাঝে।

BanglaBook.org

মোগলাই খানা খেতে কেমন লাগে আপনার?

খারাপ লাগে না। কিন্তু আপনি আমাকে এ-সব প্রশ্ন কেন করছেন বলুন তো?

নন্দিতা উত্তরটা এড়িয়ে গেল। পাশে রাখা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের প্যাকেট ফাঁক করে রাতের খাবারটা দেখে নিল একবার। ট্রেনের খাবার তার এমনিতেই ভালো লাগে না, আজ তার তো আরও ইচ্ছে করছে না খেতে। শ্যামলেন্দু খাওয়া শেষ করে আপার বার্থের বিছানায় উঠে গেছে। আজই বোধহয় পেপারব্যাকটা শেষ না করে ছাড়বে না। সন্ধে নামার মুখে মুখে রিমলি একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিল, এখন আর দশটার আগে তার চোখে ঘুম আসবে না। পাশের কুপে তিন-চারটে ছেলে তাস খেলছে, রিমলি তাদের পাশে গিয়ে বসে আছে। সে এখন একদল ছেলের তাস খেলার মুগ্ধ দর্শক। ছেলেগুলো খেলার চেয়ে হৈ-হল্লাতেই বেশি আগ্রহী। মাঝে মাঝেই হিন্দি গানের কলি গেয়ে উঠছে দু-এক জন। নন্দিতাদের কুপের ছেলে-মেয়ে দুটো নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ফিক ফিক করে হাসছে।

রাকা মোড়ক খুলে রুটি বার করল, বললেন না তো, ও-সব প্রশ্ন করলেন কেন? নন্দিতা আলতো হাসল, ট্রেনে আলাপ হল, বন্ধুত্ব হল, বন্ধুর কি ভালো লাগে না লাগে জানতে নেই? রাকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে নন্দিতার কথা বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করানোর দায়ও নেই নন্দিতার। তার শুধু অবাক লাগছে, মেয়েটা তাকে দেখে একদমই চিনতে পারল না। আশ্চর্য! নন্দিতার তবে আর একটা ছবিও নেই অরুণদের বাড়িতে। ও-বাড়ি ছাড়ার সময় নন্দিতা তার বেশির ভাগ ছবিই নিয়ে এসেছিল। হনিমুনের ছবিগুলোও। তবু একটাও কি ...? অরুণ তাকে তবে পুরোপুরি মুছে ফেলেছে জীবন থেকে। কোনও স্মৃতি চিহ্নই রাখেনি।

নন্দিতার বুকটা টন টন করে উঠল। খাবারগুলো আরও বিস্বাদ এই মুহূর্তে। রাকা জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের কি জয়েন্ট ফ্যামিলি?

নাঃ! বিশাল লম্বা একটা নিশ্বাস গড়িয়ে এল নন্দিতার বুক থেকে, আমার শ্বশুরবাড়ি নর্থ বেঙ্গলে। কুচবিহার। ওখানে সবাই আছেন। শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর।

কলকাতায় ভাড়া থাকেন?

আগে থাকতাম। রিসেন্টলি আমরা একটা ফ্ল্যাট কিনেছি।

আপনারা দু'জনে বেরিয়ে যান, মেয়েকে নিয়ে প্রবলেম হয় না?

সে তো একটু হয়ই! একটা রাত-দিনের বিশ্বাসী লোক আছে, এই যা।

রাকা বলল, আমার অবশ্য সে-দিক দিয়ে খুব সুবিধে। বাড়িতে শাশুড়ি আছেন, দেওর, জা। আমি অফিস গেলেও মেয়ে কখনও একা হয় না।

আপনি চাকরি করেন! নন্দিতা বিস্ময়ে হতবাক।

করি। ব্যাঙ্কে। আমার কর্তার ব্রাঞ্চে।

একটা ভয়ানক হিংস্র রাগ গুমরে উঠছিল নন্দিতার বুকের গভীরে। সে কলেজে চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করেছে শুনেই মুখ হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল অরুণের মা'র। অরুণ রাগে ফেটে পড়েছিল, আমার বউ চাকরি করতে যাবে? কভি নেহি।

নন্দিতা যুক্তি দেখিয়েছিল, ভেবে দেখো, দু'জনে চাকরি করলে কত সুবিধে হবে। এত বড় একটা সংসার... তোমার একার উপর বেশি চাপ পড়ে যায়।

তোমার পয়সায় আমি সংসার চালাব?

চললে ক্ষতি কী? কত ভালোভাবে থাকা যাবে বলো তো! যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পারব, পছন্দসই জিনিস কিনব।

কী পছন্দ মতো জিনিস তুমি পাও না শুনি? এই তো সে-দিন দেড় হাজার টাকা দামের একটা শাড়ি কিনে দিলাম। আসলে চাকরিটা ছুতো, তুমি এখন উড়তে চাইছ।

BanglaBook.org

মূর্খের মতো কথা বোলো না তো।

মূর্খ জেনেই তো বিয়ে করেছিলে আমাকে। এই মূর্খের প্রেমেই হাবুডুবু খেয়ে তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে এসেছ বাড়ি থেকে।

আমি ও-ভাবে কিছু বলতে চাইনি। তুমি মিছি মিছি জট পাকাচ্ছ।

সব কথা মুখে বলে বোঝাতে হয় না। হাবভাবে বোঝা যায়।

তোমার মনটা এত নিচু?

রাগে, দুঃখে, অপমানে তিন দিন অরুণের সঙ্গে কথা বলেনি নন্দিতা। অরুণ নরম হয়নি এতটুকু। সেই লোক নিজের অফিসের মেয়েকে বিয়ে করে দিব্যি সুখে ঘর করছে? কবে থেকে ভালোবাসা চলছিল রাকার সঙ্গে? নন্দিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে থেকেই কি? সেই কারণেই নন্দিতার সঙ্গে...?

নিজের অজ্ঞাতেই গলায় ঝাঁঝ ফুটল নন্দিতার, বিয়ের অনেক আগে থেকেই আপনাদের তবে আলাপ বলুন?

উঁহু। রাকা হাসছে ঠোঁট টিপে, আমি আগে একটা অন্য ব্রাঞ্চে ছিলাম। এই ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে আসার পরও সে-রকম প্রেম-টেম কোনও দিনই হয়নি। কলিগরাই প্ল্যান করে...।

ও। তার মানে অরুণের দুর্ভাগ্যে কাতর। সহকর্মীরাই ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। কিন্তু সুমিতা কেন নন্দিতাকে বলেনি, রাকা চাকরি করে? নন্দিতার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবে না বলে? হয়তো তাই।

নন্দিতার বুকে ঢেউ ভাঙছিল ক্রমাগত। রাকার বেলায় চাকরি করা নিয়ে আপত্তি নেই অরুণের। অরুণের মা-ও দিব্যি মেনে নিয়েছেন ব্যাপারটা। খুশি মনে রাকার মেয়েকে সামলান দিনভর। এ চেতনাটা যদি ওদের আগে আসত। নন্দিতাকে এখন কলেজে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে ভাবতে হয় রিমলি কী করছে, কী খাচ্ছে, স্কুল থেকে ঠিক মতো ফিরছে তো। একটা যদি দেওর ননদও থাকত নন্দিতার। না হয় তারা তরুণ-বরুণদের মতোই হত।

নন্দিতার সংসারটা বড় বেশি ফাঁকা ফাঁকা। রাকা জানলার কাচ নামিয়ে দিয়েছিল, নন্দিতা সেটা তুলে প্রায় ভর্তি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা ছুঁড়ে দিল বাইরে। পলকে এক ঝলক দমকা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে গায়ের উপর। নিন্দিতা জানলা বন্ধ করে দিল। বেসিনে হাত ধোওয়ার জন্য যেতে গিয়ে রিমলির ওপর চড়াও হল, কী রে, তুই ঘুমোবি না?

দেখো না, এই কাকুটা আমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না। ছেলেগুলো হেসে উঠল। এক জন বলল, এই মিষ্টি মেয়েটা হাত ছোঁয়ালেই যা দারুণ তাস উঠছে না বউদি।

আরেক জন বলল, বসুন না বউদি।

তাসখেলা নন্দিতার দু'চোখের বিষ।

ছেলেগুলোর আহ্লাদেপনা মোটেই পছন্দ হল না তার, ন'টা বেজে গেছে। রিমলি, এবার ঘুমোবে চলো।

রিমলিকে বাথরুম করিয়ে নিয়ে এসে নন্দিতা দেখল শ্যামলেন্দু নিচে নেমে সিগারেট ধরিয়েছে। কী সব কথা বলছে রাকার সঙ্গে। নন্দিতার শরীরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী আলোচনা হচ্ছে দু'জনের।

রাকা নন্দিতাকে দেখে বলল, আমার এক জামাইবাবু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আছেন, ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম চেনেন কি না।

নন্দিতা শ্যামলেন্দুর দিকে তাকাল, তুমি নেমে এলে যে? বই শেষ?

শ্যামলেন্দু ঠোঁট ওলটালো, আলোটা বড় কম, চোখে লাগছে।

BanglaBook.org

নন্দিতাদের শোওয়ার তোড়জোড় দেখে নতুন বর-বউ দু'জন ঈষৎ সন্ত্রস্ত। রাকাও যদি শুয়ে পড়তে চায়, তাদের উঠে যেতে হবে নিজেদের বার্থে। দু'জনেরই মনে হয় বেশ অনিচ্ছা তাতে।

শ্যামলেন্দুর সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম বার বেরিয়ে ফেরার সময় দারুণ ভিড় ট্রেনে উঠতে হয়েছিল আগ্রা থেকে। ট্রেনে পাশে উঠেই উশখুস করছিল শ্যামলেন্দু। নন্দিতার মনে হয়েছিল একটু বোধহয় বাঙ্কে আসতে চাইছে মানুষটি। ও মা, প্রথম সুযোগেই একটা বাঙ্ক পেয়ে সটান শুয়ে পড়ল তাতে। নিচে সারা রাত ঠায় বসে নন্দিতা। পরে বুঝেছে উদাসীন মানুষটার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক আচরণ। নাহলে ও-ভাবে কোনও মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কেউ। পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে দিতে।

ডিভোর্সের পর বাপের বাড়িতে থাকাটা তখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে নন্দিতার। দাদা-বউদির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততম পর্যায়ে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের জন্য বাপের বাড়ির চৌকাঠ যে কত উঁচু হয়ে যায়, প্রতি পলে তখন নন্দিতা টের পাচ্ছে। একলা থাকার জন্য একটা বাড়ি বা হস্টেল খুঁজে খুঁজে হন্যে। কিন্তু একা মেয়েকে কে দেয় বাড়ি? পেয়িংগেস্ট থাকতে চাইলেও সহস্র জেরার মুখোমুখি হতে হয়। লেডিস হস্টেলের সংখ্যা বড়ই অপ্রতুল। এমন একটা সময়ে চিন্তায় চিন্তায় পাগল নন্দিতা পরীক্ষার হলে শ্যামলেন্দুর গলা শুনেছিল, ম্যাডামকে খুব ডিপ্রেস্‌ড লাগছে যেন?

নন্দিতা উত্তেজনার মাথায় বলে ফেলেছিল, একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারেন? হস্টেল-ফস্টেল?

কার জন্য?

আমার জন্য। বাড়িতে ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে। দাদা-বউদি...। বলতে গিয়ে নন্দিতার সম্বিৎ ফিরেছিল, না মানে, ওদের একটু অসুবিধে...

শ্যামলেন্দু চিন্তিত মুখে উঠে গিয়েছিল চেয়ার থেকে। গোটা হলে বার কয়েক চক্কর মেরে পাশে এসেছে, আপনি আমার ফ্ল্যাট শেয়ার করতে পারেন। আমার এক্সট্রা ঘরও আছে। একা থাকি।

নন্দিতা স্তম্ভিত। লোকটা কি পাগল? না বদমাইশ? ডিভোর্সি মেয়েদের অনেক রকম অশোভন প্রস্তাব শুনতে হয় অনেক সময়, তা বলে শ্যামলেন্দু বলবে? যার কিনা সভ্য, ভদ্র, মার্জিত, পণ্ডিত বলে এত সুনাম কলেজে? যাকে একটু আগে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে নন্দিতা।

আপনি কী বলছেন, আপনি জানেন?

জানি। জানি বলেই বলছি। আপনার মানসিক অসুবিধে না থাকলে আমরা বিয়েও করে নিতে পারি।

নন্দিতা দপ করে জ্বলে উঠেছিল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।

দু'দিন পরে করিডরে তাকে একা পেয়ে আবার শ্যামলেন্দু বলেছিল, আমার প্রপোজালটা ভেবে দেখেছ?

নন্দিতার চোয়াল কঠিন। আপনি থেকে সোজাসুজি তুমি। একবার মনে হয়েছিল যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করে দেয়। কিন্তু শ্যামলেন্দুর মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্ব আছে যা খারাপ মনে হলেও খারাপ ভাবা যায় না তাকে।

শ্যামলেন্দু আবার ধরেছে তাকে, কী হল? ভেবেছ?

না, সময় পাইনি।

নন্দিতা একবার ভেবেছিল প্রিন্সিপালের কাছে যাবে নালিশ করে শ্যামলেন্দুর নামে। অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে শ্যামলেন্দুর মুখোশটা খুলে দেওয়ার কথা ভেবেছিল একবার। কিছুই করতে পারেনি। নিজের সঙ্গে একা হলেই ওই শান্ত, সৌম্য, মিতভাষী শ্যামলেন্দু ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়। কেন যেন মনে হয়েছে ওই মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায়। তবুও দিনের পর দিন তাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে নন্দিতা।

BanglaBook.org

শ্যামলেন্দুও হাল ছাড়েনি। শেষে মরিয়া হয়ে নন্দিতা এক দিন বলে ফেলেছে, ভালো না বেসে শুধু ঘর শেয়ার করার জন্য এক জন আরেক জনকে বিয়ে করতে পারে?

শ্যামলেন্দু বিকারহীন, আমি কি একবারও বলেছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি না?

তবু মুখ ফুটে বলেনি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে চাই। তোমাকে ছাড়া চাঁদ, তারা, ফুল, পৃথিবী সব বৃথা।

নন্দিতা প্রশ্ন ছুঁড়েছিল। আমার পাস্ট লাইফ সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?

না জানার কী আছে। এ কলেজের প্রতিটি ইট, কাঠ জানে, তোমার একটা ফুটবলার স্বামী ছিল, সে তোমাকে কিক্ মেরে গোল পোস্টের বাইরে করে দিয়েছে। তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

কেন ঝগড়া হয়েছিল জানেন?

অনুমান করতে পারি। নিশ্চয়ই বনেনি।

আপনার সঙ্গে যে বনবে, নিশ্চয়তা কী?

ট্রাই করতে দোষ কী? ইউ ক্যান স্টার্ট অ্যাফ্রেশ।

নন্দিতার মুখ থেকে দুম করে বেরিয়ে গেছে, আমার কিছু শর্ত আছে।

জানি। তুমি তোমার মতো থাকবে। আমি আমার মতো। কেউ কারুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় মাথা গলাব না। তাই তো?

নন্দিতা কেঁদে ফেলেছিল। হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করেছিল বেয়াড়া ভাবে।

শ্যামলেন্দু কথা রেখেছে। অক্ষরে অক্ষরে। তবে কেন যে নন্দিতার মনে হয়, শ্যামলেন্দু যদি একটু জোর করেই ঢুকে পড়ত তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, বেশি ভালো লাগত তার।

শ্যামলেন্দু টয়লেট থেকে রাত্রে পরার পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এসেছে। সাদা পোশাক রোগা লম্বায়ে চেহারাটা আরও গুরুগম্ভীর। চোখে হাইপাওয়ারের চশমা, চওড়া কপালে ঝকঝকে তামাটে মুখ। নন্দিতার হাতে তোয়ালে ফেরত দিয়ে তর তর করে উঠে গেল উপরের বার্থে, আর কিন্তু আমাকে ডাকবে না। একেবারে ভোরে উঠব। এগারোটা সাড়ে এগারোটায় কানপুর আসবে, তখন যদি চা খাওয়ার ইচ্ছে হয় কাচ তুলবে, চা-ওয়ালাকে ডাকবে। আমাকে নয়।

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করল, এয়ার পিলো নিয়েছ?

রিমলি নন্দিতার কোলের কাছে ঘুমিয়ে কাদা। জোর করে একবার শোয়াতে পারলে ঘুম আসতে দেরি হয় না মেয়ের।

নন্দিতা রাকাকে বলল, এই হচ্ছে মেয়ে। এই হচ্ছে বাবা। পুরো কুম্ভকর্ণ ফ্যামিলি।

রাকা হাসল, যাই বলুন, আপনার হাজব্যান্ড কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম।

কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও নন্দিতা তেমন খুশি হতে পারল না। অরুণ অনেক বেশি ম্যানলি ছিল।

তিন

কৃষ্ণপক্ষে গাছপালা ক্ষেত-নদী সব কিছুর উপর এক ছায়ার আস্তরণ দেখতে পায় নন্দিতা। চাঁদের আলো থাকলেও জ্যোৎস্নার মায়াবী আনন্দ যেন হালকা কালো পর্দায় ঢেকে রেখেছে কোনও অদৃশ্য জাদুকর। আঁধারমাখা কাচের মধ্য দিয়ে দূরের এক-আধটা বাড়ির টিম টিম আলো হঠাৎ হঠাৎ মাটির বুকে তারার মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর কাচের গায়ে শুধুই নিজের মুখের আবছা প্রতিচ্ছবি। ঘুমন্ত কামরার মৃদু আলোয় নিজের সেই প্রতিচ্ছবিকেও কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছিল নন্দিতার। রহস্যময়। কে সে! কী চেয়েছিল এত দিন ধরে! এখন কী চায়! কেন ওই সামনে শুয়ে থাকা মেয়েটাকে দেখে এত চঞ্চল হয়ে পড়েছে সে। তবে কি...?

BanglaBook.org

রাকা পাশ ফিরল সামান্য। বন্ধ চোখ খুলেছে, ঘুমোবেন না?

ট্রেনে আমার ঘুম আসে না। বসে বসেই ঢুলে নিই একটু।

আমারও আসে না।

তাহলে শুয়ে রয়েছেন কেন? এ-দিকে এসে বসুন। গল্প করি।

রাকার চোখ ছল ছল করে উঠল, মেয়েটার কথা মনে পড়ছে। কত দিন দেখিনি মেয়েটাকে। মা'র অসুখ শুনে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লাম।

কবে এসেছিলেন দিল্লিতে?

সেই ফার্স্ট অক্টোবর স্টার্ট করেছিলাম। আজ একুশ।

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেই তো পারতেন।

মাথা খারাপ? মেয়ের বাবা মেয়ে ছাড়া এক দিনও থাকতে পারে না। মেয়েও চোখে হারায় বাবাকে। মা'র জন্য অত কান্নাকাটি নেই। ছোট্ট থেকেই। রাকা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, শুধু তার বাবা কেন? ঠাকুমা, কাকারাও এমন ভাবে সারা দিন আগলে রাখে, ওদের ছেড়ে মেয়ে কোথাও গিয়ে থাকতেই পারে না।

নন্দিতা সন্তর্পণে ঠাট্টা ছুঁড়ল এবার, মেয়ের মাকে বুঝি তার বাবা চোখে হারান না?

রাকা হেসে ফেলল, প্রথম প্রথম হারাত। মেয়ে হয়ে গেলে মায়েদের কি আর সে দর থাকে?

রাকার স্বর বলছে, রাকারও কোথাও একটা গোপন কষ্ট আছে। কি সেটা? নন্দিতা খুব সাবধানে প্রশ্ন ভাঁজল, আপনার বর কেমন? আমার বরের মতো গোমড়ামুখো? না হাসিখুশি?

মন ভালো থাকলে হাসিখুশি। মন বিগড়লে গোমড়া।

আপনার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন কেমন ছিলেন?

সব ছেলেই যেমন থাকে। খুব লাইভ্লি। রাকার গলা কী একটু কেঁপে গেল? উত্তর দিতে একটু বেশি সময় নিল? নন্দিতা ঠিক বুঝতে পারল না। সে জানতে চেষ্টা করছিল, কত তাড়াতাড়ি তাকে ভুলেছে অরুণ।

একেবারেই কি ভুলে গেছে? এক সময় অরুণ যে তাকে সাংঘাতিক ভালোবাসত তাতে তো কোনও সন্দেহই নেই। একটু পাশবিক, একটু উগ্র, এই যা। সেই অরুণ দিব্যি অন্য একটা মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে, এ-কথা কী করে বিশ্বাস করে নন্দিতা? রাকা নির্ঘাত চেপে যাচ্ছে। হয়তো অরুণের বিষণ্ণ মুখটাই তাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি। হয়তো অরুণের অতীত যন্ত্রণাই পথ করে দিয়েছিল মসৃণ প্রেমের। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই তাই। নিজের মনে অরুণের নতুন করে প্রেমে পড়ার যুক্তিগুলোকে সাজাতে পেরে এক ধরনের তৃপ্তি পাচ্ছিল নন্দিতা। শ্যামলেন্দু বলত, নন্দিতা যদি তাদের বিয়েটাকে ম্যারেজ অফ লাভ্ না বলতে পারে, ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স বলতে আপত্তি কী। নন্দিতা আর শ্যামলেন্দুর বিয়ের সংজ্ঞা যদি তাই-ই হয়, রাকা অরুণের বিয়েটাকে কী বলা যায়? ম্যারেজ আউট অপ সিমপ্যাথি? না ম্যারেজ অফ্ ফিজিক্যাল নিড্?

গুম গুম শব্দে ট্রেনটা একটা ব্রিজ পার হচ্ছে। নিশুত রাতে নদী পেরোনোর এই শব্দটা বড় বেশি প্রকট হয়।

রাকা উঠে এসেছে নন্দিতার পাশে। গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে।

নন্দিতারও শীত শীত করছিল। কোন অদেখা ফাঁক-ফোকর দিয়ে যে ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ বাতাস হানা দেয় রাতের ট্রেনে কে জানে! রিমলিটাও ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেছে, নন্দিতা মেয়ের গায়ে কম্বল ঢেকে দিল ভালো করে। অনেকক্ষণ পর কথা বলল, আপনার মেয়ের স্কুল?

সাউথ পয়েন্ট! আপনার মেয়ে?

BanglaBook.org

আপাতত পাড়ার একটা নার্সারিতে। দেখি এরপর ওয়ানে কোথায় ভর্তি করা যায়। আজকাল ভালো স্কুলে ভর্তি করার যা ঝামেলা।

ঝামেলা বলে ঝামেলা। আমার মেয়েকে যে কী করে..। অবশ্য সব হ্যাপা আমার কর্তাই সামলেছে। সেই রাত থেকে লাইন দিয়ে ফর্ম আনা, অফিস কামাই করে মেয়েকে পড়ানো...। কাকে সব ধরে-টরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে...। মেয়েক ভালো স্কুলে দেওয়ার জন্য তো ওর ঘুম চলে গেছিল।

নন্দিতার বুক ফাঁকা হয়ে গেল। রিমলির লেখাপড়া নিয়ে শ্যামলেন্দুর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কিছু বলতে গেল হেসে উড়িয়ে দেয় নন্দিতাকে, কুচবিহারের অনামী স্কুল থেকে পাশ করে আমি যদি ইউনিভার্সিটির মাস্টারিতে পৌঁছতে পারি, আমার মেয়েও যে-কোনও স্কুলে পড়ে যেখানে পৌঁছবার ঠিক পৌঁছবে। তুমি নিজেই-বা কী এমন কনভেন্ট বা পাবলিক স্কুলে পড়েছিলে?

নন্দিতা তর্ক করেও বোঝাতে পারে না সময় এখন অন্য রকম। ইঁদুদৌড়ে নাম লেখাতে গেলে একটা দামি খাঁচার ভিতর ঢুকতে হয় আজকাল।

বোধহয় কোনও সিগন্যালে ট্রেনের গতি সামান্য কমেছিল, আবার সশব্দে দৌড়তে শুরু করেছে এক্সপ্রেস। নানা ভঙ্গিতে বেজে উঠছে ধাতব ঝঙ্কার। নন্দিতার মনেও সেই ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি? নাকি আর্তনাদ? গলার কাছে একটা চোরা কষ্ট ডেলা বাঁধতে চাইছে বার বার।

শ্যামালেন্দুই-বা কম নিষ্ঠুর কীসে। অরুণ তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা জাহির করত গলার জোরে। একবার সিনেমা যেতে রাজি হয়নি বলে নন্দিতার হাত মুচড়ে দিয়েছিল। আর শ্যামলেন্দুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা এতই সূক্ষ্ম যে নিকটতম সম্পর্কের মানুষজনও তার হদিস পায় না। যখন পায় তখন অজান্তেই ওই নিস্পৃহ মানুষটার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শিকার হয়ে যায়। এত দিন সেটা ভালো ভাবে বোঝার সুযোগ পায়নি নন্দিতা। আজ সে যেন হঠাৎই এই রাতের গাড়িতে বসে উত্তেজনাহীন, নিরীহ স্বভাব শ্যামলেন্দুর নাড়ির ঠিকানা পেয়ে যাচ্ছে। এই তো এবার যেমন। এবারই তো সমুদ্রে যেতে চেয়েছিল নন্দিতা। একটি বারও আপত্তি না জানিয়ে মেয়েকে শুধু পাহাড়ের গল্প শোনাতে শুরু করল শ্যামলেন্দু। তখন সমুদ্রে যাওয়ার কথা উঠতেই মেয়েরও বায়না শুরু। সে বরফের পাহাড় দেখবেই। এখন নন্দিতা বুঝতে পারছে রিমলি নয়, শ্যামলেন্দুই পাহাড়ে যেতে চেয়েছিল। এমন অনেক নিষ্ঠুরতা থাকে যার বিরুদ্ধে চিৎকার করা যায় না, দেওয়ালে মাথা ঠোকা যায় না, কেবল একটা শীতল বন্ধ জানালার ধারে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুকচেরা কষ্ট নিয়ে জেগে থাকতে হয় সারা রাত।

মাঝের বাঙ্কে শুয়ে নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েটা ঘুমের ঘোরে এলোমেলো হাত বাড়াচ্ছে। যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে কাউকে। বিদ্রুপের হাসিতে নন্দিতার ঠোঁট বেঁকে গেল।

রাকারও দৃশ্যটা নজরে পড়েছে। নন্দিতার কানে কানে বলল, আহা রে, এক বাঙ্কে যদি শুতে পারত দু'জনে।

নন্দিতার ঠোঁট থেকে বিদ্রূপ মুছে গিয়ে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল, চান্স পেলে সে-ভাবেও যায় অনেকে। আমিই গেছি।

রাকার চোখে অবিশ্বাস, যাঃ।

নন্দিতা বলল, সত্যি। বম্বে যাওয়ার সময় প্যাসেজের দিকের বার্থ দুটো পেয়েছিলাম। গোটা রাত্তির ও একবারও উঠল না উপরে।

তবে যে বলেছিলেন, উনি একটুও রোমান্টিক নন, অ্যাঁ?

সে তো কথার কথা। এক্কেবারে অন্য মানুষ ছিল সে-সময়। বৃষ্টি পড়তে কিছুতেই আমাকে ছাতা খুলতে দেবে না। একই ছাতার নিচে দু'জনকেই আধভেজা হতে হবে।

ওমা, তাই।

BanglaBook.org

লজ্জার কথা কী আর বলব। নিজে হাতে শাড়ি গয়না পছন্দ করে কিনে আনত। এনেই হুকুম, শিগগির সব পরে এসো। দেখব তোমাকে।

রাকা খিল খিল করে হেসে উঠল, সত্যি, আপনার বর...।

নন্দিতা আরাম করে সিটে মাথা রাখল। হাসল চোখ বুজে। মনে মনে বলল, সেটা আমার বর ছিল না রে, তোর বর।

চার

চোলিকে পিছে কেয়া হ্যায়, চোলিকে পিছে...।

গানের কলিটা শুনেই পিত্তি জ্বলে উঠেছিল নন্দিতার। আড়চোখে দেখল, রাকার ভুরুতেও ভাঁজ পড়েছে। শ্যামলেন্দু পাটনা থেকে কেনা ইংরেজি কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

মোকাম স্টেশন থেকেই হা-রে-রে-রে করে উঠে পড়েছে ছেলেগুলো। তার আগে, পাটনা ছাড়ার পর থেকেই অবশ্য ট্রেনে বেশ ভিড়। দিনের বেলাতে এ-সব ট্রেনে রিজার্ভেশনের কোনও বালাই থাকে না। কন্ডাক্টর, গার্ড, চেকার-ফেকার সব উধাও। ঠেলেঠুলে যে যেখানে পারছে জায়গা করে নিচ্ছে এখন। নন্দিতা আর রাকাদের সিটে জনা পাঁচেক দেহাতি বুড়ি বসে পড়েছে গাদাগাদি করে। ছেলেগুলোও নন্দিতাদের কুপের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

চুনরি কে নিচে কেয়া হ্যায় চুনরি কে নিচে... রাকা, নন্দিতা শ্যামলেন্দু তিন জনই পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কাকে উদ্দেশ্য করে এই অশালীন উচ্ছ্বাস। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েটিকে দেখে পুলক আর ধরে রাখতে পারছে না ছেলেগুলো। মেয়েটি মাথা নিচু করে একটা ম্যাগাজিন পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির চোখমুখ লাল। চোয়াল শক্ত।

রাকা, নন্দিতার কানের কাছে ফিস ফিস করে উঠল, এ-সব রাফিয়ানগুলোর জন্য লং ডিসটান্স ট্রাভেল করাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আজকাল।

রিমলি হাঁ করে ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নন্দিতা মেয়ের ঘাড় ধরে তার মুখ জানলার দিকে ঘুরিয়ে দিল। শ্যামলেন্দু এখনও ইংরেজি দৈনিকের আড়ালে।

নন্দিতা নিচু গলায় শ্যামলেন্দুকে বলল, পাশের কুপের ছেলেগুলোকে ডাকো না। কিংবা ও-দিকের পাঞ্জাবি ভদ্রলোকদের।

লাভ হবে না। তার থেকে বরং ইগনোর করার চেষ্টা করো। কিউল-ফিউলে নেমে যাবে মনে হয়। মনে করো না, মেট্রো চ্যানেলের গান শুনছ।

নন্দিতা চুপ করে গেল। জানে, কথা বলে লাভও নেই। কলকাতার রাস্তাঘাটে হাঁটার সময়ে দু-চারটে টিটকিরি যে তাকে শুনতে হয়নি তা নয়। শ্যামলেন্দু হয়তো তখন পাশেই তার। কখনও অপমানে নাকের পাটা ফুলে উঠলেও শ্যামলেন্দুর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। ঘরদোরে পোকামাকড় থাকে না? এগুলো হল রাস্তার পোকামাকড়। এদের টিকাটিপ্পনী গায়ে লাগাতে আছে? ঝেড়ে ফেলো না, মেরে ফেলো। বলেনি। শ্যামলেন্দু গায়ে মাখত না। ঠিক আরেকটা কোনও বক্তৃতা দিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত তার শান্তিপ্রিয়, বিদ্বান স্বামী।

নন্দিতার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। অত্যন্ত অভব্য ভঙ্গিতে ছেলেগুলোর মধ্যে এক জন মাঝের সরু প্যাসেজটায় ঢুকে দাঁড়িয়েছে। কারণ ছাড়াই ঝুঁকে পড়ে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে মেয়েটির গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মেয়েটি ভয়ে জড়োসড়ো।

BanglaBook.org

মেয়েটির বর আর নীরব থাকতে পারল না। ভুল হিন্দিতে বলে উঠল, ঠিক সে দাঁড়ানে নেই সাকতা কেয়া?

সঙ্গে সঙ্গে বাকি ছেলেগুলো ভেংচে উঠেছে, কেয়া দাদা, ঠিক সে দাঁড়ানে নেই সাকতা কেয়া?

এক জন বিহারি ভদ্রলোক পিছন থেকে বোধহয় শাসন করার চেষ্টা করলেন ছেলেগুলোকে।

উত্তরে যুবকের দল অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে।

মেয়েটি ভয়ে কেঁদে ফেলে প্রায়। তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে রাকা। নন্দিতার ডান হাতের কব্জি চেপে ধরেছে প্রাণপণে। নন্দিতারও শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত ওঠা-নামা করছিল। বেশ বুঝতে পারছে সামনের ছেলেটি চিৎকার করে উঠতে চাইছে। সাহস পাচ্ছে না। আর কেউ এগিয়ে না আসে, অতগুলো ছেলের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন? অক্ষম রাগে চোখ-মুখ তার দপ দপ করছে।

ট্রেনটার গতি ক্রমে ধীর হয়ে এল। গুড় গুড় আওয়াজ বাজিয়ে একটা ব্রিজে উঠে পড়েছে গাড়িটা। উদ্ধত ছেলেগুলো চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গীর উদ্দেশে, আরে ও শামা, ছোড় দে দুলহানিয়াকো।

শ্যামলেন্দু নন্দিতার হাঁটুতে হাত রাখল, কিউল এসে গেছে। এবার সব নেমে যাবে।

সত্যিই তাই। ট্রেন পুরোপুরি থামার আগেই ধাক্কাধাক্কি করে নেমে যাচ্ছে ছেলেগুলো। প্ল্যাটফর্মে নেমে জানলার ধারে এসে হাসির ফোয়ারা তুলল। ভাবটা এমন, কেমন মজা করলাম? ভয় দেখালাম তোদের?

ট্রেন ছাড়ার পর শ্যামলেন্দু নতুন করে খবরের কাগজে মন ডুবিয়েছে। যেন এতক্ষণ যা ঘটল তা কোনও স্বাভাবিক দৈনন্দিন ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। যেন এতক্ষণ ছেলেগুলোর হল্লাবাজিতে শুধু শুধুই বিঘ্ন ঘটছিল তার পড়ায়। অথচ রিমলি যে রিমলি, সে-ও বেশ আহত হয়েছে ছেলেগুলোর বেলেল্লাপনায়। মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলছে, তুমি মন খারাপ কোরো না আন্টি। দুষ্টু লোকগুলোকে বড় হলে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব।

ছেলে-মেয়ে দুটোকে হাসার চেষ্টা করছে। শ্যামলেন্দুর মুখেও মৃদু হাসি। নন্দিতার মাথা গরম হয়ে গেল। হঠাৎই ঝাঁঝিয়ে উঠে শ্যামলেন্দুকে বলে, হাসবে না একদম। তখন ভয়ে চুপ করে থাকলে...।

শ্যামলেন্দুর মুখ থেকে হাসি মুছল না, কী করতে পারতাম বলো। ওরা ও-রকমই।

পারবে না যখন, তখন হাসবেও না।

ছেলেটি নিজেকে ঠাণ্ডা করার জন্যই বোধহয় উঠে গেল সামনে থেকে। মেয়েটি চোখ বুজে হেলান দিয়েছে সিটে। রাকা অসম্ভব রকম চুপচাপ।

নন্দিতা, রাকার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। অরুণ থাকলে এতক্ষণে এই কামরায় যে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে যেত তাতে কোনও সন্দেহই নেই। একবার ক্যানিং লোকালে দুটো ছেলে নন্দিতাকে চোখ মেরেছিল বলে সোজা গিয়ে দু'হাতে দু'জনের কলার চেপে ধরেছিল অরুণ। কোনও প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি মেরেছিল এক জনের চোয়ালে, লাথি চালিয়েছিল অন্য জনের পেটে। ছেলে দুটোও ছাড়ার পাত্র নয়। মুহূর্তে উলটো আক্রমণ হেনেছে। অরুণও নাছোড়বান্দা। মারপিট করতে করতে নাক-মুখ কেটে রক্ত ঝরেছে, তবু অরুণকে ছাড়াতে পারেনি আর সব প্যাসেঞ্জাররা। অবিরাম চিৎকার করে যাচ্ছিল অরুণ, মেয়েদের ঝিলিক দেওয়া, অ্যাঁ? শুয়োরের বাচ্চা, তোদের আমি চোখ উপড়ে নেব। লজ্জায় ট্রেনের দেওয়ালে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল নন্দিতার।

এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, শ্যামলেন্দুর জন্য ট্রেনের দেওয়াল খোঁজা উচিত। ভাগ্যিস, রাকা তাকে চিনতে পারেনি। চিনলে ভাবত, এক কাপুরুষ নপুংসককে বিয়ে করেছে তার স্বামীর আগের পক্ষের বউটা।

রাগুক, মারুক, ধরুক একটা চনমনে উত্তাপ ছিল অরুণের মধ্যে। শ্যামলেন্দু বড় বেশি শীতল। যান্ত্রিক। ভিতু ধরনের। পড়াশুনোর জগতে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি করে যেন গোটা সাইবেরিয়া বুকের ভিতর পুরে রেখেছে লোকটা!

রাকা বুঝি পড়ে ফেলেছে নন্দিতার মনের ভাবটাকে। নরম গলায় বলে উঠল, ওঁর উপর অত রেগে যাচ্ছেন কেন? সত্যিই তো উনি একা কী-ই বা করতে পারতেন? দেখলেন না, এত ভদ্রলোক চারদিকে; কেউ জোর গলায় প্রোটেস্ট করল না।

নন্দিতার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আপনার স্বামী থাকতে তিনি নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকতেন না।

রাকা বলল, কে জানে। ওর সঙ্গে থাকা অবস্থায় এ-রকম সিচুয়েশনে তো পড়িনি কোনও দিন।

নন্দিতা মনে মনে বলল, আমি পড়েছি। আমি জানি। অরুণ, শ্যামলেন্দু নয়। অরুণের ভিতর প্রকৃত সাহস আছে। স্ত্রীর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসাও।

মন যে কী চায়, মন কি তা জানে!

এই যে সারাটা সকাল ধরে, সারাটা দুপুর ধরে শ্যামলেন্দুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে ইচ্ছা করল না নন্দিতার, সারাক্ষণ ধরে শুধু অরুণের স্মৃতি রিন রিন করে বেজে চলল অন্তরে, বার বার মনে হল অরুণের সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না শ্যামলেন্দুর, অরুণ কম শিক্ষিত হয়েও অনেক বেশি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, সেই মনই সহসা কেন যে বিরূপ অরুণের ওপর।

মুহূর্তে নন্দিতার ভুরু জড়ো, কার আসার কথা আছে?

আসার কথা তো আমার বরেরই।

শ্যামলেন্দু বলল, চিন্তার কী আছে? আমরা তো ভবানীপুরের উপর দিয়ে যাবই, তেমন হলে আপনাকে...।

নন্দিতা নিথর। অরুণ স্টেশনে আসতে পারে শুনেই আতঙ্কে শিথিল হয়ে আসছে তার শরীর। ওই লোকটার সামনাসামনি পড়তে হবে। যে কিনা ঘাড় ধরে নন্দিতাকে বার করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। যে কিনা ডিভোর্সের পর পরই নন্দিতাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে আরেকটা মেয়েকে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে।

রাকা বাথরুমের দিকে যেতেই নন্দিতা হিস হিস করে উঠল, ওর বর আসবে কি আসবে না সেটা ওর ব্যাপার। গায়ে পড়ে উটকো ঝামেলা তোমার ঘাড়ে নেওয়ার দরকার কীসের?

বাঃ, ভদ্রমহিলার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অবিরাম গল্প করে গেলে! আর ট্রেন থেকে নামার সময় সে উটকো ঝামেলা!

নন্দিতা হাতের কাছে ভালো যুক্তি খুঁজে পেল না। পেল না বলেই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল স্পষ্ট ভাবে, আমি হাওড়া পৌঁছে কারুর জন্য দাঁড়াব না। তুমি অপেক্ষা করে দেখো, ওর স্বামী আসে কি না। তারপর দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে এসো।

শ্যামলেন্দু আরও গম্ভীর হয়ে গেল। গোমড়া মুখে স্যুটকেস, হোল্ডঅল নামাচ্ছে বাঙ্ক থেকে। মুখ দেখে বোঝা যায় সে নন্দিতার আচরণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ।

শ্যামলেন্দুর কাছে ছোট হয়ে গিয়ে নন্দিতারও খারাপ লাগছিল। কী করবে? সব মানুষেরই এমন কিছু কথা থাকে, যা কাউকে খুলে বলা যায় না। নিজের স্বামী বা স্ত্রীকেও নয়।

রাকা বাথরুম থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে ফিরে এল। নন্দিতারা মোটামুটি নামার জন্য তৈরি। রিমলি ওয়াটার বটল কোলে করে বক বক করছে সামনের ছেলে-মেয়ে দুটোর সঙ্গে।

রাকা নিজের স্যুটকেস মেঝেতে নামাল, কাল রাত থেকে আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

BanglaBook.org

নন্দিতা জানলা দিয়ে শহরতলির স্কাইলাইন দেখার ভান করছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে তাকাতে হল তাকে, কী?

কাল আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর দেননি কিন্তু।

কোন প্রশ্ন?

ওই যে, আমি কী ভালোবাসি, কী বাসি না... কাল ও-সব কেন জিজ্ঞেস করছিলেন?

এমনিই। নন্দিতা লম্বা শ্বাস ফেলল। স্রেফ কৌতূহল।

কৌতূহল মিটল? কী বুঝলেন?

সব কি আর কোনও দিন পুরোপুরি বোঝা যায়? সব কৌতূহল মেটে মানুষের? নন্দিতা মুখ হাসি হাসি রাখার চেষ্টা করল, কিছুটা আন্দাজ পেলাম বৈ কী।

রাকা লঘু স্বরে হেসে উঠল, বেশ। আমার বর স্টেশনে এলে আলাপ করিয়ে দেব। ওর সঙ্গে কথা বললে আরেকটু আন্দাজ বাড়তেও পারে।

মন্থর গতিতে কারশেড পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ডাউনের গাড়ি। নন্দিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

ট্রেন দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রিমলিকে নিয়ে নন্দিতা আগেভাগে নেমে পড়েছিল কামরা থেকে, রাকাকে অবাক করে দিয়ে। শ্যামলেন্দুকে মাল নামাতে একটু সাহায্য না করে, নেমেই একটা মোটা থামের আড়ালে লুকিয়েছে নিজেকে।

শেষ সন্ধ্যাকালে গোটা স্টেশন চত্বর জুড়ে এখন অফিস-ফেরত যাত্রীদের অবিরাম স্রোত। ভরা জোয়ারের মতো। সকলেই ঘরে ফেরার জন্য মরিয়া এখন।

নন্দিতার হাঁটু দুটো টিপ টিপ কাঁপছিল। অবাধ্য চোখ বার বার ভিড় মাড়িয়ে খুঁজছে অরুণকে। অরুণ এসেছে কি আদৌ? হয়তো এসেছে। হয়তো আর সব কোচগুলোতে উঁকি মেরে খুঁজছে বউকে। মানুষ তো এ-ভাবেই আপন জনকে খুঁজে বেড়ায়।

শ্যামলেন্দুও কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে ব্যস্ত চোখে খুঁজছে নন্দিতাকে। নন্দিতা এক দৌড়ে গিয়ে স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরল, তাড়াতাড়ি চলো।

বলল বটে, তবুও কেন যে বেয়াড়া পা দুটো থেমে পড়তে চাইছে নন্দিতার। ফিরে ফিরে চোখ পিছন দিকেই যায়। এক চিলতে দেখা যদি হতই অরুণের সঙ্গে, ক্ষতি কী হত।

ভাবতে গিয়ে ভাবনা হোঁচট খেয়েছে আচমকা। আশ্চর্য! সে এ কী বোকামি করল! অরুণ যে একই রাকারই স্বামী তা তো না-ও হতে পারে। নন্দিতা একবারও রাকাকে তার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করেনি। সম্পূর্ণ ঠিকানাটাও! পূর্ণ সিনেমার কাছাকাছি দু'জন রাকা থাকতেই পারে।

নন্দিতার পা দুটো পুরোপুরি নিশ্চল হয়ে গেল। ফিরে গিয়ে দেখবে। থাক। যদি সত্যি সত্যি অরুণই হয়। যদি হয়!

ভিড়ের চাপে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। একটা বড় ধাক্কায় কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল নন্দিতা, আবারও এক ধাক্কায় বুকটা ধক করে উঠেছে। শ্যামলেন্দু বা রিমলি কেউ আর নেই চোখের নাগালে। দু'জনেই ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

নন্দিতা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভিড় সরিয়ে সামনে এগোনোর চেষ্টা করছিল। কোথায় শ্যামলেন্দু! রিমলি কোথায়! কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বড় বেশি উটকো লোক এসে পড়েছে মাঝখানে।

হায় রে, নন্দিতা এখন কী যে করে॥

BanglaBook.org

আবুল বাশার

জরিনা

আমি জরিনাকে তার ছবি আঁকার খোদায়ী গুণ দেখে সাদি করেছিলাম। আমার নাম রাসেল মল্লিক। আমি শাসন পঞ্চায়েত অফিসে অ্যাসিসট্যান্সের চাকরি করি। জরিনাও বেকার রাঙাবেলিয়া গোসাবায় অঙ্গনওয়াড়িতে কাজ পেয়েছে। দু'জনেরই ছোট চাকরি। কিন্তু আমরা খুশি। আমরা সুখীও নিশ্চয়। ওর কাজের জায়গাটা নদীর ধারে। ও-পারে সুন্দরী গরানের বন। বাঘ আছে।

একটাই ভয়, যদি বাঘ আসে।

দু'জন দুই জায়গায় থাকি। সপ্তাহান্তে হয় জারিনা শাসনে আসে, নয়তো আমি রাঙাবেলিয়া যাই। এ সপ্তায় আমার যাওয়ার কথা। হঠাৎ একটা চিঠি এসে পৌঁছল।

জরিনা লিখেছে, সেলফোনে বলা যায় না বলে, চিঠি লিখতে হল। আমি দিকশূন্যপুরে নানির কাছে এসেছি, মাস খানেক এখানে থাকতে হবে। নানি খুব অসুস্থ। এখন এসো না। তাছাড়া ফোনেও কথা হবে না। নানির এখানে টাওয়ার ধরে না, ওদিককার কথা শোনা যায় না। আবার তোমাকে চিঠি লিখব। ভালো থেকো। ইতি তোমারই জরিনা।

অবাক লাগল। মনটা দমেও গেল। নতুন বিয়ে হয়েছে। এই অবস্থায় বউকে না দেখে থাকা যায়! তারপর ভাবলাম, সত্যিই হয়তো নানি নিতান্ত অসুস্থ। জরিনা মিথ্যে বলবে না। এই করে একা শাসনে পড়ে রইলাম। পরের সপ্তাহে চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। চিঠি কিন্তু এল না।

দিকশূন্যপুরে কখনও যাইনি। বাস্তবিকই ওই নামে দক্ষিণে একটি জনপদ রয়েছে, যেমন পথের দাবি নামে একটি গ্রাম রয়েছে। নানিকে শুধু বিয়ের রাতে দু'চার নজর দেখেছি।

নানি বলেছিলেন, বলি কী ভাই, জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ; আমার নাতিন রে বুক দিয়ি আগলায়ে রাখিও; অঙ্গনওয়াড়ির চাকরি, ছড়ি গেলে নুকসান; না হলি কইতাম নাতিন রে জন্মের মতন শাসনে নিয়ি যাও, কাছে রাইখ্যা থিতু হও। ক্বচিৎ আসে দক্ষিণরায়, কিন্তু আসে তো। মারে মারুক; কিন্তু থাবায়ে রাইখ্যে গেলে মানুষের সেই রূপ আর সহ্য হয় নে বাপু! শাদি মোবারক ভাই; এমন সাঁঝবেলায় দক্ষিণরায় রে স্মরণ করতি নাই। হা বনবিবি, আমার সন্তান রে তুমি দেখিয়ো, যতন করিও মা!

নানির কথা সব কানে আজও বাজে। কী কথার ধাত, কী নির্মম। থাবা শব্দের অমন ব্যবহার কখনও শুনিনি। এই দক্ষিণের লোকও নই। আমি মুর্শিদাবাদী নির্মাণ-মিস্তিরির ছেলে। বাবা ছিলেন মুখ্যত দালান-মিস্ত্রি। সোনারপুর এলাকায় এসে কাজ ধরেন এবং থেকে যান; একটা আস্তানাও গড়ে নেন। তাঁরাই সন্তান আমি। লেখাপড়া শিখেছি। উচ্চ ডিগ্রি গোপন করে, উচ্চমাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট দর্শে এই চাকরিটা জোগাড় করেছি। বরাবরই আমার নানা শিল্পকলার দিকে ঝোঁক। চাকরি পাওয়ার আগে দক্ষিণের ট্রেনে মাইক লাগিয়ে ট্রেনের কামরায় কিশোর-কণ্ঠী গানের মাধুকরী বা ফিরি করতাম। সাহস করে টিভির পর্দায় দেখানো গানের রিয়েলিটি শো-তে পার্টিসিপেট করে শেষ রাউন্ড পর্যন্ত উঠেছিলাম।

ফলে দক্ষিণে আমার একটা নামডাক হয়। দোখনো গানের এক জলসায় শ্রোতার আসনে জরিনাকে দেখি, গান শেষে ও আমার কাছে এসে আলাপ করে এবং মুগ্ধতা প্রকাশ করে। জরিনা সুন্দরী, সে আমাকে ওদের বাড়ি যাওয়ার জন্য বলে। আমার মোবাইল ফোনের নম্বর পর্যন্ত নেয়। ফোনে আমাদের কথা হত। এক দিন ওদের বাড়ি গেলাম।

জরিনাদের বাড়ি গিয়ে অবাক হই। মাটির বাড়ি, খড়ের চাল। দু'খানা ঘর, তা-ও ছোট-ছোট, উঠোন আছে মাটির। কিন্তু ঘরের দেওয়ালে পাকা হাতের আদিবাসী-টেরাকোটা মোটিফের চিত্রকলা, এমনকী দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ছাঁদের নারীমুখ এঁকেছেন জরিনা।

BanglaBook.org

জরিনা বলল, আমি নকল করতেও পারি, নিজের করতেও পারি।

কোথায় শিখলে?

আমার কোনও গুরু নেই। মাধব চিত্রকর আমাকে কিছুটা দেখিয়ে-টেখিয়ে দিতেন। তিনিও আর নেই। একা-একা যেমন আসে করি। যে-দেখে সে-ই বলে, বড় ঘরে জন্মালে আমার দেশজোড়া নামডাক হত। ওস্তাদের ঘরে জন্মালে আপনি যেমন বড় গায়ক হতেন সেই রকম। সে যাই হোক, আমি কিন্তু আঁকতে ভালোবাসি। ইজেলে-ক্যানভাস করেছি। দেখবেন সেগুলো?

দেখতে দেখতে আমি থ হয়ে গেলাম। আমি জরিনার প্রতি আশ্চর্য এক আকর্ষণ টের পেলাম। মনে হল, এ কোন সুন্দরের কাছে এসেছি আমি।

ছবিগুলো দেখানোর পর আমার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে জরিনা বলল, কিন্তু যে-সমাজে থাকি, সেখানে চিত্রচর্চা পাপ। বাপ নেই বলে আরও অসুবিধা। মা বিধবা। এক প্রকার চেয়েচিন্তে মা আমাকে মাধ্যমিক পাশ করিয়েছে; হায়ার সেকেন্ডারি অসম্পূর্ণ, এখন আমি কাগজের কাঠের মুখোশ বানিয়ে মেলায় গিয়ে বেচে আসি। এ-ভাবে তো চলবে না। মা বিয়ে দিয়ে মুক্তি চাইছে, দায়মুক্তি বলতে পারেন। অঙ্গনওয়াড়িতে যদি চাকরিটা হয়ে যায়, তা-ও কিছুটা বাঁচি। মোল্লারা খুব চাপ দিচ্ছে। কী করি বলুন তো? কিছু মনে করবেন না, বেহায়াও ভাববেন না আমাকে, আমি কোনও ওয়াক্তি মৌলবি বিয়ে করতে পারব না। তাঁরা ভালো মানুষ, ধার্মিক মেয়ে আছে সংসারে। আমাকে কেন? আসলে কী জানেন, কারা যেন আমার হাতের তুলিটা কেড়ে নিতে চাইছে।

আমি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, বুঝলাম।

কী বুঝলেন?

এ যে আমারও সমাজ জরিনা। বুঝব না? তোমার হাতের তুলি বিদ্যমান কীসে হয় ভাবতে হবে।

বিদ্যমান?

ওই আর কী! বজায় কীসে থাকে।

কীসে?

আমি তোমার জন্য পছন্দের ছেলে দেখব!

শুধু দেখবেন বিয়ের পর তুলিটা যেন কেড়ে না নেয়।

সে বড় কঠিন কথা হল জরিনা। দেখতে মোল্লা নয়, শিক্ষাও আছে, অথচ ছবিগানের গোঁড়া-দুশমন সমাজে অনেক। সে যুবক, গান শোনে, ছবি দেখে, ছায়াছবি দেখে, মাথার চুলে ফাঁট আছে, বিয়ের পর দেখা গেল, প্রথমেই তোমার হাতের তুলি কেড়ে নিয়ে জ্বলন্ত উনানে দিল। কী করে বুঝব বলো তো? আচ্ছা, কীসের মুখোশ করো তুমি?

কেন, দক্ষিণরায়ের মুখ।

তার মানে বাঘ!

জি।

অবাক হয়ে কী যেন কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম।

তারপর বললাম, বাঘের মুখোশ করো কেন?

জরিনা বলল, রয়েল বেঙ্গল বাঘ ভারি সুন্দর।

ভয়ঙ্কর একটা জীব, তাকে তুমি সুন্দর বলছ?

হ্যাঁ বলছি। সুন্দর, ভয়ঙ্কর হলেও সুন্দর।

ভয়ও তো করে।

BanglaBook.org

করে। জগতের লোক সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরকেই তো দেখতে আসে। ভয় করে, আবার গর্বও হয়; এমন বাঘ আর আছে কোথায় বলুন।

আর বলো না। গোসাবার বিধবা পল্লীর সব বিধবা ওই বাঘের মুখে স্বামী খুইয়ে বিধবা। মধু ভাঙতে জঙ্গলে গেল, বাঘ সাবাড় করে দিলে। তোমরা মউলে?

জি। বলে মাথা নেড়ে জরিনা বলল, আমার বাপুকেও বাঘে নিয়েছে। তবু বলছি, বাঘ সুন্দর।

বুঝলাম না। আচ্ছা, আসি এখন।

আপনি ভয় পেয়েছেন।

এই বলে শব্দ করে জোরে জোরে হাসতেই থাকে জরিনা। তাকে দেখায় আরও সুন্দর।

তারপর জরিনা হাসতে হাসতে বলে, মউলে যারা, জঙ্গলে মধু ভাঙে, তারা বাঘের সঙ্গেই ঘর করে, তামাম সুন্দরবনের মানুষ, আমরা কেউ না-কেউ, সেই হিসেবে সবাই, আমরা সকলে বাঘের সঙ্গে লড়েই তো বেঁচে আছি।

বলতে বলতে হাসি থেমে যায় জরিনার।

এই জরিনাকেই আমি বিয়ে করেছি। বিয়ের সন্ধ্যায় নানির কথা শুনে বুকের ভেতরটা গুড় গুড় করতে লাগল। মনে হল, কোনও মৃত্যুরই সঙ্গে আমার বিবাহ হল না তো? তারপর ভাবলাম, এখানকার লোককে বাঘে খায়, কুমির জলে টেনে নিয়ে যায়। তবু এখানে বিয়ে-সাদি বন্ধ থাকে না। আমার ইচ্ছে নয় যে, জরিনা এখানে থাকে। কিন্তু ওর চাকরিটা যে এখানেই!

জরিনা আমার মনের কথা কেমন করে যেন টের পেয়ে যেত।

বিয়ে করে শাসনে এসে যখন ওকে বিছানায় কাছে পেলাম, তখন রাত হয়েছে।

জরিনাকে বললাম, খুলবে না?

জরিনা বলল; হ্যাঁ।

সে কানের গলার নাকের একটা একটা করে ধীরে ধীরে খুলতে থাকে আর নির্নিমেষ আমার মুখে তাকায়। ওর পলকহারা, মায়াজড়ানো চাউনি আজও মনে পড়ে।

সে নিজেকে খুলতে খুলতে বলে, ভয় পেয়ো না রাসু। যেখানে কাজ করি, ওখানে নদীর খুব উঁচু খাঁড়ি, দক্ষিণরায় আসবে না। বারো বছর আগে মাত্র একবার এসে থাবা মেরেছিল। যদি ভয়ে ভয়ে থাকো, সুখ করতে পারবে না। বলতে বলতে আরও খুলতে থাকে নিজেকে। বুকের শাড়ি স্খলিত হয়েছে। বুক দু'টি জামা ঠেলে ফেটে পড়তে চাইছে। বুকের আকৃতি ক্ল্যাসিক গোল বলে মনে হচ্ছে। দেখা গেল, আমার চোখ ব্লাউজের আড়াল এবং ব্রা-এর বাঁধুনি ঠেলে দ্রুপদী স্তন যুগলকে ঠিকই আভাসিত করেছিল। ব্লাউজ খুলে বাহুমূলে আটকে রেখে জরিনা শুধাল, কেমন? তোমার পছন্দ হয়? দেখো, ভালো করে। ভয় পেয়ো না। এ-সবই তোমার জন্য সারা জীবনের উপহার। আমার গাঁথুনি ভালো, সহজে ঢলে পড়বে না, শোনো, আগে দেখে নাও, তারপর হাত লাগাবে।

আমি থাবা গুটিয়ে নিই।

জরিনা বলল, আমার তো মনে হয়, তোমাকে আমি বুক দিয়ে আগলে রাখব, বুকের এই খাঁজে তোমার মুখ এবং চোখ দুটো ডুবে যাবে, আমার শরীরে সুঘ্রাণ আছে, কোনও বাঘিনির মতো বোঁটকা গন্ধ তুমি পাবে না। নাও, এসো। শরীরের সবখানে তুমি দৃষ্টি বুলাবে। যদি দেখো তো দেখবে, আমার যৌনফুল মধুরা। আমি বেশুমার সাহিত্য পড়ি, আঁকতে হলে পড়তে হয়। আমি এখানকার লাইব্রেরির মেম্বার। নাও, এসো। যত দেখবে, ভয় কেটে যাবে।

বললাম, তোমার দেহ শিল্পীর ভাস্কর্যের মতো; ধাতুর মতো দৃঢ় আর পেলব। দৃঢ় এবং নরম। বেহেস্তের ফুলের মতো, কী বলে, সুগন্ধিত। মনে কোরো না বাড়িয়ে বললাম। কিন্তু ও কী! দরজায় কী যেন নখর আঁচড়ায় জরিনা।

BanglaBook.org

দরজা খুলে দেখা গেল কিছু নেই।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও জরিনার চিঠি এল না। ফোনে চেষ্টা করেও পেলাম না। আমার আর ধৈর্য রাখা দায়।

বিয়ের রাতেই জরিনা বলেছিল, এই রূপ যদি নষ্ট হয়, কারও নখরে এঁটো কী তিহিসনিহিস (তছনছ) হয়, আমাকে তালাক করিয়ো রাসু। এসো, ভয় কেন করো। আকাশের ফরিস্তা দেখছেন, আমরা আরও সুখে ভাসছি; হে বনবিবি, আমার লখিন্দর রে রক্ষা করো মা।

অবশেষে চিঠি এল। জরিনা লিখেছে :

চিঠি দিতে দেরি হল। ডাক্তার বলেছেন, ছ'মাস নানির সেবা লাগবে। নানি একা। দিকশূন্যপুরে আমার ছ'মাস থাকতেই হচ্ছে অগত্যা। তুমি রাঙাবেলিয়া না এলেই ভালো করবে। কারণ, শনি-রবি নানির কাছ থেকে নড়বই না। অন্য দিনগুলোয় সেন্টারে শুধু হাজিরা দিয়ে চলে আসি, যা হোক করে ম্যানেজ দিতে হচ্ছে। লক্ষ্মীসোনা, রাগ কোরো না। আমি তোমারই সোনা। ছ'মাস কষ্ট করো। তারপর এসো। যদি জোর করে আসো, কাশিমভাইকে সঙ্গে এনো। হয়তো উনি দিকশূন্যপুর চিনবেন। মুখ এখন এঁটো হয়ে রয়েছে। তবু তোমাকে চুম্বন দিলাম। ঘৃণা কোরো না। প্লিজ, ইতি তোমারই জরিনা।

কাশিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। তাঁকে কেন? তাঁকে সঙ্গে নেব কেন? কাশিমই তো আমাদের বিয়ে দিয়েছেন। দিকশূন্যপুর কাশিম চিনবেন। আমি কি চিনে নিতে পারব না? এঁটো চুম্বনের মানে কী? নাকি জরিনা কিছু খেতে খেতে চিঠিটা লিখেছে বলে এঁটো? নাকি তাকে বাঘে খেয়ে দিয়ে গেছে? কী সর্বনাশ! এ-সব কী ভাবছি আমি! বিয়ের রাতেও ভুল করে ভেবেছিলাম, কীসে যেন দরজায় আঁচড়াচ্ছে। দরজা খুলে দেখি, কিছু নেই। তাহলে কি এই যে, কিছুই তিহিসনিহিস হয়নি; আমিই কেবল ভয়ে মরলাম? কথায় বলে, বনের বাঘে খায় না; মনের বাঘে খায়। আমাকে কি তাহলে মনের বাঘে সাবাড় করে চলেছে? আমাকে বাঁচাও জরিনা। জরিনাকে আমি জরিন ডেকে খুব সুখ পাই। মনে মনে আর্তনাদ করে উঠি, বাঁচাও।

কাশিমভাইকে নিয়ে রাঙাবেলিয়া এলাম। আগে খোঁজ নিই, কী হয়েছে। তারপর দিকশূন্যপুর যাব।

রাস্তায় এক কিশোর আমাদের দেখে বলল, অ্যাদ্দিনে এলেন জামাইবাবু। ও-পাড়া যান। দেখতি পাবেন, কেমন কইরে থাবায়ে গেছে। সিধা কাঁঠালবাগান যাবেন। দেখবেন মানপাতায় মুখ ঢেকি শুয়ে আছে। গাছতলায় যান। কী সাধের জেবন কেমন হইল জামাইবাবু। যান, যান। খালি দাঁড়ায় দেখেন কী?

গল্প এই যে, প্রকাণ্ড মানপাতায় মুখ ঢেকেছে জরিনা।

জরিনকে ডেকে উঠতে আমার গলা কেঁপে গেল।

জরিন। কাশিমভাইকে সঙ্গে এনেছি জরিন। পাতা সরাও। তোমাকে দেখি।

না রাসু। হয় না। দূরে থাকো। কাছে এসো না।

আমি তোমাকে যে দেখব বলে এসেছি।

দেখতে চেয়ো না। আমাকে তালাক দাও। তালাকের সাক্ষী কাশিমভাই। দাও, তালাক দিয়ে শাসন ফিরে যাও রাসেল। খোদা আমাকে যে-ভাবে এঁকে দিয়েছেন, এরপর আর দেখতে চেয়ো না। তোমার ভয় করবে।

জরিনের এমন কথায় কি মহাকাশে অবস্থিত খোদার আরশ (সিংহাসন) কেঁপে উঠল না! বিদীর্ণ হল না সহস্র ক্যানভাস? শিল্পীকে তুমি এমনই কষ্ট দিলে ওহে দক্ষিণরায়! মা বনবিবি, তুমি তো

BanglaBook.org

জরিনকে যত্ন করলে না, আমার গলার গান তুমি শুকিয়ে দিলে কেন জঙ্গলমহলের দেবী! আমি কোথাও ফিরব। না, আমি পারব না।

পাতা সরাও জরিনা।

তালাক দাও।

আমি আর কাশিম চুপচাপ ঘরে চলে আসি। আমাদের পায়ের শুকনো পাতা মাড়ানো শব্দে ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে জরিন, মা গো। ফের দক্ষিণরায় আসতেছি মা। আমাকে ভক্ষণ করুক, তুমি দেখিয়ো না। যাও রাসু। পালাও।

মুখের থাবার ছিন্ন ক্ষত শুকায় ছ'মাসে। তারপর শাসনে একটি গৃহে গভীর রাতে আমরা দু'জন। আমি জরিনাকে ভোগ করছি। ও তার মুখ ওড়নায় ঢেকে রেখেছে।

এটাই শর্ত। সম্ভোগ সময়ে আমি জরিনার মুখ দেখব না। নিষ্প্রভ নীল আলোয় আমাদের সুখের ঘরখানি যেন-বা দিব্যালোকের মতো সুন্দর হয়েছে। বাঘ শুধু মুখের ওপর মেরে গেছে; শরীর স্পর্শ করেনি। জরিনার বক্ষ পূর্ণিমায় ঈশ্বরের তুমি বিস্ময় গান এখনও গেয়ে চলেছে। আমি ভাবছি, শর্ত যখন, তার মুখে চাইব না অতএব।

কিন্তু নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অভিজ্ঞতা আদম-ইভের ছিল। যেখানে মানা, সেখানেই ভক্ষকের ক্ষুধা চোখ মেলে।

আমি কি মাথা খারাপ করার মতো পাগল? যৌন-আবেগে আমি কি দানব? আমি কি ভালোবাসায় ফতুর? আমি কি স্ত্রীদেহে সমগ্রকে পাচ্ছি না বলে বিহ্বল ও কাতর?

চরম-পুলক-মুহূর্তে তার মুখের ওড়না সরিয়ে দিলাম।

একটি কুটানো শিলার মতো মুখ। ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। নীল আলোয় খোদিত করেছে বনবিবির বৃত্তান্ত আর দক্ষিণরায়ের রাজকীয় ইতিহাস — মনে হল, হে খোদা, তবু এ মুখ এখনও সুন্দর — সুন্দর কঠিন। শিউরে ওঠার মতো বীভৎস, তথাপি সুন্দর।

চরম-পুলক শেষে আমার চোখে জল এসে গেল।

জরিন তারপর আমাকে সর্বাঙ্গে বাগিনির মতো আরাম দিতে লেহন করে চলল॥

BanglaBook.org

কিন্নর রায়
রতিলেখ

ঋতুকালে ঋতুরঙ্গে কেলি করে কার সঙ্গে
সতত মদন মীন খোঁজে পরিসর
শোন হে ঋতুর ফুল চন্দ্রে লাগে মেঘ ধূল
আননে শমন হানে জরা বিষ শর
বয়স চলিয়া যায় কালকে ধরিবে কায়
মন মধ্যে রাধে শ্যাম প্রেম মনোহর...

সকালের আলো হয়ে এই কটি পঙক্তি এখনই যেন উঁকি দিল মনের আকাশে। সেই সব শব্দের কলরোল নূপুর নিক্কণ হয়ে গেঁথে যেতে থাকল মাথার গভীরে। ঠিকঠাক শব্দে পদটি বাঁধা হলে

আনন্দলহরি বাজতে থাকে মনের মধ্যে। সঠিক পদটি চিনে নিয়ে, তাকে ঠিকঠাক জায়গায় বসিয়ে দিতে পারলে সেই সব অক্ষরমালা থেকে আলো বেরতে থাকে। আলোর সেই ঝঙ্কার টের পায় পূর্ণমাধব। অন্ধ দু'চোখে দুলে উঠতে থাকে আলোক পুষ্পবাহার।

ঋতুকালে ঋতুরঙ্গে কেলি করে কার সঙ্গে...।

নাঃ, ঠিকঠাক হল না। পদটি হয়তো বাঁধা গেল না জুত করে। আরও বেশি, অনেক অনেক বেশি মন দিতে হয় পদবিন্যাসে। কিন্তু গোটা মন-মাথাই তো চঞ্চল হয়ে আছে। এই ছটফটানি, অস্থিরতা আটকানোর উপায় কী। মন বড়ই ছটফটে। আজ এখানে, তো কাল ওখানে।কেন, এই তো এখানে রয়েছে, মুহূর্তে ভুরশুট, নয়তো কালনা। কাটোয়াও হতে পারে। যেখানে ভরা গঙ্গা। টইটম্বুর অজয়। বর্ষায় তারা ফুলে-ফেঁপে গর্ভবতী।

কথাটা মনে মনে ভেবেই নিজেকে কাটল পূর্ণমাধব। গঙ্গা নয় নদী। তার তো গর্ভিণী হওয়া সম্ভব। কিন্তু অজয়? সে তো নদ। পুং। পুরুষ। বর্ধমান, বীরভূম-সর্বত্র তার যাওয়া আসা। তাহলে সে কী-ভাবে গর্ভধারণ করবে?

কে পুং আর কে যে নারী, এ-কথা বলে দেবে কে? গত কাল মঞ্জীর সঙ্গে বিপরীত বিহারে, যখন মঞ্জীর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপটিকে জাগরিত রেখে পূর্ণমাধবের মনে হতে থাকে হয়তো এই আলোয় দেখা যাবে মঞ্জীকে। তার সরস ওষ্ঠমায়া, বিপুল স্তনভার, নিতম্বলীলায় স্তব্ধ হয়ে আছে লক্ষ-কোটি বছরের পুরুষ আকাঙক্ষা, হায়, নারী, তুমি কি মন বোঝো না পুরুষের। মন! ভালোবাসার নীল অপরাজিতাগুচ্ছ অথবা নদীপারের নির্জন কাশ, যেমন কিনা শেষ শরতের স্তব্ধ বেলায়, যখন ভাসান হয়ে গেছে দেবী প্রতিমার। নিরঞ্জনের পর শুধুই খড়ের কাঠামোটুকু মুণ্ডহীন, বস্ত্র, অলঙ্কারশূন্য, নগ্ন-অথবা নগ্নতার চিহ্নটুকু, কোনো লিঙ্গ সঙ্কেত নেই, হাতের পাতা, আঙুল নেই, পায়ের পাতা, আঙুল সবই নিরুদ্দেশে, শুধু মেড় বা কাঠামোটুকু নদীর ঘোলা জল মেখে শান্ত, নিরুচ্চারিত, আধপচা।

নারী কি বিপরীতে বলতে পারে পুরুষমন মানে তো খঞ্জনার নেচে বেড়ান, এ-ডাল থেকে ও-ডালে। কল্পনায় এখন ভেবে নিতে নিতে পূর্ণমাধবের মনে হতে থাকে পদকর্তা কি নারীমন বোঝে? আসলে পদকারও তো এক জন পুরুষই। নারীর রতি তৃপ্তিতে তার মাথাব্যথা কোথায়?

পিদ্দিম নেবাও। পিদ্দিম নেবাও। আহত, গোঙানি-ধরা স্বরে বলে ওঠে মঞ্জী। সে জানে পূর্ণমাধবের দু'চোখেই দৃষ্টির যে আলো থাকার কথা, তা বহু দিনই নেই। মায়ের দয়া, নাকি বসন্ত কী নামে বোঝানো যাবে তাকে, সেই মারীগুটিকায় দু'চোখের মণিই তো গলে গেল। বড়সড় সাদা একটা পর্দাকে যেন রাতারাতি টাঙিয়ে দিল চোখের সামনে।

কত ধরনের চিকিৎসা দৃষ্টি ফেরানোর জন্য কবিরাজি, হেকিমি, দৈব, মুষ্টিযোগ, স্বপ্নাদ্য ওষুধ, কিছুই তো বাদ গেল না। এ-পুকুরের জল, ও-থানের মাটি, তাও তো অনেক হল। পদ্ম ফুলের মধু, গেঁড়ির মাংসভর্তি খোলের ভেতর জমে থাকা জল সবই ব্যর্থ অনুপান। হায়, হায়, কিছুতেই যে কিছু হয় না। চলে যাওয়া দৃষ্টি ফিরে আসে না আর। ফলে শুধুই দুঃখ থাকে। আর থেকে যায় অন্ধ চোখের জল। বিপরীত বিহারে মঞ্জী হয়তো খানিকটা অস্বস্তি বোধ করে। প্রথম প্রথম তো খুবই আপত্তি ছিল তার। অন্তত মুখে। কিন্তু এখন এ-ও তো এক অভ্যাসেরই পরিণতি যেন। মুখের ওপর নেমে আসা মঞ্জীর সুবিশাল দু'টি স্তন ঝাড়লণ্ঠন হয়ে দুলতে থাকে পূর্ণমাধবের চোখের সামনে। বধ্‌ধোমান রাজবাড়িতে অনেক ছোটবেলায় দেখা ঝাড়বাতি, সে-সবই বিলিতি কিনা, তার ভেতর মোম জ্বেলে সাজিয়ে দিলেই আলোয় আলোময়?

মঞ্জীর জোড়া ঝাড়লণ্ঠন থেকে গা-মুখ পোড়ানো উত্তাপ টের পেতে থাকে পূর্ণমাধব। আর তখনই হয়তো তার মাথার ভেতর ডুগি তবলার বোল হয়ে বেজে উঠতে থাকে।

BanglaBook.org

খাস গেলাসে আলো পড়শে মন হরিষে বিষাদ

নারী কত রঙ্গ জানে বিপরীত সঙ্গ গুণে শ্যামচোরা গোনে পরমাদ...

শরীর মিশে আছে শরীরে। বেশ জোরেই ডান গালে দংশন করল মঞ্জী। তার দশনরেখায় কি নিশির উপদ্রব আছে? নাকি সেই সাজানো দন্তরুচিতে ভোরের প্রথম বন্দনা? ভাবতে ভাবতে পূর্ণমাধবের মনে হল, মাথায় আসা পদটি এখনই কোথাও লিখে ফেলা দরকার। সে অবশ্য বেশ ফৈজত-কর্ম। ব্যবস্থা করবে কে?

বুকের ওপর নৌকো হয়ে ভেসে থাকা মঞ্জীর শিরদাঁড়ায় ডান হাত রাখল পূর্ণমাধব। এ-নারীর কশেরুকাটি গভীর, যেন কোনো ছাদ খোলা সুড়ঙ্গ পথ, না না, উপমাটি একেবারেই ঠিক হল না, যেন বা স্তব্ধ এক জলহীন নদীখাত।

কী অ্যাত বিড় বিড় করছ মনে মনে! পাগল, নাকি ছেমো? চুপ করে যা করবার করো।

মঞ্জী আপাতকর্কশ। কম বয়সে স্বামীছুট হয়ে গিয়ে যেমন ধারায় চলতে হয়, তেমনই চলেছে। হয়তো এ নারীই আমার মৃত্যুশশী, ভাবতে ভাবতে নিজের ভেতরই কুল কুল করে হেসে উঠল পূর্ণমাধব, নিঃশব্দে। যেমন কিনা নদী তার চোরা স্রোতে গোপনে অতি চুপি চুপি পাড় ভেঙে দেয়, সে-ভাবেই এই হাস্যরেখা ছুঁয়ে গেল পূর্ণমাধবকে।

আসলে কেন বাঁচা?

কেনই-বা পদ রচনা?

ঘরে সতেরো বছরের জীবনসঙ্গিনী মায়া, তিন সন্তানের মা। শান্ত, নিবিড় কোনো ছায়া, অথচ রতিরঙ্গে প্রায় স্থির অচঞ্চলা, অভিব্যক্তিহীন কোনো শক্ত পাথুরে দেওয়াল। যেখানে একা একাই কোনো দাগ এঁকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। আর কিছু না। আর কিছু নয়। দেওয়াল কখনো সচল, জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। হয়তো সে আমারই ত্রুটি, একান্ত দোষ।

শাঙ্খিনী মাত্রায় থাকে নারী বিলাসিনী
রূপেতে সতত তার আনন্দ শিঞ্জিনী
রূপ না হেরিলে চক্ষে মদনেরই বাণ
যতেক চাতুরি বাধা করে খান খান...

এমন পদ মাথার মধ্যে থাকে রাত-দিন, ঘোরে। খেলা করে। যে পালতু কবুতরদের শুধুমাত্র স্পর্শ করে, তাদের পালকের রঙ, ডানার বর্ণ বলতে পারি, তারা যখন বাড়ির উঠোনে আমাকে ঘিরে থাকে, তখনো মনের গভীরে উঁকি দিতে থাকে অনেক অনেক নতুন অক্ষরমালা। খুব ভোরে চারপাশের জগৎ-সংসার ভালো মতো জেগে ওঠার আগেই পূর্ণমাধবের বাড়ির উঠোনে বসে যায় পাখিদের পাঠশালা। তখন মাথার ভেতর মায়ার বারে বারে বলা দাদখানি চাল, গোবিন্দের ভোগ দেওয়ার জন্য সুগন্ধী আতপ তণ্ডুল, গব্য ঘৃত, স্বর্ণমুদ্রা কারোরই কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। এ-সবই পূর্ণমাধব তার বাড়ির কাজের লোকজনদের দিয়ে আনিয়ে দেবে। আনিয়ে দেবে অর্থে ব্যবস্থা করবে। সবই চাষের, গোয়ালের সামগ্রী, খালি ভাঁড়ার থেকে আনিয়ে নেওয়া, এই যা। কিন্তু সেটাও-তো মনে রাখতে হয়। ব্যস্ত রাখতে হয় মনকে। এ-সব কথা নিয়ে নিজের মনে নাড়াচাড়া করতে করতেই পূর্ণমাধবের মনে পড়ল মঞ্জী তকে এক দিন বলেছিল কাঁটানটে শাক গরুর ডাবায় ধরে দিতে পারলে গাইয়ের দুধ বাড়ে।

কাঁটানটে ছাড়াও হয় চাঁপানটে, গোয়াল নটে, এসব তথ্য পূর্ণমাধবের জানা।

মঞ্জীর কথা শুনতে শুনতে তার মনে হতে থাকে, কী আশ্চর্য এই জগৎ সংসারের খেলা! কাঁটানটে খেয়ে দুগ্ধবতী গাভী আরো বেশি বেশি করে কেঁড়ে ভর্তি অমৃতরস দিয়ে থাকে। পুরুষের বীর্য নারীর

BanglaBook.org

রজঃ, দুইয়ে মিলে সন্তান। আবার সব সময় যে সন্তান আসবে এমনও নয়। ব্যর্থ কাম। ব্যর্থ রতিখেলা। ভাবতে ভাবতে মঞ্জীর স্তন চাল হাতড়ায় পূর্ণ। অথই দরিয়ায় ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন আঁকুপাঁকু আঁকুপাঁকু করতে করতে হাওয়া মোচড়ায় তেমনই এমন শরীর অভ্যাসে মঞ্জীকে কাটা কলাগাছের ভেলাকে যে-ভাবে জড়িয়ে ধরে বানভাসি মানুষ, সে-ভাবেই যেন আরো জোরে বেঁধে নিতে চায় পূর্ণমাধব।

কেন আমি বার বার আসি এ নারীর কাছে? কেন ভেসে আসি কোনো শবদেহ হয়ে কী এক অলীক, কুহকি মহিমায়, যে-ভাবে সাধক-তান্ত্রিকের কাছে চলে আসে নদী ভাসা মৃত শরীর, ঠিক যেন সে-ভাবেই ভাসতে ভাসতে চলে আসা। তারপর আটকে যাওয়া সেই কাপালিকের সাধনক্রিয়ায়।

এ-সব নিজের ভেতর একা একা নাড়াচাড়া করে পূর্ণমাধব। মন বড় বিচিত্র বস্তু। শরীর এখন মঞ্জীর গভীরে, আরো গভীরতর লীলাময় প্রদেশে যেতে চাইছে। অথচ এই মন, মানসভূমি সে তো তখন কত কত দূরে হয়তো সেই বিপরীত রতাতুরা ছোট বিগ্রহটির সামনে। পাথর নয়, পিত্তল প্রতিমা, প্রস্তর বড় কঠিন, তবে তাকে প্রাণময় করে তুলতে পারলে তার কোনো জবাব হয় না। একেবারে নিধুবাবুর সাধা টপ্পা যেমন, অনেকটা যেন তেমনই। কথায়, সুরে, প্রাণ উচ্ছ্বাসে, জীবন-কল্লোলে সে যেন কোনো শরতের ভোরাই আলো মাখা, ঠিক মাখা বা মাখানো হয়তো নয়, খোদাই করা রক্তিম মেঘ। প্রতিমা এখানে বিপরীত রতাতুরা। শিব নিচে, নগ্ন। গলায় তার নর করোটি, মুখে স্মিত হাসি। মাথায় অর্ধচন্দ্র শোভা, সেই সঙ্গে সর্পকুণ্ডলী। শিবের দু'টি পা-ই টান করে রাখা। উচ্ছ্রিত লিঙ্গের ওপর রঙ্গময়ী কালী। নগ্নিকা। দু'চোখে সামান্য লাজচ্ছটা। বিপুল স্তনভারে উন্মত্ততা। আঃ। আঃ। আঃ! মুখে আধফোটা শব্দ করতে করতে মঞ্জী নতুন করে দংশন করল পূর্ণমাধবের কানের লতিতে। একি নিছকই শব্দ, নাকি গোঙানি? নাকি নতুন কোনো পদ চয়নে সেই ভাবটি —

চিত্রিণী নায়িকা সে কি কুরঙ্গী সমা
রতিভঙ্গে সতীসঙ্গ মাহেশ্বরী উমা
তপভাবে হিমালয় দুহিতা হন পখিনী
তাঁহারে চিনিতে নারে সদাশিব গুণী...

যখন পায়রাদের পালকে হাত ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে বুঝতে পারি কোনটা সাদা, কোনটা পাটল বা লাল, কোনটাই-বা কৃষ্ণ কবুতর। পারাবত দল ডানা ঝাপটে বাতাস সাঁতরাতে থাকলেও রোদের গন্ধে বুঝতে পারি কোন রঙের, কিংবা আসলে কোন কোন বর্ণের কবুতর দল উড়ে গেল শূন্যে। তাদের ডানার টোকায় টোকায় রোদ্দুর থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো রঙ ঝরে পড়তে থাকে। শুকনো, খানিকটা যেন ভেজা ভেজা। সেই সব বর্ণালীকে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। এমনকী গভীর অন্ধকার কালো পাথরের নিচে থেঁতো হতে হতে হতে হতে সেই সব বর্ণভাষার টুকরোদের যেন খুঁজে পাই।

বিপরীত রতিমুদ্রায় দেবী হাসেন, সেই লাজুকতলতাসম হাস্যভঙ্গিটি শৃঙ্গারভঙ্গিকে আরো নিবিড়, আরো অনেক অনেক বেশি ক্রিয়াশীল করে তুলতে থাকে। ভূমিশয্যায় থাকা মহাশিব নেহাৎই শবমাত্র নয়, তার প্রাণ সঞ্চার করেছে একটু অন্যতম আসন প্রয়াস।

শৃঙ্গার মাধবী কলা অনন্ত আকাশ
চিদাখাশে মাতঙ্গ মাতন নাই অবকাশ
কেলিতে রঙিন মুখ সুখেতে পাগল
রতিরঙ্গ রাগরূপে হয়েছে বিমল...

এই নারী কি বোঝে কাব্যভাষা আমার, কাব্যকলা, সৃষ্টি? কবিতা যখন মৈথুনানন্দে মদির হয়ে বার বার উপচে আসতে চায় উৎসমুখে, তখন, কী হয় তখন? কী হতে পারে? সাদা রঙিন কবুতরেরা

BanglaBook.org

আলোয় মৃদঙ্গতান তুলতে তুলতে আরো দূর কোনো আলোকাভিসারে চলে যায়। নাকি অবোধ নারী কেবলই শাড়ি, গয়না, সংসার প্রত্যাশা করে? রতিতৃপ্তির পর দুই পা টান টান সোজা — খানিকটা যেন কাটা কদলী তরু — করে মেলে দিলে মঞ্জী কানবালা চায় বুকের লোমে বিলি কাটতে কাটতে কিংবা কোমরের গোট, পৈঁছে। সেই সব কনকময়, নয়তো রজত নির্মিত গহনা সকল, তার প্রাণের অধিক। আদুরে ভঙ্গিতে নিজের প্রার্থনা জানাতে জানাতে আবারও পূর্ণমাধবের বুকের নরম, কালো কোঁকড়া লোম ধীরে, অতি ধীরে আকর্ষণ করে মঞ্জী। অথচ মায়া, সে তো বিবাহিত স্ত্রীর কর্তব্য হিসেবেই যেন নিয়েছে এই শরীর অভ্যাসকে। তার সঙ্গে সেই প্রাত্যহিকতায় যেন তেমন করে কোনো সঙ্গত পঙক্তি উঠে আসতে চায় না মনে। তখন মস্যাধার, তালপত্র, লেখনী, কোনো কিছুর কথাই তো মনে পড়ে না। সে যেন দৈনিকের খাদ্যতালিকা ডাল, ভাত, মাছ, অম্বল।

স্বামীছুট মঞ্জী অসম্ভব হিসেবি। নিরক্ষর এই নারী টাকা-পয়সার যোগ, বিয়োগ গোনাগুণতি দেওয়া-নেওয়ায় অতীব দড়। এখন তার নগ্ন শরীরটুকু মেঝের ওপর। খাট থেকে রতিযুদ্ধ করতে করতে তারা নেমে এসেছে। সাদা কাপড়ে নিজের বুকে উমলে থাকা জোড়া খরগোশ ঢাকা দিল মঞ্জী। সে-দৃশ্য চোখের সামনে স্পষ্ট কোনো দেখন চিত্র না হয়ে এলেও শাড়ি সরানোর সতর্ক, ভোঁতা শব্দে পূর্ণমাধব বুঝতে পারল নারী তার স্বাভাবিকতায় লাজ ঢাকছে।

শৃঙ্খলিত কুঞ্জর হায় নশ্বর শরীর
প্রাণের রূপেতে প্রাণ হইয়া বাহির
তনুতে কম্পন স্বেদ অতীব পুলক
জীবনে নামিল সুখ শৃঙ্গার মোহক...

মায়া কেমন শান্ত, ধীর লয়ে সংসার করে। সন্তান সামলায়। কর্তব্য পালন করে। মঞ্জীকে কিনে দেওয়া পোক্ত খাটে শুয়ে শুয়ে পূর্ণমাধব কিছুতেই মনে করতে পারল না কখন সে এই খট্টায় ছিল। কখন-বা ঘোর লাগা শরীরে নেমে গেছে নিচে। আবার সেই ঘোরাচ্ছন্নতার ভেতরই কেমন করে যেন উঠে এসেছে ওপরে। নাকি সে আসলে কোথাওই নেই। রয়েছে শূন্যভাবে। যেমন নিরালম্ব মেঘদল, তেমনই কোনো শ্রান্ত কঠিন কিংবা আদপেই কঠিন নয়, বায়বীয় অবস্থানে থেকে যাওয়া তাদের।

এমন দীর্ঘ খেলার পর বড় কাঁসার গ্লাসে দুধ আনবে মঞ্জী। বাইরে অন্ধকার সাঁতরাবে জোনাকিরা। নিজের বাড়ির শয্যায় মায়া যখন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লেপ্টে থাকে বুকের ওপর, তখন শুক্লপক্ষ হলে জ্যোৎস্নার ভেদবমি চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে সারাটি বাড়িতে, উঠোনে, তখন অনেকটা দূরে কোনো বাঁশবাগান নয়তো আম্রকুঞ্জের সমবেত কণ্ঠে ডেকে উঠতে থাকে যামঘোষেরা। সেই শৃগালধ্বনিতে একটু হলেও যেন পেয়ে যায় মায়া। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে আরো নিবিড় করে কাছে টেনে নিতে নিতে পূর্ণমাধবের কখনো কখনো মনে হতে থাকে, মায়া কি সত্যি সত্যি ভয় পায় জম্বুক কণ্ঠের বিচিত্র নির্ঘোষে! কে জানে! শৃগালকণ্ঠকে দশ হাতে সরিয়ে দিতে কখনো জ্যোৎস্না রাতে জেগে ওঠে কুহুরব। কোকিল গায়।

খানিক আগেও মঞ্জীর বুকে জেগে থাকা জোড়া কবুতর বেশ স্বেদাতুর, শক্ত, প্রাণছন্দের তীব্র বোধ নিয়ে জেগে ছিল। এখন তা হয়তো-বা বাসি দাড়িম্ব। নদ যদি পুরুষই হবে, তাহলে তার গর্ভসঞ্চার হত কেমন করে? কী-ভাবে? সেখানে কি একমাত্র জাগে কবি কল্পনা? তাই গর্ভের গভীরে একটু একটু করে দামের শিকড় ছড়ায় জানবীজ? পুরুষও ভ্রূণরেখা এঁকে নেয় নিজের গভীরে। সেই ভ্রূণের আর এক নাম কি জ্ঞান? প্রজ্ঞা নামেও কি ডাকা যেতে পারে তাকে? কিংবা নব নব কাব্য সৃষ্টির তাগিদ!

ছায়া অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে সমস্ত ঘর। দূরে কোথাও বুঝি ডেকে উঠল তক্ষক। চাঁদের যে আলো নিজস্ব ছন্দে প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে দিয়েছে বাইরের আঁধারিয়া প্রলাপে, তার গায়ে এখনো

BanglaBook.org

কোনো গোপন অভিসারের গন্ধ। নিজের নৌকো নিয়ে বাইতে বাইতে বাইতে — বৈঠা ঠেলে অজয় অথবা গঙ্গায় খানিকটা ঘুরে আসতে পারলে জটধরা মাথার ভেতরটা কিছুটা হলেও সাফ হয়ে যায়। নদীর বাতাস তখন চাপা স্বরে বলতে থাকে কত কী! সেই ফিসফিসানিকে আবিষ্কার করাই এক জন প্রকৃতি পদকর্তার কাজ। যেমন কিনা নিধুবাবু — রামনিধি গুপ্ত, যেমন বধ্ধোমানের নীলকণ্ঠ ঘোষাল। যে-শরীর খানিক আগে বিপুল খেলাধূলায় থাকে, কিছুক্ষণ পর খেলা শেষে তারও তো যাকে বলে একেবারে দশ দশা, সেই দশা পাওয়া ভাব থেকে নিজেকে টেনেটুনে তুলে এনে আবার আগের জায়গায় বসাতে হয়।

মধু শ্যাম মধু রাই মধু কদম্ব শোভা
মধুতে মধুর লিপি মোহন মন লোভা...

কাঁসার বড় গেলাসে গরম দুধ নিয়ে এলে মঞ্জী তার ভেতর খানিকটা গুড় থাকবেই। দুধের ওপরের ঘন সরটুকু নাকের নিচে কখনো কখনো জড়িয়ে গেলে তাকে চুম্বন ছলনায় নিজের জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দেয় মঞ্জী। এটুকু শরীর স্থাপত্যে, বিভঙ্গরেখায় তাকে মনে হতে থাকে পিচ্ছিল কোনো মীনকন্যা। তখন বাহুপাশে বেঁধে তাকে কোলে তুলে নিতে সাধ জাগে বড়। আর একবার যদি ইচ্ছের ভেরী বেজে ওঠে মনের ভেতর, তখন তো সেটা করবই করব, করবই করব বলে অভিযান চালাতে থাকি।

অন্ধকারে মায়া দাঁড়িয়ে থাকে
ঘোর আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জী।

শব্দের কেতাবি মারে উসখুস করতে থাকে ভেতরটা। নতুন নতুন কাব্যপঙক্তি বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে। নতুন করে আবারও ডেকে উঠল তক্ষক।

মঞ্জীর নিয়ে আসা গরম দুধের গেলাস এখন ঠোঁটের কাছে। এত রাতেও এই উষ্ণ দুগ্ধ দেওয়ার নিয়মে তার কখনো ভুল হয় না। আর কী আশ্চর্য, রোজই যেমন হয়, আজও তেমনই কোনো পাতা বা কাঠ জ্বালানোর ধরা গন্ধ নেই দুধের গভীরে। অথচ এই সাদা পদার্থটুকু যাকে কিনা গো-রসও বলা হয়েছে কোথাও কোথাও, তা দিব্যি চনমনে গরম। এটুকু ধীরে ধীরে পান করলে শরীরে নতুন নতুন বল ফিরে আসে। মঞ্জী এ-সবই জানে। হয়তো জানে মায়াও। কিন্তু মায়ার লজ্জা এতটাই তীব্র এখনো এত বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর যে, শরীর অভ্যাসের কোনো কথা আজও সোচ্চারে তো নয়ই, প্রকাশ্যেও বলতে পারে না। ফলে খানিকটা অসুবিধা তো হয়ই পূর্ণমাধবের।

ছায়া অন্ধকার মেখে জেগে আছে এই ঘর।
রাত ঠিক কত হল কে জানে!

মঞ্জীর ঘরের প্রদীপটি তো কখনই যেন নেভানো হয়ে গেছে। সেই দগ্ধ সলতের গন্ধটুকু, সে-ও তো কবেই যেন অন্ধকারের নিবিড়তায় মিশে যেতে যেতে কখন, কোন ফাঁকে যেন মুছে গেছে একেবারে। মঞ্জী কি মনে মনে কখনো কখনো কানা বলে গাল পাড়ে আমাকে? আমার কানা দৃষ্টিহীনতা থেকেই কি তার জিভে নেমে আসে কানাই শব্দটি? নাকি এই কানাই পরকীয়ার কোনো নাটের গুরুর নাম? কৃষ্ণকে ভেঙ্গে গ্রামীণ অভ্যাসে, উচ্চারণে যেমন হয় কেষ্ট অথবা কানাই, এখানেও কি তেমনটিই হল! ভাবতে ভাবতে কোনো তল-কূল পায় না যেন পূর্ণমাধব। নাকি আদপে এই ভাবনার দুই বা তিনের কোনোটাই নয়? বরং আসলে অন্যতর কোনো অর্থ। যার সংকেত বা গূঢ় কথনের মানে শুধু নারীই জানে। পূর্ণভাবে পূর্ণশশী বিকাশে সদা হাসি।

বিকাশে, নাকি বিতরে — কোনটা রাখা ঠিক হবে নিজস্ব পঙক্তিতে! কোনটা? মনে মনে আঁক কষে পদকর্তা পূর্ণমাধব। নতুন করে মনের মধ্যে ফেনিয়ে তুলতে চায় খানিক আগে ভাবা পদের আভাস। পূর্ণভাবে পূর্ণশশী বিতরে প্রসন্ন হাসি।

BanglaBook.org

না না, বিতরেই থাক বিকাশের বদলে। সদার পরিবর্তে আসুক প্রসন্ন। তাহলে কী দাঁড়াল এবার? দাঁড়িয়ে গেল —

পূর্ণভাবে পূর্ণশশী বিতরে প্রসন্ন হাসি
পূর্ণমাধবের প্রাণে খেলিতেছে দিবানিশি
মরণ মদন ত্রাসে
ভাবিতেছি চিদাকাশ
মনেতে বাসনা রজ্জু অতীব কঠিন
ভাবিলে ভাবিতে হবে রহিবে না কোনো ভাবে
আসিবে নিয়তি ডালা কাড়িবে প্রাণেরই মালা
ভাবনা পটে ঢেউ খেলা অতি সমীচিন
ভণয়ে মাধব পীর্ণ গীতি বাক্য অসম্পূর্ণ
নারী যে নাড়ির লগ্ন বিশ্বাস প্রাচীন...
অন্ধকারে নগ্নতা থাকে।

আন্‌ধার ভূমিতে পোষ্য নগ্নতা থাকে না। সবটাই কেমন যেন লাগামবিহীন, বেপরোয়া।

চূড়ান্ত কিছু একটার পর ধীরে ধীরে উত্তেজনা নেমে গেলে শরীর তো পারদ পারা। তারও তো ওঠা-নামা হয়, তাপ অনুযায়ী। এ-সব ভাবনার ফাঁকেই পূর্ণমাধবের মনে পড়ল হিন্দু শাস্ত্রে শিববীর্য বলা হয়েছে পারা বা পারদকে। সেই পারা খেয়ে ফেললে সারা গা জুড়ে বেরোয় পারা-ঘা। তখন সেই ক্ষত একেবারে পুরোপুরি সারিয়ে ফেলা অসম্ভব প্রায়। প্রেম-গোপন প্রেম কি আসলে এ-রকমই কোনো পারদ ক্ষত, যা এক দিন না-এক দিন ঠিক ফুটে বেরবে?

অন্ধকারে মিশে থাকে অন্ধকার — এই তিমিরাভাসে কবি পূর্ণমাধব যেন-বা তিমিরবন্দিত কোনো কুশপুতুল। সেই কুশপুত্তলি জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়, নতুন করে কামে, প্রেমে, শরীরে।

মদন মদন তনু অতুলন বিভা
কামেতে কামজ যক্ষী বরষয়ে প্রভা
সতত মানস মুখে মনের মুকুর
নারীর দিঘল তনু বরষে চিকুর...

শরীরের মগ্ন নিবেদনের পর ঘুম আসতে চায়। সেই নিদ্রাসুখকে সহজে আসতে দিতে চায় না পূর্ণমাধব। আকাশে অন্ধকারের ঢেউলাগা চাঁদ তীরবেঁধা মৃগচক্ষু হয়ে জেগে। হয়তো জাগ্রত নয়, মরণঘোরের আধোঘুমে থাকা সেই হরিণচোখ দেখতে দেখতে পূর্ণমাধবের মনে হল, জেগে থাকতে হবে। জেগে থাকতে হবে। আবারও নতুন করে জাগাতে হবে শরীর। শরীররেখা।

মঞ্জী অন্ধকারের আড়ালে থাকা তার প্রিয় মানুষটিকে দেখতে পেল নতুন করে। সে তো আবার নতুন করে শরীর শানাচ্ছে। এই যে লোক, যে বার বার আসে, ঢেলে দেয় নিজেকে, তারপর একেবারে যেন অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তার মনে কি একবারও ভেসে ওঠে এই প্রশ্ন, নারী — মানে আমারাও আছে কোনো তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা।

আদপেই কি এ-সব ভাবে মঞ্জী! নাকি এ-সবই আখ্যানকারের বেঁড়ে পাকামো। অতিরিক্ত সংবেদনশীল হওয়া, নারীর প্রতিও আমার নজর আছে, এমন ভাবনার ভেতর থেকে সে তো এমন পাটটিই আঁকতে চাইবে। আর মঞ্জী, সে তো সামান্য কনক বলয়, কানবালা, রজত নির্মিত পৈছাঁ বা গোট, মল নয়তো নূপুরের লোভে নতুন করে নিজেকে কোনো পুষ্করণী করে তুলবে। অতলান্ত দিঘি কোনো। যার জলে ছায়া পড়বে আকাশে ভাসা পূর্ণচন্দ্রের। সেই মায়ায়, নাকি অভ্যাসে নিজেকে

BanglaBook.org

সাজিয়ে তুলবে মঞ্জী। তখন, ঠিক তখনই আকাশের মেঘদল নেমে আসবে তার কেশভারে। সেই কুন্তল মায়ায় চুম্বন করবে কবি। কবি পূর্ণমাধব। এই রতিলেখটি নিজের মনে মনেই নির্মাণ করে নিতে পারে মঞ্জী, আপন স্বাধীনতায়। স্বতন্ত্রতার অন্য অর্থ তৈরি করে নিতে নিতে ॥

ড. নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় বিয়ে

ডাক ফাইলে কাগজগুলি দেখছিল। হঠাৎ একটা সাদা খামে চোখ আটকে গেল। সুন্দর করে নাম-ঠিকানা লেখা। শুচিস্মিতা সেনগুপ্ত, বাবুপাড়া, ভুবনপুর। কে এই মহিলা? মুকুলের কাছে অনেক দিন এ-রকম কোনও চিঠি আসেনি। মনটা কেমন করে উঠল। ভুবনপুর কলেজের প্রিন্সিপাল, ডক্টর মুকুল মণ্ডল তার বেকার জীবনে ফিরে গেল। বসন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে সবে এমএসসি পাশ করেছে। পিএইচডি করছে। বাড়িতে অর্থের টানাটানি। বাবা আর পারছেন না। একটা চাকরির খোঁজ করছে। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হলেই ভালো হয়। বেতনও ভালো। ছুটিছাটাও আছে। পড়াশোনার মধ্যেও থাকতে পারবে। তার জন্য কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে হবে। তখনও পিএইচডি হয়নি। নেটে বা স্লেটে উত্তীর্ণ হতে হবে। ফিজিক্সের পেপারটা নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু একটা সাধারণ পেপার থাকে। তাতে বিএসসি পড়ার সময় সংশ্লিষ্ট আর যা পড়তে হয় তার থেকেও প্রশ্ন থাকে। ওগুলো একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। কেরিয়ার মেকারে তার জন্য একটা কোর্স করাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস হবে। গবেষণার কাজ করেও যাওয়া যাবে। ভর্তি হবার জন্য গেল।

রিসেপশানের মহিলা জানাল, ডাইরেক্টর এখনও আসেনি। অপেক্ষা করতে হবে। রিসেপশানিস্ট বলল, আপনিও কি তার জন্য অপেক্ষা করছেন?

মুকুল মুখ তুলে তাকাল। মহিলার বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে। হালকা গড়ন। গায়ের রঙ শ্যামলা। চুল খোলা। বলল, হ্যাঁ। আপনি?

মেয়েটি মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে বলল, আমি শুভ্রা সেন। এবার ফিজিক্স অনার্স পাশ করেছি।

এখানে?

এসএসসি দেব। তাই ভাবছি এদের কোর্সটা করব। থার্মোডিনামিক্স চ্যাপ্টারটা আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন?

আমি দেখিয়ে দেব মানে?

আপনি মুকুল মণ্ডল তো?

গতবার বসন্তপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এমএসসি পাশ করেছেন।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি? জানলেন কী করে?

আমিও তো এবার ওখান থেকেই অনার্স করেছি। ওখানে আপনাকে সবাই জানে।

মুকুলের ভালো লাগল। নিজের প্রশংসা শুনতে বোধহয় সকলেরই ভালো লাগে। আরও শোনার জন্য জিজ্ঞেস করল, কী করে?

BanglaBook.org

মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে বলল, আপনি ভালো ডিবেট করেন না? গতবার ইন্টার ইউনিভার্সিটি ডিবেটে যখন আমাদের ইউনিভার্সিটিকে ফার্স্ট করে দিলেন তখন থেকে আমরা তো আপনার ফ্যান হয়ে গেলাম।

মুকুল গলে গেল। আন্তরিক ভাবে জিজ্ঞেস করল, তাই?

তাই। তা আপনার ফ্যানকে থার্মোডিনামিক্সটা একটু দেখিয়ে দিন না।

এত দরকার পড়ছে কেন?

বললাম তো, এসএসসি দেব।

অনার্সে কেমন ফল করেছেন?

আমি আপনার মতো পড়াশোনায় অত ভালো ছাত্রী না। ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট মাত্র।

ঠিক আছে। এমএসসি পড়ুন। সিক্সটি পার্সেন্টের ওপর তুলুন।

পড়তে ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার একটা চাকরিরও দরকার। একটু দেখিয়ে দেবেন কি না বলুন।

মুকুল না করতে পারেনি।

শুভ্রা তার কাছে আসতে শুরু করে। সখ্যতা হয়। মুকুল কলেজের চাকরিটা পেতেই শুভ্রা বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পরই শুভ্রা পড়াশোনা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল।

মুকুল মানেনি। তাকে পড়া চালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

শুভ্রা ঘাড় বেঁকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্বামী ভালো চাকরি করে। আমি আবার পড়ব কেন?

মুকুল বলেছিল, আমি চাই না, আমার স্ত্রী আমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। আমি খেতে না দিলে সে খেতে পাবে না। তাই আমাকে ভালোবাসবে।

তুমি কী চাও?

আমি চাই আমার স্ত্রী স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী হবে। আমার কোনও সাহায্য না হলেও তার চলবে। তার পরেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাকে ভালোবাসবে।

শুভ্রা এখন প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী। কিন্তু সে মুকুলকে আর ভালোবাসে না। কোনও দিন কি বাসত? মুকুলের মনটা ব্যথায় টন টন করে উঠল।

বিয়ের পর শুভ্রাকে নিয়ে কলেজে চাকরি করার জন্য মুকুল ভুবনপুরে বাসা ভাড়া নিল। এক দিন কলেজ থেকে ফিরে দেখল, সমবয়সি একটি ছেলের সঙ্গে শুভ্রা গল্প গলছে। পরে জানল, ছেলেটি সম্পর্কে তার আপন মামা। মনের ভারটা অনেকটা হালকা হল। কিন্তু ক'দিন পরেই যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মুকুল জানতে পারল, ওই মামার সঙ্গে শুভ্রার শুধু মানসিক নয়, শারীরিক সম্পর্কও ছিল।

মুকুল শুভ্রাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার জীবনটা এ-ভাবে নষ্ট করে দিলে কেন? বিয়ের আগে আমি তো আমার জীবনের সব কথা তোমাকে খুলে বলেছিলাম।

অসহায় ভাবে শুভ্রা বলল, নীলাদির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সম্মানের ছিল। তোমার বলতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক কি সে-রকম সম্মানের ছিল?

যে-সম্পর্ক অসম্মানের সে-সম্পর্ক করতে গেল কেন?

সম্পর্ক অঙ্কের মতো হিসেব করে হয় না।

তত্ত্বকথা শুনে মুকুলের মগজে আগুন জ্বলে গেল।

BanglaBook.org

মুখ নিচু করে শুভ্রা বলে চলল, আমার প্রথমে সম্পর্কটা অসম্মানের মনে হয়নি।

কেন ?

বান্ধবীরা বলল, তামিলনাড়ুতে তো মামার সঙ্গে ভাগ্নীর বিয়ে সব থেকে ভালো মনে করা হয়। তাহলে এখানে হবে না কেন ?

হবে তো করলে না কেন ?

আমি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন একেবারে বেঁকে বসল।

তুমি তো বলছ যে-সম্পর্ক অঙ্কের মতো হিসেব করে হয় না। তা তুমি তো বাবা-মা'র অনুমতি নিয়ে মামার সঙ্গে শুতে যাওনি। তাদের অজান্তেই গিয়েছিলে। তাহলে তাদের অজান্তেই বিয়েটাও করলে না কেন ?

করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মামা করল না।

আর মামার অপরাধের শাস্তিটা তুমি আমাকে দিলে। আমার অসন্দেহবতিক হওয়ার সুযোগটা নিলে।

সুযোগ নিয়েছি ঠিকই। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। আমি অনেক বার তোমাকে বলতে চেয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারিনি। যদি তুমি ভালোভাবে না নাও। এখন মনে হচ্ছে, প্রথম দিকে বললেই ভালো হত।

এখন কী হবে তাই বলো।

শুভ্রার বাবা বলল, তুমি চাইলে ওকে ছেড়ে দাও।

শুভ্রা কাকুতি-মিনতি করে বলল, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না। দিলে আমার অসম্মানের একশেষ হবে। আমাকে কাছে রাখো। স্ত্রী হিসেবে না মানতে পারো, চাকরানি ভাব। তোমার বাড়িতে কাজ করতেও তো এক জন লোক লাগে। আমাকে সেই ভেবেই রাখো। তুমি যা চাইবে, আমি তাই করব। পড়াশোনা করব। চাইলে চাকরি করব। বাড়ির সব কাজ করে দেব। তুমি আমাকে তাড়িও না।

শুভ্রার আকুল আবেদন মুকুল ফেরাতে পারেনি।

কিন্তু মুকুলের কোনও আবেদন শুভ্রা রাখার দরকার মনে করেনি। যখন নিজের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করেছে, মুকুলকে ছুঁড়ে ফেলে চলে গেছে।

আজ মনে হয়, শুভ্রা হয়তো তার কাছে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে যে তাকে ক্ষমা করে নিয়েছে সেটা বুঝতে পারল না। তার কেবলই নিজেকে অপরাধী মনে হত। মনে হত, মুকুলের দয়ায় আছে। যত দিন কোনও উপায় ছিল না, তত দিন ছিল। যে-দিন বুঝেছে, মুকুলকে ছাড়াও তার চলে, সে-দিনই ছেড়ে চলে গেছে। এতে মুকুলের কতটা খারাপ লাগতে পারে তা ভাবার দরকারও মনে করেনি।

আর্দালি এসে বলল, স্যার ফাইলটা নিয়ে যাব।

মুকুল অতীত থেকে তার অফিস ঘরে ফিরে এল। বলল, না, দেখে দিচ্ছি। সে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল।

॥ ২ ॥

মহাশয়,

আমার নাম শুচিস্মিতা সেনগুপ্ত। আমার বাবা *পেশায় চিকিৎসক। বর্তমানে বামনাবাদ মেডিক্যাল* কলেজের প্রফেসার। *পাঁচ বছর হল আপনার কলেজের লেকচারার মলয় সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার* বিয়ে হয়েছে।

বিয়ের পর থেকেই মলয় আমার ওপর শারীরিক এবং মানসিক ভাবে নির্যাতন করে আসছে। *সে সকালে উঠেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। অনেক রাত করে ফেরে। তা-ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে।*

BanglaBook.org

আমার মাতালের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। তবুও সে আমাকে বলতে গেলে প্রতি রাত্রেই আমার মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক করে। অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়। গায়ে হাতও তোলে।

তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমি বাবা-মা'র কাছে চলে গিয়েছিলাম। তখন সে মা'র কাছে গিয়ে আর কখনও মদ না-খাবার প্রতিজ্ঞা করে আমাকে নিয়ে আসে। আমি একটি বাচ্চাদের স্কুলে পড়াতে শুরু করেছিলাম। আমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। কিন্তু কয়েক মাস না-যেতেই সে আবার স্বমূর্তি ধারণ করে।

আমাদের বছর তিনেকের একটি মেয়ে আছে। যখন-তখন মেয়েকেও মারধোর করে। সে তার বাবার ভয়ে সব সময় সিঁটিয়ে থাকে। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, এ-রকম অবস্থা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কাম্য নয়। তার জন্য আমি তাকে বলতে গেলে জোর করেই বামনাবাদে মডেল মন্টেশ্বরীতে ভর্তি করেছি। তার জন্য মলয় গত কাল রাতেই আমাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। আমি আজ সকালে ডাক্তার দেখিয়েছি। থানায় কেস করে বাপের বাড়ি চলে যাব। কেস করতে যাবার আগে মনে হল, আপনাকে একবার জানানো দরকার। আপনি মলয়কে সামলান। না হলে আমি তার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের কেস করতে বাধ্য হব। তার ফলে যদি তার কোনও সাজা হয় তার জন্য আমাকে দোষ দেবেন না।

ইতি,
আপনার বিশ্বস্ত
শুচিস্মিতা সেনগুপ্ত

মুকুল ভাবতেই পারছে না, তার কলেজের অঙ্কের লেকচারার মলয় সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে কেউ এ-রকম কোনও অভিযোগ করতে পারে। মলয়বাবু ধীর, স্থির, বিবেচক মানুষ। কলেজের যে-কোনও কাজে তার ওপর ভরসা করা যায়। সে কলেজের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন হোক আর বিতর্ক প্রতিযোগিতা হোক। তার ওপর ভার দেওয়া মানে আর কিছু ভাবতে হবে না। তিনি কোনও দিন কোনও ক্লাসে দেরি করে ঢোকেন না। কোনও ক্লাস কামাই করেন না। তার বিরুদ্ধে এ-রকম অভিযোগ! তার জীবনটা এ-রকম। এ ব্যাপারে একবার মলয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মুকুল টিচার্সরুমে ফোন করল, মলয়বাবু আছেন?

বরেণবাবু ফোন ধরে বলল, না স্যার, উনি এখনও ক্লাস থেকে ফেরেননি।

ফিরলেই আমার সঙ্গে একবার কথা বলতে বলবেন তো।

একটু পরেই মলয়বাবু ফোন করল, স্যার, আমাকে খোঁজ করছিলেন?

হ্যাঁ, আপনার ক্লাস হয়ে গেলে একবার দেখা করবেন তো।

॥ ৩॥

মুকুল অপেক্ষা করছিল।

মলয় এসে নমস্কার করে বসল।

মুকুল আর্দালিকে ডেকে বলল, এখন কেউ যেন না ঢোকে। আমাদের একটু গোপন কথা আছে।

আর্দালি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মুকুল প্রথমে কুশল জিজ্ঞেস করল, আপনার শরীর ভালো আছে? ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা কেমন করছে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মলয় উত্তর দিল।

একটুখানি নীরবতা। অথবা কী-ভাবে শুরু করা যায় তা মুকুল ভাবছিল। তারপর শুরু করল, মলয়বাবু, আপনার পারিবারিক জীবন নিয়ে প্রশ্ন করার আমার কোনও অধিকার নেই।

BanglaBook.org

পারিবারিক কথাটা শুনেই মলয়ের মুখটা নিচু হয়ে গেল।

মুকুল বলে চলল, তবে আপনার স্ত্রী আমার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। মলয়ের মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

মুকুল বলে যেতে থাকল, আমি আপনার বড় দাদার মতো। তাছাড়া আপনি জানেন, এ ব্যাপারে আমার নিজের জীবনটাও একটা গ্রিক ট্র্যাজেডি। নিজের ব্যাপারে তো মানুষ নির্মোহ ভাবে চিন্তা করতে পারে না। যেমন এখন আমি যা বুঝতে পারি, যখন বোঝার দরকার ছিল তখন বুঝতে পারিনি। কাজেই আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার সমস্যার কথাটা আমাকে বলতে পারেন।

মলয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, বলুন স্যার, আপনি কী জানতে চান।

আপনি কি সত্যিই মদ খান?

সে অনেক কথা স্যার।

কত দিন থেকে খান?

বিয়ের পর থেকেই স্যার।

বিয়ের পর থেকে কেন? মানুষ আগে অনেক কিছু করে। কিন্তু বিয়ের পর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে।

যাদের বিয়েটা স্বাভাবিক থাকে তারা করে।

আপনার বিয়েটা স্বাভাবিক নয় বলছেন কেন?

মলয় প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, আমার বিয়েটা স্যার একটা প্রতারণা। মানুষ যেমন ফাঁদ পেতে বক ধরে মাংস করে খায়, আমাকে ওরা ও-রকম করে ধরে ঝলসে খাচ্ছে।

কেন, আপনার বিয়ের সম্পর্কে এত ঘৃণাত্মক ধারণা কেন? সত্যি সত্যি কী হয়েছিল বলুন?

মলয় বলতে লাগল।

॥ ৪ ॥

মলয় সবে তখন অনার্স পাশ করে ভুবনপুরে কলেজে পড়তে এসেছে। একটা মেসে থাকে। কিন্তু গরিব বাবা খরচ জুগিয়ে উঠতে পারে না। হঠাৎ মলয় স্থানীয় কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখল, 'প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের একমাত্র মেয়েকে পড়ানোর জন্য গৃহশিক্ষক চাই।' ঠিকানা দেখে স্টেশন রোডের কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করল। তার সঙ্গে কথা বলে মেয়েটির বাবা মলয়কে নিয়োগ করতে রাজি হয়ে গেল।

মলয় বলল, ওর অভিজ্ঞ বাবা হয়তো আমাকে দেখেই বুঝে গিয়েছিল, একে টুপি পরানো যাবে।

মুকুল জানতে চাইল এ-রকম বলছেন কেন?

বাঁকাপুর থেকে তো তার জন্যই ট্রান্সফার নিয়ে ভুবনপুরে এসেছিল।

কী জন্য?

অচল মেয়েটাকে কারও গলায় ঝুলোনোর জন্য।

অচল বলছেন কেন?

অচল না তো কী? বৈকুণ্ঠপুর থাকতে হাসপাতালের সুইপারের ছেলের সঙ্গে হোটেলের একই ঘরে বিবস্ত্র অবস্থায় পুলিশে ধরা পড়ে। লজ্জায় বাবা ট্রান্সফার নিয়ে ভুবনপুরে চলে আসে। আমাকে গৃহশিক্ষক লাগায়। ক'দিন পরেই মেয়েকে দিয়ে প্রস্তাব দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর পরামর্শ করে রেজিস্ট্রি করে নেয়। পাশে একটা বাড়িও ভাড়া করে দেয়। আমি অদ্ভুত ভাবে ওদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। ওরা মেয়ের সুবিধার জন্য খাট, বিছানা, টিভি-ফ্রিজ, গয়নাপত্র কিনে

BanglaBook.org

দেয়। আমার বাড়ির লোকজনেব সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি তখন প্রাণপণে একটা চাকরির চেষ্টা করছি। চাকরি পেতেই ওদের ভাড়া করা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি আমার বর্তমান বাড়িটা ভাড়া নিই। কিন্তু তত দিনে সেই সুইপারের ছেলে এই থানার দারোগা হয়ে এসে ওর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। ওর অতীত জীবন আমার গোচরে আসে। আমার জীবনটা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

দেখুন, আপনি তো ওদের বাড়িতে থেকে মেয়েটিকে দেখেশুনে তবেই বিয়ে করেছিলেন।

কিন্তু তখন তো ওর ঘৃণ্য অতীত জীবনের কথা কিছু বলেনি।

তাহলে আপনার স্ত্রীর ওপর আপনার অসন্তোষের একমাত্র কারণ তার অতীত জীবনের কথা বিয়ের আগে আপনাকে গোপন করা। এমনও তো হতে পারত যে, সব জানার পরও আপনি তাকে বিয়ে করতে রাজি হতেন।

হতে পারত। সে-ক্ষেত্রে আমার মনে হত না যে, আমাকে সরল মানুষ পেয়ে সকলে মিলে ঠকিয়েছে।

শুধুমাত্র এই ঠকানোর জন্য আপনার মনে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য আপনাদের সম্পর্ক অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

গেছে।

সম্পর্কের মজা হচ্ছে, একবার খারাপ হলে উত্তরোত্তর খারাপ হয়, একবার ভালো হলে উত্তরোত্তর আরও ভালো হয়। আপনার স্ত্রী যদি চায়, আপনি কি আপনাদের সম্পর্কটা ভালো করতে চান?

অসম্ভব। আমাদের সম্পর্ক বলতে আর কিছু নেই। শুধু আইনি সম্পর্কটা টিকে আছে।

ঠিক আছে। আমি একবার মিসেস সেনগুপ্তের সঙ্গে কথা বললে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?

ও কী লিখেছে, একবার দেখাবেন?

আপনার স্ত্রীর চিঠি? আপনাকে নিশ্চয় দেখাব। তার আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে চাইছি। মুকুল ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল। রিং হতে রিসিভারটা মুখের কাছে নিয়ে এসে বলল, প্রিন্সিপ্যাল মুকুল মণ্ডল বলছি। ... মিসেস সেনগুপ্ত বলছেন? ... আপনার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল। ... আপনি এলে তো খুব ভালো হয়। ... আজকেও আসতে পারেন। ... তবে আমার অফিসে চলে আসুন। ... আমি গেটে বলে রাখছি। আপনি আসুন। ফোন রেখে মলয়কে বল, তাহলে আপনি ক্লাসে যান। আমি কথা বলে নিই। দরকার হলে আপনাকে ডেকে নেব।

মলয় উঠে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

॥ ৫ ॥

মুকুল ভাবছিল, এখনকার সব ছেলে-মেয়েই কি এত কম বয়সে এ-রকম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে? আর অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই কি তার বিপরীত লিঙ্গের মানুষের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়ে যায় যে, ভালোমন্দ চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে! তারপর একবার বিয়ে হয়ে গেল সেই সম্পর্কটাকে আর খুব আকর্ষণীয় মনে করে না।

দরজা ঠেলার শব্দে তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

গেটের দারোয়ান নিয়ে এল। মহিলা নমস্কার করে বলল, আমি শুচিস্মিতা।

মুকুল উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসতে বলল, বসুন, বসুন। শুনলাম আপনার কোনও দাদা বা দিদি নেই। আমাকে আপনার দাদা ভাবতে পারেন।

শুচিস্মিতা বলল, সেটা আমার অনেক সৌভাগ্য। বসে জানতে চাইল, আপনি আমার চিঠি পেয়েছেন?

মুকুল বলল, হ্যাঁ।

BanglaBook.org

পড়েছেন?

অবশ্যই।

মলয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন?

বলেছি।

কী বুঝেছেন?

তার কথা এক রকম বুঝেছি। এখন আপনার কথা বুঝতে চাইছি।

বলুন, কী জানতে চান?

মলয়ের ব্যাপারে আপনার যা অভিযোগ তা হল, সে মদ খেয়ে, মাতাল হয়ে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে।

হ্যাঁ।

বিয়ের আগে থেকেই তো মলয় আপনাকে পড়াত। আপনাদের বাড়িতেই থাকত। তবে এ-রকম মাতাল লোককে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

ও তখন মদ খেত না তো।

তাহলে বিয়ের পর খেতে শুরু করল কেন?

আপনি হিন্দি দেবদাস সিনেমা দেখেছেন?

হ্যাঁ।

ওটাতে একটা গান আছে, পিনেওয়ালোকো পিনে কি লিয়ে কুছ বাহানা চাহিয়ে। তারা সুবিধা মতো বাহানা বের করে।

যেমন?

যেমন, ওর মা-বাবা, ভাই-বোনদের খুব কষ্ট। তা ওর মা-বাবা যদি হাড়-হাভাতে হয় তো আমি কী করতে পারি বলুন?

বিয়ের আগে ওদের অবস্থা ভালো ছিল?

মোটেই না। আরও খারাপ ছিল। এখন তো মলয় মাসে মাসে ওর বেতন থেকে টাকা পাঠায়। তাই ভালোই খায়।

তাহলে ওই হাড়-হাভাতে ঘরের ছেলেকে বিয়ে করলেন কেন?

তখন তো বাড়ি থেকে কেউ আসত না। বিয়ের পর আসতে শুরু করল। যখন তখন এসে খাড়া হবে। আর কী বলব দাদা, একদম কোনও সেন্স নেই। বাথরুম নোংরা করবে। নোংরা চটি পরেই শোবার ঘরে ঢুকে পড়বে। নোংরা জামাকাপড় ছেড়ে আমার আলনায় রাখবে। বলুন, এই সব সহ্য করা যায়?

সহ্য করা শক্ত। কিন্তু মলয়ের কথা ভাবুন। ও ওদের মানা করবে কোন মুখে? ওরা কি এখন আর আসে?

না, বছর খানেক আগে আমি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম, তারপর থেকে আর আসে না। কলেজে দেখা করে চলে যায়। বাড়িতে যায় না।

তাহলে মলয়ে পক্ষে সেটা কত দুঃখের বলুন? আপনার বাবা-মা যদি না আসত?

আসে না তো।

কেন?

মলয় যখন থেকে তাদের কথা না শুনে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে নিয়েছে, তখন থেকেই আর আসে না। আমি তাদের একমাত্র মেয়ে। তাদের যাবতীয় সম্পত্তি তো আমারই থাকবে। তাহলে মলয়ের আপত্তির কারণ কী হতে পারে বলুন?

BanglaBook.org

একটা কারণ বোঝা গেল। আর?

প্রচণ্ড সন্দেহবাতিক। কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই মুখ গোমড়া হয়ে যাবে। বোতল খুলে বসে যাবে।

কার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে বোতল খুলে বসে যায়?

ভুবনপুর থানার এস আই বিনয় দাস আমাদের পূর্বপরিচিত ছিল। আমি কমপ্লেন করতে এক দিন এসে খুব কড়কে দিয়েছিল। আর অমনি বোতল খুলে বসে গেল। তারপর গালাগাল হুল্লোড়।

কিন্তু কাজটা কি ঠিক হয়েছিল? স্বামী যদি কারও সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ না করে তার সঙ্গে মেলামেশা করা কি ঠিক?

তাহলে রীতার সঙ্গে ওর মেলামেশা আমিও পছন্দ করি না। ও মেলামেশা করে কেন?

আপনি পছন্দ না করেল ওর মেলামেশা করা উচিত নয়। তবে আমি যতটা জানি মেয়েটি গান গায়। বাৎসরিক অনুষ্ঠানের ভার মলয়ের ওপর ছিল বলে ওকে দিয়ে গান গাইয়েছিল। সেই উপলক্ষে ওদের আলাপ। তার বেশি কিছু কি?

আমি তার বেশি কী করেছি?

বিয়ের পরের কথা আমি জানি না। কিন্তু বোনটি, আমি শুনেছি যে, বিয়ের আগে পুলিশ আপনাদের একটি ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

ও আপনাকে ইতিমধ্যেই এই সব লাগিয়েছে। আর আপনিও বিশ্বাস করে বসে আছেন। তাহলে তো আপনার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। শুচিস্মিতা উঠে দাঁড়াল।

মুকুল মাথা গরম না-করে বলল, দেখুন বোনটি। কিছু লুকিয়ে চাপিয়ে সম্পর্ক ভালো হয় না। কিছু থাকলে তা বের করে দিয়ে সম্পর্কটাকে একটা ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হয়। আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। আমি সমস্যাটা সমাধানের জন্য জানতে চাইছি।

শুচিস্মিতা বসে বলল, আমরা বন্ধু ছিলাম। বেড়াতে গিয়ে হোটেলে উঠেছিলাম। একটা ঘরে বিশ্রাম করছিলাম। গাঁজার রেড করতে পুলিশ এসে দরজায় নক করে। ডক্টর মুখার্জীর নাম করতে সেটা যাচাই করার জন্য বাবাকে খবর দেয়। ব্যাপারটা এই যে, আমরা বিশ্রাম করছিলাম।

এমনও তো হতে পারে, আপনারা পুজোআচ্চা করছিলেন। কিন্তু বাইরের লোক তো দেখতে পায়নি। লোক দেখেছিল আপনারা দু'জনে একটা বন্ধ ঘরে ছিলেন। পুজো করার জন্য মন্দিরে এবং বিশ্রামের জন্য আলাদা ঘরেও যাওয়া যায়। তাই লোক যদি অন্য কিছু ভাবে তার জন্য তাদের দোষ দোওয়া যায় না।

শুচিস্মিতা চুপ করে থাকল।

মুকুল বলে চলল, আপনার ব্যাপারে মলয়ের প্রধান অভিযোগ এই যে, বিয়ের আগে এ-কথা আপনি বা আপনার মা-বাবা তাকে জানাননি। ঠিক কি না?

ঠিক।

তাহলে আপনাদের সম্পর্ক ভালো করতে হলে এটা মলয়কে ক্ষমা করে দিতে হবে এবং মলয়ের ক্ষোভটা যে অস্বাভাবিক কিছু নয়, আপনাকে তা মনে রাখতে হবে।

দাদা, তাহলে আপনাকে বলি। বিয়ের আগে তো আমি মলয়ের সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। কথা বলে মনে হত, এ-রকম ছোটোখাটো ভুলকে মলয় কিছু মনেই করবে না। তার জন্যই তো আমি ওকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিই।

মুকুলের মনে পড়ে গেল। তাকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে শুভ্রারও এ-রকম একটা আশা ছিল বলে জানিয়েছিল। তার অতীত জীবনের কথা জানলেও মুকুল কিছু মনে করবে না। হয়তো উদারমনা লোকদের কাছ থেকে তার আশেপাশের লোকেরা তাদের ক্ষমতারও বেশি আশা করে। সে বলল,

BanglaBook.org

বিয়ের আগে যদি আপনি জানাতেন, মলয় হয়তো কিছুই মনে করতেন না। না-জানানোর ফলে মনে করছেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

তাহলে দাদা, ওকে বলুন, আমাকে নতুন করে বিয়ে করুক।

মুকুলের বুকে খচ্ করে লাগল। শুভ্রাও তাকে এ-রকম প্রস্তাব দিয়েছিল। তার অতীত জীবনের কথা জানাজানি হয়ে যেতে তাদের সম্পর্ক যখন খুব খারাপ, তখন এক দিন আকুল ভাবে বলেছিল, তুমি আমাকে নতুন করে বিয়ে করো।

কেন?

এখন তো তুমি আমার জীবনের সব কথা জেনে গেছ। কিচ্ছুই অজানা নেই। এখন আমাকে বিয়ে করো। তাহলে আমার আর কোনও দোষ থাকবে না। তোমাকে খুব ভালোবাসব। আমাকেও তুমি ভালোবাসবে। আমাদের কোনও আফশোস থাকবে না।

প্রস্তাবের গূঢ়ার্থ মুকুল তখন বুঝতে পারেনি। শুভ্রা যে ভুলটা করে ফেলেছে এবং যার ফলে সে মরমে মরে আছে সেটা ঝেড়ে ফেলে একটা সম্মানের জায়গায় আসতে চাইছিল। এখনকার মতো হলে হয়তো সে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেত। তখন সেটা হাস্যকর মনে হয়েছিল। বলেছিল, সেটা আবার হয় নাকি! একবার বিয়ে করে আবার বিয়ে করার কোনও অর্থ হয়?

শুভ্রা বোঝাতে পারেনি। মুকুলের বক্তব্যের জোরের কাছে হার মেনে নিয়েছিল। সেটা যদি শুচিস্মিতাদের কাজে লাগে। মুকুল বলল, আপনি ওর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে চাইছেন তো?

নিশ্চয়। আমি ওকে এখনও ভালোবাসি।

ওর জন্য দরকার হলে কিছু ত্যাগ করতে পারেন? জীবনে কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়।

ও ভালোবাসলে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি।

তাহলে আমি একটা কথা বলব?

বলুন।

ওঁর কী কী আচরণ আপনার খারাপ লাগে সেটা ভাবার আগে আপনি ভাবুন, আপনার কী কী আচরণ ওর খারাপ লাগে বা লাগতে পারে। আপনি ওর কাছে কী আশা করছেন ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবুন, আপনার কাছে ও কী আশা করতে পারেন তা-ও ভাবুন।

আপনি ওকে ডাকুন। আপনার সামনেই কথা বলে নেব।

আমার ইচ্ছে, তৃতীয় কোনও ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই কথা বলুন।

কেন?

আপনাদের সব কথা অন্য কাউকে জানাতে হবে এমন কথা নেই। আর আপনারা কেন চাইবেন, আপনাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সাক্ষী অন্য কেউ থাকবে। আমার মনে হচ্ছে, আপনারা দু'জনে কথা বললেই মিটে যাবে।

শুচিস্মিতা নমস্কার জানিয়ে উঠে গেল।

মুকুল আর্দালিকে ডেকে বলল, মলয়বাবুকে বলুন, ক্লাস হয়ে গেলে একবার আমার সঙ্গে কথা বলে যেতে।

॥ ৬॥

শেষ ক্লাসের ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল। মলয় বিধ্বস্তের মতো এসে বলল, কী কথা হল স্যার?

মুকুল আশ্চর্য হওয়ার ভান করে বলল, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

কেন স্যার?

BanglaBook.org

এক আপনি মদ খেয়ে মাতলামি করেন, এ ছাড়া আপনার বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগই নেই।

তাহলে আপনার কাছে চিঠি লিখল কেন স্যার?

আমিও তো তাকে সেই প্রশ্নটা করেছিলাম। তা তিনি চিঠি ফেরত নিয়ে নিলেন। বললেন, রাগের মাথায় লিখে ফেলেছিলাম। আমাদের বিরোধ আমরা মিটিয়ে নেব। আরও বললেন, তিনি আপনার ভালোবাসার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন। আপনার বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করতে রাজি আছেন। বিয়ের আগে তার জীবনের কথা যে আপনাকে বলতে পারেননি, তার জন্য ক্ষমা চাইতেও রাজি আছেন। এখন আপনি কী করবেন দেখুন। তাকে ত্যাগ করবেন, না ক্ষমা করে দিয়ে নতুন জীবন শুরু করবেন?

আমি ওকে ছাড়তে পারব না স্যার। আমি এখনও ওকে ভালোবাসি।

আপনার কথা শুনেই সেটা মনে হয়েছিল। সম্পর্ক শেষ হওয়ার যে-কথা বলছিলেন, সেটা ছিল নেহাতই ক্ষোভের কথা। আপনারা কথা বলুন।

আপনি একবার আমাদের বাড়িতে চলুন স্যার। আমাদের একবার কথা বলিয়ে দিন।

আমার মনে হয় সেটার আর দরকার হবে না। আপনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিন। তবে আপনাকে মদ ছাড়তে হবে। আর আপনার স্ত্রীর আপত্তি থাকলে রীতার সঙ্গে মেলামেশাটা বন্ধ করতে হবে।

মদ স্যার আমি ছেড়ে দেব। আর রীতার সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক সেটা আর কেউ না হোক আপনি তো বোঝেন!

আমার বোঝার চেয়ে আপনার স্ত্রীর বোঝাটা খুব জরুরি। আর সৎ থাকাটাই যথেষ্ট নয়, আমাদের চলাফেরা থেকে লোকের মনে হতে হবে যে, আমরা সৎ। আরও একটা কথা।

কী স্যার?

রীতার সঙ্গে কথা বলতে যে আপনার ভালো লাগে তার একটা কারণ নারীর সত্যিকার ভালোবাসার অভাববোধ। আপনার স্ত্রীকে মন থেকে ভালোবাসতে পারলে রীতার প্রতি আপনার এখনকার আকর্ষণ আর থাকবে না। আপনার অভাববোধ দূর হয়ে যাবে।

সেটা কী করে সম্ভব স্যার?

শুচিস্মিতার প্রতি আপনার ক্ষোভের তো একটাই কারণ, ওর অতীত জীবনের একটা ঘটনা আপনাকে না-জানিয়ে বিয়ে করা। মনে করে নিন না, বলতে চেয়েও বলতে পারেননি। আর এখন তো আপনি সবই জানেন। মনে করুন, এখন বিয়ে করছেন। বাকি জীবনটা সুখে কাটুক।

আর কিছু স্যার?

আপনি যেমন আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু আশা করেন, আপনার স্ত্রীও আপনার কাছ থেকে কিছু আশা করেন। আর তাঁর কোন আচরণ আপনার খারাপ লাগে ভাবার আগে ভাবুন, আপনার কোন ব্যবহার তাঁর খারাপ লাগতে পারে। তাহলে আর কোনও সমস্যা হবে না।

ঠিক আছে স্যার। মলয় নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

মুকুল তার ধূসর জীবনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

তাদের কলেজের বাৎসরিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান চলছে। রীতা স্টেজে বসে গান গাইছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা লম্বা মেয়ে ডোরাকাটা শাড়ি পরে বান্ধবীদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। মুকুল তাকে চিনতে পারল। তার স্ত্রী শুভ্রা। ডাকতে গেল। সেটা দেখে এক জন বান্ধবী মুকুলের প্রতি শুভ্রার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুভ্রা পাত্তা দিল না। বলল, হি ইজ নো মোর মাই হাজব্যান্ড। মুকুলের মনে খচ্ করে লাগল। মনে পড়ল, শুভ্রার সঙ্গে সত্যি সত্যি তার আইনি বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। আইনের দিক

BanglaBook.org

থেকে তার কথা ঠিক। মুকুলের ভালো লাগল না। ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল, কে যেন কলিংবেল বাজাচ্ছে। শুভ্রা কি এল? সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলল।

দেখল শুচিস্মিতাকে নিয়ে মলয় দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই প্রণাম করল। মলয় বলল, আমরা নিজেরাই কথা বলে বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছি স্যার। তাই দু'জনে মিলে মা-বাবাকে দেখতে যাচ্ছি স্যার। ফিরেই আপনাকে আমাদের বাড়িতে ডাকব স্যার।

শুচিস্মিতা বলল, বোন যখন বলেছে, না করতে পারবেন না। বোনকে আশীর্বাদ করুন, যাতে দু'জনে মিলেমিশে থাকতে পারি।

মুকুলের মনের মধ্যে তখনও শুভ্রাকে স্বপ্নে দেখার রেশটা লেগে ছিল। কিছু বলতে পারছিল না। নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বলল, খুব ভালো। আপনাদের বিয়েতে ডাকলে নিশ্চয় যাব।

স্বপ্নের কথাটা মুকুলের আবারও মনে পড়ল, শুভ্রা ডোরাকাটা শাড়িটা পরে বান্ধবীদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। মুখ বাঁকা করে বলছে, হি ইজ নো মোর মাই হ্যাজব্যান্ড॥

জয় গোস্বামী

সংশোধন বা কাটাকুটি

সেই কাণ্ড করেছে আবার? উফ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

কবি চমকে ফিরে তাকালেন।

গৃহিনী।

কী করলে দেখো তো একবার। সারা ঘর জলে থই থই। বিছানাটা অবধি ভিজে গেল।

কবির হুঁশ ফিরল। তাই তো। স্নান করতে করতে তোয়ালে পরে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। সারা শরীর থেকে জল ঝরছে। মাথার চুল থেকে। হ্যাঁ, কাগজের ওপরেও পড়েছে।

যাও। বাথরুমে ঢোকো শিগগির। দু-মিনিট পরে যেন ওই সব কাটাকুটি না করলে চলত না। মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত তাতে!

কবি বাথরুমে ফিরলেন আবার। সত্যিই কাজটা অন্যায্য হয়েছে। এমন কাজ তিনি আগেও করেছেন। ছোটো দু'খানা ঘর। লাগোয়া বাথরুম। ঘরে আলো ঢোকে না। সকাল থেকে টিউব জ্বালিয়ে রাখতে হয়। জল পড়লে শুকোতে সময় লেগে যায়। কিন্তু স্নান করতে করতে মাথায় একটা কারেকশন আসতেই, ওই অবস্থায় বেরিয়ে খাটের ওপর ফেলে রাখা সদ্য লিখতে শুরু করা কবিতাটির ওপর ঝুঁকে পড়া থেকে নিজেকে আটকাতে পারেননি তিনি। কাগজ যে ভিজে গেল, সে-খেয়ালও ছিল না। কেটে, মার্জিনে লিখেছিলেন মোটে একটা শব্দ। 'আছিল'।

নিজের ওপর রাগ হল কবির। সত্যিই, মাথায় একবার লাইন এলে বা কারেকশন এলে জগতের কোনো কিছু তাঁর খেয়াল থাকে না। সারা দিন যত লাইন মাথায় আসে, তার চেয়ে বেশি আসে কারেকশন। ওই লাইনটার বদলে যদি এই লাইনটা হয়। ওই শব্দটার বদলে কি এই শব্দটা ঠিক? এমনকী এই চিহ্নের বদলে ওই চিহ্ন। দাঁড়ির বদলে জিজ্ঞাসা? নাকি বিস্ময়বোধক! একটা কবিতা যখন মাথায় আসে, তখন লেখার আগে দু-চার দিন সেটা মাথায় নিয়ে ঘোরা যায়। এটা বেশ নেশার মতো। গোপনে গোপনে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু কাগজে একবার লিখিত হয়ে যাবার পরই,

BanglaBook.org

যখনই তার সংশোধন মনে আসবে, আর তা কেবলই আসবে, তখন তা প্রতিবার ছুটে গিয়ে কাগজে না বসানো পর্যন্ত রেহাই নেই নিজের কাছ থেকে। শুধু কাগজে বসানো নয়, ছাপতে চলে যাওয়ার পর যদি মাথায় আসে কারেকশন। আর এমন কপাল, তাই-ই আসে, তখন প্রুফে গিয়ে বসাতে হয়। প্রেসের লোকেরা রেগে যায়। স্বাভাবিক। এক কাজ তিনবার করে করানো। তারপর যদি ছাপতে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে আসে, তখনও আরেক কাণ্ড। সবাইকে ধরে বেঁধে আবার বদল করা। ওই সময়টা যেন নেশার মতো। অন্যের অসুবিধে হচ্ছে কি না সে-দিকে কোনো নজর থাকে না।

এই কারণেই প্রেসের শ্যামাপদবাবু থেকে অফিসের সহকর্মী থেকে, নিজের গৃহিণী পর্যন্ত অনেকের কাছেই বার বার মুখঝামটা খেয়েছেন কবি। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বদলাতে পারেননি। বাথরুমে ঢুকে পুনর্বার কল খুলে চান করতে করতে কবি শুনলেন, গৃহিণীর সরোষ নির্দেশ, চায়না ঘর দুটো মুছে দে তো।

চায়না। এই চায়নার জন্যই হল গণ্ডগোলটা। দু'দিন হল এ বাড়িতে কাজে ঢুকেছে মেয়েটা। সামনের বস্তির পিছনে যে-রেললাইন, তার ধারের একটা ঝুপড়িতে নাকি এসে উঠেছে ওর মা-ভাইদের সঙ্গে মাস খানেক আগে। দো-তলায় মিহিরবাবুর বাড়ি যে-বউটা কাজ করে, তার নাকি পাঁচ বাড়ি কাজ, তার সময় নেই, তাই এই মেয়েটাকে এনে দিয়ে গেল। বলল, নতুন এসেছে। গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, আগে বাড়ি কোথায় ছিল? মেয়েটা বলল, আমাগো বাড়ি আছিল বনগাঁয়।

সদ্য এসেছে তো, তাই ভুলতে পারছে না। আজও সকালে, কবি যখন লিখছিলেন মানে, আলো কম বলে বাথরুমের ধারে পশ্চিমমুখো খোলা প্যাসেজটায় যেটুকু আলো আর প্রকৃতি আর পাখি, নারকেল গাছ চিলতে মেঘ এই সব দেখতে পাওয়া যায়, সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে প্রতি দিনকার মতোই ভাবছিলেন, ভাগ্যক্রমে দু-চারটে লাইন পাওয়া যায় কি না। ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেছিলেন, আর লিখতে শুরু করার পর শুনেও ছিলেন, চায়না বলে মেয়েটা বলছে গৃহিণীকে, আমাগো বাড়ি তো আছিল বনগাঁয়। সেইখানে এত ধুঁয়াধূলা না। এত্ত আওয়াজও না।

কবি ভাবছিলেন, ভুলতে পারছে না বেচারা। জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসে আর নিজের গ্রামকে ভুলতে পারছে না।

কবিও কি পেরেছেন? না। তাঁর নিজের বাড়িও তো ছিল গ্রামেরই সীমায়। তিনি ভুলে যাবেন। এ মেয়েটা লোকের বাড়ির কাজের লোক। তিনিও কাজ করেই খান। লিখেও খান কিছুটা। লিখে খেলে নাকি লেখা হয় না, সবাই বলে। না হোক। খাওয়া তো হয়। তাই-বা কে দেয়। লেখাপড়ার চাকরি তাঁর। এর চাকরি ঘর মোছা, বাসন মাজা। দু'জনেই তো গ্রাম ছাড়া। সেখানে তো এক।

লেখাটায় দুটো লাইন লিখেছিলেন, আমার বাড়ি ছিল বসিরহাটে? আমার বাড়ি ছিল কি বনগাঁয়? স্নান করতে করতে হঠাৎ মনে 'হল আমার বাড়ি আছিল বনগাঁয়' করলে কেমন হয়? কেমন-টেমন জানি না, করতেই হবে। আমার বাড়ি ছিল বসিরহাটে। আমার বাড়ি আছিল বনগাঁয়। সে-ক্ষেত্রে শেষের জিজ্ঞাসার চিহ্ন দুটো তুলে দিতে হবে।

যেমন মনে হওয়া তেমনি কাজ। বাথরুম খুলে তৎক্ষণাৎ শোবার ঘরে। আর ওই সব বিপত্তি। সে-দিক দিয়ে চায়নাই তো দায়ী। চায়না 'আছিল বনগাঁয়' না বললে তো ওটা কবিতায় লাগাতেন না কবি। ছিল আর আছিল। একটা ঘটি এক্সপ্রেশন। একটা বাঙাল এক্সপ্রেশন? হতে পারে। কারণ দু-ধরনের লোকই তো গ্রাম মফস্বল ছেড়ে এসেছে শহরে। কাজ খুঁজতে। নানা দিক থেকে নানা জাতি এসে মিলে যায় এখানে। নানা রকম মেয়েরাও আসে। যে-সব মেয়ে কাজ পায় না, তারা শেষমেশ নিজের শরীরকেই জীবিকা করে। নিজের শরীর ভেঙেই খায়। আচ্ছা, যদি সন্তান এসে পড়ে, কী করে এরা! খবরের কাগজে যে প্রায়ই 'সন্ধান চাই' শীর্ষক বিজ্ঞাপন বেরোয়, তাতে থাকে যে-সব সদ্যোজাত

BanglaBook.org

পরিত্যক্ত শিশুর ছবি, যাদেব বাবা-মা'র সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, তারা কি অনেক সময় এই সব মায়ের সন্তান? এরা কি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, তার আগেই গর্ভপাত ঘটায়? উঃ ভগবান! কত সব ব্যাপারই যে ঘটে পৃথিবীতে! কবি যেন শিউরে উঠলেন অজানা ভয়ে। অবশ্য শরীরকে ভাঙিয়ে যারা খায়, শরীরকে বিক্রি করে, তারা কি আর করবে। শরীর ছাড়া তো কোনো মূলধন নেই তাদের।

কবিও কি অনেকটা সেই রকম নন! লেখা ছাড়া আর কোনো বিদ্যা তো তিনি জানতেন না। তাই লেখা দিয়েই প্রধানত উপার্জন করতে হয় তাঁকে। এইখানে কি ওই সব মেয়ের সঙ্গে কোথাও একটা মেলে না তাঁর? কেননা শরীর যখন শরীরের কাছে আসে তখন তো তা নিভৃত আনন্দকেই প্রকাশ করতে চায়। গোপনে। কেবল আনন্দ নয়। শরীর তো অনেক সময় দুঃখকে প্রকাশ করবার জন্য শরীরকেই টানে কাছে। তেমনই যে-কবিতা এক সময় ছিল কবির নিভৃত দুঃখ-আনন্দের সংগোপন প্রকাশ, আজ তাকেই প্রকাশ্যে পসরা করবার পালা। তাছাড়া এখন তো আর কোনো কিছু লিখে দিনের পর দিন ফেলে রেখে সেটা পুরোনো হতে দেবার অবকাশ নেই। লেখার পর পরই তা চলে যাবে প্রেসে। এই অবস্থায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা সংশোধন করা যায়, তার চেষ্টা করে চলেন কবি। এই করতে করতেই ভাষার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের সীমাটা তবু দেখতে পাওয়া যায়। জানতে পারা যায় আজো কতটা তিনি জানেন না — এই ভাষা শব্দ ছন্দের বিষয়ে, এই জীবনের বিষয়ে। সরোদিয়া যেমন, কেবল সুর দিয়েই জীবনের মধ্যে ঢুকতে পারেন, সেই অন্ধের হাতে যেমন সরোদ ছাড়া অন্য কোনো যষ্ঠি নেই, কবির কাছেও তেমনি অন্ধের লাঠি হল শব্দ। শব্দ দিয়ে সে জীবনের মধ্যে তার রূপ রস গন্ধের মধ্যে প্রবেশপথ পায়। আর কী উপায়ে এই সব নিরুপায় লোক পৃথিবীকে জানবে!

অবশ্য এমনও কেউ কেউ আছে, যারা শব্দকে অন্যভাবেও ব্যবহার করে। অন্যকে ছিন্নভিন্ন করবার কাজে। অপরকে ধ্বংস করবার কাজে। অপরের ত্রুটি ধরবার আনন্দ থেকে তার শুরু। তাদেরও বেশ প্রতিপত্তি আর কীর্তিগাথা আছে এই ধরাধামে। কিন্তু কবি নিজের ভাগ্যকে প্রণাম করেন, হাতে একটা সরোদ কিংবা একটা বেহালা, কিংবা একটা বাঁশি জলে ভাসতে ভাসতে তাঁর হাতে এসে পড়েছিল বলে। ভাগ্যিস তিনি সেটাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। রাজা কবির হাতে সেতার ধরিয়ে দিয়ে অন্যকে দিয়েছেন ঘাতকের ভূমিকা। একই দরবার। একই শ্রোতা দর্শক। একই সভাসদ। রাজা জানেন কে কোনটা পারবে। ঘাতক এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে দর্পভরে রাজদরবার পেরিয়ে যায়। লোকে সভয়ে কুর্নিশ করে আর বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে, কী কীর্তি। একেবারে ভুলুণ্ঠিত করে দিয়েছে? অ্যাঁ। দেখলে, এই হল হিরণ্যকশিপু। অন্য জন বলে, কে বলেছে, এই তো ঘটোৎকচ। তৃতীয় জন বলে, তোমরা ছাই জানো, এ রাসপুটিন ছাড়া কেউ নয়। আলোচনা করতে করতে বাড়ি যায় সব।

তার কয়েক প্রহর পরে যন্ত্রী জাগে। একটা একটা পর্দায় আঙুল পড়ে তার, আর এতক্ষণ ভয়ে যে কান্না লোকে কাঁদতে পারেনি, সেই সব কান্না ঝর ঝর করে বেরিয়ে আসে চোখ ধুয়ে দিয়ে। প্রকাশ্যে নয়, নিভৃতে। নিজের নিজের গোপন কোনায়। সুর তো সমস্ত জায়গায় পৌঁছয়। এই রাজদরবার কবির হাতে একটা বাঁশি দিয়েছে। সমস্ত আঘাতের পর একটা ফুঁ লাগে। একটা ফুৎকার মাত্র। অমনি বাজাও রে মোহন বাঁশি... রিঝ-মন ভেদন, বাঁশরি বাদন-ন...।

সুর তার প্রত্যেক কণায় কণায় উঠে গিয়ে অশ্রু লাভ করে। কবির বড়ো ভাগ্য যে, লাঠির মাথায় পুঁটলি বেঁধে এই জীবনে এতটা হেঁটে আসার পর এই কাজ পাওয়া গেছে।

স্নান শেষ করতে করতে কবি দেখলেন, পিছনেই রাজা। বাথরুমের মধ্যে।

রাজার মুখে কথা ফুটল। দেখলে তো কী অশান্তিটা হল। কী দরকারটা ছিল তোমার।

BanglaBook.org

তার মানে?

শুনতে পাচ্ছ না?

কবি শুনলেন, বাইরে তর্জন চলছে থেকে থেকেই। কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থেকে থাকে। ভাগ্যিস চায়না কাজ করে চলে যায়নি, নইলে আমাকেই মুছতে হত।

রাজা লাফিয়ে উঠে বাথরুমের ভাঙা জানলাটার ওপর উঠেছে। যেন ওটা তমাল গাছের ডাল, আবার কথা ফুটল, চান করে বেরিয়েই কারেকশানটা করতে পারতে।

কবি বললেন, এখন কি আর সে যুগ আছে? কারেকশনটা করব কি করব না মনে করে দোনামনায় আমি চান করতে গেলাম আর তুমি এসে কারেকশনটা লিখে দিয়ে গেলে — দেহি পদপল্লবমুদারম। আর গিন্নিও চিনতে পারল না। এখন দিনকাল অন্য রকম। নিজের কারেকশানটা নিজেকেই করতে হয়।

রাজার মুখে দুষ্টু হাসি। রাজা একটি বালক। রাজার খালি গা। মাথায় ময়ূর পাখা। কোমরে বাঁধা উত্তরীয়ের মধ্যে গোঁজা একটা আড়বাঁশি।

তুমি কিন্তু তোমার গিন্নিকে বড্ড জ্বালাও।

এইবার কবির রাগ হয়ে গেল, জ্বালাই মানে? তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। যখন তখন মাথায় কারেকশন আনবে। মনে লাইন আনবে। এনে আমাকে বিপদে ফেলা। যাও তো এখন। আমি অফিসে যাবার সময় বাড়িতে লোক আসা পছন্দ করি না।

রাজা হুস করে ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে জানলার বাইরে চলে গেল। তারপর কাচের ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল, মাথায় লাইন না এলে খেতে কী? চাকরি পেতে কী করে? গিন্নিকে খাওয়াতে কী? মেয়েকে হস্টেলে দিতে পারতে! ... দুয়ো, দুয়ো...।

রাখালরাজা অন্তর্হিত হল।

আর কবি মর্মাহত হলেন। ছিঃ! শেষে রাখালরাজাও এই কথা বলল। নাঃ, আজ থেকে আর লেখা নিয়ে ভাববেন না। পত্রিকা থেকে যা চাইবে, বসে লিখে অবিলম্বে দিয়ে দেবেন। কারেকশন-ফারেকশন বাদ! ও-সব করে তো ঘণ্টা হয়। শ্যামাপদবাবুদের অসুবিধে। বুড়ো মানুষ। রাগ করেন, এটাও কবির তরফে অন্যায়। গিন্নির অসুবিধে হয়। রাতে ঘুম আসবার পর অতবার উঠে লাইট জ্বালানো। গিন্নি মেয়াদি অনিদ্রায় ভোগেন। ঘর তো দুটো মোটে। এ ঘরে তো ঝামেলা হবেই। গিন্নির সবে আসা ঘুম দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের জন্য ভাঙল। উঃ ভগবান! রাতে একটু দু'চোখের পাতা এক করবার জো নেই। সংসারের কোনো সুখই তো দিলে না। একটু ঘুমোব, তারও উপায় নেই!

সত্যি তো। সবাইকে বিরক্ত করার কী দরকার। লোকের তারিফ পাবার জন্য তো নয়। নিজেরই মধ্যে কেমন একটা অপূর্ণতা ঘুরে বেড়ায়। নিজের মধ্যেই কেউ বলে, যে-কাজ করতে এসেছ তা নিখুঁত করে করো। নিখুঁত নির্ভুল তো আর হয় না কবিতা। তবু সেই সীমার যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়। ভেতরে কেউ বলে এ-সব। কে বলে? তাকে চুপ করিয়ে দিতে হবে এবার।

কী ব্যাপার? ঘটের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

অ্যাঁ!

চানে ঢুকে তো এক ঘণ্টা লাগালে। এখনো আপনমনে বিড়বিড় করছ যে। লেখা শেষ হয়নি?

ও কিছু না। প্রায় হয়ে এসেছে।

আমারও হয়ে এসেছে। নাও, খেতে বসবে চলো।

শোবার ঘরেই আসন পেতে মেঝেয় বসে কবির খাওয়া। খাবার টেবিল তাঁদের নেই। কবির সম্বন্ধী নন্তুবাবু বলেছেন ভাড়ায় একটা খাবার টেবিল আর চারটে চেয়ার এনে দেবেন। ভাড়া হবে

BanglaBook.org

মাসে একশো কুড়ি টাকা। এ ছাড়া ভাড়া করা দুটো ফ্যান আর একটা আলমারিও রাখছেন তাঁরা। আলমারি কেনার সঙ্গতি নেই। টেবিলেরও কী দরকার, কবি বলেন। বেশ তো চলছে।

গৃহিণী বলেন, না দরকার। শ্যামলদা শেফালিদির বাড়ি দেখো না। কী সুন্দর টেবিল। ওরা কত গোছানো।

কবি বলেন, সবাই তো সমান হয় না গিন্নি। তাছাড়া ওরা তো দু'জনেই চাকরি করে।

গৃহিণী আরো একটি অবরুদ্ধ রাগের প্রকাশভূমি পান, দু'জনেই চাকরি করে। আমিও তো চাকরি করতাম। তুমিই তো দিলে না।

কবি আহত, আমি দিলাম না। তোমারই তো শরীর দিল না।

ও মাঝে মাঝে অমন সবারই হয়। তারপর এক সময় ঠিক হয়ে যায়।

হল না তো একবারও। প্রত্যেকটা কাজের সময়ই কয়েক মাস পর পরই শরীর ভেঙে পড়তে লাগল তোমার। তুমি ও-সব পারো? বস্তিতে বস্তিতে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ওই সব কাজ...।

তবু। ইমুনাইজেশনের সময় কত বাচ্চাকে ধরতে পারা যায়। স্কুল চালালে কত বাচ্চা আসে। জানো এক বার একটা বস্তিতে একটা বাচ্চা আমাকে কি বলেছিল? বলেছিল, আমাকে একটু কোলে নেবে!

জানি, তারপর সেই বাচ্চাটিকে বস্তি থেকে তুলে তুমি বাড়িতে এনে রাখতে চেয়েছিলে। ওর মাকেও প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলে।

তুমি দিলে না।

কবি আবার অপ্রস্তুত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন, আমি দিলাম না। মানে? আমাদের কি সে-অবস্থা আছে? মিস্টুর হস্টেলের খরচ। এতগুলো বাড়ি ভাড়া। সব করে, আরেকটা বাচ্চা কি আমাদের আনলে চলত, বলো!

গৃহিণীর চোখ হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে, ঠিক চলত। তুমিই চাও না। বাচ্চা চাও না। নিষ্ঠুর তুমি! নিষ্ঠুর!

কবি এগিয়ে গিয়ে গৃহিণীর কাঁধ স্পর্শ করেন। শোনো, ব্যাপারটা বুঝে দেখো।

ঝাঁকুনিতে নিজের শরীর ছাড়িয়ে নেন, খবরদার! তুমি ছোঁবে না আমাকে। ছোঁবে না। বলতে বলতে বুকের কাছের পাঞ্জাবিটা মুঠো করে ধরে ঘুঁষি মারতে থাকেন কবির বাঁ-কাঁধে। পুরো বাহু সমেত বাঁ-কাঁধটা অসাড় লাগে। কবি রান্নাঘরের সীমায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেন ছুঁড়ে মারার মতো কোনো থালাবাটি কাছাকাছি আছে কি না। নেই দেখে, নিশ্চিন্ত হয়ে ডান হাতের তালু দিয়ে ধীরে ধীরে মাথায় চাপড় মারেন আর বলেন, শান্ত হও, শান্ত হও। গৃহিণী স্থবির দৃষ্টি নিয়ে বসে পড়েন।

ক'দিন আগের এ ঘটনা।

কবি খেতে বসে ভাত ভাঙেন। গৃহিণী বলেন, আগে মাছ নয়। আগে উচ্ছে-সেদ্ধটা। এই যে।

কবি, ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলে উচ্ছে-সেদ্ধ খান।

এ বার ডালটা। এই যে। খেতেও শিখলে না।

কবি নিশ্চুপে খান।

গৃহিণী বলেন, ক্লাস ওয়ান হওয়ার কথা।

অ্যাঁ! হ্যাঁ!

পাঁচ বছর তো! পূর্ণ হয়ে গেছে।

কবি তাড়াতাড়ি খান। হ্যাঁ পাঁচ বছর, না! তাই তো!

কবি খাওয়া শেষ করেন।

BanglaBook.org

গৃহিণী বলেন, এই যে তোমার প্রেসারের ওষুধ।

হ্যাঁ।

মাথায় প্রায়-সমাপ্ত কবিতাটা হানা দিচ্ছে। কী নাম দেওয়া যায় লেখাটার! ছোটোখাটো কিছু একটা দিতে হবে। লোকেরা? নাকি মানুষজন। নাঃ লোকজন। এটাই চলতে পারে।

জল খেয়ে কাঁধ-ঝোলায় বইপত্র নিয়ে, ছাতা ভরতে ভরতে কবি কবিতার নাম সন্ধান করেন। গৃহিণী তাঁর দিকে সারা দিনের খরচ এগিয়ে দেন, কুড়ি টাকা।

গৃহিণী বলেন, আজ একটু বেরোব।

কোয়ায় যাবে?

দেখি কোথায় যাই।

চাকরি খুঁজতে।

খুঁজিই যদি! বাড়িতে কী করব? পাঁচ বছর আগে হলে...। কবি রাস্তায় বেরোলেন।

॥ ২॥

কবি হাঁটছেন।

পাঁচ বছর। পাঁচ বছর অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকার পক্ষে। কর্মহীন থাকার পক্ষে। ভুলে যাবার পক্ষেও।

বাসের লাইন আজ ছোট। কীসের যেন সরকারি ছুটি আজ। তাঁদের অফিস বেসরকারি। লাইনে দাঁড়িয়ে কবি তাড়াতাড়িই জানলার ধারে একটা সিট পেয়ে গেলেন। নিশ্চিন্ত। এবার রাস্তাটুকুর মধ্যে কবিতাটা মনে মনে সাজিয়ে নিতে পারবেন। নাঃ কারেকশন নয়, এখানেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার মনে মনে পড়ে বুঝে নেওয়া। কাটাকুটি পরে আবার।

বাস ছেড়েছে। ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর উঠেছে। হঠাৎ জানলার বাইরে একটা মুখ। রাখালরাজা। মাথায় চূড়া। বাঁশিটা হাতে। জানলার বাইরে দিয়ে বাসের পাশে পাশে সমান বেগে উড়ে চলেছে। পত পত উড়ছে উত্তরীয়।

রেগে গেছ নাকি তখন? চানের সময়।

নাঃ, রাগ করে কী হবে। আর কারেকশন করেই-বা কী হবে।

এই তো রাগের কথা।

না, রাগ নয়। সবার শুধু অসুবিধে সৃষ্টি করা। কেউই তো আর পরিশ্রমের মানে বুঝতে চায় না। লক্ষ্যই করে না ও-সব। আরে...!

কবি দেখলেন একটা ডবলডেকার পাশে পাশে চলেছে। রাখালরাজা কোথায় গেল? কবি জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দো-তলায় একটা জানলা এক হাতে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। কবিকে দেখে হাত নাড়ল। বাঁদর নাকি? আজ আর রাগটা পড়ছে না।

ডবলডেকার ধীরে চলে। মিনিবাস জোরে। কবিকে নিয়ে মিনিবাসটা এগিয়ে যেতেই আবার দু'হাত ভাসিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে রাখালরাজার হাওয়া সাঁতার। ময়ূরপাখা কাঁপছে হাওয়ায়। বাঁশিটা কোমরে গুঁজতে গিয়ে হাত থেকে স্লিপ করে পড়ে গেল নিচে ধাবমান মারুতির ছাদে। সে ডাইভ দিয়ে ধরে নিল। তুখোড় ছেলে।

জানলার বাইলে উড্ডীন রাখালরাজা কোমরে বাঁশিটা গুঁজতে গুঁজতে বলল, কেন ও-কথা বলছ?

কী কথা!

এই যে বললে, পরিশ্রমের মানে বুঝতে চায় না কেউই। কেউ লক্ষ্য করে না ও-সব। কেউ লক্ষ্য করবে বলেই কি তুমি লেখো! অন্যের তারিফ পাবে বলে?

BanglaBook.org

না। ঠিক তা নয়, মানে...।

দুপুরে, রোদ্দুরের মাঠে আমি যখন বাঁশি বাজাই, পাখিও যখন গান বন্ধ করে, কে শোনে সেই বাঁশি? কেউ শোনে? কেউ শুনবে বলেই কি বাজাই?

রুদ্র শোনে।

রুদ্র? হ্যাঁ। তা ঠিক

'প্রান্তর প্রান্তের কোণে, রুদ্র বসি তাই শোনে।' কবি ভাবেন, প্রান্ত বলার পর আবার কোণ বলার কী দরকার ছিল। প্রান্ত মানেই সীমা, ধার। তারও আবার কোণ। উঁহু। ঠিক মেনে নিতে পারছেন না।

রাখালরাজা জানলার ও-পিঠ থেকে ফুট কাটে, যেন কত জানে, তাহলে মিল হত কী করে?

হ্যাঁ, মিলের জন্যই আনা। এটা তো ভালো জিনিস নয়। একটু কারেকশন করতে পারতেন।

উঃ। আবার সেই কারেকশন। যে এটা লিখেছে, সে তোমার চেয়ে কত হাজার গুণ বড়ো কবি তা জানো?

জানি।

আর সে কত হাজার কারেকশন করেছে তা-ও নিশ্চয় জানো?

জানি।

দেখবে, কিন্তু খুঁজবে না। তুমি তো ভুল খুঁজছিলে। 'প্রান্তর প্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে'—এর কোনো বিকল্প হয়? হতে পারে?

কবি লজ্জা পান। সত্যিই এর কোনো বিকল্প হয় না। এ অবধারিত।

রাখালরাজা বলে, ত্রুটি সন্ধান করতে গেলেই কিন্তু মরবে। চোখ কালো হয়ে যাবে। জীবনে আর ভালো দেখতে পারবে না। অন্ধ চোখে ঘুরতে ঘুরতে এক দিন পাঁকে গিয়ে পড়বে। তবে এটা ঠিক 'রুদ্র কোণে বসেই হয়তো শোনে'। না না, শোনে না।

রাখালরাজা নিশ্চিত হয়।

কোথায় বসে শোনে তবে?

ওপরে। দেখো, প্রান্তর প্রান্তের কোণ থেকে সুরটা উঠে যাচ্ছে, চড়ায় উঠে যাচ্ছে। কত ওপরে। মানে দূরত্বে। দূরে আর ওপরে উঠে যাচ্ছে সুর। তার মানে, রুদ্র আছে সেইখানে। তারসপ্তকের ওপরে তার আসন। সেইখানে সে আছে।

রুদ্র কে?

যে শোনে সে রুদ্র। নিঃসঙ্গ রৌদ্রপীড়িত দুপুরবেলায় বাঁশি যে শুনতে পায়।

যে রুদ্র সে প্রবল। সে নিঃসঙ্গ। সে মগ্ন। সে কবি।

ওই দেখো। কন্ডাক্টর আসছে।

কবি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, কনডাক্টর। কবি একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলেন, ঢাকুরিয়া গ্রেট ইস্টার্ন, একটা।

কনডাক্টর বিরক্ত, খুচরো দিন। ২ টাকা ৭০।

নেই তো ভাই।

নেই তো আগে বলেননি কেন? ছুটিছাটার দিন প্যাসেঞ্জার নেই, রাখুন। পরে দেখছি।

কবি অপ্রতিভ মুখে জানলার দিকে তাকান। রাখালরাজা অন্তর্হিত। তা থাকবে কেন! দরকারের সময় থাকবে না। তুখোড় ছেলে।

বাসটা কার্জন পার্ক পেরিয়ে যাচ্ছে। কবি উঠলেন, দশ টাকার নোটটা হাতে। অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়ালেন কনডাক্টরের সামনে। কনডাক্টর ভাঙিয়ে খুচরো আর টিকিট দিচ্ছে। হেল্পার দরজায় হাঁকছে, গেটিস্টান, গেটিস্টান। অপরাধীর মতো মুখ নিয়েই নেমে পড়লেন কবি।

BanglaBook.org

অফিসে পৌঁছে কবি দেখলেন, টেবিলে চিঠিপত্রের সঙ্গে বিশেষ জরুরি লেখা একটা খাম। বিশ্বনাথ হাজরা জানিয়েছেন তাঁর কবিতায় ছাপার ভুল হয়েছে দু'টি। একটি মৌনপ্রতিমা শব্দটি হয়েছে যৌনপ্রতিমা, অন্যটি মরুরমণী শব্দটি হয়েছে সরুরমণী। বেশ ক্ষুদ্র ও দুঃখিত চিঠি। হবারই কথা, সম্পাদককেও এই মর্মে চিঠি দেওয়া হল বলে জানিয়েছেন বিশ্বনাথবাবু। সহকর্মী শ্যামল রায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে প্রুফ দেখেছিল? আপনি।?

কবি মানলেন, হ্যাঁ। তিনিই দেখেছিলেন প্রুফ। দায় তাঁরই।

শ্যামলবাবু বললেন, কী করছিলেন কী প্রুফ দেখতে দেখতে? নিজের লেখার কারেকশন ভাবছিলেন বুঝি! ওই আপনার প্রবলেম মশাই। ওই একই ইস্যুতে তো আপনারও কবিতা ছাপা হয়েছে। কই, সেখানে তো মিস্টেক নেই!

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো মুখে নিজের টেবিলে ফিরে এলেন কবি। সত্যিই নিজের লেখার প্রুফ আর অন্যের প্রুফ কি তিনি সমান সতর্কতায় দেখেন না! এই অভিযোগ কি সত্যি!

না, সত্যি নয়। কিন্তু প্রমাণ করার কোনা উপায় নেই। ভুল ভুলই। পরের ইস্যুতে চিঠিপত্রের কলমের শেষে, ভ্রম সংশোধন বের করতে হবে একটা। কারেকশন নোট।

টেবিলের ওপর দু-থাক খাম। এর মধ্যে আছে ডাকে আসা লেখা। এর মধ্যে কয়েকটি উঠবে ফাইলে, প্রধান নির্বাচকের কাছে যাওয়ার জন্য। আর কয়েকটি যাবে টেবিলের তলায়।

প্রতি দিন টেবিলের তলা থেকে কত অপরিচিতের অভিশাপ উঠে আসছে কবির দিকে।

টেবিলের তলা থেকেই নয় শুধু, টেবিলের ওপর থেকেও। আর অপরিচিতই নয়, পরিচিত অভিশাপও থাকে। টেবিলেই রয়েছে নতুন একটা পত্রিকা, ডাকে আসা। তাতে মাধব সেনের একটা গদ্য রয়েছে। মাধব সেন, নানা ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই কবিদের খোঁচা দেন বা আক্রমণ করেন। পাকে প্রকারে, স্পষ্টতায়। নাম করে বা না করে। ব্যক্তিগত জমায়েতে বা বন্ধুসমাবেশে। মুখোমুখি হয়ে পড়লে অবশ্য দু'জনেই বন্ধুত্বের মুখোশ ব্যবহার করে থাকেন। এই ব্যক্তির চোখ দেখেই বোঝা যায় সব। ব্যক্তিটি সর্বদা অসন্তুষ্ট, উপদেশাত্মক এবং আস্ফালন-প্রিয়। রচনায় ও স্বভাবে। এই গদ্যটিতে একটু চোখ রেখে কবি দেখলেন সকলকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। এবং এ সময় কেমন লেখা উচিত এই নির্দেশনামা রয়েছে। তাঁকেও বিদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। এঁরাই হলেন ঘাতকশ্রেণীর। কবি পত্রিকাটি বন্ধ করে রাখলেন নিজের ব্যাগে। এই গদ্যটি পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিকই। কিন্তু অনেক তরুণ কবির লেখা রয়েছে এতে। বাড়ি গিয়ে পড়তে হবে।

কবির পাশের চেয়ারটি ফাঁকা। তাঁর প্রবীণ সহকর্মী আজ আসেননি। বদলে সেই চেয়ারে এসে বসে আছে রাখলরাজা। মাথায় শিখীপাখা। কোমরে গোঁজা বাঁশি।

কবি গম্ভীর ভাবে বললেন, অফিসে কাজ করছি, এখন বিরক্ত কোরো না।

রাখালরাজার ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর কন্ডাক্টর ভাঙিয়ে দিল দশ টাকার নোট?

দিল। কোনো দিন কোনো কাজে একটু হেল্প করতে দেখলাম না। সেই কত বছর আগে একবার চান করতে যাবার সময় ওই 'দেহিপদপল্লব'টুকু ছাড়া। মজা দেখো, না?

রাখালরাজা চোখ পাকায় — অ্যাই, বাজে কথা বোলো না। এই সে-দিনই তো বেড়া বাঁধার সময় উলটো দিক থেকে দড়ি এগিয়ে দিয়েছি।

কবে আবার?

ওই তো যেবার গান বাঁধতে আর কাছারির খাতায় গান লিখতে। সেবার অবশ্য মেয়ে হয়ে এসেছিলাম।

ফোন বেজে উঠল।

BanglaBook.org

কবি ধরলেন। গৃহিণী।

হ্যাঁ। বলো।

ও এসেছিল।

কে ?

গোপাল।

কবি ঢোক গেলেন, তাই নাকি ?

হ্যাঁ, শোনো না, স্কুলে ভর্তি হয়েছে। পাঁচ বছর তো। খেতে দিলাম।

ভালো তো।

যাবার সময় না, হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল। ধরতে পারলাম না।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বাড়ি যাই। তারপর সব শুনব। কেমন ?

শোনো না। একলা বাড়িটায় বড়ো পাগল পাগল লাগছে। শিপ্রাদির কাছে যাব একবার ? বলব চাকরির কথা ?

আগে আমি বাড়ি যাই। তারপর কথা হবে।

আচ্ছা। তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।

কবি ফিরে দেখলেন রাখালরাজা উধাও। সিটের ওপর শুধু তার ময়ূরপাখাটি। ফেলে গেছে। কবি সেটি তুলে নিজের ব্যাগে রাখলেন।

নমস্কার।

কবি তাকিয়ে দেখলেন একটি যুবক।

আমার নাম বিকাশ মজুমদার।

আচ্ছা।

আমি এই চিঠিটা পেয়েছি।

খাম খুলে একটি চিঠি এগিয়ে দেয় যুবকটি।

হ্যাঁ। পুজোসংখ্যার চিঠি। লেখা এনেছেন ?

না।

সে কী ? কেন ?

তিনটে লিখেছিলাম। একটাও ভালো হয়নি। জিজ্ঞেস করতে এসেছি আর কিছু দিন সময় পাওয়া যাবে ? চিঠিতে তো আছে এ মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা।

কবি হেসে ফেললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। বসুন না।

ছেলেটি বসল না। ছেলেটির মাথার চুল ছোটো ছোটো। কথায় একটু বাঙাল টান। কবি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় থাকেন ?

আমার বাড়ি বনগাঁয়।

কবির মনে পড়ল চায়নার কথা। আমার বাড়ি আছিল বনগাঁয়। বাড়ি গিয়ে লেখাটা শেষ করতে হবে। কবি লক্ষ্য করলেন ছেলেটির পায়ে হাওয়াই চটি।

কবি বললেন, আপনি হাওয়াই চটি পারছেন কেন ? বাসে ওটা তো বিপজ্জনক এটা পরে।

ছেলেটি বলল, আমি তো বাসে উঠি না। আমাকে তুমি বলবেন।

আচ্ছা বেশ, বাসে ওঠো না কেন ?

ভালো লাগে না। আমি হেঁটেই ঘুরি।

কবি অবাক হন। বলেন, বাঃ। তুমি অনেক হাঁটতে পারো তো।

BanglaBook.org

লেখাটা কবে দিতে হবে?

পরের সপ্তাহে পারবে?

আচ্ছা। জমা দেবার পর দরকার হলে একটু কারেকশন করা যাবে তো?

আবার কারেকশন? কবি হাসলেন, আবার। যাবে, আমাকে জানিও। কেমন? বোসে না।

আজ যাই। নিচে বন্ধু আছে। কলেজ স্ট্রিট যাব।

কে বন্ধু? আমি চিনি?

শান্ত, শান্তব্রত।

কবি চিনতে পারলেন। মুখটা ভেসে উঠল। চশমাপরা। ঝকঝকে কালো। চশমার নিচে জুলজুলে চোখ। হাসিটা শিশুর মতো।

ফোন বাজল। হাতে ফোন কবি হাঁকলেন, মুরারীদা-আ।

মুরারীদা আরেক জন অগ্রজ সহকর্মী। ও-দিকে যে ফোন আছে তার সামনেই বসেন। অধিকাংশ ফোন তাঁরই আসে।

উল্টো দিক থেকে মুরারীদার উত্তর ভেসে এল, ধরছি ভাই। হ্যালো...।

কবি ছেলেটির দিকে ফিরলেন। ছেলেটি বলল, আজ যাই।

এসো।

কবি তরুণ কবির মাথায় ময়ূরপাখা দেখতে পেলেন। মনে মনে ভাবলেন, এরা এখন পৃথিবী জয় করতে পারে।

আবার ফোন বাজল।

হ্যালো।

শ্যামল রায়ের ভিজিটার আছে রিসেপশনে।

ফোন রেখে কবি হাঁকলেন, শ্যামলবাবুর নিচে লোক।

নিচে লোক, এই দপ্তরের একটা চালু টার্ম। দপ্তরটি তিন তলায়। এক তলায় রিসেপশন। তাই সংক্ষেপে বলা হয় 'নিচে লোক'

সিটে বসে একটা খাম খোলামাত্র আবার ফোন বাজল।

গৃহিণী।

বলো।

ও এসেছিল আবার।

কে?

গোপাল। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।

যাচ্ছি। শরীর কেমন আছে?

মনে হচ্ছে ফুলছে আবার। নিশ্বাসের কষ্টও হচ্ছে।

ওষুধ খেয়েছ?

নাঃ, কী হবে খেয়ে?

ও-রকম কোরো না। খেয়ে নাও, কেমন? আমি যাচ্ছি সন্ধের আগেই।

আচ্ছা।

কবি ঘড়ি দেখলেন। ড. সেনগুপ্তকে আজ পাওয়া যাবে না। পরশু বসবেন। কী করা যায়। সকালের দিকে বাড়িতে ধরা যায় কাল। কোনো অজানা কারণে স্ত্রীর শরীর ফুলে যাচ্ছে ক্রমশ। সেই সঙ্গে রাগ বেড়েছে খুব। অস্থিরতাও। সেই সঙ্গে নিশ্বাসের টান ও একাধিক মেয়েলি উপসর্গ। সবটা ঠিক ঠিক জানেনও না কবি।

BanglaBook.org

জানেন না? নিজের স্ত্রীর অসুস্থতার কথা? সে কী! অপরাধীর মতো মুখ হল কবির। নিজেরই কাছে। গত পাঁচ বছর ধরে এমনই। পাঁচ বছর। পাঁচ বছর খুব কি লম্বা সময়।

কবি দেখলেন তাঁর অগ্রজ সহকর্মী শুভ্রাংশু চৌধুরী ঢুকলেন। ঢুকে নিজের সিটের দিকে না গিয়ে উলটো দিকে শ্যামলবাবুর সিটের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেল দেখো তো শ্যামল আমার ধারাবাহিকটা কি ছাপতে চলে গেছে?

শুভ্রাংশুদা, আজকেই ফার্স্ট প্রুফটা এসেছে!

দাও তো ভাই প্রুফটা একটু।

কবি জানেন শান্ত লাজুক শুভ্রাংশু চৌধুরী রেগে গেলে, অন্যমনস্ক হলে অথবা উদ্বেগে থাকলে রোজকার চেনা কাজের লোককেও ভাই বলেন। শুভ্রাংশু চৌধুরী প্রুফটা এনে তার মার্জিনে খুব খুদে খুদে অক্ষরে কিছু লিখতে লাগলেন।

ফোন বাজতে লাগল।

শুভ্রাংশু চৌধুরী কবিকে বললেন, ফোনটা একটু ধরবে ভাই?

আবার ভাই। তার মানে উদ্বেগে আছেন।

কবি ফোন ধরে বললেন, হ্যালো... হ্যাঁ... না উনি আজ আসেননি।

প্রুফ ফেরত দেবার পর কবি জিজ্ঞেস করলেন শুভ্রাংশু চৌধুরীকে, তথ্যের কোনো গোলমাল ছিল বুঝি?

শুভ্রাংশু বলেন, না না। এক জায়গায় ভাষাটা একটু কমজোর মনে হচ্ছিল কাল লেখাটা জমা দেবার পর থেকেই। যতটা পারলাম ঠিক করে দিলাম তো।

শুভ্রাংশু চৌধুরীর মুখে সেই উদ্বেগের ছাপটা এখন আর নেই। তিনি বলেন আবার, যাকগে পরে বই হবার সময় তো আবার কারেকশন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। তখন দেখে দেব।

আবার কারেকশন! এত কাল ধরে এত পাঠক জয় করে আসার পরেও এখনো এত সংশোধন করতে হয় শুভ্রাংশু চৌধুরীকে! আজীবন কারেকশন করে চলাই তাহলে লেখকের ভবিতব্য। সারা জীবন সে ভুল করবে। সারা জীবন সে সংশোধন করবে। জীবনটাই লেখকের এই। শুভ্রাংশুর ক্ষেত্রে, এই ষাট পেরিয়েও কবি একটা জিনিস দেখেছেন বার বার। তাঁর কোনো লেখা নিয়ে হয়তো উচ্ছ্বাসের বন্যা চারদিকে। লেখক চুপ করে আছেন। কিন্তু বাড়ি ফিরতে ফিরতে কবিকে নিভৃতে বলেছেন তিনি, ঠিক ঠিক হয়নি জানো? একটু অন্যভাবে লিখলে হত। আচ্ছা বইয়ের সময় দেখব। আসলে লেখকই কেবল বুঝতে পারেন, কী চেয়েছিলেন তিনি আর কী পেয়েছেন। অন্যরা সেটা বুঝতে পারেন না। ঘাতকদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তারা সবই জানে। সবই বুঝতে পারে।

আবার ফোন বাজল। অফিসে এই এক মুশকিল। এবার তুললেন শুভ্রাংশু চৌধুরী। হ্যালো বলেই বললেন, হ্যাঁ। তারপর কবির দিকে তাকালেন। 'তোমার'।

কবি ধরে বুঝলেন গৃহিণী।

শোনো, আজকের কাগজের দুয়ের পাতায় একটা বাচ্চার ছবি আছে। ছ'মাসের বাচ্চা। বাপ-মা'র সন্ধান চাইছে। এখন লিলুয়া হোমে আছে। কপালে কাজলের টিপ পরা। দেখেছ?

না।

চলো না গো, ওই বাচ্চাটিকে আমরা নিয়ে আসি। আমরা মানুষ করব।

আমি আগে বাড়ি যাই। বাড়ি গিয়ে এ নিয়ে কথা বলব।

আমি তো জানি বাড়ি এসে তুমি কী বলবে। তুমি না বলবে। না বলবে তুমি। না ছাড়া আর কী তুমি বলেছ সারা জীবন?

BanglaBook.org

আচ্ছা। এখন রাখছি!

ফোন রেখে কবি বললেন, শুভ্রাংশুদা আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি চলে যাব।

॥ ৩॥

সত্যিই একটু আগে বেরোলেন কবি। যাবার জন্য নিচে এসে দেখলেন, রিসেপশনে তাঁর চেনা একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

কী শান্তনু, কার কাছে এসেছ!

আপনার কাছেই এসেছি।

বলো কী খবর!

ছেলেটি এ-দিক ও-দিক তাকায়। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

চলো। যেতে যেতে শুনব।

রাস্তায় বেরিয়ে ছেলেটি বলে, আচ্ছা, আমার লেখা কি কিছু হয় না?

কবি তাকালেন, ছেলেটির মুখ বিপন্ন ব্যথিত দেখাচ্ছে। শেষ বিকেলের আলো পড়েছে তার করুণ সুন্দর মুখে।

কী ব্যাপার, কবি হাসলেন। কেউ বুঝি খারাপ বলেছে তোমাকে?

না, আপনি বলুন তো, কিছু হয় না, না? আপনি আমাকে স্নেহ করেন বলেই ভালো বলেন, উৎসাহ দিতে। আসলে আমার কি লেখা বন্ধ করাই উচিত?

কবি দাঁড়ালেন। চলো রাস্তার ও-পারে ওই চায়ের দোকানটায় একটু বসি। তারপর কথা বলব।

দুটো চা আর টোস্ট সামনে নিয়ে কথা শুরু হয় আবার।

তোমার লেখা সত্যিকারের ভালো কি না, আমি কি তা জানি!

মানে?

আমি যেটুকু বুঝি, তার ভিত্তিতেই ভালো বলেছি তোমাকে। কিন্তু আমার বোঝাটাই তো আর একমাত্র নয়, সর্বোচ্চ নয়। ভালোর ধারণাও তো অবিরল সংশোধিত হয়। কারেকশন হয় তার। না? সত্যিকারের ভালো যে কী তাই বুঝতেই তো জীবন কাটে। সেটাই ধরতে চেষ্টা করি আমরা। তুমি তোমার মতো করে করো। আমি আমার মত করে।

আপনি আর আমি? কত তফাৎ।

কী তফাৎ বলো তো। তুমি আমার পনেরো বছর পর লিখতে শুরু করেছ। আমি তোমার পনেরো বছর আগে শুরু করেছি। এইটুকুই তো তফাৎ। কিন্তু একই আলো-অন্ধকারের মধ্যে পথ আর দৃষ্টি খুঁজে চলেছি তো আমরা।

ছেলেটি অবাক হয়ে বলে, আপনি এই রকম বলছেন, অথচ অন্য কেই তো অন্য রকম বলে!

সেটাই স্বাস্থ্যকর। প্রত্যেক মানুষই তো আলাদা। সে তো তার মতো করেই বুঝতে চাইবে পৃথিবীকে।

আর কেউ যদি বুঝে যায় সবটাই! অন্য সকলকেই।

সে তবে জ্ঞানী।

কিন্তু জ্ঞানী বলেই কারুর অন্যকে অপমান করার অধিকার জন্মায়!

এই দেখো, তুমি কিন্তু বলছ না কী হয়েছে। কেউ নিশ্চয়ই কিছু বলেছে তোমাকে! কে বলেছে?

মাধব সেন।

কবি একটু নিভে গেলেন। কী বলেছেনি উনি?

সে-দিন অফিসে আপনাকে আমাদের 'দুর্গ' পত্রিকাটি দিতে গেলাম না!

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

BanglaBook.org

দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, সামনের সিগারেটের দোকানটার কাছে মাধব সেন আর অমল বসু। আমি বললাম, মাধবদা ভালো আছেন? পত্রিকা পেয়েছেন তো? উনি বললেন, হ্যাঁ, তা তো পেয়েছি। কিন্তু কী খবর তোমার? অ্যাঁ! তুমি চ্যানেল চেঞ্জ করেছ শুনছি। আজকাল আর আসো-টাসো না। বড়ো গাছে নৌকো বেঁধেছ? হ্যাঁ? আমি বললাম, বড়ো গাছ মানে? উনি বললেন, খুব চালাক হয়েছ, বড়ো গাছ মানে জানো না। কিন্তু লেখা তো কিছু হচ্ছে না। দুর্গ.পত্রিকায় তোমার তিনটে লেখাই খুব খারাপ হয়েছে। পড়া যায় না। এত খারাপ লিখছ কেন আজকাল?

কবি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বললে?

আমি বললাম, ভালো হয়নি বুঝি! নিজে তো বুঝতে পারিনি। তাই ছাপতে দিয়েছিলাম। তবে মাধবদা, সংকেত-এ আপনার দুটো কবিতাই খুব ভালো লেগেছে।

বাঃ, এই তো তোমার জয়।

তার মানে।

মাধব সেন নিজের রুচিতে বলেছেন ও-কথা। তুমি তোমার রুচির প্রমাণ রাখলে।

না, মানে, আমি বলছি, 'দুর্গ'য় দেবার আগে আমি তো আপনাকে দেখিয়েছি লেখাগুলো। আপনি বলেছিলেন ঠিক আছে।

ওই যে বললাম, আমার বিচারবুদ্ধি অনুযয়ী বলেছিলাম। মাথব সেনের বিচরেও যে সেটা ভালো হবে তা কি বলতে পারি!

আপনি ভালো আছেন, জিজ্ঞেস করলে কেউ যদি বলে. চ্যানেল চেঞ্জ করেছ, বড়ো গাছে নৌকো বেঁধেছ, সেটা কী-রকম।

কেন বুঝতে পারছ না, সেটা তাঁর রুচি।

বড়ো গাছ মানে কী জানেন?

কী?

আগে ওঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতাম। আজকাল আর যাই না। আপনার কাছে আসি। উনি সেই খবরটা পেয়েছেন। সেই ইঙ্গিত করছিলেন।

ব্যাস, ব্যাস। আর নয় শান্তনু, এই প্রসঙ্গে নিয়ে আর কথা বলব না আমরা।

কেন? আপনি রাগ করলেন?

না, রাগ নয়। আত্মরক্ষা। সতর্কতা। কারণ এ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের মনকে পাঁকে টেনে আনতে হবে। নিন্দা কুৎসার পাঁকে। এমনিতেই আমাদের মন, জীবন-জীবিকা নির্বাহের কারণে সব সময় পাঁকের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। অবিরল সংশোধন করে করে তাকে বাইরে আনতে হয়। উন্নয়ন করতে হয় তার। লেখার দিকে আনতে হয়। আমরা যারা লিখি, মন ছাড়া তো কোনো সম্বল নেই আমাদের, স্বেচ্ছায় কি তাকে নষ্ট করে কেউ?

তাহলে আমি কী করব?

কেউ লেখা খারাপ বললে স্বাভাবিক ভাবে নেবে। পৃথিবীর সবার তোমার লেখা ভালো লাগবে তা কখনো হয়? পাগল! আর মাধব সেনের সঙ্গে দেখা হবে, ভালো আছেন বলে সরে যাবে।

মাধব সেনদের চোখ উচ্চাশায় অন্ধ, ঈর্ষায় অন্ধ তা ঠিক, কিন্তু এত অল্পবয়েসি একটি তরুণের ওপর তার প্রয়োগ ঘটবে?

ছেলেটি অসহায়ের মতো বলে, আমি তো তাই বলেছিলাম, সেটুকুই তো মাত্র বলেছিলাম আমি।

কবি জানেন না এরপর কী বলবেন ছেলেটিকে। অপমানের আঘাতে সে ছটফট করছে। ছেলেটি বুদ্ধিমান। সান্ত্বনা দিলেও ধরতে পারে। কবি বুঝতে পারলেন না তাঁর কী বলা উচিত। তাঁরা এখন

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছেন বড়ো রাস্তার ধারে। সামনে দিয়ে ব্যস্ত সন্ধের ট্র্যাফিক ছুটে যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে। ছেলেটির মুখে পড়েছে রাস্তার হোর্ডিং-এর আলো। সে এখনই টিউশনি করতে যাবে। কী বলবেন একে। কবি নিজে কী করেছেন এ-রকম অবস্থায়? হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কবি বললেন, শোনো, যে তোমাকে যাই বলুক, তুমি বাড়ি গিয়ে সাদা কাগজের সামনে বসরে। আরেকটা কবিতা লিখবে।

মানে, এই মানসিক অবস্থায় কবিতা হয়!

তা আমি জানি না। আমি যতবার আঘাত পেয়েছি, যতবার আনন্দ পেয়েছি, সাদা কাগজের সামনে গিয়ে বসেছি। সাদা কাগজের সামনে বসলে দেখবে, সেটাই জলধারা। নিজের মুখ দেখা যায়। পৃথিবীর মুখ দেখা যায়।

যত আঘাত পাও, সাদা কাগজের সামনে গিয়ে বসো। আমি তাই বসি। আমি আর আমার কলম। এর বেশি আমি কিছু পারি না। এর বেশি আর কিছু সেখাতেও পারি না তোমাকে...।

সন্ধে একেবারে পার করে ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে বাস থেকে পথে নামলেন কবি। নামতে গিয়ে পাঞ্জাবির বোতাম ছিঁড়ল। ছাতার হ্যান্ডেল আটকে গেল লোকের জামায়, ভিড়ের মধ্যে বেধে গেল কাঁধঝোলা। লোকের তিরস্কার আর খিঁচুনি সহ্য করে অপরাধীর মতো নামতে পারলেন কবি। নিজের কাছে কবি যতই শব্দ কাগজ সাদা পাতা, সংশোধন — অহোরাত্র এই সব বলে চলুন না কেন, বাইরে তো তিনি এক জন চিঁড়েচ্যাপ্টা ভিড়ের লোক। সেখান থেকে তিনি বাঁচবেন কী করে?

কিন্তু তার থেকে বাঁচলে তিনি লিখবেনই-বা কী করে? জীবন কোথা দিয়ে আসবে তবে?

বাসস্টপ থেকে বাড়ি অনেকটা ভেতরে। মোড়ের রিকশাওয়ালারা প্রায়ই চেনা। একটা বাচ্চা ছেলে ডাকল তাঁকে, বাবু যাব? এর নাম ফুচকা।

কবি হাত নেড়ে বললেন, না। খানখন্দে ভরা রাস্তা। এতখানি ভিড়ের চাপ নেওয়ার পর এখন আর ঝকাং ঝকাং ঝাঁকুনি সইবে না। তার চেয়ে সন্ধের হাওয়ায় আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়াই ভালো।

হাঁটতে হাঁটতে কবি শুনলেন, সামনের ক্যাসেটের দোকানের বক্সে গম গম করে উঠল একটি কণ্ঠ, পেটকাটি চাঁদিয়াল...। সুমন চট্টোপাধ্যায়। অনেক বার শোনা গানটি আরেক বার কবির কানে ঢুকতে লাগল। রিকশাচালানো একটা বাচ্চা ছেলের কথা বলছে এই গান। সেই ছেলেটাও কি ওই ফুচকার মতোই সিটের ওপর এঁকেবেঁকে রিকশা চালায়? প্যাডেলে ভলো করে পা পায় না বলে? গানের মধ্যে আকাশে নানা সব ঘুড়ি উড়ছে। চালাতে চালাতে বাচ্চা ছেলেটা দেখছে। আর সওয়ারবাবুর অফিস যাওয়ার তাড়া বকুনি হয়ে ঠেলে দিচ্ছে তাকে বার বার। ঘুড়ি উড়ছে। মুক্তির ঘুড়ি তাকে খবর পাঠাচ্ছে।

কবিও প্রায়ই ফুচকার রিকশায় যান। কবিও কি কোনো দিন অমন তাড়া দেননি ফুচকাকে? দিয়েছেন, সেই সব সময়ে তিনি কবি নন। বিরক্ত প্যাসেঞ্জারবাবু মাত্র। হাজার হাজার অফিসবাবু কি প্রতি দিন অমন তাড়া দিচ্ছে না? গানটির গতি এমন যে-রিকশা চালানোর বেগ আর তাড়া খাওয়ার সভয় দ্রুততা, একই সঙ্গে ফুটে ওঠে এক চঞ্চল ছন্দে। অথচ মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। মন রেগে ওঠে।

মুক্তির ঘুড়ি তাকে খবর পাঠচ্ছে। চার মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা। চার মাত্রার এই মাত্রাবৃত্ত এখন আর সাধারণত কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু কেমন কাজ পাওয়া যায়! বাঃ!

কিন্তু কবি নিজেও তো চার মাত্রার ছন্দে লেখেননি অনেক দিন। হঠাৎ কবির মনে হল এই ফুচকাকে নিয়ে তিনিও তো লিখতে পারতেন। ও তো তাঁরও প্রতি দিনকার নিজের অভিজ্ঞতা। না। পারেননি তিনি। অপরাধীর মতো মুখ নিচু করলেন কবি নিজের কাছেই। কবি দেখতে পেলেন, গানের অচেনা সেই রিকশাবালকের মাথায় সুমন চট্টোপাধ্যায় যুক্ত করে দিয়েছেন একটি ময়ূরপাখা। কবির মনে পড়ল দু'টি লাইন, 'এই যে দেখছি আদ্যিকালের দেয়াল ফুঁড়ে/জংলা গাছের বাচ্চা খেলে

হাত পা ছুঁড়ে।' কী আশ্চর্য ছবি। কবিও তো গ্রামের কাছেই থাকতেন। কত ভাঙা পুরোনো বাড়ি, তার দেওয়ালে অশ্বত্থ বটের চারা কি তিনি দেখেননি, দেখেননি সদ্য গজানো বুনো গাছ? কিন্তু এ জিনিস তিনি পারেননি। ভাঙা দেওয়াল স্থবির। জড়। ঠিকই। গাছ সজীব, কিন্তু সে-ও তো নিশ্চল। ভাঙা কাঠের দেওয়ালের মধ্যে তার বন্দিত্ব এক ঝটকায় মুক্তি আর চলমানতা পেয়ে গেল এইখানে, 'জংলা গাছের বাচ্চা খেলে হাত-পা ছুঁড়ে।' হাত-পা ছোঁড়া একটি শিশুবর উপমায় একটি সদ্য বেরোনো গাছের চারা। তা-ও দেওয়ালের বিপরীতে। এমন অসামান্য কল্পনা কখনো হাতে আসেনি তাঁর। না তিনি পারেননি।

পারেননি তো কী হয়েছে! আরেক জন তো পেরেছেন। এক জন কবির না পারাকে সংশোধন করে নিয়েছেন আরেক জন কবি। এই তো কবির কাজ। সকলে মিলে তৈরি করে তোলা একটা মস্ত কবিতা। এইভাবেই তো ভাষা বাঁচে। কবিতা বাঁচে। কবি ভাবলেন, তখন তাঁর মনে পড়েনি। মনে পড়লে শান্তনুকে তিনি বলতেন, 'আমরা যদি এই অকালেও স্বপ্ন দেখি/কার তাতে কী!' বলতেন, তুমি আমি আমরা সবাই আমাদের সাধ্যমতো লিখি, আমাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে লিখি। আমাদের হাতে যদি মহৎ কবিতা না আসে, কার তাতে কী!

কবির মন খুশি হয়ে উঠল। কবি সন্ধের হাওয়ায় ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। তাঁর মনেও রইল না, আজ তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন সন্ধের আগেই ফিরবেন।

ঘরে ফিরে স্নানে ঢুকলেন কবি। বেরিয়ে আজ সকালের 'লোকজন' কবিতাটির সংশোধন নিয়ে আবার বসতে হবে। সংশোধন। এই এক অমোঘ প্রক্রিয়া! নিজেকে সংশোধন। নিজের কবিতাকে সংশোধন। কাটতে কাটতে সেই মুহূর্তে যা নিশ্চিত ও যোগ্য, সেই ভাষাকে খুঁজে এনে ব্যবহার করা। কিছু কাল পরেই হয়তো আর তত যোগ্য মনে হবে না, এই মুহূর্তের পক্ষে বিকল্পহীন ভাষাটাকে। পরদিনই হয়তো নতুন সংশোধন আসবে, তা আসবে হয়তো নতুন কবিতার চেহারায়। তখন আবার একই ভাবে তাকেই খুঁজতে চলা। অবিরাম কাটতে কাটতে সত্যের শতচ্ছিন্ন, তবু সত্যরূপটা এক দিন ধরা যাবে। আর আজকের পৃথিবীতে আজকের সময়ে, সত্য কী শতচ্ছিন্ন নয়? আমাদের শতচ্ছিন্ন মনের মতোই?

স্নান শেষ হল। নিজের কাছে নিজের একটা বিচার দাঁড় করাতে পেরে খানিকটা গরিমা নিয়েই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন কবি।

॥ ৪ ॥

সামনের দেওয়ালে হেলান-দিয়ে, রাতে শোবার আগে কবি 'লোকজন' কবিতাটা ঘষামাজা করছিলেন। গৃহিণী ঢুকলেন, কী, এখনো শেষ হয়নি তোমার লেখা? সারা দিনে আমার সঙ্গে একটু কথা বলবার ফুরসত তোমার হবে না? ফোনে তো বললে গিয়ে কথা বলব।

কবি মুখ তুললেন, অ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

কবির হাতে কলম। কবির চোখে লেখাপড়ার গোল চশমা। কবির কোলে লেটার প্যাড। প্যাডে আঁকিবুঁকি।

গৃহিণী বললেন, শোনো, ও আজ আবার এসেছিল। গোপাল। আজ সারা দিন দুষ্টুমি করেছে।

কবি বললেন, আজ খেতে দিয়েছিলে তো?

সে তো কখন দিয়েছি। সকালে নকুলদানা বাতাসা জল। আর দুপুরে দিয়েছি লুচি গোকুলপিঠে।

বাঃ, ভালোই তো দিয়েছ।

BanglaBook.org

গৃহিণীর চোখ-মুখ জ্বল জ্বল করে, আজ সারা দিন হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকছে। পালাচ্ছে। হঠাৎ দেখি স্কুলের ড্রেস। পিঠে ব্যাগ। পাঁচ বছরের ছেলে। এত বড়ো! ধরতে গেলাম, পালাল। ঘরে গিয়ে দেখি, নেই।

তাই নাকি?

দেখবে এসো।

রান্নাঘর আর বারান্দার মাঝখানের একটু কোণে গৃহিণীর ঠাকুর পাতা আছে। কাঠের একটা বড়ো বাক্স। সামনেটা দরজার মতো ফাঁকা। সেটাই সিংহাসন। তার মধ্যে সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা। পাথরের ছোটো শিবলিঙ্গ। আর এক পাশে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে ছোট্ট গোপাল। মাথার উষ্ণীষ। হাতে নাড়ু। গোপালের জন্য আলাদা ছোটো সিংহাসন। পেতলের। তার সামনে স্টিলের ছোটো থালা-গেলাস। গেলাসে জল। থালা দুটোর একটায় বাতাসা, অন্যটায় লুচি, গোকুলপিঠে। দু-তিনটে বড় বড় কালো পিঁপড়ে উঠেছে তাতে।

কবি নিশ্চিন্ত, ওই তো। সব ঠিকই তো আছে।

না নেই। ঠিক থাকত। ঠিক থাকতে পারত। পাঁচ বছর আগে তুমিই তো সব শেষ করে দিলে।

কবির মুখ ছাইবর্ণ ধারণা করে। কবি শক্ত হয়ে যান। বলেন, শোনো, আমার উপায় ছিল না। মানে আমাদের আর কী। উপায়...।

উপায় ছিল না? উপায় কাকে বলে?

তোমাকে তো বলেছি। আমি যা মাইনে পাই তাতে চলত না।

মেয়েটাকে হস্টেলে পাঠালাম। বুকটা খালি হয়ে গেল। সারাটা দিন আমি কী করে থাকি!

সে তো তুমিই জোর করলে। প্রত্যেক দিন আমি অফিস থেকে ফেরবার পর এক কথা, হস্টেল দেখো, হস্টেল দেখো। নইলে আমার কী সাধ্য আছে হস্টেলে রেখে পড়ানোর!

এখানে থেকে কি মানুষ হত? তুমি তো সারা দিন ওই কবিতা আর কবিতা। কবিতা হল তো একবার কারেকশন। তারপর অফিস থেকে গদ্য লেখা দিল তো বাড়ি এসে দিনের পর দিন মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকা। আর কাগজ ছেঁড়া। ও-দিকে মাইনে কাটা যাচ্ছে, তার অশান্তি। ওইটুকু মেয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে পারে! হস্টেলে দেব না তো কী করব? আমাকে এক ফোঁটা সময় দিতে না! মেয়েটাকে দেখতে না!

কবি অসহায় বোধ করেন, কী করব? আমি কি সময় পাই, বল?

অথচ কে এসে বলল, অমুক কবি আমাকে খারাপ কথা বলেছে, অমনি তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোঝানোর সময় তো ঠিক পাও। তার মনে শান্তি না দিলে যেন তোমার চলছে না।

কবি বিস্মিত। নতুন ছেলে সব। সদ্য লিখছে। আমি ওদের সাহস দেব না তো কে দেবে?

দেবে। কিন্তু নিজের বউ-মেয়েকে দেখবে না? মেয়েটাকে রোজ মারতাম পড়ার জন্য। মার খেতে খেতে একগুঁয়ে হয়ে যাচ্ছিল। এতটুকু দুটো ঘর। পাশেই বস্তি। একটু খেলার জায়গা নেই চারিদিকে। সমবয়সি একটা-দুটো সঙ্গীসাথী নেই। মানুষ হত মেয়েটা? এখানে থাকলে?

আর তোমার চাকরি? চাকরির কথাটা বললে না?

চাকরি তো ছেড়ে দিলাম। তুমিই তো চাইতে না চাকরি করি আমি। তারপর শরীরটা। শররীটা তো একটা আপদ আমার। ভেঙে পড়ল। ওই ব্যাপারটার পর আরো গেল। ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি বাচ্চাদের নিয়েই থাকতে চেয়েছিলাম। বললাম, বাড়িতে একটা ক্রেস করি। ছোটো ছোটো সব পুতুল আসবে। তাদের ধরব। খাওয়াব। ঘুম পাড়াব। পড়াব। তুমি রাজি হলে না।

BanglaBook.org

কবি আকাশ থেকে পড়লেন। তুমি কি পাগল হয়েছ? এইটুকু একখানা ঘরে ক্রেস হয় কখনো! তাদের বাবা-মা'রা রাজি হবে কেন? তাছাড়া বাড়িওয়ালা আপত্তি করত। এ ছাড়া তোমাকে চাকরি ছাড়তে তো আমি জোর করিনি। আর বাচ্চা নিয়ে থাকতেও আপত্তি করিনি।

রমণী ফুঁসে ওঠেন, আপত্তি করোনি মানে? তুমিই তো বললে, নষ্ট করো।

কবির শরীর শিউরে ওঠে, চুপ করো! চুপ! সে তো নিজেদেরটা। তোমার ওই হোম। ওই স্ট্রিট চিলেড্রেন, এ-সবে তো আমি আপত্তি করিনি কখনো।

তাহলে সারা দিন আমি কী করব বলো। যাই তাহলে আবার শিপ্রাদির কাছে?

কবির মুখ ভেঙেচুরে যায়। নিজেকে এতক্ষণের চেপে রাখা থেকে স্খলিত হন তিনি।

শিপ্রাদি? আবার? তোমার মনে নেই সেই সব অপমানের কথা! সেই সব ঠাট্টা? রাত ন'টা পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে হোমের বাজার করানো আর পরদিন সহকর্মী অন্য মেয়েদের দিয়ে তোমাকে অপমান করানো? হোমের বাচ্চা মেয়েগুলো, যাদের কথা তুমি বাড়ি এসেও রাতে শুয়েও সব সময় ভাবতে, তাদের তোমার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া। এর পিছনে ওকে লেলিয়ে দেওয়া। পরস্পরের মধ্যে সেই সব লুকোনো নিন্দে ছড়ানো। মনে পড়ে না তোমার? মনে পড়ে না অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে টাকার কথা তুলে তোমাকে ছোটো করা?

পড়ে, পড়ে। মনে পড়ে।

আর শিপ্রাদির সেই বোনের কথা মনে পড়ে না, যে নিজের ইচ্ছেমতো অফিস ছাড়ে, আর অফিসে ঢোকে, যেন সেটা তার পৈতৃক ব্যবসা, আর শাড়ি-গয়না, হিরেমুক্তর নাকছাবি নিয়ে তোমাকে খোঁচা দেওয়া মনে পড়ে না?

আঃ, আর বোলো না।

আর বাড়ি এসে দিনের পর দিন তোমার বালিশ ভেজানো, আর আমাকে লুকিয়ে যাওয়া...। তাদের কাছে আবার ফিরবে তুমি যে শিপ্রাদি তুমি চাকরি ছেড়ে দেবার পর ড্রাইভার দিয়ে তোমাকে বারবি ডল উপহার পাঠিয়েছিলেন। যেন, এরপর সমাজসেবা ছেড়ে ঘরে বসে পুতুল খেলাই তোমার কাজ হবে। আমি কি তাদের চাইতেও খারাপ! বলো, আমি কি তাদের চেয়েও নিষ্ঠুর!

চুপ করো। চুপ করো।

আর সেই দীপালি? লোপামুদ্রা? যারা তোমার এই সারল্যকে সব সময় বোকামি বলে আড়ালে হেসেছ। এমনকী সামনেও, হ্যাঁ, সামনেও, আমি আচমকা ঘরে ঢুকছিলাম বলে বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি বুঝতে পারোনি। তুমি কষ্ট পাবে ভেবে তোমাকে বলিওনি, তোমার কাছ থেকে এমনকী টাকা ধার করেছে, নিজেরা অবস্থাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও। আর সেই টাকা হল, আমার প্রকাশকের কাছ থেকে ঋণ করে নেওয়া টাকা, তুমি যখন তা ফেরত চেয়েছ, তখন চিঠি পাঠিয়েছে যে, কী টাকার কথা বলা হচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না, আর তুমি তোমাকে মিথ্যেবাদী বলা হল মনে করে দিনের পর দিন বিষাদে ভুগেছ। অফিস থেকে এসে আমি দেখেছি সারা দিন স্নানহীন অবস্থায় তুমি বসে আছ, দাঁতে কাটোনি কিছু, বলছ, দীপালি আমাকে মিথ্যেবাদী বলল? বলো, হয়নি এ-সব?

হয়েছে।

আর তুমি বাচ্চাদের সঙ্গে থাকবে বলে এর পরও, একটার পর একটা অর্গানাইজেশনে ঘুরেছ, আর ঠোক্কর খেয়ে ফিরেছে, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ্দুরে হেঁটে হেঁটে ভাঙা শরীরে ওই সব ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে আরো ভেঙে ফেলেছ নিজের শরীরটাকে। এর পরও তুমি আবার ওদের কাছে ফিরে যেতে চাও? আবারও?

এক টানে এতগুলো কথা বলে ফেলে কবি হাঁপান। ভেতরটা খালি লাগে। জিভে তেতো স্বাদ। খারাপ কথা, কুৎসিত প্রসঙ্গ বলতে ইচ্ছে হয় না। মন অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। নিজের

BanglaBook.org

স্ত্রীকে তিনি জানেন। তাঁকে বাঁচানোর জন্য, পুনশ্চ আহত হবার আগেই তাঁকে আটকানোর জন্য এগুলো মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া পথ নেই। সত্যিকারের সর্বস্বপণ করা তরুণ-তরুণীরা আছে, যারা সত্যি সত্যিই নিজেদের সবটুকু দিয়ে রাস্তার বাচ্চাদের জন্য, সবহারানো মেয়েদের জন্য কাজ করে চলেছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী গিয়ে পড়েছিলেন ভুল জায়গায়। ভুল জায়গাগুলিতে।

প্রতি-আক্রমণে তাঁর স্ত্রী কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। এইবার কথা খুঁজে পান। অথবা আপন মনেই যেন নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করতে থাকেন, আচ্ছা যাব না। যাব না তো? তা হলে... কী করব! নিজেকে নিয়ে কী করব আমি বলো? কী করব। রুনির তো বাচ্চা হয়েছে। ওকে বলব ক'দিন এসে থাকতে এখানে! আমি ওদের দেখাশুনা করতে পারব।

তোমার বোন? এখানে আসা পরের কথা, তোমার বোন তোমার সঙ্গে কথা বলবে তো? অপমান করে তাড়িয়ে দেবে না তো? পুজোর জামাকাপড় দিতে যাওয়ার সময় যেমন করেছিল? আবার তুমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়বে না তো? মনে রেখো কিন্তু, এ তোমার সেই বোন, তুমি যাকে না দেখে থাকতে পারতে না। শেষে প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে পর্যন্ত খবর নিতে। আর সে তাই নিয়ে বিদ্রুপ করত।

কবি ক্রমশই সাংসারিক হতে থাকেন। আর আরো অসহায় হতে থাকেন কবিজায়া, দিশাহারার মতো বলেন আবারও, তা হলে? আমি সারাটা দিন কী করব নিজেকে নিয়ে? ওই বাচ্চাটা, ওই বাচ্চাটা যদি থাকত...।

কবি অধৈর্য হন, আবার সেই কথা! বলছি না, যা রোজগার করি তাতে উপায় ছিল না। আরেকজনকে আনবার...।

উপায় ছিল না মানে? আমি রেড লাইট এরিয়ায় কাজ করার সময় ঘুরে দেখিনি? ওই সব মায়েরাও তাদের বাচ্চাকে বড়ো করে কি না? শুধু নিজেদেরটাই নয়, ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যাওয়া দু'দিন-তিন দিনের বাচ্চাকেও ঘরে এনে বড়ো করে ওরা। যারা লোকের বাড়ি গিয়ে কাজ করে তারাও মানুষ করে, কষ্ট করে, আর আমি? আমি পারলাম না।

কবিজায়া ভেঙে পড়েন কান্নায়। এবং কবির সমাজতাত্ত্বিক অংশটা এইবার নড়েচড়ে বসে। তাঁর বোঝানোর সত্তাটা আত্মপ্রকাশ করতে চায়। না, শোনো। তারা অন্য রকম অবস্থানে আছে। মানে অন্য রকম সামাজিক অবস্থান আর কী। যেমন-তেমন করে তারা ছেলে-মেয়ে আনতে পারে পৃথিবীতে, আমরা তো সেটা পারি না। আমাদের তো অনেক কিছু ভাবতে হয়, অনেক দায়িত্ব নিতে হয়, যেমন-তেমন ভাবে তো আর...।

থামো। নারী মাথা তোলেন। নিজের হাঁটুতে লেগে তাঁর সিঁদুর টিপ ঘষটে গেছে কপালের বাঁ-দিকটায়। তাঁর চোখে জল।

তুমি জানতে আমাদের সংসারে আরেক জন এলে তোমার ওপর চাপ পড়বে। তোমারে উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। আর তার একটাই রাস্তা। তোমাকে আরো গদ্য লিখতে হবে। এবং তাহলেই তোমার কবিতা লেখার ক্ষতি হবে বলে তুমি মনে করো। তাই তুমি বলে চললে নষ্ট করো, নষ্ট করো। বলে চললে দিনের পর দিন। হইনি, আমি রাজি হইনি, আমি দেরি করিয়ে দিচ্ছিলাম। তবু শেষকালে রাজি হলাম, রাজি হলাম আমি।

নারী আবার ভেঙে পড়েন।

কবি ধীরে ঝুঁক স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন, শোনো।

সরো। খবরদার ছোঁবে না আমাকে। কবি হবে তুমি? কবি? যে-কলমে কবিতা লেখো, সেই কলমে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখলে ডাক্তার সেনগুপ্তকে। সেই কলমে নার্সিংহোমের ফর্ম ভরতি করলে। সেই কলমে আমার কোনো ক্ষতি হলে কারো দায় নেই, এই শর্তে বন্ড সই করলে, সেই কলমে।

BanglaBook.org

হঠাৎ কী যেন খুঁজে পান কবিজায়া, ও-ই, ও-ওই তো ওটা, ওটাই তো এখন তোমার হাতে। ওটা কলম না ছুরি?

কবি শিউরে উঠে দেখলেন, তাঁর দুটো হাত রবারের দস্তানায় ঢাকা। তাঁর লেখার প্যাডটা হল ট্রে। তাতে অক্ষর নয়, নানা যন্ত্রপাতি। আর তার হাতে কলম নেই, আছে গর্ভপাত ঘটানোর ডাক্তারি অস্ত্র। তিনি ঘাতক। তিনি এক জন ঘাতক। নিজের সন্তানের ঘাতক। যাদের তিনি ঘাতক ভাবেন, তাদের চেয়েও বড়ো ঘাতক।

রমণীর চুল খুলে গেছে। তাঁর দুই গাল অশ্রুতে ভাসছে। জানলায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আলুলায়িতকেশী নারীটি তখন বলছেন, আমি সারা দিন বাড়িতে থাকি, এই দু'কামরার বদ্ধ ঘরে বন্দি থাকি, আর ওই ছেলেটা, গোপাল, সারা দিনই হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়ায়!

আমি জানি আমার পেটে গোপালই এসেছিল। ও লুচি ভালোবাসে। গোকুলপিঠে ভালোবাসে। বেগুন ভাজা। ও এসে ঠিক খেয়ে যায়। এক-একবার এক-এক রকম বয়স নিয়ে আসে। ওই খাটের ওপর ছ'মাসের বাচ্চা হতে হাত-পা ছোঁড়ে কোনো দিন। দু'বছরের ছেলে হয়ে কোনো দিন টলমল দৌড়োয় বারান্দা দিয়ে, ধুপ করে পড়ে যায়, ধবধবে সাদা জাঙিয়া, পিঠে পাউডার, পায়ের পাতা গোলাপি... আমার না-হওয়া বাচ্চাটা সারাদিন ছুটে বেড়ায় একা বাড়িতে, আমি তাকে ধরতে পারি না। আর আজ এসেছিল স্কুলের পোশাকে একেবারে পাঁচ বছরের বড় ছেলে। স্কুল যাবার জন্য তৈরি। ওই যে, ওই যে...।

কবি তাকালেন দরজায়। দরজায় এক নীল বালক। স্কুল ইউনিফর্ম। মাথায় ময়ূর পাখা।

কবি বলেন, এ কী। এ তো রাখালরাজা!

নারী বললেন, ওই তো গোপাল!

নীল বালক মিলিয়ে গেল।

নারী হাহাকার করে ওঠেন, বলো, এখন নিজেকে নিয়ে কী করব আমি! কী করব!

কবি দু'হাত একত্রিত করে মনে মনে বলে চলেন, হে রাজা! হে রুদ্র! আমার পুরুষার্থ জাগ্রত করো। পাঁচ বছরের অধিককাল, আমি নারী স্পর্শহীন। আমার মরচে পড়া শরীরে একবার পুরুষকার অবতীর্ণ হোক। এক রাত্রের জন্য আমাকে জাগাও, সন্তানার্থে জাগাও আমাকে।

এই স্তব মনে মনে উচ্চারণ করতে করতে কবি এগিয়ে গেলেন তাঁর নারীর দিকে। শেষ আশ্রয়ের মতো কবি কাঁধ আঁকড়ালেন তাঁর। আকর্ষণ করলেন নিজের প্রতি, এসো, আবার আমরা তাকে নিয়ে আসি। আমরা দু'জনে, এক সঙ্গে আবার যদি ইচ্ছে করি, সে আসবে। এসো আমাকে সাহায্য করো। তুমি আমার সহধর্মিণী, এসো মিলনধর্মে আমরা আবার সন্তানের দিকে পৌঁছই।

নারী বিদ্যুতের মতো ছিটকে সরে যান, না, তুমি ছোঁবে না আমাকে। পাঁচ বছর আমি তোমাকে ছুঁতে দিইনি। এখনো দেব না। কখনো দেব না।

কবি আহত। কিন্তু বিস্মিত হন। কেন এ-রকম করছ? এসো। আমাকে নাও। এবার আর তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব না। এবার তাকে ঘরে আনব। বড়ো করব।

হয় না। হয় না। পাঁচ বছর আগেই তোমার জানা উচিত ছিল আর হয় না।

কী জানা উচিত ছিল।

তুমি জানতে না তখন, আমার শরীরের অবস্থা কী ছিল। বলো, জানতে না?

জানতেন। কবি অন্তত এটুকু জানতেন যে, তাঁর রমণীর গর্ভস্থান কিছু ত্রুটিযুক্ত ছিল। ভ্রূণনাশের আগে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার সেনগুপ্ত।

পাঁচ বছর আগেই ডাক্তার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ওই নষ্ট করার ধাক্কায় আর কখনো কিছু হবে না। খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল তো। ও তো বড়ো হয়ে গিয়েছিল। ওর হয়তো শরীর হতে শুরু করেছিল। হাত হচ্ছিল, পা হচ্ছিল, কিন্তু শেষ হতে পারেনি। তাই বলে এখন আর হয় না। কিছুতেই হয় না।

BanglaBook.org

কবি মরিয়া হয়ে হাহাকার করলেন, হয়। হয়। একবার আমরা চেষ্টা করে দেখি।

না! নারী ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখে অশ্রু জ্বলছে। আঁচল লুটোচ্ছে প্রায়। ঠোঁট ফুলে উঠছে, মুখের রেখা ভাঙতে শুরু করেছে আটকানো কান্নায়।

না। এ তোমার কবিতা নয় যে, যতবার খুশি সংশোধন করবে কাটাছেঁড়া করবে। এটা জীবন, জীবনকে একবার দু'বার কাটাছেঁড়া করলেই তা থেকে যে-রক্ত পড়া শুরু হয় অনেক সময় তা সারা জীবন বন্ধ হয় না। আমার হয়নি, এই দেখো সারা জীবন আমার রক্ত বন্ধ হয়নি, এই দেখো, আমি তোমার কবিতা নই...। বলতে বলতে দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন নারী। পাশের খাটে তাঁর সজোরে আছড়ে পড়ার শব্দ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় ফোঁপানির শব্দ। কাটাছেঁড়া করা রক্তমাখা একটি কবিতার ফোঁপানো।

কবি আধো অন্ধকার ঘরে পশ্চিমমুখো জানলায় স্তব্ধ হয়ে আছেন বহুক্ষণ। কবির সংশোধনের তত্ত্ব আর তার গরিমা কাচের বাসনের মতো খান খান হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে আছে ঘরে। পা ফেললেই পায়ে বিঁধে যাবে সেই কাচ, এই ভয়ে কবি নড়তে পারছেন না। স্তব্ধ হয়ে আছেন বহুক্ষণ। সেই সব কাচ-টুকরো অন্ধকারের মধ্যেও ঝকঝকে প্রিজম হয়ে খণ্ড খণ্ড সব ছবি দেখাচ্ছে। তাকানো যায় না। অমীমাংসিত কলহের ছবি। দমনশীল স্বামী-ভূমিকার ছবি। বাইরে, এই তিন তলা থেকে দেখা যায় পিচ রাস্তা, তার পাশে বড়ো নর্দমা, টিউবওয়েল। আরো ও-পাশে ডাস্টবিন। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা চায়ের ঝুপড়ি দোকান। বস্তি শুরু হয়েছে ওই দোকানের দিক থেকেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে বস্তিতে রোজকার মতো হল্লা নেই। কী এক কারণে যেন সব নিস্তব্ধ। রাস্তাতেও লোক হাঁটছে না। শুধু দূরে, লেকের পাশের রেললাইনে দুটো মালগাড়ির বগি ঘটাং ঘট শব্দ তুলে ঠুকে গেল। আর সেই দূরাগত শব্দের পরই চারিদিক আরো নিঃশব্দমন্থর হয়ে এল। বোঝা গেল রাত্রি বাড়ছে।

কবি দেখলেন, চাঁদের আলোয় নর্দমা থেকে উঠে এল অদ্ভুতকার একটি প্রাণী। নজর করলে বোঝা যায় একটি অসমাপ্ত মানবশিশু। একটি বিশাল ভ্রূণ। মাথাটা অস্বাভাবিক বড়ো, কেশহীন। চ্যাপ্টা ধরনের। পায়ের দিকটা ব্যাঙাচির মতো, যেন লেজ আকারের।

অন্ধকারে ক্রমশ হাওয়ায় ভেসে টলতে টলতে সে চাঁদের আলোয় উড়তে থাকে। তার চোখ ফোটেনি। তার হাত দু'টি অসম্পূর্ণ। সেই অসম্পূর্ণ হাতের একটিতে সে কী যেন একটা আঁকড়ে আছে। কী ওটা? লম্বা মতো?

চাঁদের ময়লা আলো একটু উজ্জ্বল হয়। কবি চিনতে পারেন। অসমাপ্ত হাতে আঁকড়ানো ওটা, হ্যাঁ বাঁশিই!

BanglaBook.org

দেবল দেববর্মা

সীমামাসিকে ভুলিনি

এক

সীমন্তিনীকে এখন প্রায় ভুলে গেছি। তার কথা আর তেমন মনে নেই। এত দিন পরে ওর মুখচ্ছবিটা মনে থাকবার কথা নয়। ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে কাউকে দেখার চেষ্টা করলে সেটা যেমন

অস্পষ্ট আকার বিহীন একটা অবয়ব বলে ভ্রম হয়, সীমন্তনীকে কল্পনা করলে এখন আমার অনেকটা তেমনি দশা। ওকে যখন প্রথম দেখি তখন ওর বয়স চব্বিশ বলে শুনেছিলাম। আর আমার বয়স আরও চার বছর কম। সে-জন্যই সীমন্তিনী আমাকে মাঝে মাঝে বলত, তুই তো আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। আর তোর মাকে যখন আমি দিদি বলি, তখন তুই তো আমাকে মাসি বলে ডাকলেও পারিস। তারপর গঙ্গা দিয়ে কত জল বয়ে গেছে। ঝড়-জল, দুর্ভিক্ষ-সাইক্লোন, সুনামি-ভূমিকম্প এই পৃথিবী তো কম সহ্য করেনি। সহনশীলা ধরিত্রী হাসিমুখে সব তার অঙ্গে ধারণ করেছে। কোনও প্রতিবাদ জানায়নি।

সীমন্তিনী এখন কোথায় আছে আমি জানি না। জানবার কথাও নয়। তারপর কত বছর যে গড়িয়ে গেছে, কে তার হিসেব রেখেছে? আরও একটা কারণ, কলকাতায় সীমন্তিনীর যখন বিয়ে ঠিক হল তখন আমরা কেউ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাইনি। কারণটা সহজ। সীমন্তিনীরা আমাদের কোনও আত্মীয়-স্বজন নয়। কিছু দিনের জন্য ওরা একই শহরে আমাদের প্রতিবেশী হয়েছিল। প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ-সালাপ, ভাব-সাব সবই যে সাময়িক সেটা তো সবাই বোঝে। হয়তো জমি কিনে বাড়ি করে কেউ উঠে যায়। কেউ-বা আবার কনট্রাক্টরের বানানো ফ্ল্যাট কিনে সেখানেই বাস করে।

সীমন্তিনীরাও ওর বিয়ের পর আর বেশি দিন আমাদের প্রতিবেশী থাকেনি। ওর জামাইবাবু, যিনি ওর একমাত্র অভিভাবক তখন, তিনি কলকাতার আশেপাশে কোথায় যেন একটা আড়াই কামরার ফ্ল্যাট কিনে উঠে গেলেন। তার আগেই ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল। যে-ভাড়া বাড়িতে ওরা ছিল বিয়ে সেই বাড়িতে অবশ্য হয়নি। ওর সম্পর্কীয় এক মামা কসবার ও-পাশে কোথায় যেন একটা দো-তলা বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিলেন। তিন দিনের জন্য ভাড়া। তারপর বর-কনে বিদেয় হলে ভাড়া বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ওরা এ বাড়িতে দিন সাতেকের জন্য ফিরে এসেছিল। সীমন্তিনীর দিদি তখনই এসে বলল তারা এ বাড়িটাও ছেড়ে দিচ্ছে। তার কারণ সীমন্তিনীর জামাইবাবু এখন রানাঘাটে বদলি হয়েছেন। সামনের সপ্তাহেই সেখানে কাজে যোগ দেওয়ার কথা। ভূমি-রাজস্ব দপ্তরে একটা ছোটখাটো অফিসারের কাজ করতেন ভদ্রলোক। ফলে এই বাড়িটা এখন আর তাদের দরকার নেই। বাড়িটা যে ছেড়ে দিচ্ছেন বাড়িওয়ালাকে সেই মর্মে একটা চিঠিও দিয়ে ফেলেছেন।

আমাদের বাড়িটা আন্দুলে। বেশ খানিকটা ভিতরের দিকে। গঙ্গার ধারেও বলা যায়। শুনেছি এই বাড়িটা নাকি আমার ঠাকুরদা তৈরি করেছিলেন। শহর থেকে এত দূরে কেন যে বাড়ি করতে গেলেন সে-প্রশ্ন অনেকেই করছে। সবাই বলত, ঠাকুরদা সেকেলে লোক। গাছপালা, নদী, খালি জমি এ-সব তার প্রিয় ছিল। তাই গঙ্গার ধারে আট কাঠা জমির ওপর এই বাড়িটা উনি তৈরি করেন। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বাগান, আমগাছ ছিল আট-দশটার কম নয়। সেই সঙ্গে লিচু আর কাঁঠাল। লিচুগাছ এখন আর নেই। আমগাছ সাকুল্যে পাঁচ-ছ'টা হবে। কাঁঠাল গাছ মোটে একটা। আসলে বাবা এই জমির প্রায় অর্ধেকটা বিক্রি করে দেন। মনে হয়, সে-সময় বাবার কিছু টাকার দরকার হয়েছিল। আমার দিদির বিয়েতে সম্ভবত কিছু দেনাকর্জ হয়ে থাকবে। বিয়েটা খুব ধুমধাম করে হয়েছিল। সকাল থেকে সানাই বেজেছে। সাতখানা গাড়ি ফুল দিয়ে সাজিয়ে বর এসেছিল। ফলে খরচপত্রও বেশি হয়েছিল। দিদির বর ডাক্তারি পাশ করে আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়া হাসপাতালে সার্জন ছিল। বিয়ের পর দিদি আর জামাইবাবু এ-দেশে বড়ো একটা আসেনি। বছর পাঁচ-ছ'য় আগে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য একবার এসেছিল। সঙ্গে দুই ছেলেমেয়ে। এক জনের বয়স পাঁচ আর এক জনের তিনের কাছাকাছি। দিদি আর জামাইবাবু আসছে শুনে আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। মা ঘর ঝাড়পোঁছ শুরু করে দিল। বাবা লোক ডাকিয়ে বাইরের গাছপালা, বাগান সাফসুতরো করতে হুকুম দিল। কিন্তু দিদি আর জামাইবাবু ফিলাডেলফিয়া থেকে রওনা হবার দিন দুই আগে বাড়িতে একটা চিঠি এল। চিঠিটা দিদিই লিখেছিল। চিঠিতে লেখা ছিল, তাদের জন্য ঘরদোর পরিষ্কার, থাকাব ব্যবস্থা এ-সব কিছুই করতে

BanglaBook.org

হবে না। কারণ আমার জামাইবাবু কলকাতা থেকে অত দূরে গিয়ে থাকতে নারাজ। তার নাকি কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে এবং পিজি হাসপাতালে অনেক কাজ আছে, তাই ফিলাডেলফিয়া থেকেই তারা রাসেল স্ট্রিটের একটা ভালো হোটেলে সাত দিন থাকার জন্য বুকিং করেছে। কলকাতায় থাকার সময় দুটো এসি গাড়িও তাদের জন্য বুক করা আছে। একটা তাদের জামাই ব্যবহার করবে। আর একটা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তার হেপাজতে থাকবে।

দিদি আর জামাইবাবু এ বাড়িতে একটা রাত্তিরও থাকবে না শুনে মা আর বাবা দু'জনেই একটু মুষড়ে পড়েছিল। তবে বাবা পুরুষমানুষ। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আসলে কী জানো? ওদের এয়ার কন্ডিশন ঘরে থাকার অভ্যেস। তাছাড়া কমোড ভিন্ন ওরা কেমন করে থাকবে? তাই রাসেল স্ট্রিটের হোটেলে যে ওরা বুকিং করে আসছে সেটাই বরং ভালো হয়েছে। এখানে জোর করে থাকলে মেয়ে-জামাই আর বাচ্চা দুটোর কষ্টের সীমা থাকত না।

তবে জামাইবাবু দু-এক ঘণ্টার জন্য হলেও এ বাড়িতে এসেছিল। এই খোলামেলা জায়গায় বাড়িটা তার যে ভালো লাগেনি তা নয়। বাড়ির লাগোয়া বাগানে বড় বড় আমগাছ। এক কালে লিচুগাছও ছিল। এখন সবেধন নীলমণি একটি কাঁঠাল গাছ। তবু এ-সব হয়তো তার চোখে ভালো লাগল। আর দিদি দু-এক ঘণ্টা নয়, সমস্ত দিনটা বাপের বাড়িতে কাটিয়ে গেল। সঙ্গে এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেটার বয়স পাঁচ। ঠোঁটের ফাঁকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে। কিন্তু নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন। আমি আদর করে ভাগ্নে বলতেই সে ঠোঁট বেঁকিয়ে বিকৃত ঢং করে বলল, ইউ লুক লাইক এ ব্ল্যাক নিগার।

আমার গায়ের রঙটা অবশ্য রোদপোড়া কালো। ওর মতো ফরসা নই, তবু ওর কথা শুনে আমার খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ-ছ'বছরের একটা বাচ্চাকে এই নিয়ে কী বলা যায়? তাছাড়া দিদি আর জামাইবাবু দু'জনেই ধবধবে ফরসা বলে বাচ্চাটাও বেশ ফরসা হয়েছে। তারপর শীতের দেশ আমেরিকাতে মানুষ। তাই গায়ের রঙটাও সাহেবদের মতো সাদা হয়েছে।

দিদি আর জামাইবাবু সাত দিন থেকেই আমেরিকায় উড়ে গেল। আমাদের বাড়িতে আগে টেলিফোন ছিল না। দিদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ-বাড়িতে একটা ফোন লাগিয়ে দিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কোম্পানি কী একটা স্কিম চালু করেছে বলে অন অ্যাকাউন্ট দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে এসে মাকে বলল, এখন এই ফোন থেকে তুমি ইচ্ছে করলেই আমাকে আমেরিকাতে ফোন করতে পারবে। এর জন্য যে টাকা জমা দিয়ে গেছি তাতে পাঁচ বছর আমেরিকাতে মাসে দু-তিনবার ফোন করলেও কুলিয়ে যাবে। তারপর ফুরিয়ে গেলে ওরা আমাকেই জানাবে। আমি ফের টাকা জমা দিলেই ফোন তুলে আগের মতো কথা বলতে পারবে।

দিদি আর জামাইবাবু ফিলাডেলফিয়া চলে যাবার পর আমাদের কেমন সব ফাঁকা ফাঁকা লাগল। তবে দিদি আর জামাইবাবু কেউই তো আমাদের বাড়িতে একটা রাত্তিরও থাকেনি। রাত্তিরে মা কিংবা বাবা দিদিকে টেলিফোন করত। কখনও দিদি নিজেও মাকে টেলিফোন করত। কখনও দিদি নিজেও মাকে টেলিফোন করে নানারকম গল্পগুজব করত। বাবা হেসে বলত, এখন আর তোমার চিন্তা কীসের? মেয়ে আমেরিকাতে থাকলেই-বা কী হবে? তোমার ইচ্ছে হলেই রিসিভার তুলে ডায়াল করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। শুধু একটাই অসুবিধে, ওদের যখন রাত্তির তোমার এখানে তখন খটখটে দিন।

যাবার আগের দিন রাত্তিরে দিদি মাকে ফোন করে বলেছিল, ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের সি-অফ করতে দমদম এয়ারপোর্টে যেতে পারো। তোমার জামাই বলছিল একটা ভাড়া গাড়ি বুক করে দেবে। সে তোমাদের বাড়ি থেকে পিক-আপ করে এয়াবপোর্টে নিয়ে আসবে। আবার ফ্লাইট রওনা হয়ে

BanglaBook.org

গেলে তোমাদের ফের আন্দুলের বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে আসবে। মায়ের ইচ্ছে থাকলেও বাবা এতে রাজি হয়নি। তার বক্তব্য হল, ইন্টান্যাশনার ফ্লাইট। প্যাসেঞ্জারদের খুব কড়াকড়ির মধ্যে যেতে হয়। আর আজকাল সিকিওরিটি চেকিং এরিয়ার ভিতরে একবার ঢুকলেই তোমাকে আর বেরিয়ে আসতে দেবে না। শুধু শুধু একবার মেয়েকে চোখের দেখা দেখতে নাই-বা গেলে।

দিদি-জামাইবাবু ওদের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে চলে যাবার কয়েক দিন বাদেই আমাদের পাশের বাড়ির এক তলায় ভাড়াটে এল। এক তলাটা অনেক দিন ধরেই খালি ছিল। ওপর তলায় যার বাড়ি তিনি থাকতেন। তবে তারা বুড়োবুড়ি। নিচের তলাটা মাস দুই-তিন ধরে ফাঁকা ছিল। কলকাতা থেকে এত দূরে বলেই বোধহয় ভাড়াটে জুটছিল না। তাছাড়া বাড়িটাও বেশ একটু ভিতরের দিকে। প্রায় গঙ্গার ধারে। যাই হোক, যারা এই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এল সেই বাড়ির কর্তা ভূমি-রাজস্ব বিভাগের এক জন ছোটখাটো অফিসার। দিন তিন-চার বাদে বাড়ির গিন্নি আর এক জন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে পরিচয় করতে এলেন। মা তাদের দু'জনকেই অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে এনে বসাল। পাশের বাড়ির ভাড়াটে গিন্নি বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম দিদি। বলতে গেলে এক রকম আপনার ভরসাতেই এখানে থাকছি।

মা হেসে জানাল, ওমা, সে কী কথা? আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। এখানে কোনও ভয়-ডর নেই। তারপর তার সঙ্গী ভদ্রমহিলাকে ইঙ্গিত করে মা শুধোল, এটি বুঝি আপনার মেয়ে?

ভদ্রমহিলা এক গাল হেসে বললেন, ওমা! মেয়ে হতে যাবে কেন? ও তো আমার ছোটো বোন।

ছোট বোন? মা বিস্ময়ে থ। বলল, আপনার সঙ্গে ওর বয়সের অনেক তফাৎ বলেই তো মনে হয়।

হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা স্বীকার করলেন। বললেন, আসলে শেষ বয়সে মাকে কোন জ্যোতিষী বলে গিয়েছিল, আপনার একটি পুত্র সন্তানের যোগ আছে। সেই আশাতেই মা আবার বেশি বয়সে সন্তানসম্ভবা হন। কিন্তু ছেলে নয়, এই মুখপুড়িই মায়ের কোলে এল।

তাতে কী হয়েছে? মা সান্ত্বনা দিল। বলল, আজকাল ছেলে আর মেয়ে দুই সমান, অনেক সময় ছেলে যা না করে মেয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি মা-বাবাকে দেখে।

ভদ্রমহিলা একটা হতাশ ভঙ্গি করে বললেন, মা আর বাবা দু'জনের কেউই এখন বেঁচে নেই। ছেলে হল না বলে বাবা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিডনির গোলমাল থেকে কিছু দিন ভুগে বাবা মারা গেলেন। তারপর বছর চার বাদে মা-ও সংসারের মায়া কাটিয়ে ও-পারে চলে গেলেন।

মা জিজ্ঞেস করল, তা আপনার বোনের বয়স কত?

কত আবার? এই বছর চব্বিশ পূর্ণ হবে। কিন্তু কী জানেন, অনেক চেষ্টা করেও ওর জন্য একটি সুপাত্র জোগাড় করতে পারিনি।

তাই নাকি? তাহলে অবশ্য একটু চিন্তা থাকে। তবে আজকাল ছাব্বিশ-সাতাশ বয়সের কত মেয়ের দিব্যি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, জানেন দিদি, মা মারা যাবার পর ওই বোনটাকে আমার হাতে দিয়ে বলল, শোন নিরু, একে তুই দেখিস। তুই ছাড়া কিন্তু কেউ নেই ওর। তখন ওর বয়স পাঁচ-ছয় হবে। তা সেই থেকে আমার কাছে রেখে মানুষ করছি। বলতে নেই, আমার কর্তার এই বিষয়ে একটুও অমত হয়নি। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকবার পর ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি শুনে উনি বললেন, ঠিক কাজই করেছ। ওই একরত্তি মেয়ে, আমারা না দেখলে ও কোথায় যাবে?

মা বলল, তা সেই থেকে আপনার বোন আপনাদের সঙ্গেই আছে?

হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা সাহ্লাদে জবাব দিলেন। বললেন, তবে বোন আমার খুব বুদ্ধিমতি মেয়ে। বছর দুই আগে বাংলা নিয়ে এমএ পাশ করেছে। সেকেন্ডে ক্লাসের ওপরের দিকেই নাম ছিল ওর। চাকরির

BanglaBook.org

চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। আর আজকাল জানেন তো, পার্টির লোক না হলে চাকরি হয় না। এমএ পাশ করে স্কুল মাস্টারির জন্য কী একটা পরীক্ষা দিল। তাতে পাশও করল। কিন্তু পার্টির লোক নয় বলে ওর কপালে আর চাকরির চিঠি এসে পৌঁছল না।

মা বলল, অত চিন্তা কোরো না ভাই। দেখবে ঠিক সময়ে এর পাত্র এসে আপনিই হাজির হবে।

ভদ্রমহিলা বললেন, সেই আশাতেই তো আমরা দিন গুনছি দিদি।। গায়ের রঙটা একটু চাপা বলে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। নইলে আমার বোন বলে বলছি না, যার বাড়িতেই ও যাবে, সব দিক বজায় রেখে ও ঠিক মানিয়ে নেবে।

ঠিক এই সময় আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই মা বলল, এই যে নীলু। তারপর ইঙ্গিত করে সীমন্তিনীকে দেখিয়ে বলল, এই মেয়েটি সম্পর্কে তোর মাসি হয়। আমাদের পাশের বাড়িতে ওরা ভাড়াটে হয়ে এসেছে। এখানে বসে আমাদের গিন্নিদের গল্প ও আর কী শুনবে? তার চেয়ে ওকে বরং তোর পড়ার ঘরে নিয়ে যা। সেখানে দু'জনে বসে পড়াশুনো নিয়ে আলোচনা কর। আর সীমন্তিনী বাংলায় এমএ পাশ করেছে। এখন একটা চাকরির চেষ্টায় আছে।

ওকে সঙ্গে নিয়ে আমার পড়ার ঘরে চলে এলাম। একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, বসুন আপনি।

সীমন্তিনী বলল, আপনি নয়। আমাকে তুমি বলবে। আর তোমার মা আমাকে মাসি বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন, তবে ইচ্ছে করলে আমাকে দিদিও বলতে পারো। যেমন সীমাদি কিংবা সীমামাসি, যেটা তোমার ইচ্ছে।

ওকে শুধোলাম, আপনি তো এমএ পাশ?

ফের আপনি? সীমামাসি আমাকে একটা ছোট্ট ধমক দিল। বলল, তোমার বয়স কত?

কুড়ি বছর হবে।

কী পড়ো?

শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে বিএ ক্লাসে ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়ছি। এ বছর পার্ট-টু দেব।

তাই নাকি? তাহলে তো সামনের বছর এমএ ক্লাসে ভরতি হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যদি রেজাল্ট ভালো হয় তবেই।

কেন? এত হতাশা কীসের? সীমামাসি জিজ্ঞেস করল, বলল, পার্ট ওয়ানে কী-রকম নম্বর পেয়েছিলে?

প্রায় সাতচল্লিশ পারসেন্ট।

নট ব্যাড। সীমামাসি মন্তব্য করল। শেষে বলল, যদি পার্ট-টুতে আর একটু ভালো করতে পারো তাহলে অ্যাভারেজ ফিফটি পারসেন্ট পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

সীমামাসি বলল, আমার অবশ্য বাংলায় অনার্স ছিল না। তবে তার জন্য এমএ ক্লাসে ভরতি হতে কোনও অসুবিধে হয়নি। রেজাল্ট খুব একটা খারাপ নয়। সেকেন্ড ক্লাসে পঞ্চাশের মধ্যে পাই।

তা এই রেজাল্ট নিয়ে কলেজে কিংবা স্কুলে চাকরির চেষ্টা করোনি?

কেন করব না? তবে কলেজ সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিইনি। শুনেছি কলেজের প্রফেসরি পেতে হলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট ছাড়াও এমফিল থাকা খুব প্রয়োজনীয়। আর এসএসসি-তে বসেছিলাম। পাশও করেছি। কিন্তু কই, চাকরির চিঠি তো আমার নামে এল না। খোঁজখবর করেছিলাম। এর-ওর মুখে শুনলাম পার্টি থেকে একটা রেকমেন্ডেশন না থাকলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। তারপর থেকে সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরে বসে আছি।

ওকে বললাম, আমার দিদি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় থাকে। জামাইবাবু ডাক্তার। ওখানকার হাসপাতালে সার্জন।

BanglaBook.org

তাহলে আর তোমার চিন্তা কীসের? বিএ পাশ করে দিদির কাছে আমেরিকায় চলে যাবে। সেখানে তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

নাঃ, দিদিকে সে-কথা বলেছিলাম। কিন্তু দিদি নেতিবাচক উত্তর দিল। বলল, তুই আমেরিকায় চলে গেলে মা-বাবাকে কে দেখবে? বাবার বয়স তো এর মধ্যেই ষাট পেরিয়ে গেছে। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো নেই। যে-কোনও দিন একটা বড়ো অসুখ করতে পারে। তখন?

সীমামাসি বলল, কিন্তু ধরো, তুমি যদি বাইরে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে কোথাও ভালো চাকরি পেয়ে চলে যাও?

বললাম, এ-সব কথা দিদির সঙ্গে হয়নি। তবে এর উত্তর না দিয়ে দিদি আমাকে অন্য অনেক কথা বলল।

আবার কী কথা?

দিদি বলল, আমেরিকা দেশটাকে দূর থেকে যে-রকম মনে হয়, সেখানে গিয়ে থাকলে তোর কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হবে। যেমন ধর রুটিন মাফিক কাজ। উইক-এন্ডে এ-দিক সে-দিক বেড়াতে যাওয়া। আর মাইনে যা পাবি সেটা ফ্যাট স্যালারি নিশ্চয়। তবে তার থেকে ট্যাক্স, ইনসিওরেন্স, নানা ধরনের ইনস্টলমেন্ট আর ইনটারেস্ট দিয়ে যেটা থাকবে সেটা তোর এই ফ্যাট স্যালারির একটা অংশ মাত্র।

সীমামাসি বলল, এমএ-তে ভালো রেজাল্ট করতে পারলে তুমি কলেজেও ঢুকে যেতে পারবে। আজকাল কলেজের টিচারদের মাইনে কম নয়। রীতিমতো লুক্রেটিভ। তবে ওই যে একটু আগে বললাম, কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে যাবার আগে এমফিলটা করে রাখতে পারলেই ভালো। তুমি এর জন্য চেষ্টা করবে।

পাশের ঘর থেকে সীমন্তিনী মাসির দিদি বলল, এবার আমরা উঠব। তুই এ-দিকে চলে আয় সীমা। যাবার আগে ওর দিদি আমার মাকে বলল, এক দিন আমাদের বাড়িতে আসবেন কিন্তু। আমরা আশা করে থাকব।

দুই

সীমন্তিনী মাসির সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। সেটা ঠিক মাসি-বোনপোর সম্পর্ক কিংবা পাতানো ভাই-বোনের সম্পর্ক নয়। আসলে মাস খানেকের মধ্যেই সীমামাসির সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। বিকেলের দিকে অথবা কখনও সন্ধের পর সীমামাসি আমাদের বাড়িতে চলে আসত। মায়ের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলত। তারপর আমি কলেজ থেকে ফিরলে আমার পড়ার ঘরে এসে কলেজে কী পড়ানো হচ্ছে তাই নিয়ে দু-চারটে প্রশ্ন করত। কখনও বাংলা নিয়ে তার মতামত আমাকে জানাত। আর সীমামাসি যখন বাংলার এমএ তখন বিএ-তে যা বাংলা পড়ানো হয় তাই নিয়ে মতামত দেবার অধিকার নিশ্চয় তার ছিল।

সীমামাসি চলে গেলে মা এক-এক দিন বলত, মেয়েটার আর বিয়ে হবে কি না কে জানে? এখনই মুখটা কেমন পাকাটে হয়ে গেছে। নরম-সরম ভাব নেই। ওর দিদি বলে সীমার বয়স চব্বিশ শুরু হয়েছে। কিন্তু আমার তো মনে হয় ও ছাব্বিশ পেরিয়ে সাতাশে পা রেখেছে। মা যাই বলুক, আমার কিন্তু মনে হত সীমামাসি দেখতে এমন কিছু ছি-ছি করার মতো নয়। মুখে এক-দুটো ব্রণের দাগ অবশ্য রয়ে গেছে। খুঁজলে দু-একটা মেচেতার চিহ্নও পাওয়া যাবে। নইলে সীমামাসির চুল কিছু কম নয়। আর হাসলে এখনও ওকে বেশ সুন্দর দেখায়। দোষের মধ্যে সীমামাসি তেমন লম্বা নয়। বরং একটু খাটো বলা চলে। কিন্তু বাঙালি মেয়েরা পাঁচ ফুট দু-ইঞ্চি হলেই তো যথেষ্ট লম্বা মনে করে।

সীমামাসি বলেছিল তার দুটো টিউশনি আছে। একটা শিবপুরে। সেই ছাত্রীটাকে ক্লাস সেভেনের ইংরেজি, বাংলা পড়াতে হত। সপ্তাহে দু'দিন। তার জন্য সীমামাসি দুশো টাকা মাইনে পেত। আর

BanglaBook.org

একটি ছাত্র, অবশ্যই ছেলে। সে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। সপ্তাহে এক দিন তাকে দু'ঘণ্টা বাংলা পড়াতে হত। ছেলেটি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ত বলে বাংলায় খুব কাঁচা ছিল। এই ছেলেটির অভিভাবক তাকে দেড়শো টাকা মাইনে দিতেন। ফলে মাস ফুরোলেই সীমামাসির হাতে করকরে সাড়ে তিনশো টাকা এসে যেত। এ-রকম একটা নিশ্চিত আয় ছিল বলে হাতখরচ নিয়ে সীমামাসিকে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি।

এক দিন কলেজ-ফেরত বাড়ি আসছি। কী একটা কারণে আমাদের রুটের বাস বন্ধ ছিল বলে আন্দুল-মৌরী রোডের বাস থেকে নেমে হেঁটেই ফিরছিলাম। হঠাৎ নাজিরগঞ্জের মোড়ের কাছে দেখলাম আমার খানিকটা আগে সীমামাসি যাচ্ছে। পিছন থেকে ডাকলাম, সীমামাসি, আমি নীলেশ।

আমার গলা শুনে সীমামাসি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। এক গাল হেসে বলল, তুমি এখানে?

কী করব? দুঃখ করে বললাম, আন্দুল-মৌরী বাসে উঠে শুনলাম, আমাদের রুটের বাস বন্ধ। তাই মোড়ে নেমে হাঁটতে হচ্ছে।

আমারও তো সেই অবস্থা। রুটের বাস নেই শুনে অগত্যা পা দুটোই ভরসা।

কিন্তু এতখানি পথ কি তুমি হেঁটে যেতে পারবে সীমামাসি?

অন্য আর কী উপায় আছে বলো? টিউশনি সেরে ফিরছিলাম। বাস নেই, তাই হাঁটছি।

যাবার সময় তো বাস পেয়েছিলে?

হ্যাঁ। তারপর হঠাৎ কন্ডাক্টরের সঙ্গে প্যাসেঞ্জারের কী নিয়ে বচসা, মারামারি। তার পরই ওরা নাকি রুট থেকে বাস তুলে নিয়েছে।

হঠাৎ একটা খালি রিকশো উলটো দিক থেকে আসছে দেখে সীমামাসি তাকে হাত বাড়িয়ে থামতে ইঙ্গিত করল। শুধোল, আমাদের নারায়ণগঞ্জের পোল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে?

লোকটা রাজি হল। কিন্তু পনেরো টাকা ভাড়া লাগবে।

অত! সীমামাসি একটা অসহায় ভঙ্গি করল।

লোকটা বলল, আপনারা দু'জনে বাসে করে গেলেও তো দশ টাকা লাগত দিদি।

অকাট্য যুক্তি। তবু আমি বললাম, এতখানি পথ তো আমরা হেঁটে এসেছি। আন্দুল-মৌরী মোড় থেকে এই রাস্তাটাও তো কম নয়।

লোকটা হেসে বলল, ঠিক আছে। তাহলে বারো টাকা দেবেন।

সীমামাসি আর কথা না বাড়িয়ে রিকশোতে উঠে বসল। আমাকে বলল, বোসো আমার পাশে।

এতখানি পথ হেঁটে আমার পা দুটো একটু টন টন করছিল। সীমামাসিকে বললাম, তোমার নিশ্চয় এই পথটা হেঁটে আসতে কষ্ট হয়েছে? মাইল খানেক তো নিশ্চয় হবে।

সত্যি। আর পারছিলাম না। ভাগ্যিস খালি রিকশোটা পেলাম। নইলে কী যে হত!

কিন্তু নারায়ণগঞ্জে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ তড়বড়ে বৃষ্টি নেমে এল। শেষ শরতের বৃষ্টি যেমন হয়। এই আছে আবার এই নেই। রিকশোওয়ালাটা গাড়ি থামিয়ে সামনের ওয়াটারপ্রুফ পর্দাটা টেনে দিল। নিজে মাথায় একটা প্লাস্টিকের টুপি পরে ফের সিটে উঠে বসল। পিছন ফিরে তাকিয়ে শুধু বলল, আর বেশি দূর নয়। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

হঠাৎ সীমামাসি আমার হাতে-গলায় আঙুল রেখে বলল, কী তাড়াতাড়ি বৃষ্টি এল, তাই না? এরই মধ্যে তুই কিন্তু ভিজে গিয়েছিস। আমার চোখে দৃষ্টি রেখে সীমামাসি ফের বলল, শোন। এখন থেকে আর তুমি বলব না। তুই বললে কি আপত্তি হবে তোর?

আপত্তি হবে কেন? তুই বললে কিছু মনে করব না।

BanglaBook.org

রিকশোর ঘেরাটোপেব মধ্যে সীমামাসি এবার আমার জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে, আমার গায়ে ওর নরম আঙুলগুলো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বলল, ইশ। তুই তো বেশ ভিজে গিয়েছিস। বাড়ি গিয়ে জামাটা খুলে ফেলবি কিন্তু। নইলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

আমার সমস্ত শরীরটা শির শির করছিল। সাতাশ কিংবা ছাব্বিশ যাই হোক এই বয়সের অনাত্মীয় নারীর সঙ্গে রিকশোর ঘেরাটোপের মধ্যে বসে এতখানি পথ যাওয়া আমার জীবনের এক বিচিত্র অনুভূতি। এক-একবার ইচ্ছে করছিল ডান হাতটা বাড়িয়ে ওকে একটু জড়িয়ে ধরি। সীমামাসি হয়তো আপত্তি করত। নিজেকে ছাড়িয়ে নিত। তারপর রাগ করে রিকশো থেকে নেমে যেতেও পারত। কিন্তু সীমামাসি এ-সব কিছুই করেনি। অবশ্য আমিও ওকে জড়িয়ে ধরবার কিংবা উত্ত্যক্ত করবার চেষ্টা করিনি। তবে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে আমি ওর ডান হাতটা ধরে প্রথমে ওর আঙুলগুলো আমার মুঠির মধ্যে টেনে নিয়ে তারপর ইচ্ছে করেই ওর বাহুমূল পর্যন্ত স্পর্শ করলাম। বললাম, ইশ! তুমিও তো বেশ ভিজে গিয়েছ দেখছি।

ছাড় আমাকে। সীমামাসি বলল, তোর হাতের আঙুলগুলো বেশ শক্ত দেখছি।

তোমার লাগল নাকি?

নাঃ। ছাড়, তুই একটা গোঁয়ার।

ইতিমধ্যে রিকশো নারায়ণগঞ্জের পোলে পৌঁছে গেছে। বৃষ্টিও নেই। ফটফটে নীল আকাশ। রিকশো থেকে সীমামাসি নামতেই বললাম, এখানে নামলে কেন? বাড়ি পর্যন্ত রিকশোটাকে নিয়ে গেলেই পারতে।

নাঃ। সীমামাসি জোরের সঙ্গে নেতিবাচক উত্তর দিল।

বাড়ি পৌঁছতেই মা বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে এলি কেমন করে?

কই, ও-দিকে তো তেমন বৃষ্টি হয়নি।

সে কী রে? জামায় হাত দিয়ে মা বলল, তুই তো বেশ ভিজেও গিয়েছিস দেখছি।

না মানে, বৃষ্টি আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়ির চালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু তার আগেই যা ভেজার ভিজে গিয়েছি।

তারপর? তুই বৃষ্টি থামলে চলে এলি?

নাঃ, ঠিক তা নয়। বৃষ্টি কমতেই দেখলাম একটা রিকশো যাচ্ছে। এক জন ভদ্রলোক সেটাতে বসে। রিকশোওয়ালা আমাকে শুধোল, যাবেন কোথায়?

বললাম, নারায়ণগঞ্জের পোল পর্যন্ত।

রিকশোওয়ালা অন্য যাত্রীর অনুমতি নিয়ে বলল, ঠিক আছে। আপনি উঠে বসতে পারেন। তবে তিন টাকা লাগবে। বাধ্য হয়ে ওর কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তাই তো বেশি না ভিজে বাড়ি পৌঁছে গেছি। মা বলল, বেশ করেছিস। এতে বরং ভালোই হল, ভিজে একশা হয়ে বাড়ি এলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বরজারি হতে পারত।

সন্ধের পর সীমামাসি অন্য দিনের মতো আমাদের বাড়িতে চলে এল। আমার ঘরে ঢুকে শুধোল, কী রে, আজ কলেজে গিয়েছিল নাকি?

হ্যাঁ। কলেজ তো খোলা। না গেলে ক্লাস কামাই হত।

সীমামাসি শুধোল, বৃষ্টিতে ভিজিসনি তো?

আমার মনে হচ্ছিল মেয়েরা এমন ন্যাকা সাজতে পারে, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। দিব্যি আমাকে পাশে বসিয়ে নারায়ণগঞ্জের পোল পর্যন্ত দু'জনে এলাম। আর এখন কিনা আমাকেই বৃষ্টিতে ভিজেছি, তাই জিজ্ঞেস করছে?

BanglaBook.org

মা বোধহয় কাছাকাছি কোথাও ছিল। আমাদের কথা শুনে কাছে এসে বলল, নীলেশ আজ খুব ভিজেছে, বুঝলে সীমা? তবে খানিকটা পরে কে এক জন রিকশো করে যাচ্ছিল, সেই রিকশোতে তিন টাকা দিয়ে নারায়ণগঞ্জের পোলে এসে নেমেছে। তখন অবশ্যও বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

মা ঘর থেকে চলে যেতেই সীমামাসি বলল, এই তো দিব্যি গুলতাপ্পি মারতে শিখেছিস। শুনে তো মনে হল দিদি তোর কথা আগাগোড়া বিশ্বাস করে বসে আছে।

সীমামাসিকে শুধোলাম, তোমাকে মা কিছু জিজ্ঞেস করেনি? বৃষ্টির সময় কোথায় ছিলে?

জিজ্ঞেস করেছিল বৈ কী, তার উত্তরে আমি তো বলেছি, বৃষ্টি শুরু হবার অনেক আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছি।

কয়েক দিন বাদে সীমামাসি হঠাৎ আমাকে শুধোল, শনিবার তোর কলেজ আছে নাকি?

নাঃ। কলেজের ফাউন্ডেশন ডে না কী যেন। সে-জন্য ছুটি।

তাহলে বিকেল তিনটে নাগাদ মেট্রো সিনেমার কাছে আসতে পারবি?

কেন? সেখানে কী দরকার?

দরকার যাই থাক, তুই আসতে পারবি কি না তাই বল।

তা আসতে পারি। তিনটের মধ্যে হলেই চলবে তো?

হ্যাঁ। তবে তার বেশি দেরি যেন না হয়।

কিন্তু সেখানে কী জন্য যাব, সেটা বলবে তো?

এ-দিন সে-দিক তাকিয়ে সীমামাসি বলল, মেট্রোতে একটা ভালো ফিল্ম এসেছে। পুরোনো বই, অথচ আমার দেখা হয়নি। স্টারিং গ্রেগরি পেক আর অড্রে হেপবার্ন। ফিল্মটার নাম রোমান হলিডে।

আমি সহর্ষে বললাম, দারুণ বই! শুনেছি গ্রেগরি পেকের দারুণ অ্যাক্টিং। নিশ্চয় যাব।

তুই বোধহয় ছবিটা আগে দেখিসনি?

নাঃ।

সীমামাসি বলল, আসলে কী জানিস? এ-সব ছবি-টবি একা দেখতে ভালো লাগে না। কেউ পাশে না থাকলে কেমন যেন লোনলি ফিল করি।

হ্যাঁ, সেটা ঠিক। তা কী করবে বলো? তোমার তো এখনও বিয়ে হয়নি। তুমি ম্যারেড হলে তোমার হাজব্যান্ড সঙ্গে যেত।

হল থেকে বেরিয়ে বললাম, ওয়ান্ডারফুল ছবি। তাই না সীমামাসি? শেষ দৃশ্যে গ্রেগরি পেক যখন রানির সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসছে তখন ওর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন একটা বিষণ্ণ সুর বাজছিল। যা নাকি মনকে স্পর্শ করে।

সীমামাসি বলল, চল, কাফে-ডি-মনিকোতে বসে দু'জনে দুটো ফিশফ্রাই খাই। কখন বেরিয়েছি বল, তাই না?

সে-জন্যই খিদে পেয়ে গেছে।

মেট্রো সিনেমার পাশে কাফে-ডি-মনিকো। আমি আগে কখনও সেখানে যাইনি। একটা ছোট টেবিল দেখে দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াতেই সীমামাসি অর্ডার দিল, দুটো চা আর দুটো ফিশফ্রাই।

চা নিশ্চয় পরে খাবেন? বেয়ারা শুধোল।

হ্যাঁ। ফিশফ্রাই আগে।

গরম মুচমুচে ফিশফ্রাই। চামচের সাহায্যে একটু ভেঙে নিয়ে মুখে দিতেই বললাম, টেস্টটা বেশ ভালো।

BanglaBook.org

সীমামাসি ফিশফ্রাইটা একটু ভেঙে এক নজর তাকিয়ে বলল, মাছটা ধবধবে সাদা নয়। তার মানে ভালো জাতের ভেটকি বলতে পারব না। এ-সব রেস্তোরাঁয় যা হয়। শুনেছি আরও ছোটখাটো রেস্তোরাঁতে ভেটকি মাছ বলে শোল মাছও চালিয়ে দেয়।

ফিশফ্রাইয়ের পর চায়ের কাপে চুমুক।

বললাম, সীমামাসি, তোমার কিন্তু আজ অনেক খরচ হয়ে গেল।

তাতে কী হয়েছে? একটা টিউশনির টাকা আজ পেয়েছিলাম। তার থেকেই খরচ করলাম। তোর এত চিন্তা কীসের?

রেস্তোরাঁ থেকে সীমামাসি বলল, দু'জনের কিন্তু এক সঙ্গে বাড়ি ফেরা ঠিক হবে না। তুই যেমন একা এসেছিলি তেমনি একাই চলে যা।

আর তুমি?

আমি এ-দিক সে-দিক একটু ঘুরে আধ ঘণ্টা বাদে বাড়ি পৌঁছব।

আমি বললাম, দু'জনে এক সঙ্গে ফিরলে কী হয়? আমি যখন তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

তুই ও-সব বুঝবি না। বয়স বিচার করে কি মেয়ে-পুরুষের ভালোবাসা হয়? আমার এক বন্ধু আছে তার স্বামী বয়সে ওর চেয়ে আড়াই বছরের ছোট। কিন্তু দু'জনে দিব্যি ঘরসংসার করছে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হয়েছে। বয়সের একটু ফারক আছে বলে তো কিছু আটকায়নি। তবে এখন ব্যাপারটা সবাই মেনে নিয়েছে।

তাহলে? তুমি এত ভাবনা-চিন্তা করছ কেন?

তার কারণ মানুষের মন বড় ছোট। খুব সন্দেহপ্রবণ। দু'জনকে এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে নানা ধরনের কেচ্ছা রটিয়ে বেড়াবে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি চুপ করে গেলাম। আর কোনও প্রশ্ন করলাম না।

সীমামাসি বরং বলল, তোকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে সন্ধে পর্যন্ত কোথায় ছিলি তাহলে যা হোক কিছু বানিয়ে বলে দিস। তবে সেটা যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

তিন

সীমামাসির সঙ্গে হঠাৎ এক দিন একটা ব্যাপারে ঘটে গেল। কোথায় যেন মায়ের একটা নেমন্তন্ন ছিল। সাধভক্ষণ কিংবা ওই ধরনের কিছু। যারা নেমন্তন্ন করতে এসেছিল তারা সীমামাসির দিদি এবং সীমামাসিকেও যেতে বলে গেল। এমনিতে সীমামাসিদের নেমন্তন্ন করার কথা নয়। কিন্তু মা ওদের সঙ্গে সীমামাসির দিদির পরিচয় করিয়ে দিতেই মায়ের সেই বন্ধু ওদের দু'জনকেও নিমন্ত্রণ করল। মেয়েদের এই সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানে শুধু মেয়েরাই নিমন্ত্রিত হয়। তা-ও যারা ইতিমধ্যে জননী অর্থাৎ যাদের কোলে ছেলে বা মেয়ে এসেছে তাদেরই বিশেষ করে নিমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে।

নিমন্ত্রণ সেরে ভদ্রমহিলা চলে যাবার পরই সীমামাসি কিন্তু বেঁকে বসল। বলল, এই নিমন্ত্রণ রাখতে আমি কিন্তু যেতে পারব না। ইচ্ছে থাকলে দিদি তুমি বরং একা যাও।

কেন, তোর যেতে অসুবিধে কীসের?

আশ্চর্য! এই অনুষ্ঠানে আমার যাবার অধিকার আছে? সীমামাসি প্রায় প্রতিবাদ জানাল। বলল, আমার কি বিয়ে হয়েছে?

সীমামাসির দিদি বোধহয় ওর আপত্তির কারণটা বুঝল। সন্তানবতী না হলেও অন্তত সধবা মেয়ে ভিন্ন এই সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানে যাওয়া নিতান্ত বেমানান। তাই ওর দিদি বলল, ঠিক আছে, আমি নীলেশের মায়ের সঙ্গে একাই যাচ্ছি।

BanglaBook.org

সন্ধের মুখে মা ওই ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এই বাড়িতে আমি একাই রইলাম। বাবা তাস খেলে রাত ন'টার আগে কোনও দিন বাড়ি ফেরে না। সীমামাসিদের বাড়িতে সীমামাসিও একাই ছিল। ওর জামাইবাবুরও কলকাতার কোন অফিস থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত্তির হয়ে যায়।

যাবার সময় মা সীমামাসিকে ডেকে বলে গেল, সীমা শোনো, যদি হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামে তাহলে তুমি একবার কষ্ট করে এ বাড়িতে এসে জানলা-কপাট সব বন্ধ করে দিয়ে যেও। নীলেশকে বলে লাভ নেই। ও দিব্যি ভুলে যাবে। আর আমি এসে দেখব বিছানায় জল সপ সপ করছে।

আমি আপত্তি করলাম, ইস। তুমি কী ভাবো আমাকে মা?

জোরে বৃষ্টি হলে জানলার কপাট বন্ধ করার কথা আমার মনে থাকবে না?

সীমামাসি এগিয়ে এসে বলল, আপনি নিশ্চিন্তে নেমন্তন্ন রাখতে চলে যান দিদি। তেমন বৃষ্টি হলে আমি নিশ্চয় ঘরের জানলা-কপাট সব বন্ধ করে দিয়ে যাব।

মায়ের আশঙ্কা কিন্তু অমূলক হয়নি। সাড়ে সাতটা বাজবার পরই মেঘের গুড় গুড় গর্জন শুরু হল। তার পরই বৃষ্টি। প্রথমে ছিটেফোঁটা, তার পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সীমামাসি দৌড়ে এসে ঘরের জানলা-কপাট সব বন্ধ করে দিল। আমি একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ওকে বসতে বললাম। কিন্তু মিনিট দু-তিন পরেই কারেন্ট চলে গেল। এ-সব অঞ্চলে ভারি বৃষ্টি হলে কারেন্ট অফ করে দেয়। নইলে যদি বাজ পড়ে লাইনের ক্ষতি করে।

সীমামাসি বলল, একটা মোমবাতি-টাতি কিছু নেই? আর দেশলাই? কী অন্ধকার!

আছে সবই। আমি বললাম, দাঁড়াও খুঁজে দেখছি।

সীমামাসি কখন উঠে দাঁড়িয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি। আচমকা দু'জনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগতেই সীমামাসি পড়ে যাচ্ছিল। আর সেই মুহূর্তে দু'হাত বাড়িয়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। ততক্ষণে আমার শিরা-উপশিরায় দ্রুত রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই জানলার ফাঁক দিয়ে আমি বিছানাটা দেখতে পেলাম। সীমামাসিকে বিছানায় শুইয়ে দিতে সে কিন্তু কোনও আপত্তি করল না। পরমুহূর্তেই আমি পাগলের মতো ওর নরম ওষ্ঠে, গালে, গলায় চুমু খেতে শুরু করলাম। সীমামাসি আসঙ্গলিপ্সাজনিত কেমন একটা সুখানুভূতিতে মুখ দিয়ে বিচিত্র সব ধ্বনি ছাড়ছিল। খানিকক্ষণ পরে সীমামাসি বেশ জোর গলায় বলল, এবার ছাড় আমাকে।

ছাড়ব কেন? বাকিটা শেষ করতে দাও।

নাঃ। তুই কী করতে চাস সেটা আমি বুঝতে পারছি।

তাহলে?

এতে কী হতে পারে জানিস?

কী?

মেয়েরা পোয়াতি হয়ে যায়। তখন তুই কেমন করে মুখ দেখাবি? লজ্জায় শহর ছেড়ে কোথায় পালাবি?

এরপর সীমামাসিকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই আর মোমবাতি বের করে আলো জ্বাললাম। সীমামাসি মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে শুধোল, তোর কাছে কন্ডোম নেই?

কন্ডোম কথাটা জানতাম। কিন্তু তার ব্যবহার তখনও জানা ছিল না।

সীমামাসি বলল, দুটো কন্ডোম কাছে রেখে দিস।

দুটো কেন? আমি অবুঝের মতো প্রশ্ন করলাম।

BanglaBook.org

ন্যাকা! সীমামাসি ব্যঙ্গ কবে বলল, একটাতে যদি তোর ইচ্ছে না মেটে?

ইতিমধ্যে বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। সীমামাসি বিছানা থেকে উঠে জানলা-কপাট সব খুলে দিল। আমার শোবার বিছানাটা কুঁচকে লেপটে গিয়েছিল। সীমামাসি সেটাকে টেনেটুনে স্বাভাবিক করল। বালিশটাকে চাপ দিয়ে একটু ফুলিয়ে মাথার কাছে রাখল। তার ওপর তোয়ালেটা বিছিয়ে দিল। যেন এর আগে কেউ এটা ব্যবহার করেনি।

আমার দিকে তাকিয়ে সীমামাসি বলল, অ্যাই, এবার আমি যাচ্ছি। দিদির আসার সময় হল।

এক মিনিট দাঁড়াও।

সীমামাসি দাঁড়াতেই আমি কাছে গিয়ে ওকে একটা চুমু খেলাম।

সে বলল, এক দিনেই সব ফসকে যাবে ভেবেছিস? অপেক্ষা কর। সবুরে মেওয়া ফলে। বুঝলি তো?

সীমামাসির সঙ্গে ওই ব্যাপারটা মাঝে মাঝেই ঘটছিল। তবে মা বাড়িতে থাকলে তার উপায় ছিল না। একটা সুবিধে ছিল। মাসের প্রথম দিকে মাসকাবারি বাজার করতে মাকে বেরুতে হয়। সীমামাসির দিদিকেও মা সঙ্গে নিয়ে যায়। দুই পরিবারেরই মাসকাবারি বাজার একটা দোকান থেকেই করা হত। সন্ধের পর মা দু-তিনটে থলি নিয়ে বেরুত। সীমামাসির দিদি তার সঙ্গে। আর শুধু বাজার সেরেই তো মা কিংবা সীমামাসির দিদি বাড়ি ফিরত না। বাজারের পর আরও পাঁচটা দোকান থেকে টুকিটাকি জিনিস, যেমন পেটিকোট কিংবা ব্রা অথবা কাজের মেয়ের জন্য কাচের চুড়ি, দু-চারটে প্লাস্টিকের বাটি, ইত্যাদি কেনাকাটির কি আর ফর্দ থাকত? ঘুরতে ঘুরতে চোখে যা পড়ত মা কিংবা সীমামাসির দিদি তাই কিনে আনত।

দু'জনের বাড়ি ফিরতে প্রায় আটটা বাজত। ফেরার সময় অবশ্যই রিকশো করে ফিরত। মা আর সীমামাসির দিদি দু'জনে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমি ছটফট করতাম। সীমামাসি এখনও কেন আসছে না? এক-এক দিন ব্যস্ত হয়ে ওদের বাড়ি গিয়ে টোকা দিয়ে এসেছি। মিনিট দশ বাদেই সীমামাসি ঘরে ঢুকে বলত, এত তাড়া কীসের? ছেলের দেখি আর তর সয় না, তারপর ঈষৎ ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলত, ধর, এই সন্ধের মুখে কেউ যদি হঠাৎ তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে? তারপর তোকে আর আমাকে এই অবস্থায় দেখলে তার কিছু বুঝতে বাকি থাকবে?

প্রথম দিন দোকানে কন্ডোম কিনতে গিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছিলাম। বুড়ো দোকানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করে শুধোল, তোমার বিয়ে হয়েছে?

বললাম, হ্যাঁ।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো ফের বলল, গ্রামের দিকে বাড়ি বুঝি? তাই অল্প বয়সেই বিয়ে করে ফেলেছ।

বললাম, হ্যাঁ, মানে শহরে এসেছিলাম, তাই এগুলো কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

বুড়ো শুধোল, ক'টা দেব বলো? পাঁচটা না দশটা?

কত দাম পড়বে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল, আগে কেনোনি বুঝি?

না মানে, গ্রামের দোকানে দাম বেশি, তাছাড়া পরিচিত জায়গায় এসব কিনতে একটু লজ্জা করে।

লজ্জা কীসের? বুড়ো হেসে উঠল। বলল, মেয়েদের স্যানিটারি টাওয়েল আর ছেলেদের কন্ডোম দুটোই পার্টস অফ লাইফ। বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন হবে। তবে একটা বয়সের পর এগুলো আর লাগবে না।

বললাম, আপাতত পাঁচটা দিন। সঙ্গে বেশি টাকা নেই।

BanglaBook.org

পাঁচটা কন্ডোম নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

দিন সাত বাদে কন্ডোম ব্যবহারের প্রথম সুযোগ এল। কী একটা ছবি দেখতে মা আর সীমামাসির দিদি দু'জনে এক সঙ্গে বেরুল। সীমামাসিকেও সঙ্গে যাবার জন্য মা অনেক করে বলেছিল। কিন্তু সীমামাসি মাথা নাড়ল। বলল, না দিদি, ও-সব প্যানপ্যানে বাংলা ছবি আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া দেখলাম পেপারে ছবিটার একটুও প্রশংসা করেনি।

ঠিক আছে। তোর যাবার দরকার নেই। সীমামাসির দিদি তাকে প্রায় ধমকে দিল। বলল, চলুন দিদি। আমরা দু'জনেই ফিল্মটা দেখে আসি। ফের বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর মতো টুই টুই করে এ-দিক সে-দিক চষে বেড়িয়ে আসি না। তাই আমাদের কাছাকাছি একটা হলে গিয়ে ছবি দেখে এলেই ভালো লাগবে। কাগজে কী লিখেছে তাই নিয়ে এত মাথাব্যথা কীসের?

মা আর সীমামাসির দিদি দু'জনে বেরিয়ে গেলে আমি চুপ করে বসে রইলাম। মিনিট পনেরো বাদেই সীমামাসি এসে ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল, কন্ডোম কিনে এনেছিস তো?

হ্যাঁ। আমি প্রায় ফিশফিশ করলাম।

কই, বের কর দিকি। সীমামাসি বলল।

তার কিছুক্ষণ বাদেই সীমামাসির সঙ্গে আমার সেই কাণ্ডটা ঘটল। শুরুতে নিজেকে যেমন নার্ভাস লাগছিল পরে সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেল। সীমামাসিকে বললাম, তোমার একটুও অসুবিধে হলে আমাকে বলবে কিন্তু।

ধুর বোকা, মেয়েদের এ-সব ব্যাপারে অসুবিধে হয় নাকি?

মিনিট দশ বাদেই সীমামাসি উঠে চলে গেল।

বলল, এগুলো সাবধানে রাখিস। আর যেটা ব্যবহার করেছিস, ওটা কলেজ যাবার পথে কোথাও ফেলে দিস।

সীমামাসির সঙ্গে আমার এই যে ব্যাপারটা ঘটল এটা কি সত্যি প্রেম ছিল? পরে কিন্তু আমার মনে হয়েছে এর মধ্যে কোনও প্রেম বা ভালোবাসার চিহ্নও ছিল না। হয়তো সীমামাসি যৌবনের জ্বালা সইতে না পেরে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এমনও অসম্ভব নয়, আমার বদলে অন্য কারও সঙ্গে পরিচয় হলে হয়তো তার সঙ্গেই এই ব্যাপারটা অনায়াসে ঘটতে পারত।

কিছু দিন পরে সীমামাসিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এর আগে তোমার সঙ্গে আর কারও সম্পর্ক হয়নি?

আমি কী জানতে চাইছি সম্ভবত সীমামাসি সেটা বুঝতে পারল। আমাকে পালটা প্রশ্ন করল, কেন? তোর কি কোনও সন্দেহ হয়?

ঠিক তা নয়। তবে তুমি দেখতে-শুনতে ভালো।

তাই নাকি? আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সীমামাসি বলল, তোর বুঝি তাই মনে হয়? তাহলে এত দিন কেন আমার বিয়ে হয়নি?

তার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে সীমামাসি।

তোর সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এর আগে প্রেম-ভালোবাসা দূরে থাক, কারও সঙ্গে তেমন পরিচয় কিংবা ঘনিষ্ঠতা ঘটেনি। শুধু একবার —।

সীমামাসি বাকিটুকু বলতে বোধহয় ইতস্তত করল। আমি চেপে ধরলাম, থামলে কেন সীমামাসি, বাকিটুকু শেষ করো।

সীমামাসি বলল, এর আগে নাকতলায় একটা বাড়িতে আমরা ভাড়া ছিলাম। যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতাম সেই বাড়ির মালিকের এক জন ভাই ছিল। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের মতো বয়স তার।

BanglaBook.org

বাড়িওয়ালার একটা দোকান ছিল। আর ভাইটা নানা রকম জিনিসের ক্যানভাসিং করে বেড়াত। লোকটার কোনও বাঁধাধরা আয় ছিল বলেও আমার মনে হয়নি। তখন আমার বয়স বাইশ-তেইশের মতো হবে। সদ্য এমএ পাশ করেছি — বাংলায়। একটা চাকরি-বাকরি নিশ্চয় জুটবে সেই আশায় দিন গুনছি। মাঝে গান শেখার শখ হয়েছিল। বাড়িতে একটা পুরোনো হারমোনিয়াম ছিল। সেটা বাজিয়ে কখনও-সখনও রেওয়াজ করতাম। যাদবপুর বাজারের কাছে গানের স্কুলে ভরতিও হলাম। সপ্তাহে দু'দিন সেখানে তালিম নিতে গিয়েছি। নিজেও বুঝতাম এ-সব উটকো শখ। নইলে কোনও দিন নামি গায়িকা হব আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সীমামাসি বলল, এক দিন সেই বাড়িওয়ালার ভাই যাদবপুর বাস স্টপের কাছে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এল। একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম। লোকটাকে চিনি না, জানি না। আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে চলে এল? কী নির্লজ্জ বেহায়া রে বাবা! মেয়েমানুষ দেখলেই জিভ দিয়ে লালা পড়ে।

আমি বললাম, লোকটা তোমার একেবারে অচেনা নয়। এক বাড়িতে ছিলে। সিঁড়ি দিয়ে বেরুতে, ঘরে ঢুকতে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় চোখাচোখি হয়েছে?

তা অবশ্য হয়েছে। সীমামাসি স্বীকার করল, কিন্তু আমি তো কোনও দিন ওর সঙ্গে কথা বলিনি।

আমি শুধোলাম, তা যাদবপুরের স্টপে দেখা হতে লোকটা তোমাকে কী বলল?

কী আবার বলবে? দেখা হতেই প্রথমে এক গাল হাসল। তারপর বলল, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সন্দিহান ভাব করতেই সে ফের বলল, আমরা তো এক বাড়িতেই থাকি। মানে আমি হলাম আপনার বাড়িওয়ালার ছোট ভাই।

তারপর?

এবার ওকে চেনার ভাব করতেই হল। বললাম, হ্যাঁ, মনে পড়েছে আপনাকে। ওই বাড়িতেই দেখিছি।

আমি চুপ করে আছি দেখে সে এবার শুধোল, এ-দিকে কোথায় এসেছিলেন?

জবাবে বললাম, ইউনিভার্সিটিতে একটু কাজ ছিল, তাই।

এবার সে ইতস্তত করে বলল, ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন মানে?

বললাম, এবার আমি বাংলায় এমএ পাশ করেছি কিনা। তাই একটা প্রভিশনাল পাশ সার্টিফিকেট যাতে পাওয়া যায় তারই খোঁজে এসেছিলাম।

ওঃ! সে চোখ দু'টি প্রায় বিস্ফারিত করে বলল, আপনি এমএ পাশ করেছেন বুঝি?

বললাম, হ্যাঁ। মানে এ-বছরই।

সীমামাসিকে বললাম, তুমি এমএ পাশ করেছ শুনেই লোকটা বুঝি চুপসে গেল? আর আলাপ জমানোর চেষ্টা করেনি?

তাই কখনও না করে? দিন পাঁচ-সাত বাদেই ওর সঙ্গে ফের আমার দেখা। আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও লোকটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। দু-চার কথার পরই ফস করে বলে বসল, খুব তেষ্টা পেয়েছে। চলুন না সামনের ওই কাফেটায় বসে দু'কাপ চা খেয়েনি।

বললাম, আপনার চায়ের তেষ্টা পেয়ে থাকলে কাফেতে গিয়ে খেয়ে আসুন। কিন্তু আমি কোনও স্বল্পপরিচিত লোকের সঙ্গে কাফেতে কিংবা রেস্তোরাঁয় গিয়ে চা খাই না।

অপমানে লোকটার মুখটা ঈষৎ কালো দেখাল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলাম। জামাইবাবু ফিরে এলে দিদি আর জামাইবাবু দু'জনকেই সব ঘটনা জানালাম। বাড়িওয়ালার বউ অবশ্য খুবই লজ্জিত হয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না দিদি, ওর স্বভাবটা ওই রকমই। আমরা

BanglaBook.org

অবশ্য ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কে ওর হাতে মেয়ে দেবে বলুন। রোজগার বলতে ক্যানভাসিং করে যা দশ-পঞ্চাশ টাকা পায় তাতেই ওর হাতখরচটা চলে যায়। বড় দাদাকে তো কখনও একশো টাকাও হাতে তুলে দিতে দেখিনি। সংসারের জোয়ালটা দাদা একাই টানে। ছোট ভাই, তাই ফেলেও দিতে পারে না। তাই বলে ওর বিয়ে দিতে হবে? এ তো সেই আপনার ঠাঁই হয় না, তায় শঙ্করাকে ডাকে।

তারপর থেকেই ওর উপদ্রবটা বুঝি কমে গেল?

হ্যাঁ, তবে আমরাও ও-বাড়িতে বেশি দিন থাকিনি। হাওড়ার দিকে জামাইবাবু একটা বাড়ির সন্ধান পেলেন। সেটাতেই উঠে গেলাম।

সীমামাসির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিন্তু স্থির ছিল, বদলায়নি। মাঝে মাঝেই বাড়িতে কেউ না থাকলে সীমামাসি আমার ঘরে চলে আসত। সন্ধের পর মা এবং সীমামাসির দিদি বেরিয়ে গেলে আমি শিকারী বাঘের মতো ওৎ পেতে বসে থাকতাম। সীমামাসি ঘরে ঢুকলেই ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিতাম। বলতাম, এখন আমার হাত থেকে তোমার রেহাই নেই।

কেন? কী করবি আমাকে?

যা করব সেটা তুমিও জানো।

সন্ধের দিকে শুধু একটাই অসুবিধে ছিল। মাঝে মাঝেই কেউ দরজায় কড়া নেড়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইত। অপরিচিতি কেউ হলে তাকে কপাট খুলে দু-চারটে কথা বলে বিদেয় করে দেওয়া যেত, কিন্তু পরিচিত মানুষ হলে তার সঙ্গে দু-দশটা কথা না বলে উপায় ছিল না। সীমামাসি কখনও কপাট খোলার আগেই পিছনের দরজা দিয়ে নিজেদের বাড়ি চলে যেত।

কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে মা এবং সীমামাসির দিদি অবশ্যই ফিরে আসত। তাই সাতটা বাজলেই আমরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করতাম। ঘরে আলো জ্বলছে না অথচ ভেতরে লোক আছে, কেউ কেউ বোধহয় এটাও সন্দেহের চোখে দেখত।

ইতিমধ্যে বিএ অনার্স ক্লাস শেষ হয়ে গেল। মাস দুই বাদেই পরীক্ষা। এই সময়টা পড়াশোনা না করে উপায় নেই। দিনের বেলা এমনকী রাত জেগেও পড়াশুনো করেছি। কিন্তু তাই বলে সীমামাসির সঙ্গে আমার সম্পর্কে যে ছেদ পড়েছিল তা নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়লেই রক্তের মধ্যে কামনার পোকাগুলো যেন কিলবিল করত। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো সেটা চরিতার্থ করা যায় না, সুতরাং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। মা কবে সীমা মাসির দিদিকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধের পর বেরিয়ে যাবে সেই সময়টুকুর জন্য অধীর চিত্তে অপেক্ষা করতাম।

সীমামাসির অবস্থাও যে আমার চেয়ে ভালো ছিল তা নয়। প্রায়ই ছটফট করত। এক-এক দিন বলত, চল না কলকাতায় কোনও হোটেলে দু-চার ঘণ্টা থেকে আসি।

আমি বলতাম দু-চার ঘণ্টায় জন্য ঘরভাড়া চাইলে হোটেলের মালিক কিংবা ম্যানেজার কী মনে করবে?

কেন? বলবি আমরা কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে এসেছি। বিকেল পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ডাক্তার দেখানো হলেই সন্ধের পর আপনার হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, কিন্তু শুনেছি আজকাল হোটেলে রুমভাড়া নিতে গেলে ইভি কার্ডটা দেখাতে হয়।

ইভি কার্ড মানে?

ইলেকশন কার্ড। তাতে অবশ্যই আমাদের এখানকার ঠিকানা লেখা আছে। তাহলে আমরা যেখান থেকে ডাক্তার দেখাতে এসেছি বলব, সেটা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে। তারপর এই সব উটকো হোটেলে এখন মাঝে মধ্যে পুলিশ রেড করে।

BanglaBook.org

চার

তবু এরই মধ্যে আমরা এক দিন প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধের পর মা সীমামাসির দিদিকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুল। তার মানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আমার অনুকূলে। মিনিট পনেরো পরে সীমামাসি চুল-টুল আঁচড়ে সামান্য একটু প্রসাধন করে আমার ঘরে এসে ঢুকল। বিছানায় শুয়ে আমরা কথা বলছি। ঘরের আলো নেভানো। মাঝে মাঝে আমি ওকে জড়িয়ে ধরে সবল নিষ্পেষণে কখনও চুম্বন করছি। হঠাৎ এমন সময় বাইরে কেউ যেন সজোরে কড়া নাড়ল। ভুরু কুঁচকে আমি কে হতে পারে ভাবতে চেষ্টা করলাম। তারপর কাপড়টা ভালো করে কোমরে জড়িয়ে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কপাট খুলতেই চমকে গেলাম। এ তো আমার কলেজের সহপাঠী মৃন্ময়!

ওর দিকে তাকিয়ে শুধোলাম, কী রে, এই রাত্তিরবেলায় তুই?

হ্যাঁ, মানে একটা দরকারে আসতেই হল।

কী দরকার বল? আমি দরজায় প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে বলল, প্রফেসর এসকেবি জন কিটসের ওপর একটা ভালো নোট দিয়েছিলেন। সেটা নিশ্চয় আছে তোর কাছে?

হ্যাঁ। মানে থাকতেও পারে। অবশ্য এই মুহূর্তে সেটা বলতে পারছি না।

বাইরে থেকেই ঘরে উঁকি দিয়ে মৃন্ময় বলল, ঘরে আলো জ্বালিসনি কেন? চল না ভিতরে গিয়ে একটু বসি।

না রে। আমার শরীরটা ভালো নেই। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আর এখন বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে একটুও ভালো লাগবে না। তুই বরং কাল আয়।

ফের কাল? মৃন্ময় ভুরু কোঁচকাল। বলল, ঘরের ভিতর কার যেন গলা শুনলাম।

কী যে বলিস। কার আবার গলা শুনবি?

কী জানি! আমার যেন মনে হল মেয়েলি গলা। খিল খিল করে সে হাসছিল।

তোর মাথা খারাপ হয়েছে। শেষে একটু গম্ভীর গলায় বললাম, অবশ্য পুরোনো বাড়ি তো। কেউ কেউ এই বাড়িতে খড়ম পায়ে চলার শব্দ, মেয়েলি কণ্ঠে খিল খিল হাসি এ-সবও শুনেছে।

তাই নাকি! মৃন্ময় কিন্তু আর দাঁড়াল না। বলল, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। বরং কাল দিনের বেলায় একবার আসব। তুই সময় পেলে ওটা খুঁজে রাখিস।

মৃন্ময়কে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি শুনে সীমামাসি এবার জোরে হাসল। আমি ওর মুখ চেপে ধরে বললাম, অত জোরে হেসো না, প্লিজ। বাইরে থেকে কেউ শুনলে ঠিক বুঝতে পারবে।

আর কিছু দিন বাদেই আমাদের বিএ পার্ট-টুর পরীক্ষা হয়ে গেল। ব্যাস, আর পড়াশুনোর বালাই নেই। কলেজ যাওয়া বন্ধ। সীমামাসি এক দিন আমাকে বলল, আজ বিকেলের দিকে একবার মেট্রো সিনেমার সামনে আসতে পারবি?

কেন? কোনও ভালো ইংরেজি ছবি এসেছে বুঝি?

নাঃ, তেমন কোনও খবর নেই।

তবে? এমনিই যেতে বলছ?

হ্যাঁ। তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বেশ, তাহলে যাব। আমি একটু চিন্তা করে বললাম, তবে সাতটা নাগাদ চলে এলেই হবে।

কেন? সাতটার পর তোর কিছু দরকার আছে বুঝি?

নাঃ। দরকার তেমন কিছু নয়। আসলে সন্ধের পর আমি একটা টিউশন নিয়েছি। মেয়েটা ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। এই মাস থেকেই শুরু করেছি।

BanglaBook.org

সীমামাসি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, মেয়েছেলে ছাত্রী? দেখিস ওর সঙ্গে না আবার ফেঁসে যাস।

কী যে বলো সীমামাসি! বাচ্চা মেয়ে। কত আর বয়স হবে ওর? পনেরোর বেশি বলে মনে হয় না। বাড়িতে এখনও ফ্রক পরে।

ঠিক আছে। তাহলে চারটের সময় চলে আসবি, কেমন?

সীমামাসি যে কেন আমাকে বিকেলবেলা মেট্রো সিনেমার সামনে আসতে বলল সেটা কিছুতেই মাথায় ঢুকল না। এমন কী দরকার আছে সীমামাসির যে-কথাটা বাড়িতে না বলে আমাকে মেট্রো সিনেমার সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? তাছাড়া মাসে অন্তত দু'বার সীমামাসি খালি বাড়িতে আমার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ত। তখন এটা-সেটা কত কথাই তো বলেছি দু'জনে। তাহলে?

মেট্রোর সামনে সীমামাসি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। দেখা হতেই সোল্লাসে বলল, এসে গিয়েছিস। চল দু'জনে কাফে ডি-মনিকোতে গিয়ে বসি।

চেয়ার দখল করে দু'জনেই মুখোমুখি বসলাম। সীমামাসি বলল, আজ আর ফিশফ্রাই খেয়ে কাজ নেই। বরং দু'জনকে দুটো চিংড়ির কাটলেট দিতে বলি।

চামচে দিয়ে কাটলেটটা একটু ভেঙে মুখে দিতেই বেশ ভালো লাগল। সীমামাসি বলল, খেতে ভালো লাগবে। চিংড়িতে আর ভেজাল দেবে কেমন করে?

কাটলেটটা শেষ করতেই চায়ের কাপ বেয়ারা দিয়ে গেল। এক চুমুক চা পান করেই সীমামাসি বলল, তোকে যে-জন্য ডেকেছি এবার সেটা শোন।

আমি চোখ তুলে তাকাতেই সীমামাসি বলল, আচ্ছা আমাকে নিয়ে তুই কিছু ভেবেছিস?

তোমাকে নিয়ে, মানে — আমি সীমামাসির কথাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

সীমামাসি বলল, তোর সঙ্গে আমি অনেক দূর এগিয়েছি। যা কখনও ভাবিনি, কারও সঙ্গে হতে পারে বলে চিন্তাও করিনি, তোর সঙ্গে তার সবই হয়েছে। আমি কোনও দিন তোকে বাধা দিইনি। তুই যখন যা চেয়েছিস আমি উপুড় করে ঢেলে দিয়েছি।

আমি তাকে সমর্থন করে বললাম, তুমি ঠিক কথাই বলেছ সীমামাসি। আমাকে তুমি কোনও দিন ফিরিয়ে দাওনি। সত্যি কথা বলতে, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে জীবনের একটা দিক আমার কাছে অজানাই থেকে যেত।

তাহলে ভেবে দেখ আমার প্রতি তোরও তো একটা কর্তব্য আছে। এরপর কি তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে আমি থাকতে পারব?

আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবার কথা তুমি ভাবছ কেন সীমামাসি? তবে আরও কিছু বলার আছে।

বেশ তো, তুই যা বলতে চাস বল।

আমি বললাম, বুঝতেই তো পারছ আমি কিছু দিন হল বিএ পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়েছি। রেজাল্ট বেরুতে এখনও মাস খানেক কিংবা আরও বেশি দেরি হতে পারে। পরীক্ষা দিয়ে আমি যা বুঝেছি তাতে আমি হয়তো সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে যাব। কিন্তু রেজাল্ট যে খুব ভালো হবে তা আমি মনে করি না।

তার কারণ বোধহয় আমার সঙ্গে তোর সম্পর্কটা হবার পর তোর মনটা ঠিক স্থির ছিল না। হয়তো সর্বদাই আমার কথা ভাবতিস। কখন আবার আমাকে কাছে পাবি সেই চিন্তাটা তোর মাথায় ঘুরপাক খেত।

তুমি ঠিকই ধরেছ সীমামাসি। কিছু দিনের মধ্যে তোমাকে আর একবার কাছে না পেলে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। সর্বদাই মনে হত মা আর তোমার দিদি কখন আবার কোনও কাজে সন্ধের পর

BanglaBook.org

দু'জনে বেরিয়ে যাবে। আসলে এই রকম একটা অস্থির মন নিয়ে পড়াশোনা করা বেশ শক্ত ব্যাপার ছিল।

সীমামাসি বলল, আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

কী কথা বলো।

সীমামাসি স্পষ্ট বলল, তুই আমাকে বিয়ে করবি?

বিয়ে! আমি একটা ঢোঁক গিললাম।

হ্যাঁ, সীমামাসি প্রত্যয়ের সঙ্গে জানাল, শোন, আমার বোধহয় আর সম্বন্ধ করে বিয়ে হবে না। সে-আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, ফলে তুই এখন আমার ভরসা। আর একটা জিনিস ভেবে দেখ, তোর সঙ্গে আমার দেহঘটিত কোনও ব্যাপারই তো বাদ যায়নি। আজ পর্যন্ত বাজার থেকে প্রয়োজন মতো কত কন্ডোম কিনেছিস সেটা তুই ভালো জানিস। এরপর তুই যদি আমাকে বিয়ে না করিস তাহলে আমার প্রতি সেটা চরম অবিচার হবে।

বললাম, তুমি এ-রকম ভাবছ কেন সীমামাসি? তোমাকে বিয়ে করতে আমি রাজি নই এমন কথা তো কখনও বলিনি। তবে —।

তবে কী বল?

অন্য কিছু নয়। আমাকে অন্তত আর কিছু দিন সময় দাও।

সময় চাস?

হ্যাঁ বিএ পার্ট-টু'র রেজাল্টটা বেরিয়ে যাক। অনার্স পেলেই আমি একটা চাকরির চেষ্টা করব। বলা যায় না, হয়তো তাড়াতাড়ি আমি একটা চাকরিও পেতে পারি।

হ্যাঁ, ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিস। চাকরি তোর কপালে হয়তো জুটো যাবে। আর আমার তো অনার্স ছিল না। তারপর বাংলায় এমএ। সে-জন্যই বোধহয় চাকরি পাইনি।

বললাম, তখন হয়তো পাওনি। কিন্তু চেষ্টা ছাড়লে তো চলবে না, কখন যে লেগে যাবে সেটা তুমিও জানো না।

সীমামাসি বলল, ধর অনার্স নিয়ে পাশ করার পর তোর একটা কাজ জুটে গেল। তাহলেও কিন্তু সমস্যাটা মিটল না।

কেন?

সীমামাসি বলল, চাকরি পেলেই তুই বিয়ে করবি আমাকে, তাই বলছিস তো?

হ্যাঁ। আর্থিক সমস্যার একটা সমাধান না হলে কি একটি মেয়েকে বিয়ে করা যায়? তুমিই বলো সীমামাসি।

সেটা ঠিক। তবে একটা কথা জেনে রাখ। তুই চাকরি পেলেও সমস্যাটা কিন্তু অত চট করে মিটবে না।

তার কারণ?

কারণ তো সোজা। আমাকে বিয়ে করতে চাইলে এই কথাটা তোর মায়ের কানে যাবে। আর ছেলের চেয়ে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড় কোনও মেয়েকে ঘরের বউ মানে পুত্রবধূ হিসেবে স্বীকার করে নিতে তার যথেষ্ট আপত্তি থাকতে পারে।

সীমামাসির কথায় যে যথেষ্ট যুক্তি আছে সেটা আমাকে মানতেই হল। আর সত্যিই তো, যে-মেয়ে এক সময় তাকে দিদি বলে সম্বোধন করেছে, এখন তাকেই আবার বউমা বলে স্বীকার করে নিতে মন বিদ্রোহ করবে।

ঈষৎ গম্ভীর মুখ করে বললাম, তাহলে উপায় সীমামাসি?

BanglaBook.org

আশ্চর্য! তুই কি বিয়ের পরও আমাকে সীমামাসি বলে ডাকবি নাকি?

ধুর। তাই কখনও বলি? তখন তোমাকে শুধু সীমা বলে ডাকব, আমার সীমা।

ইস। প্রেম যে একেবারে উথলে উঠেছে, সীমামাসি ব্যঙ্গ করে তাকাল। বলল, আগে তো বিয়েটা হোক, তাপর এর একটা সমাধান করে নিলেই হবে।

আমি শুধোলাম, আচ্ছা, এ-রকম বিয়ে তোমার কোনও বন্ধুর হয়েছে, না? যেখানে স্বামী তার স্ত্রীর চেয়ে প্রায় আড়াই বছরের ছোট।

হ্যাঁ। এ-রকম একটা কেন, পাঁচ-সাতটা কেস আমার জানা আছে। আসলে ব্যাপারটা কী জানিস? একটা ছেলে আর মেয়ে যখন প্রেম করে কিংবা পরস্পরকে ভালোবাসে তখন তারা দু'জনে কেউ কারও বয়সের খোঁজ করে না। তখন দু'জনের মধ্যে ভালোবাসাটাই সব। আর ছেলেটা যদি শক্তপোক্ত লম্বা-চওড়া হয় তাহলে তো আর বয়স নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রশ্নই ওঠে না।

সীমামাসিকে জিজ্ঞেস করলাম, এদের বিয়ে-থা নিয়ে কোনও ঝামেলার সৃষ্টি হয়নি?

জবাবে সীমামাসি বলল, ঝামেলা মানে বাড়ির লোক নিশ্চয় এটা সহজে মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু ওরা কেউই আর বাড়িতে থাকে না। প্রায় সকলেই বাড়ি ভাড়া করে নিয়েছে। ধীরে ধীর অবশ্য ছেলে বা মেয়ের মা-বাবা ব্যাপারটা মেনে নিতেও শুরু করে। রক্তের সম্পর্ক বলে তো একটা বস্তু আছে। ছেলে বা মেয়েকে ছেড়ে কে-ই বা চিরকাল থাকতে পারে?

সীমামাসিকে বললাম, তাহলে আমাকেও একটু সময় দাও। অনার্সের রেজাল্টটা বেরুলে আমিও একটা চাকরির চেষ্টায় নেমে পড়ি?

সীমামাসি বলল, সেটা হয়তো পেয়ে যাবি। কিন্তু আমার ভয় হয় কীসে জানিস?

কীসের ভয়?

সীমামাসি বলল, তোর মায়ের কান্নাকাটি চোখের জল দেখে তুই না আবার বেঁকে বসিস।

তোমার কি তাই সন্দেহ হয়?

সন্দেহ কেন বলছিস? যেটা বাস্তব আমি সেটাই তোকে বলছি। আর এ-সব ক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস ভাববার আছে।

সেটা কী?

সেটা হল এই যে, তোদের বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো। নিজেদের বাড়ি-ঘর। দেশে জমিজমাও আছে শুনেছি। তাহলে বউ নিয়ে অন্যত্র বাড়িভাড়া করে থাকলে তোর কিছু ক্ষতি হবে।

আর তোমার যে-সব বন্ধু এই ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যত্র বাড়ি ভাড়া করে সংসার পেতেছে তাদের বুঝি পৈতৃক সম্পত্তি হারানো বা সেই অধিকার থেকে হওয়ার কোনও আশঙ্কা ছিল না?

হ্যাঁ। তেমন কিছু ছিল না বলেই আমি শুনেছি।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এরপর আর চেয়ার-টেবিল দখল করে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

সীমামাসি বলল, আগের দিনের মতো তুই বাড়ি চলে যা।

আর তুমি?

আমিও যাব। তবে একটু পরে। এই ধর আধ ঘণ্টা বাদেই আমি পৌঁছে যাব।

সীমামাসির দিকে তাকিয়ে আমার সেই কামনার ইচ্ছেটা ফের জেগে উঠেছিল, বললাম, খুব শিগগির এক দিন এসো কিন্তু।

এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা তো করতে চাইছি। ফের তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর মা আর আমার দিদি দু'জনে এক সঙ্গে কোথাও না গেলে তো নীলেশবাবুর

BanglaBook.org

ঘরটা ফাঁকা পাওয়া যাবে না, বলেই সীমামাসি খিল খিল করে হেসে উঠল। এমন মজার কথা শুনে আমিও না হেসে পারলাম না।

পাঁচ

মাস খানেক পর আমাদের পার্ট-টু পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। অমি সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছি। তবে বেশ নিচের দিকে নাম। বোধহয় পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টের মতো নম্বর। এই রেজাল্ট নিয়ে এমএ পড়ার কোনও অর্থ হয় না। অন্তত শতকরা পঞ্চাশের চেয়ে বেশি নম্বর না পেলে কলেজের চাকরি অর্থাৎ লেকচারারশিপের জন্য গণ্য করা হয় না।

ইংরেজি কাগজ দেখে আমি চাকরির দরখাস্ত পাঠাতে লাগলাম। ভারত সরকারের অনেক অফিস কলকাতায় আছে জানতাম। সেখান থেকেই তিন-চারটে ইন্টারভিউর চিঠি এল। প্রথমে এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা। তারপর ইন্টারভিউ বা ভাইবা ভোসি। এমএ পরীক্ষার কেন আরও ভালো হয়নি সে কথাও কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল।

এই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে দিতে হঠাৎ আমার নামে একটা চাকরির চিঠি এসে হাজির। ডালহৌসিতে ভারত সরকারের একটা অফিসে আপার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি। মাইনে খুব একটা কম নয়। পে, ডিএ, হাউস রেন্ট, সিটি কমপেনসেটারি অ্যালাউন্স ইত্যাদি নিয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজারের মতো।

বাড়িতে একটা খুশির হিল্লোল বয়ে গেল। মা তখনই ঠাকুরের নামে পুজো দেবে বলে পঞ্চাশটি টাকা তুলে রাখল। আর বাবা স্নান সেরে কাচা কাপড় আর জামা পরে খানিকটা দূরে একটা শিবমন্দিরে পুজো দিতে বেরিয়ে গেল।

দিন কয়েক পরে নিয়োগপত্রটি হাতে নিয়ে আমি ডালহৌসির সেই অফিসে কাজে যোগ দিতে গেলাম। অফিসের বসের সঙ্গে দেখা করার পর উনি আমাকে সুপারিনটেনডেন্টের হাতে সমর্পণ করে বললেন, ইনি আজই জয়েন করছেন। একে কাজকর্ম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তৈরি করে নিন।

আমার বসার জন্য একটা চেয়ার-টেবিল আগেই ঠিক করা ছিল। এক জন পিওন গোছের লোক এসে সেটা ঝেড়েমুছে সাফসুতরো করে দিল। কী কাজ করতে হবে সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে কাছে ডেকে সে-সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো লেকচার দিলেন। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বললেন যে, আপাতত একটা সপ্তাহ এমনই যাক। চোখ-কান খুলে অফিসের কাজকর্ম লক্ষ্য করুন। তারপর ধীরে ধীরে নিজেই সব শিখে নিতে পারবেন।

আড়ালে পেয়ে সীমামাসি আমাকে বলল, তোর কপাল ভালো রে নীলেশ। পরীক্ষার অনার্স নিয়ে পাশ করলি। তার দু-তিন মাসের মধ্যে চাকরি পেয়ে গেলি। সাড়ে চার হাজার টাকা মাইনের চাকরি। কম নাকি?

সীমামাসির দিদি সন্ধেবেলায় আমাদের বাড়িতে এসে বলল, নীলেশ হিরের টুকরো ছেলে দিদি। তবে আমরা ছাড়ছি না, এক দিন ভালো করে খাওয়াতে হবে কিন্তু।

আমার মা বলল, তাই হবে ভাই। আগে নীলেশকে প্রথম মাসের মাইনেটা পেতে দাও, তারপর তোমাদের সকলকে পাত পেড়ে খাওয়াব, কথা দিচ্ছি।

দিন কয়েক পরে সীমামাসি আমাকে বলল, আজ একবার মেট্রো সিনেমার সামনে আসতে পারবি?

কখন?

এই ধর, তোর অফিস ছুটির পর। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চলে আয়।

বেশ। তুমি ওখানে থাকবে তো?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, তোর জন্য অপেক্ষা করব। সীমামাসি বলল।

কাফে-ডি-মনিকোতে কোণের দিকে একটা টেবিল দখল করে আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। কোনও রকম ভনিতা না করে সীমামাসি সোজাসুজি বলল, তোর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুল। চাকরিও পেয়ে গেলি। এরপর তাহলে আমাদের বিয়ের কথাটা ভাবতে হয়।

হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি সায় দিলাম। শুধোলাম, কী করা যায় বলো দিকি?

সীমামাসির যেন সব চিন্তা করা ছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, দুটো রাস্তা তোর সামনে খোলা আছে।

যেমন?

প্রথমটা হল বাড়িতে কিছু না জানিয়ে আমরা লুকিয়ে রেজেস্ট্রি করে বিয়েটা সেরে ফেলতে পারি। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রেজিস্ট্রার আসবে। দু-তিন জন সাক্ষী লাগবে। সে-ব্যবস্থাও ওরাই করে দেবে। বিয়ের রেজেস্ট্রি হবার পর এক দিন তোর মা-বাবাকে সব কথা খুলে বলবি। শুনে ওরা নিশ্চয় খুব রাগারাগি করবে। তখন বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই সংসার পেতে বাস করতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর দ্বিতীয় রাস্তাটা?

সীমামাসি বলল, ওটা একটু কঠিন। তবে সুবিধে এই, ফয়সালা আগেই হয়ে যাবে। পরে আর এই নিয়ে ঝুটঝামেলায় জড়াতে হবে না।

বললাম, তুমি বোধহয় বিয়ের কথাটা আগেই বাড়িতে জানাতে চাইছ।

ঠিক তাই। সীমামাসি বলল, অবশ্য তোর এই কথা শুনলে তোর মা কিংবা বাবা কেউ সেটা মেনে নিতে চাইবে না। তোকে নানাভাবে বোঝাবে। শেষ পর্যন্ত তোর মা চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি শুরু করবে। আমার দিদি-জামাইবাবুকে গালমন্দও করতে পারে।

কিন্তু দুটো রাস্তার একটা পথে তো যেতেই হবে।

তোর কোনটা পছন্দ? সীমামাসি শুধোল।

বললাম, আমি আগেই কথাটা জানাতে চাই। তাতে একটাই সুবিধে যে, এই নিয়ে পরে আর কোনও ঝুটঝামেলা হবে না।

ঠিক আছে। তুই একটু ভেবেচিন্তে দেখে নিস, কোনটা তোর পক্ষে সুবিধের হবে।

বেয়ারা এসে সামনে বিল ধরতে সীমামাসি ওর ব্যাগটা খুলে টাকা দিতে যাচ্ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে ব্যাগ খুলতে নিরস্ত করলাম। বললাম, আজ আমি দিচ্ছি।

বেয়ারা টাকা বুঝে নিয়ে চলে যেতেই সীমামাসি মুচকি হেসে বলল, এরপর তো আমাকে সবই তোকে দিতে হবে। কাপড় জামা, হাতখরচা, গয়নাগাটি। কী রে, এ-সব দিবি তো? এক মুহূর্ত থেমে সীমামাসি নিজেই আবার বলল, আর তুই না দিলে আমি কোথায় পাব বল?

কাফে-ডি-মনিকো থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ি রওনা হয়ে গেলাম। অন্য দিনের মতো সীমামাসি আধঘণ্টা পরে বাড়ি পৌঁছবে। যাতে কেউ না মনে করতে পারে যে, আমরা দু'জনে এতক্ষণ এক সঙ্গে কোথাও ছিলাম।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম সামনের রবিবার সন্ধেয় মা আর বাবাকে কথাটা বলব, সীমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। জানতাম এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে একটা ভারি বোমার বিস্ফোরণ হবে। মা চিৎকার করে চুল ছিঁড়বে। বাবা রেগেমেগে হয়তো আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে

BanglaBook.org

বলবে। সমস্ত রাত্তির খাওয়া-দাওয়া দূরে থাক, মা কিংবা বাবা কেউ হয়তো জলগ্রহণ করবে না। কিন্তু উপায় নেই। কথাটা তো আমাকে বলতেই হবে। আর সীমামাসির সঙ্গে যে আমি অনেক দূর এগিয়ে গেছি সেটা তো এক বর্ণও মিথ্যে নয়। আমার ইচ্ছেমতো ওকে উপভোগ করেছি, কষ্ট দিয়েছি। কখনও আমার অত্যাচারে সীমামাসি চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু আমি তখনও তাকে ছাড়িনি। করতলের প্রতিটি রেখার মতো ওর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব আমার চেনা হয়ে গেছে। আর এখন এই অবস্থায় আমি বিয়ে করতে পারব না বলে কি পিছিয়ে যেতে পারি? আর এই কাপুরুষোচিত কাজ করলে সীমামাসিই-বা কী মনে করবে? ছি-ছি! সমস্ত জীবন আমরা নাম শুনলে ঘৃণায় মুখ কুঁচকে থাকবে।

তারপর এক দিন সেই রবিবার এসে উপস্থিত হল। আমি সকাল থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করছি মাকে কথাটা বলব কেমন করে। সন্ধের পর মা আর বাবা দু'জনেই অবশ্য বাড়িতে থাকবে। তারপর যা হবার হবে। কথাটা বলেই ফেলব।

কিন্তু সকাল ন'টা নাগাদ সীমামাসি হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, তুই একবার বাইরে আসতে পারবি?

বাইরে মানে?

এই ধর হাওড়া স্টেশনে। হুইলারের দোকানের সামনে।

হুইলারের স্টল বলছ তো?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। সকাল দশটায় ওখানে একবার চলে আয়। খুব জরুরি কথা আছে তোর সঙ্গে।

কথা শেষ হতেই সীমামাসি এক মুহূর্ত দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবার পরই আমি জামাটা মাথায় গলিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হলাম। রান্নাঘর থেকে মা বলল, ভাবলাম তোর জন্য লুচি ভাজব। তা তুই আবার কোথায় চললি?

আসছি এখুনি। আধ ঘণ্টার মধ্যে। বলেই আমি বেরিয়ে এলাম।

হুইলারের স্টলের সামনে সীমামাসি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই বলল, চল স্টেশনের ওই রেস্তোরাঁটায় গিয়ে বসি।

ট্রেন যাত্রীদের ভিড় ছিল অবশ্য। কিন্তু আমরা এক কোণে বসে গেলাম।

সীমামাসি শুধোল, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুই কি তোর মাকে আমাদের বিয়ের কথা বলেছিস?

এখনও বলিনি। তবে আজ সন্ধের পর মা আর বাবা দু'জনকেই বলব ভেবেছি।

থাক। আর বলার দরকার নেই।

সে কী! আমি চমকে উঠলাম। হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন?

শোন। আমি সব খুলে বলছি। আমার এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছে। জামাইবাবু তলে তলে কোন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তিন-চারটে চিঠি এসেছিল। তার মধ্যে এই ভদ্রলোককেই জামাইবাবুর পছন্দ হয়েছে। উনি ধানবাদে কোল ইন্ডিয়ার অফিসে চাকরি করেন। মাইনেপত্র ভালোই পান। তবে এটা ওর সেকেন্ড ম্যারেজ। প্রথম স্ত্রী বছর তিন আগে হঠাৎ একটা ভারি অসুখে দশ-বারো দিন ভুগেই মারা যান।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি কি তোমাকে দেখেছেন?

নাঃ, উনি মেয়ে দেখতেও চান না। ছবি দেখেই ওর পছন্দ হয়েছে। তাছাড়া আমি এমএ পাশ শুনে উনি আর একটি কথাও বলেননি।

BanglaBook.org

আমি চুপ করে ছিলাম। কোনও প্রতিবাদ করিনি।

সীমামাসি নিজেই বলল, এক হিসেবে এটা বোধহয় ভালোই হল। তুই মা আর বাবাকে বিয়ের কথা বললেই দুই পরিবারের মধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। পাড়ার লোক সব শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, দেখ কত দিন আগে দু'জনেই মাগ-ভাতার হয়ে বসে আছে। এখন ন্যাকামি করে বিয়ে-শাদির আয়োজন করছে।

আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না?

কষ্ট হলেও উপায় নেই। মেয়েরা সব সইতে পারে। আর একটা কথা তোকে বলি। তোর চেয়ে আমি প্রায় চার-পাঁচ বছরের বড়। এর মানে হল আরও কুড়ি বছর বাদে তোর বয়স যখন চল্লিশ হবে তখন আমি পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে এসেছি। মেয়েদের শরীরে একটা রহস্য আছে জানিস তো? পঁয়তাল্লিশের পর সেটা স্তিমিত হয়ে আসে। আর কিছু দিন পরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু চল্লিশ বছরে তুই থাকবি তরতাজা জোয়ান। একটা পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে আসা বিগতযৌবনা মেয়ের প্রতি তোর আর কোনও আকর্ষণই থাকবে না।

বললাম, আমাদের মধ্যে তাহলে আর কোনও সম্পর্কই থাকছে না, এই তো?

ঠিক তাই। এরপর থেকে আমি পরস্ত্রী, আর এক জনের বউ।

কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

কী অনুরোধ বল।

তোমার বিয়ের আগে আর একটিবার তোমাকে পেতে চাই।

অসম্ভব। সীমামাসি আমার অনুরোধ নাকচ করে দিয়ে বলল, এখন থেকে আমার দেহ-মনের ওপর অধিকার একমাত্র সেই ভদ্রলোকের যিনি আমাকে বিয়ে করছেন।

সীমামাসি উঠে দাঁড়াল। বলল, চলি। দি চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ্‌ড।

দিন দুই পরে সন্ধের পর সীমামাসি আর তার জামাইবাবু আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ কার্ড নিয়ে দেখা করতে এল। এক গাল হেসে সীমামাসির দিদি বলল, এত দিন পরে বোনের আমার বিয়ের ফুল ফুটল, বুঝলেন দিদি?

মা শুধোল, তা ছেলেটি কোথাকার?

সীমামাসির দিদি বলল, এই দেশেরই ছেলে। ধানবাদে কোল ইন্ডিয়াতে চাকরি করে। বত্রিশ বছর বয়স। শুধু একটাই যা খুঁত।

সেটা কী?

দোজবরে। বছর তিন আগে ওর প্রথম স্ত্রী হঠাৎ অসুখে ভুগে মারা যান। তবে তার কোনও ছেলেপুলে হয়নি।

তাহলে তো কিছুই খারাপ নয়। আর সীমার বয়সও তো পঁচিশ পেরিয়ে গেল। তাহলে তো দু'জনের কোনও বেমানান হয়নি।

নিমন্ত্রণ পত্রটা বাবার হাতে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, পারলে অবশ্যই যাবেন।

মা শুধোল, বিয়েটা হচ্ছে কোথায়?

কসবার কাছে এর এক বন্ধু দু'দিনের জন্য একটা বাড়ি করে দিয়েছে। বিয়ে হলে ওই বাড়ি থেকেই বর-কনে ধানবাদ চলে যাবে।

তারপর তোমরা আবার এ বাড়িতে ফিরে আসবে, এই তো?

BanglaBook.org

সীমামাসির জামাইবাবু বললেন, এলেও এ-বাড়িতে আমরা হয়তো আর বেশি দিন থাকব না দিদি।

কেন? মা শুধোল।

ভদ্রলোক বললেন, পাটুলিঘাটায় একটা কো-অপারেটিভ হাউসিঙে আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম। এখন চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, সামনের সপ্তাহেই ওরা নাকি ফ্ল্যাটের পজেশন দেবে।

সীমামাসির বিয়েতে আমরা অবশ্য কেউ যাইনি। অত দূর রাস্তা। মা কিংবা বাবা কারও পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়। মা অবশ্য আমাকে যেতে বলেছিল। কিন্তু শরীরটা খারাপ এই অজুহাতে মায়ের কথা আমি এড়িয়ে গেছি। নিমন্ত্রণ রাখতে না গেলেও মা কিন্তু সীমামাসিকে একটা দামি শাড়ি কিনে হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা তোমার দিদির আশীর্বাদ।

পরিশিষ্ট

এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সীমামাসির সঙ্গে আমার আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। কখনও সবরে-অবসরে সীমামাসির মুখটা চকিতে একবার মনের মাটিতে উঁকি দিয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে যেত জানি না।

ইতিমধ্যে আমি বিয়ে করেছি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আমার। বউয়ের নাম নীহারকণা। তারপর এক দিন যথানিয়মে চাকরি থেকে অবসর নিলাম। এখন আমার বয়স পঁয়ষট্টি। এক দিন সকালে বাজার সেরে এসে চেয়ারে বসে কিছু ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার স্ত্রী এসে বলল, দেখো-দেখো, কাগজে একটা শোক সংবাদ বেরিয়েছে। আমি চশমাটা পরে কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখি সীমন্তিনী রায় নামে এক ভদ্রমহিলা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া আকস্মিক বন্ধ হওয়ায়র ফলে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর শয্যার পাশে ছেলে-মেয়ে এবং স্বামী উপস্থিত ছিলেন।

আমার স্ত্রী শুধোল, একে তো তুমি চেনো, তাই না?

চিনি মানে?

বা-রে তোমার মা যে গল্প করেছিলেন সীমন্তিনী সরকার নামে এক ভদ্রমহিলা তার দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে তোমাদের বাড়ির পাশেই ভাড়া থাকতেন। উনি অবশ্য তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তবু তোমার সঙ্গেই ওর নাকি খুব বন্ধুত্ব ছিল। সন্ধেবেলা প্রায়ই গল্প করতে আসতেন। বিয়ের পর পদবিটা পালটে রায় হয়ে গেছে।

ছবিটার দিকে আমি একবার তাকালাম। নাঃ, সীমামাসিকে চিনতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি। কারণ ছবিটা পুরোনো। অন্তত দশ পছর আগের। কপালের কাছে একটা ছোট্ট কাটা দাগ ছিল। ফটোতে সেটাও উঠেছে।

স্ত্রী বলল, কী? সীমন্তিনী রায়কে তুমি চিনতে পারছ না?

নাঃ। আমি ম্লান হেসে বলি, কত দিন আগের কথা। এ-সব কি এখনও মনে থাকে?

কাগজটা হাতে নিয়ে নীহার চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তুমি খুব ভুলো হয়ে গেছ। কিছুই আর মনে থাকে না।

আমি হাসলাম। সীমামাসিকে মনে আছে বৈ কী। সন্ধেবেলা মা আর ওর দিদি বাইরে গেলে ওর সঙ্গে ফস্টিনস্টি, কত কাণ্ডই না করেছি। সে-সব দিন কি আমি ভুলতে পারি?

তবে নীহারকে কোনও দিন তা বলিনি। কী লাভ হত বলে?

আর বিয়ের পর স্ত্রীর কাছে কে আর তার জীবনের গোপন কাহিনি স্বেচ্ছায় ফাঁস করেছে॥

BanglaBook.org

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ফাঁকি

এক

কাকা বলেছিলেন, ছেলের বিয়ে দিতে আবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন কী! জানাশুনোর মধ্যেই তো কত ভালো ভালো পাত্রী রয়েছে।

মা সামনে বসে শুনছিল। বলল, আমি আর কী বলব? আপনিই দেখুন ঠাকুরপো। যা করলে ভালো হয় করুন।

বক্স নম্বরে বিজ্ঞাপনের প্রস্তাবটা শ্যামলের। বলেছে, তুমি যা বলছ এখন আর সে-সব চলে না মা। কাকাবাবুর জানাশুনো মানে তো আদি নিবাস ঢাকা মাদারিপুর বরিশাল। জন্মে সে দেশ দেখিনি। আমার বাপ-ঠাকুরদাও বাঙাল ছিল, তাতে কী! ও-রকম করলে ভালো বউ পাবে না মা। আমার কী, তুমিই ভুগবে।

তাহলে নিজে পছন্দ করে কাউকে আন। মৃদু হেসে শ্যামল বলেছে, আমি আমার মায়ের ধাত পেয়েছি। সাবেক ধরনের। যা বলছি শোনো, একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখো, ভুরি ভুরি হুরি-পরি বিদ্যেধরীর সন্ধান পেয়ে যাবে। শুধু একটা লাইন জুড়ে দিতে হবে — প্রেফারেবলি কনজারভেটিভ টাইপ।

বিজ্ঞাপনে কাকাবাবুর তেমন সায় নেই, তবু শ্যামলকে তারিফ করেন তিনি। ঝকঝকে যুবক। যখন অফিসে বেরোয়, চেয়ে থাকতে হয়। জামা-জুতো সাজগোজ যাকে বলে পোস্টমডার্ন। যতক্ষণ বাড়িতে, শুধু ল্যাপটপের ওপর ঝুঁকে আছে। কোম্পানি ঘন ঘন ফরেন ট্যুরে পাঠায়। সর্বক্ষণের গাড়ি দিয়েছে। ফ্ল্যাটও দিয়েছিল, নেয়নি মায়ের অসুবিধে হবে বলে। এমন ছেলেরা নিজেরাই দেখেশুনে ভাব-ভালোবাসা করে বিয়ে করে। বিয়ে করে, বিয়ে ভাঙে, ফের বিয়ে করে। সে এক খেলা। এক এই শ্যামলই বংশের মুখরক্ষা করেছে।

এই বংশের জীবিত বয়োজ্যেষ্ঠ এই কাকাই। তার দুই ছেলে, যার যেমন ইচ্ছে এক-একটা ডাইনি ধরে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস হয়ে সোজা বাড়িতে এনে তুলেছে। জাতের বিচার নেই। বয়সের গাছপাথর নেই। বংশপরিচয় অবান্তর। কাকাবাবু খেদ করে বলেন, বস্তির মেয়ে। তিন সন্তানের ছোটোটি মেয়ে, নাম বাসনা, সে-ই সব চেয়ে বেশি দাগা দিয়েছে বাপকে। কী সাংঘাতিক মেয়ে! হঠাৎই এক দিন সুটকেস গুছিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। ওর মা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস? বাসনা নিঃসংকোচে বলল, চিত্ত বাসা নিয়েছে, আমি চলে যাচ্ছি। মা বলল, সে কী রে! ও বলল, চিত্তকে আমি বিয়ে করেছি। কাকাবাবু এখনও বুঝতে পারেন না, এ আবার কেমন বিয়ে! হঠাৎ এক দিন এক বিছানায় শুয়ে পড়া। কোনও ছেলের বিয়ের আগে 'পাটিপত্তর' করতে যাওয়া হল না। ফিরে এসে বলতে পারলেন না, গ্যালা কই সব! শাকে ফুঁ দাও, জোকার দাও, পোলার বিয়া পাকা কইরা আইলাম। আশীর্বাদ করতে পারলেন না কোনও বউকে, না একমাত্র জামাইটাকে। বরকর্তা সেজে বিয়ের আসরে গিয়ে বসতে পারলেন না। অধিকার-বলে পুরুতের মন্ত্রপাঠে ভুল ধরা এ জন্মে আর হল না। এবার শ্যামলের বিয়েতে যদি সে-সাধ মেটে।

কাকা খড়দাতে থাকেন। শ্যামলের মা ফোনে খবর দিতেই চলে এসেছেন টালিগঞ্জে। অল্প বয়সে, তখন দাদারও বিয়ে হয়নি, ও-পার বাংলা থেকে এইখানে এসে উঠেছিলেন বাবার সঙ্গে। দখলি জমি, বাবার নামেই পাট্টা। সেই টালিগঞ্জের এখন নতুন ঝকঝকে চেহারা। শ্যামল অনুমান করতে পারবে না কী নরককুণ্ডে এক সময় বছরের পর বছর কাটিয়েছে ওর ঠাকুরদা, বাবা-কাকা। তখনকার টালির চালের ঘরে বউ হয়ে আসে ওর মা। সে-বাড়ি নিশ্চিহ্ন। বিশাল বাড়ি করেছে শ্যামল। ওর কুল-গোত্র বদলে গেছে। হাউসবিল্ডিং লোনই পেয়েছে বিশ লাখ, চাকরি জামিন।

BanglaBook.org

যতই আলাদা থাকুন, তবু কাকাই অভিভাবক। মায়ের ইচ্ছে, বিয়ের চিঠিতে নিমন্ত্রণকর্তা হিসেবে তাঁরই নাম ছাপা হবে। কাকা অবশ্য বলেছিলেন, ও-সব তো পরের কথা। তাছাড়া আজকাল আর ও-সব নেই। বউঠানের নাম ছাপলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। নাকি রে শ্যামল? কিছু বল।

মা বলেছিলেন, ও আবার কী বলবে ঠাকুরপো। সংসারে পুরুষরাই কর্তা। পুরুষরাই অভিভাবক। বিয়ের চিঠিতে মেয়েছেলের নাম ছাপা হলে কেমন যেন দুঃখী অসহায় দেখায়।

চোখে জল এসেছিল মায়ের।

মনে মনে খুশি হয়েছেন খড়দার কাকা। বেশ তো, 'পাত্রী চাই' কলমে বক্স নম্বরেই হোক। সম্বন্ধ আসুক দু-দশটা। তিনিই দেখবেন শুনবেন।

পাত্রীপক্ষের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন। মনমতো হলে গিয়ে সাক্ষাতে কথা বলবেন। প্রসন্ন মুখে হেসে বললেন, কথায় বলে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

কাকা নিজেই বিজ্ঞাপন মুসাবিদা করলেন। বউঠানকে শোনালেন। তারপর শ্যামলের হাতে দিয়ে বলে গেলেন, কালই এটা কাগজে দিস, রোববার যেন বেরোয়।

সবই যে আজকাল অনলাইনে হয় কাকাবাবু জানেন না। ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে শ্যামল বলল, 'আচ্ছা।

দুই

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ ত্রিকোণ পার্কের ধার ঘেঁষে গাড়ি ঘোরাল শ্যামল। হিন্দুস্থান পার্কের ওই প্রান্তে ভারি সুন্দর একটা স্পট আছে। ঘন গাছগাছালি, ছায়া ছায়া, নির্জন। এইখান থেকেই কিশোরীকে পিকআপ করে শ্যামল। কিশোরীদের বাড়ি কাছেই। প্রমিস করেছে ওরা কেউ কারও বাড়িতে যাবে না। একবারই শুধু কিশোরী শ্যামলকে ডেকে নিয়েছিল বাড়িতে। মোবাইলে বলেছিল, হাঙ্গ ইওর প্রমিস। ড্যাড অ্যান্ড মম লাইক টু সি ইউ।

শ্যামল সেই প্রথম গেল কিশোরীদের বাড়ি। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। আউট হাউস আছে। গাড়ির হর্ন শুনেই দৌড়ে এল কিশোরী। কিছু বুঝে ওঠবার আগে নিমেষে শ্যামলকে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। দো-তলার কোনও ঘরে কেউ আছে বলে মনে হল না। শ্যামলের চোখে-মুখে হতচকিত বিস্ময়ের ভাব ফুটেছিল নিশ্চয়ই। সেটা উপভোগ করছে কিশোরী। খুব ক্যাজুয়াল পোশাক। জিন্স আর টপ। ছেলেমানুষের মতো হেসে গলা জড়িয়ে ধরল শ্যামলের। বলল, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স, বাড়িতে কেউ নেই। সেট সাজানো। লেট আস মেক লাভ। বলতে বলতে স্তনসন্ধিতে শ্যামলের মুখ চেপে ধরল।

দু'টি যুবক-যুবতির সর্বাঙ্গে উত্তাপ তীব্র হচ্ছে। ওরা শুয়ে পড়ল। যুবক উপগত হল তার নারীতে। স্বাভাবিক হয়ে শ্যামল বলেছিল, তোর সাহস তো খুব! যদি কনসিভ করিস!

এই —। কপট রাগে কিশোরী বলল, আর তুই না, আজ থেকে তুমি। কনসিভ করব না, ভয় নেই। প্রপার প্রোটেকশন না নিয়ে তোমাকে ডাকি! প্রমিস স্ট্যান্ডস শ্যামল, আমরা কেউ কাউকে চিনি না।

এ-রকম করে বাড়িতে মেয়েবন্ধুকে ডাকার উপায় নেই শ্যামলের। মা বাড়ি না থাকলেও না। পাড়ায় ওর সুনাম খুব।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেলফোনে খবর পাঠাল শ্যামল। দশ মিনিটের মধ্যে চেনা স্পটে চলে এল কিশোরী। শাড়ি পরেছে আজ। সঙ্গে চোলি। শ্যামল একটু অবাক হল। একটু ঝুঁকে বাঁ-হাতি দরজা খুলে ধরতেই কিশোরী বলল, উঁহু, তোমার পাশে না। আমি পিছনের সিটে বসছি।

BanglaBook.org

এলিয়ে বসে দুষ্টু হাসি হেসে বলল, ডু আই নট লুক সেক্‌সি? মিররে দেখো।

জানলার কাচ তুলে দাও। এসি চালিয়ে দিচ্ছি। বলেই গাড়ি স্টার্ট করে দিল শ্যামল।

কোথায় যাবে ঠিক করা নেই। দূরপাল্লার ড্রাইভ। ওরা ঘনিষ্ঠ হবার পর থেকেই এই রীতি। কোনও কোনও দিন কিশোরীও পিকআপ করে শ্যামলকে এমনই দূরে আড়ালে গাড়ি পার্ক করে। এই যে চলছে, প্রথম লক্ষ্য কলকাতার সীমা ছাড়ানো। বেহালা-ঠাকুরপুকুর হয়ে বিষ্ণুপুর-আমতলার দিকটা বেশ গ্রাম গ্রাম। প্রথম প্রথম বেশ লাগত। আজ গাড়ি বাইপাসের দিকে ঘুরল। মুকুন্দপুরের দিকে। কিশোরীকে সারপ্রাইজ দেবে শ্যামল।

আমরা কোথায় যাচ্ছি? কিশোরী বলল।

দেখা যাক। খুব হালকা উত্তর শ্যামলের।

কী জবর খবর আছে বলছিলে?

হবে হবে।

বড্ড সাসপেন্সে রাখো তুমি।

ইউ লুক রিয়ালি বিউটিফুল।

বলতে বলতে আচমকা স্টিয়ারিং ঘোরাল শ্যামল। এখানে কী! কিশোরী যেন একটু অবাক হল। এ তো একটা রিসর্ট। এ-সব বড়োলোকি বিনোদন মোটেই পছন্দ নয় ওর। মনে পড়ে গেল, এমনই এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে এক ছুটির দিনে ওরা ডায়মন্ডহারবার পৌঁছে গেছিল। বেশ বেপরোয়া দেখাচ্ছিল শ্যামলকে। সদ্য চাকরিতে একটা লিফট পেয়েছে। ক্রেডিট কার্ড আছে, নগদ টাকাও গোছা গোছা। বলল, আজ সন্ধে পর্যন্ত থাকব এখানে।

সেবার গাড়ি আনেনি। এসপ্লানেড থেকে টানা বাস। নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার। কিশোরীর ভালো লেগেছিল। ছেলেবেলা থেকে বাড়ির গাড়ি। বাসে-ট্রামে চড়েছে কদাচিৎ। দূরপাল্লার বাসে চড়ে কী আহ্লাদ! বলল, হোয়াই নট হোল নাইট। তোর লিমিট বুঝি টিল সানডাউন? তোর সঙ্গে ডেটিং হয় না।

শ্যামল বলল, তুই দেখছি বেশ ডাকাবুকো। জাস্ট একটা আউটিঙে এসেছি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। বসে বসে গঙ্গা দেখব।

শুধু এই? আর কিছু দেখার নেই?

লাইট হাউস আছে।

আর?

আর! একটু ভেবে নিয়ে শ্যামল বলল, আর তুমি আছ, আমি আছি।

কিশোরী তির্যক চোখে চেয়ে বলল, নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ! তারপর ইতস্তত দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, আমাকে কোনও দিন ভালো করে দেখেছিস?

ডায়মন্ড হারবার কাছারিবাড়ির হাতায় শতায়ু বট চামর দোলাচ্ছিল। সামনে আদিগন্ত সাগরমুখী গঙ্গা, মোহনার সন্ধানে উত্তাল প্রমত্ত। পশ্চিম আকাশে সূর্য গুঁড়ো গুঁড়ো মেটে সিঁদুর ছড়াচ্ছিল ঢেউয়ের মাথায়। কিশোরীর মুখে পড়েছিল মায়াবী আলো। সে-আলো তো নিজে দেখা যায় না, শ্যামলের চোখের আয়নায় তার ছায়া দেখেছে কিশোরী।

শ্যামল বলেছিল, একে বলে কনে-দেখা আলো।

কিশোরী লঘু হেসে বলেছিল, আমরা বুঝি রাস্তার বর-কনে? এখানে ঘর পাওয়া যায় না? ওঠ, চল, ভালো করে দেখবি আমাকে।

BanglaBook.org

কাছেই ডাকবাংলো। চৌকিদার এই জুটির দিকে কেমন সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল। ঘর বেবাক খালি, তবু দেবে না। পাস দাবি করেছিল। কুড়ি টাকা বকশিস পেতেই নরম হয়ে গেছিল। অতি উৎসাহে ওদের খাবারদাবার এনে দিয়েছে। যাবার সময় সেলাম বাজিয়েছে।

ডাকবাংলোর বারান্দায় উঠেই চারদিকটা ঘুরে দেখল কিশোরী। এ-রকম থার্ড ক্লাস অ্যাকোমডেশনে ওকে দেখলে ড্যাডি অজ্ঞান হয়ে যেত। কিশোরীর বেশ মজা লাগছিল। আ চেঞ্জ। নতুন রকম একটা কিছু।

বিকেলের ম্লান আলো অতর্কিতে আকাশ থেকে মুছে গেল। চৌকিদার ঘর খুলে দিতেই সেটাকে মনে হল একটা অন্ধকার চৌখুপি। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছিল চৌকিদার। প্রথমেই বাথরুমে ঢুকে জলের ব্যবস্থা দেখে এসেছিল কিশোরী।

চৌকিদার যাবার সময় দরজার পাল্লা টেনে দিয়ে গেল। তখনই বাথরুম থেকে বেরিয়ে চৌকিদারের উদ্দেশে কিশোরী বলল, থ্যাঙ্কু।

রিসর্ট দেখেই কত দিন আগেকার এ-সব পুরোনো কথা কিশোরীর মনে পড়ে গেল। ছবির মতো, একটার পর একটা।

রোঁয়া-ওঠা জাজিম পাতা বিবর্ণ খাটের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল কিশোরী। দু'হাত বাড়িয়ে শ্যামলকে ডেকেছিল, কী হল? আয়। দেখবি না?

কিছুক্ষণ ওর দিকে অপলক চেয়ে রইল শ্যামল। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে খাটের এক প্রান্তে বসল। কিশোরীর প্রসারিত হাত দু'টি ধরে তুলে বসাল তাকে পাশে। তীব্র আবেগে শ্যামলকে জড়িয়ে ধরল কিশোরী। শ্যামল সতর্ক শান্ত স্বরে বলল, তুই বড়ো সুন্দর, বলেই, মুখোমুখি বসে কিশোরীর উত্তপ্ত কপোলে হাত রেখে মুখটা উঁচু করে ধরল। চুম্বন করল অধরোষ্ঠে।

বিচ্ছিন্ন হয়ে মুগ্ধতাবিজড়িত স্বরে বলল, আমরা কী প্রমিস করেছি মনে নেই? ঝুম্পা লাহিড়ি যাকে বিয়ে করেছে সে সাহেব, ভালোবাসার বিয়ে অবশ্যই। ডেটিং করেছে। বিয়েটা হল হিন্দু মতে। অগ্নিসাক্ষী করে। শুভদৃষ্টি, বাসর, কুসুডিঙে কিছু বাদ যায়নি। এ বিয়ের চার্মই আলাদা।

প্রমিস করেছিল ওদের অ্যাফেয়ার কেউ জানবে না। সে-প্রমিস কিশোরী রেখেছে। তাই বলে প্রি-ম্যারিটাল সেক্সে বাধা কীসের। কিশোরী মনে মনে ফুঁসে উঠে বলেছে, এ কাওয়ার্ড।

রিসর্টে স্যুট বুক করা আছে।

এ-সব কিশোরীর কাছে নতুন কিছু নয়। বলল, হঠাৎ এখানে? সারপ্রাইজ দিচ্ছ?

সারপ্রাইজের এখনও অনেক বাকি। শ্যামল বলল। এইবার আমি প্রোপোজ করছি, লেট আস হ্যাভ সেক্স এগেইন।

কিশোরী হাসল, হঠাৎ মতি পরিবর্তন!

কারণ আছে। গেট রেডি ডার্লিং। আমি তোমাকে কারেজ দিয়েছি, বলো। বিয়ে যখন স্থির, ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা রিহার্সাল দেব অ্যাজ স্পাউসেস।

কিশোরীকে আলতো করে শুইয়ে দিতে দিতে শ্যামল বলল, আজ নিশ্চয় প্রোটেকশন নেই?

তা নিয়ে তোমার না ভাবলেও চলবে। কিশোরী বলল, সব কাজেই লোকে চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা। ম্যারেজ ইস নো একসেপশন। প্লিজ পারফর্ম ওয়েল।

শরীরের খিদে মিটে গেলে খবরটা দিল শ্যামল। বলল, এইটা রাখো।

কী এটা?

সেই জবর খবর। বিজ্ঞাপনের বক্স নম্বর।

রোববারের আনন্দবাজার দেখো। আমরা ছবি চেয়েছি। যা হোক করে তোমার মমের নোটিশে আনবে। গড়াপেটা খেলা, এটা যেন কেউ টের না পায়।

BanglaBook.org

মতলবটা শ্যামলের। কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না কিশোরী! ইস, কী বোকা বোকা লাগে। পত্রিকায় অ্যাড দেখে সম্বন্ধ করে বিয়ে!

ভাব-ভালোবাসা হয়েছে, প্রি-ম্যারিটাল সেক্স হয়েছে, বিয়ে তো হবেই। শ্যামল প্রথম থেকে বলে আসছে, এতে আর নতুনত্ব কিছু নেই। নিগোসিয়েশন ম্যারেজের চার্মই আলাদা। হয়ে গেল প্রমিস। বাড়িতে জানবে না, বন্ধু-বান্ধবীরা জানবে না। শেষ পর্যন্ত জানলও না।

তিন

বিজ্ঞাপনের উত্তরে অনেকগুলি পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। খড়দার কাকা একটার পর একটা দেখছেন। বললেন, ফটোতে তো সব মেয়েকেই অপ্সরী লাগে বউঠান।

শ্যামল যেন কিছুই জানে না। বিয়েতে কোনও আগ্রহ নেই এমনই একটা ভাব রক্ষা করে যাচ্ছে। এক দিন রাত্রে ওর ঘরে এল মা। যথারীতি ল্যাপটপের ওপর ঝুঁকে আছে ছেলে। মা বলল, এই ছবিগুলো রইল। সময় হলে দয়া করে একটু দেখো।

মুখ না-তুলে খুব নিস্পৃহ গলায় শ্যামল বলল, তোমরাই তো দেখছ মা।

মা খুশি হল, তবু কপট রাগে বলল, দিন দিন কী হচ্ছিস বল তো শামু! শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করবি তো?

ফাঁকির এই শুরু।

কাকাবাবু বেজায় খুশি। বিয়ের কথাবার্তা তিনিই চালাচ্ছেন। কেউ কিছু টের পেল না।

কিশোরীর হাত থেকে বিয়ের কার্ড পেয়ে বন্ধু-বান্ধবীরা অবাক। সে কী রে! তোর এমন নিরামিষ বিয়ে! কোনও গুঞ্জনই তো শুনলাম না। কবে কী করলি?

আমি করতে যাব কোন দুঃখে! ড্যাডির পছন্দ। যাস কিন্তু।

শ্যামলের বন্ধুরাও সমান অবাক! এত বড়ো কোম্পানির রাইজিং এগজিকিউটিভ, আজ ব্যাঙ্কক কাল সিঙ্গাপুর করছে, সে এই রকম ওল্ড ফ্যাশন বিয়ে করছে! নো এনগেজমেন্ট, নো অ্যানাউন্সমেন্ট!

পুরুত-টুরুত ডেকে শাস্ত্রমতে বিয়ে-থা বলতে গেলে উঠেই গেছে। হঠাৎ এমন একটা বিশুদ্ধ বিয়ের চিঠি পেয়ে দু-বাড়িতেই আত্মীয়-কুটুম্ব আসা শুরু হয়ে গেল। কিশোরীদের বাড়ির হাতায় প্রচুর জায়গা, সেখানেই মণ্ডপ বানাচ্ছে ডেকরেটার। বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়েছে শ্যামলরা। সেখানে শুধু লোক খাওয়ানো। বউভাত, ফুলশয্যা ইত্যাদি সব বাড়িতে। নতুন বউঝিরা সর্বাঙ্গে গয়নাগাটি পরার, বিয়ের বেনারসি বা তোলা দামি শাড়ির পাট ভাঙার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। খড়দার কাকার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও শ্যামলের মা বাসনাকেও একটা চিঠি পাঠাল, ওর বরের নামে। বলল, ওর দাদার বিয়ে, বাসনা আসবে না? যাকেই বিয়ে করে থাক, মেয়ে কি পর হয় ঠাকুরপো! খড়দার কাকিমা চোখ মুছল।

বাসনা এল, চিত্ত এল না।

বয়স্করা মাতলেন শাস্ত্রসম্মত রীতিনীতি আর স্ত্রী আচার নিয়ে, দু-বাড়িতেই। সবাইকারই এক-একটা জানা, এবং সেটা অবশ্য করণীয়। গায়ে হলুদের তত্ত্বর দিকটা দেখভাল করবেন খড়দার কাকা।

দিন কখন গড়িয়ে গেল, আনন্দসন্ধ্যা নেমে এল, কেউ যেন টেরই পেল না। বিয়েবাড়ির একটা আশ্চর্য গন্ধ আছে, মেয়েলি গন্ধ, আসে শাড়ি-ব্লাউজ আর খোঁপা বা বেণী থেকে। বরযাত্রীর সঙ্গে বাসনাও এসেছে হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে। বিশাল আয়োজন। তবু অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করল। আগেভাগে গিয়ে আলাপ করল কিশোরীর সঙ্গে। নামি পার্লারের বিউটিশিয়ানরা এসে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। এক পলক দেখেই পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। বলল, আমি বাসনা। শ্যামলদার খুড়তুতো বোন। বলেই কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা স্বরে রসিকতা করল, বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে বউদি?

BanglaBook.org

পিঁড়িতে করে কনেকে ঘোরানোতে কোনও মেয়েই আর রাজি হয় না আজকাল। পানপাতায় চোখ ঢেকে বউদি হেঁটে ঘুরল সাতপাক। দাঁড়িয়ে, বর-কনের মাথার ওপর ধরা কাপড়ের নিচে শুভদৃষ্টি। কাছ থেকে সবই দেখছে বাসনা। দেখল বিয়ের আসরে কন্যা সম্প্রদানের খুঁটিনাটি। শ্যামলদা বউদিকে পিছন থেকে বেড় দিয়ে খই ছড়াল, শিলের ওপর নোড়া ঠেলল পা দিয়ে। বরের বোন বলে বাসনাকে চিনে গেছে সবাই। কিশোরীর এক গিন্নিমতো দিদি ওকে জিজ্ঞেস করল, এই যে ভাই, কী দিয়ে সিঁদুর পরানোর রীতি আপনাদের? বরের আংটি, না —।

বাসনা বলল, বাবা জানে।

বাসর কবজা করল কিশোরীর বন্ধুরা। সব মড মেয়ে। বাসনা মানিয়ে নিয়েছে ওদের সঙ্গে। হঠাৎ কিশোরীর এক দূরসম্পর্কের ঠাকুমা এসে জাঁকিয়ে বসল। মেয়েগুলিকে লক্ষ্য করে বলল, বুড়িকে দেখে অমন চুপ মেরে গেলে কেন গো! বাসরের আচার অনুষ্ঠানগুলো সারো।

বুড়ির চোখে যৌন-রসিকতার ইশারা। মেয়েরা উৎসাহে কল কল খল খল করে উঠল। ঠাকুমা শ্যামলকে উদ্দেশ করে বলল, তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে ভাই, একটা স্ত্রীআচার, আমার নাতনির হাঁটুতে একটা তাগা বাঁধা আছে, ওটা তোমাকে খুলতে হবে।

শ্যামল বলল, ও নিজে খুলুক।

মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল, খুলুন মশাই, খুলুন।

কোথায় বাঁধা আমি কী করে জানব। শ্যামল বলল। ও-সব গোপন দড়িদড়া আমি খুলতে পারব না।

খুব পারবেন। ঝাঁকের মেয়েরা বলে উঠল। আর এক জন এক ধাপ এগিয়ে বলল, ওইটেই বিয়ের প্রথম পাঠ।

চোখে চোখে এক সময় কথা হয়ে গেল শ্যামল আর কিশোরীর। মেয়েবন্ধুদেরও ফাঁকি দেওয়া গেছে।

পরদিন থেকে উৎসব শ্যামলদের বাড়িতে। বধূবরণ থেকে শুরু করে সব কিছুতেই রোমাঞ্চ। উপভোগ করছে কিশোরী। কালরাত্রি কেটে গেল দ্রুত।

বাসনা নতুন বউকে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিশোরীর সঙ্গে বাসনাও ঢুকল বাথরুমে। বলল, নাও, শাওয়ারের নিচে ভালো করে নেয়ে নাও। শেষ দুপুরে পার্লারের মেয়েরা চলে আসবে। তারপর ফের জবরজং সাজগোজ করে বিয়েবাড়িতে গিয়ে বসা। বাড়িটার নাম তো দেখেছ কার্ডে — সঙ্গম। বলেই একটু হাসল। সে-সব এ বাড়িতে, ফুলশয্যা দাদার ঘরে।

বাথরুম থেকে বেরুবার সময় বাসনা বলল, কেমন লাগছে বউদি? সেই পরশু থেকে শুরু হয়েছে, অনুষ্ঠানের আর শেষ নেই।

সঙ্গম ছেড়ে নিজেদের বাড়িতে আসতে আসতে রাত প্রায় বারোটা। সন্ধ্যারাত্রিতে যারা ফুলশয্যায় আড়ি পাতবে বলে নানা মতলব করেছে তাদের উৎসাহে তখন ভাটা পড়েছে। খুড়তুতো কাকা শ্যামলকে ছাড়েন না। যাবতীয় দায়দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন, অথচ সব ব্যাপারে শ্যামলকে চাই। পরামর্শ করবেন। শ্যামলকে ক্লান্ত করে দিয়েছেন তিনি।

মা উৎসাহী দেওর-ননদদের তাগাদা দিল, ওরে, আর কখন ফুলশয্যা হবে। আয় দেরি করিস না। বিন্দু কোথায় গেল, বিন্দু? এবার ওদের শুইয়ে দে।

বিন্দু শ্যামলের মাসতুতো বোন। ও-ই নেতৃত্ব দিল। বাসনা কিছুতেই এল না, ওর ভীষণ মাথা ধরেছে।

শ্যামলকে ধরে নিয়ে এল বিন্দু। সমবয়সি, বন্ধুর মতো ওরা। পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে।

BanglaBook.org

শ্যামাল বলল, তুই পারবি?

পারি কি না-পারি দেখবি চল না, বিন্দু বলল। শ্যামলের হাত ছাড়েনি। ফুলশয্যার ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই বলল, নারকোলটা কোথায় মাসিমা?

শ্যামলের মায়ের ইচ্ছে, আরও কিছু লোকজন জুটুক ঘরের সামনে। ঘরে ঘরে ডাকছে জ্ঞাতি-কুটুম্বদের। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বলল, ওখানেই সব আছে। একটু দেখেশুনে নে না মা।

নারকোল দিয়ে কী হবে? শ্যামল জিজ্ঞেস করল।

বিন্দু বলল, তোর বউয়ের মাথায় ভাঙব।

বলেই মেঝেয় আছড়ে জল নিল পাত্রে। কিশোরীকে দিয়ে সেই জলে শ্যামলের পা ধোয়াল। তারপর বলল, এই বউ, এবার চুল দিয়ে বরের পা মুছে দে।

তেমন চুল নয় কিশোরীর। সবাই হাসল।

কেউ লক্ষ্য করেনি কখন বাসনা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। ফস করে বলল, যত সব ভালোলাগার ব্যাপার।

বিন্দু বলল, এ-সব বিয়ের অঙ্গ, করতে হয়।

জটলার মধ্য থেকে কে এক জন বলল, ভাব-সাব করা বিয়েতে অবশ্য লাগে না। খাতায় দু'জনে দুটো সই করো, আর বাড়ি গিয়ে এক খাটে শুয়ে পড়ো।

একটা অমোঘ কটাক্ষ।

শ্যামলের মা দূর থেকে হেঁকে বলল, আর দেরি কোরো না, অনেক রাত্তির হয়েছে।

চার

বাইরে আলতো পায়ের ছুটোছুটির শব্দ। কিছু ফিস ফিস কানাকানি। কান খাড়া করে কিশোরী ঠায় বসে রইল। এক সময় নিশ্চিন্ত হল কৌতূহলী আড়িপাতিয়েরা হতাশ হয়ে যে-যার ঘরে শুতে গেছে। কিশোরী হাতের চুড়ি, মানতাসা খুলে রাখল। হাত দুটো বেশ হালকা লাগছে। গলায় চিক, সীতাহার। এ-সব এই প্রথম। গলা খালি হলে স্বস্তি হয়। বাঁধন পিছনে। খোলবার জন্য হাত তুলেও হাত নামিয়ে নিল। শ্যামল খাটের ওপর টান টান শুয়ে। কিশোরী সন্তর্পণে ঠেলা দিল ওকে। চাপা স্বরে বলল, পেছনে হাত পাচ্ছি না। একটু খুলে দাও না।

শ্যামল উঠল। চিকের সুতোর গিঁট আর হারের আংটা খুলে দিয়েই আবার শোবার জন্য হেলে পড়ল।

কিশোরী বলল, তোমাকে খুব টায়ার্ড লাগছে। ঘুম পাচ্ছে, না?

আর শোয়া হল না শ্যামলের। দু'হাত কোমরের দু'দিকে দিয়ে মৃদু চাপ দিল, ক্লিষ্ট মেরুদণ্ড টান করে বসল। বলল, তুমি শোবে না?

আজ কিশোরীর আচার-আচরণ কেমন যেন বদলে গেছে। নিজস্ব পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করতে যার সামান্য দ্বিধা ছিল না, বরং তাকে দুঃসাহসিক ভাবে প্রলুব্ধ করত নিজের প্রতি, সেই মেয়ে এমন শীতল হয়ে যায় কী করে!

সারা দিন একটু ঢিলেঢালা হতে পারেনি কিশোরী। মাথার কাপড় ফেলে একটু স্বাভাবিক হল। ভারি বেনারসি ছেড়ে হালকা নরম তাঁতের শাড়ি পরল। বেনারসি ব্লাউজটাও খুলে আলনায় রাখল। রেখে ফের বিয়ের খাটে এসে বসল। আঁচল দিয়ে বুক-পিঠ ঢাকা। শ্যামলের দিকে পিঠ দিয়ে বসে পিঠ অনাবৃত করল। বলল, দম বন্ধ হয়ে আসছে। হুকটা খুলে দাও তো।

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

হুক খুলে কিশোরীর মসৃণ পিঠ একটু হাত বুলাল শ্যামল, অন্তর্বাসের চাপ-ছাপ দু'ই কাঁধের ঢালে। এ নারীদেহের এ-পিঠ ও-পিঠ চেনা শ্যামলের। নিতম্বের ওপর খাঁজে যেখানে মেরুদণ্ড শেষ হয়েছে সেই লোভনীয় টোল-খাওয়া জায়গায় কিশোরীর একটা জড়ুল আছে, তা-ও শ্যামলের জানা। কোনও রহস্য নেই আর। শ্যামল শুড়ে পড়ল। বলল নাও, এবার শুয়ে পড়ো।

কিশোরীর মনে হল শ্যামলের স্বরে কেমন অবসাদ। নিরুত্তাপ, নিরাবেগ। সন্দেহের চোখে একবার তাকাল শ্যামলের দিকে। কিশোরীর বৈধ স্বামী। বলল, কেউ না-কেউ ঠিক আড়ি পেতে আছে। আলোটা নিভিয়ে দিই।

ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে গেল। বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে শ্যামলের মাথায় হাত রাখতে গেল কিশোরী, স্তনসন্ধিতে মুখ চেপে ধরবে ওর। দেহমিলনের এটাই ওদের প্রথম ধাপ। মুহূর্তে টের পেল, শ্যামল পাশ ফিরে শুয়েছে। ভীষণ হতাশ হল কিশোরী। হঠাৎ মনে হল, বিয়ের আগের শারীরিক সম্পর্ক যদি অবৈধ তবে এ বিবাহও অবৈধ। তির্যক ভঙ্গিতে বলল, ঠাকুরঝিরা ভাবছে আমরা কী না কী করছি।

শ্যামলের চোখ জড়িয়ে আসছে, কথাও। বলল, আমাদের ম্যারেজ কনজুমেটেড হয়ে গেছে অনেক আগে। তুমি ঘুমোও। বিন্দুরা যদি আড়ি পেতে থাকে ওরাই ফাঁকি পড়বে।

কান্না পাচ্ছে কিশোরীর। কী লাভ হল ফাঁকির এত বড়ো একটা আয়োজন করে? কাল রাত পোহালেই বাসনা আসবে, বিন্দু আসবে, গোয়েন্দার চোখে দেখবে নতুন বউকে। আসল ফাঁকির জায়গাটা ধরা পড়ে যাবে না তো? কিশোরীর পরনে পাটভাঙা তাঁতের শাড়ি। একটুও অবিন্যস্ত নয়। ধামসানো নয় মোটেই। অন্ধকারে খাট থেকে নামল কিশোরী। পরনের শাড়িটা খুলে দু'হাতে চটকালো। তারপর আবার সেটা পরে নিয়ে শ্যামলের পাশে শুয়ে পড়ল॥

আবদুল জব্বার
হীরেমন পাখি

বালিমাটির মধ্যে পাতা পচা এঁটেল কাদা। পায়ে পায়ে চটকায়। গজালের তেউড় উঠেছে চারদিকে ভীষ্মের শরশয্যার মতো। পেয়ারাবানি, গর্জনবানির জঙ্গল পার হয়ে একটু উঁচু ভূমির চরে আসতেই গ্রীষ্মের জালিকাটা রোদে-ছায়ায় হিজল বনটার নিচে লালচে গোলাপী লতানে ঝরা ফুলের যেন বিছানা পাতা। সতীশ আদকের মনে হল একটু শুয়ে পড়ি। হাতখানেক লম্বা ধারালো বর্শার হেঁতাল-ডাণ্ডা দিয়ে ঝুলন্ত ডাল-পাতা ঠেলে লক্ষ্য করল পাড়ার বুড়োর মতো একটাই কাল্‌চে-খয়রা হিজল গাছ তার বংশবীজ ছড়িয়ে মাঝারি উঁচুর ঝোপজঙ্গল তৈরি করেছে। বুড়ো গাছটার বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেলেও উঁচুতে তেমন বাড়েনি। মোটা হয়েছে পাশে আর ঘন ঘন গাঁট গজিয়েছে চারদিকে। সুন্দরবনের গাছের এই প্রকৃতি। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে গেলে উঁচুতে উঠলেই ভাঙবার ভয়। শেকড়ও চারিয়ে দিতে হয় চারিদিকে জালের মতো। ওপরে যত ডালপালা নিচেও তত শেকড়ের শাখাপ্রশাখা। গরান, পেয়ারা, বানি, সুঁদরির গজাল ঠেলে ওঠে।

আকবর হঠাৎ পটাস শব্দ করে ডাঁস মারল উরুর ওপর থেকে। নদী কাছেই, ঝোড়ো হাওয়ায় জলের ওপর ঢেউ আছড়ানির শব্দ হয়। পাখিরা জঙ্গলে মানুষের আগমন দেখে নানা রকম শব্দ তুলে

উড়ে গিয়ে খানিকটা দূরের বনের ওপরে যেন ঝুপ ঝুপ করে পড়ে যায়। বনমোরগ ছুটে যেতে যেতে উড়ে ডালে বসার মুহূর্তেই শিকার হয়ে যায় কটাশের। বনবিবির বা দক্ষিণা রায়ের মানত-পুজো দিয়ে বনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া এই সব মোরগ-মুরগিদের মারা নিষেধ। জঙ্গল ঝাঁট দিয়ে অবশ্য চিমটে-হাতে ঝুড়ি-কাঁখে মেয়েরা দল বেঁধে এসে ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে সাতজেলে, মোল্লাখালি, গোসাবা, ক্যানিং-গঞ্জের হাটে-বাজারে বেচে আসে। চিমটি না থাকলে, নাঁটা, বঁইচি, হেঁতাল, তেকাঁটাল, হরকোচ, সেঁয়াকুল, শোঁকরাতে ঘাসের ঝোপ থেকে ডিম টেনে বার করা দুষ্কর ব্যাপার। শরখড়ি, হোগ্‌লার শুকনো পাতা এনে এনে এক-এক জায়গায় 'তা' বা বাসা বানিয়ে এক ওজলে বারো-চোদ্দটা ডিম পাড়ে মুরগি। বাচ্চা ফোটার সময় কেউটে বা দাঁড়াস কেওড়া গাছের ভাঙা খোড়লের ভিতর থেকে খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে বালিহাঁস, বন মুরগি, ডাহুক, জলপিপির বাচ্চা চুরি করে খেয়ে পেট ভরায়। তখন পাখিরা চেঁচামেচি করে। মোরগরা এক সঙ্গে আক্রমণ করে সাপেদের। ঠোঁটে-নখে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

আসে নেউল-বেজি, স্বর্ণ-গোধিকা, কৃষ্ণ-গোধিকা-গোসাপ বা গোহাড়গেল।

ঝড়ে গাছ দোমড়ায় মোচড়ায় — আলস্য ভেঙে নাচে যেন, তবু ভাঙে না, কেননা প্রকৃতি তাদের আঁশকে পাকিয়ে দেয় ভাঁজে ভাঁজে পরতে পরতে।

ঝোড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতারা গড়াতে গড়াতে ছুটে যায় জঙ্গলের সুঁড়িপথে দীর্ঘশ্বাসের মতো গুমোট গরম টেনে, তখন সেই শব্দ শুনলে মনে হয় যেন খালি গরুর গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে কোনও ঘর-ফেরত গাড়োয়ান।

সতীশ সাতাশ বছর জঙ্গলে আসছে, তাকে বাঘে খায়নি, মন্তর জানে মেলা, অবশ্য সাপে কেটেছে তিনবার। সে বলে, কেউটে কামড়ালে দপ্ করে 'ইলেকট্রিক' শক লাগার মতো হবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার মতো জ্বালাবে ছটকাবে। কালকেউটে কামড়ালে দাবার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত গড়াবে — চেপে ধরে রাখতে পারবেনে। বাহ্যে-বমি হবে খুব। আর চন্দুরে বোড়া কামড়ালে বরাক (বরফ) চাপানোর মতো কন কন করবে। আমার মনসার থানে একটা পাহাড়ী মুলের তেউড় ঠেলা সবুজ ভাণ্ডার গাছ আছে, তাকে পুজো করি, রোজ সন্ধে দেয় বউ, তার ডগা কেটে বেটে রস লাগিয়ে দিলে সব ঠেণ্ডা!

আকবর, সতীশ আর চিন্তামণি কেওড়া-ঝাউ-বানি-গরান-সুঁদরি-বাটাঙের বনে এসে ডালে ডালে ভালুক বা হুনোমান বাঁদর ঝোলার তো অসংখ্য ডাঁস-মউয়ের চাপ (চাক) দেখতে পায়। লগির মাথা গলিয়ে পরখ করে সতীশ। গড় গড় হড় হড় করে লগিবাড়ির গা বেয়ে নেমে আসছে মধু।

চেখে দেখে আকবর সায় দেয়, হাঁ, আসলি মাল, ফুলপট্টি ভুরভুরে গন্ধ, কেওড়া ফুলের মউ থেকে বাইনেচে সোনালী ডানার রানি মৌমাছিগুলো। উড়ে যাওয়ার সময় যারা গান করে, ডানার শব্দে যেন ঝড়ের চাপা আওয়াজ, ছুটে চলে তাদের পেছনে এঁড়ে মাছিগুলো। এই ফুলপট্টির দাম ডেড়শো টাকা কেজি। লাট-মন্ত্রিরা খায়। শরীরখেনা সুন্দুরীদের মতো চমক মারবে। হার্টে অসুখ হবেন। আর বালিহার মউ লালচে। ঘন, ভুরভুরে গন্ধ তারও আছে, তবে দু-নম্বর, একশো টাকা কেজি। খাল্‌সি লতা, আশমান দোলা লতার ফুল থেকে হয়। লালমড' তিন নম্বর। গরান বা গর্জনবানির ফুলের রস থেকে হয়। আশি নব্বই টাকা দাম।

তুই বড্ড বকিস! শালা, গেঁড়ার গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি!

সতীশ লগির মাথায় হেঁতাল, খেজুরের শুকনো পাতাগুলো ধরে রেখে তার ওপরে কাঁচা ডালগুলো বেশ করে সাপটে বেঁধে নেয় গোলঞ্চের লতা দিয়ে। তারপর দেকাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে মৌচাকের নিচে নিচে তুলে ধরে। মৌমাছিগুলো ডানা পুড়ে মরার ভয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়ে পালায় ডালগুলোর

BanglaBook.org

ফাঁক দিয়ে, আকাশের দিকে, কয়েক মুহূর্তের পিলপিলে ধোঁয়াটে কালো স্রোতের মতো। অনেকে আবার ডানা খুইয়ে পড়ে যায়।

কোমরে কাস্তে গুঁজে নিয়ে চিন্তামণি ছোকরা ভাম বা উদ্‌বেড়ালের পানা গাছে উঠে যায়, গাছের ডালে ডালে মধুর চাকের নিচে কাস্তে টেনে যখন তা কেটে ফেলে দেয় হাসিয়ান চট পেতে ধরে লুফে নেয় সতীশ আর আকবর। হলদে সোনালী মধুভরা চাকের থাক থাক কোষাগুলোয় ঠিক তিনচাঁদের পূর্ণিমার সময়ে। আরো দেরি হলে পোকা হয়ে যাবে। চাকগুলো সাজিয়ে রাখে প্লাস্টিক কাগজের ওপরে।

সতীশ গেঁড়া আকবরকে খোঁচাবার জন্য একটা লোক-চল্‌তি দখনে ছড়া বলে:

বাঁশ পাকলে সরু
পোদ পাকলে গরু
কায়েত পাকলে হীরের ধার
মোচনমান পাকলে গপ্পসার

তোকে জঙ্গলে কথা বলতে বারণ করলেও চাঁদবদনী হীরেমন পাখির গুণগান করবিই।

চারিদিকে চোখ রেখে চলতে হয়। ঘরের বউয়ের কথা ভাবার জায়গা নয়, সে যতই সুন্দরী নিকের বউ হোক।

আকবর তবু একটু মধুভরা চাক দেখিয়ে হেসে হেসে মাথা নাড়ে, অর্থাৎ তার সাধের হীরেমন পাখি ওই রকম।...

ঘণ্টা তিনেক জঙ্গলে মউ ভাঙবার পর তিন জন লুকিয়ে লাইসেন্স-না-করা মউলের তিনটে প্লাস্টিক-ছালা ভরে যেতে সতীশ গুনগুনিয়ে বনবিবি আর দক্ষিণরায়ের প্রশস্তি-গান গাইতে গাইতে জঙ্গল ছেড়ে বেলা নামার আগেই নদীর তীরের দিকে নেমে আসে। হঠাৎ চিন্তামণির চোখে পড়ে বড়মিঁয়ার পায়ের ছাপ।

সতীশ, আকবরও যেন চার চোখ মেলে দেখে।

ফিসফিসিয়ে বলে সতীশ, বড়মিঁয়া গ্যাছেন একটু অগ্রে, কাঁচা পায়ের ছাপ! চিতার ছাপ সামনের পায়ের যেখানটায় পড়ে ঠিক সেখানেই পড়বে পেছনের পা দুটোর।

তুই বড্ড বকিস্, শালা! বলল আকবর। এহোন মোর প্যাটের ভেতর পিলে চমকাচ্ছে ভয়ে। দ্যাখ্ না হেঁটো কোনাই ক্যামন করে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লেগেছে মোর। জলদি চল। বাঘ যাখন ধরে পেছন থেকে বেরালের পানা লুকিয়ে ওৎ পাতে। পর পর তিনবার ল্যাজের সাপ্‌টা মারে ভুঁয়ে। ঠিক তার পরেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শিকার ধরে।

আমরা এ-সব জানি। তোর সুন্দরী নতুন বউকে এ-সব শোনাবি। বলে সতীশ।

মধু খেতে খেতে আসছিল চিন্তামণি। পেছনে কেবলই তাকাচ্ছিল।

আকবর বলে, শালী বড্ড বেয়াড়া, রাতের বেলা বাঘ ডাকার গলা ঘড়ঘড়ানি শোনালে তবে কাছে এসে লুটি পাকায়!

মহাজন রহমান সায়েবের চোখ পড়েছে তোর নয়চা নিকের বউ হীরেমন পাখির ওপরে! তার দোকানে হেসে হেসে রগড় করে কথা কয়।

নানা (দাদামশায়) হয় তো। নাতবউ হলে ... হ্যাঁ রে, বোতলটি কই মোদের? বললে আকবর।

তাই তো। এখানেই তো ছ্যালো। কি রহম নঙ্গল দিলি ওই শালা চিন্তে। সতীশ অভিযোগ তুলল চিন্তামণির কাজের।

ভালো করে চেপে চেপে উঠে ডাইড়ে'ই তো ছিনু। বলল চিন্তামণি ছেকরা।

BanglaBook.org

দাঁইড়ে চাপ দিলে কী বালিমাটিতে শোয়া ফলা গাঁথে? নঙ্গরকে গোড়া ধরে টেনে আনলেই তো গেঁথে যায়। বলে সতীশ।

চারদিকে তাকায় তিন জনে। নদীর তিনটে মুখ এখানে। তিন দিক দ্বীপ। বড় বড় দ্বীপে অবশ্যই বাঘ থাকতে পারে। ছোট দ্বীপে নয়। মৌমাছিরাও জানে বড় দ্বীপে ভরসা পায় না মানুষ আসতে। তেমুখি এখানে বেশ চওড়া। নদীতে এখন ঝোড়ো ফৌতি। মাঝখানের দিকে গড়েন খোব আছে খুব। চড়ার দিকে গাছের মূল আছে, পায়ে লাগে। কামট আছে। হাঙরের জাতভাই। কামড়ে মাংস তুলে নেবে। কয়েকটা ছোট মেছো কুমীর শিকড়-বাকড়ের তলার বড় দ থেকে কাদা মেখে নেমে গেল নদীর জলে।

তিন জনে ছ'টা চোখের দিকে তাকায় পরস্পরে।

এখন তারা নিরুপায়। নৌকা ভেসে গিয়েছে। পেছনে সন্ধ্যা। বাঘের ভয়।

কলজ দ্বীপটা তো ওইটা? ওখানে ডাকাতেরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তারা ওইটুকু খিলে নৌকোর 'বোটে' লেবে কেন? তারা তো জেলে-বহর মাছ শিকার করে জাড়ের মোরশোমে নীলামে বেচে টাকা লিয়ে ফেরার কালে লুটে লেয়। মোদের সঙ্গে কি কেউ তামাসা মশকরা করল? বলল আকবর লস্কর।

বেলা এবার পড়ে আসছে। কালো মেঘ দেখা দিয়েছে পশ্চিম দিকের বাঁ-কোণে, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের দিকে। সেটাই ভয়ঙ্কর। হু-হু করে ছুটে আসছে মেঘের রাশি। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। পান-পায়রা, জলপিপি, বালিহাঁস, শামুকখোল, মাণিকজোড় পাখিরা বিরাট সারির মালার মতো এঁকেবেঁকে ভেসে চলেছে নদীর ওপরে। দুলছে তারা ঢেউয়ের ওপরে।

কোথাও নৌকোর নিশানা দেখা যায় না।

তাহলে কি জলপুলুস লিয়ে চলে গেছে? শুধোল আকবর।

মউলে বা বাউলিদের দল তো এ-দিকের জঙ্গলে আসেনি। সপ্তা খানেক আগে এক জন মউলে সর্দারকে বাঘে লিয়ে গিয়ে ডহরখালির বন থেকে। তিন দিন আগে সাত জন মউলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ঢুকিয়েছে পুলুস। বউরা গিয়ে পায়ে পড়ে কাঁদলেও ছাড়ান দেয়নি। টাকা দিলে নাকি হত। টাকাই এখন ভগবান। গরিব বড়লোক সবাই এখন টাকার গোলাম। বলল সতীশ চিতোড় চুলকোতে চুলকোতে। ডাঁস কামড়ানোর জায়গায় মুখের লালা লাগায়।

সব ভাবনার গলায় দড়ি এখন, নৌকো কই? বলল আকবর। দুর্ভাবনায় কালঘাম গড়াচ্ছে তার পাথরকালো শক্ত গতর থেকে। পঞ্চাশ বছরেও সে এখন জোয়ান মরদ।

যাব কী করে তিন জন মানুষ? জঙ্গলে বাঘের হাতে মারা পড়ব? চিন্তামণির গলায় কান্নাস্বর ভেসে ওঠে।

রহমান মাঝির টাবুরে। তাকেই মউ দিতে হবে। আগাম টাকা নিয়ে রেখেছে অথবা মুদিখানায় বাজার খেয়েছে তারা।

মহাজন অনেক কম টাকায় মাল নেবে। বেচবে প্রায় ডবল দামে। তাও খদ্দেরকে খাঁটি মাল দিলেও কথা ছিল। এমন ওষুধ দেবে যে জলে ফোঁটা ফেলে বা আগুন জ্বেলে ভেজাল কি না ধরতে পারবে না।

মানুষ দিন দিন বেশি বুদ্ধিমান, চতুর, স্বার্থপর হচ্ছে। শয়তানের কর্তৃত্ব এখন পৃথিবীজোড়া।

রহমান মিঁয়ার দাড়ি আছ। লোকদেখানো নামাজ পড়ে। কুমিটা নৌকো ভাড়ায় খাটে। পাকা বাড়ি টিভি এনেছে।

পাগল হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। নৌকো কি উড়ে যাবে? তার ডানা গজিয়েছে? ৯৯৯৯ নম্বর নৌকো। ডাক দিলে কি সাড়া দেবে?

BanglaBook.org

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। বাঘের ডাক শোনা গেল কিছু দূরের রহস্যময় আঁধার-ঢাকা অরণ্যে। মেঘের গর্জনে মেদিনী কেঁপে ওঠে।

ঠিক হয় ঝড় বৃষ্টি আসার আগেই মালঝাল সব নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপ দেবে তারা। জোয়ার উঠেছে। ঠেলে নিয়ে যাবে উত্তর দিকে। যে-কোনও লোকালয়ে যেতে পারবে, অবশ্য সে-সব এখান থেকে বিশ মাইল দূরে। কার মুখ দেখে বেরিয়েছিল তারা!

চিন্তামণি কাঁদতে থাকে। ঘন ঘন জঙ্গলের দিকে তাকায়। মাগো! তোমার নিষেধ না শুনে কেন জঙ্গলে এনু!

সতীশ বলে, একটা কিছু ঘটেছে। ঝড়খালির ঘাট থেকে ঝাউখালি পর্যন্ত একটা নৌকোকে আমাদের পিছু পিছু আসতে দেখেছিলাম আমি। মাথার টুপি দেখে মনে হচ্ছিল রহমান মাঝি। যাচ্ছে বোধহয় কোথাও। চারদিকে ওনার ধান্দাবাজি। আচ্ছা, যদি আমাদের নৌকোটা সরিয়ে নেয় লোক দিয়ে অন্য কোথাও?

আকবর বলে, দূর শালা! তোর মাথাটা গেছে। বউ বুড়ি হলে সে-সব খেয়ে লেয়, মাথার মগজ পর্যন্ত।

চোপ! তুই গরু খাস, মাথায় ঘি হবে কোত্থেকে? মাংসে মাংস বৃদ্ধি হয়। বুড়ো বয়সে সুন্দরীকে নিকে করাটার জন্যই জীবন যাবে। তোর সঙ্গে আমাদেরও। এমন আহম্মুকের সঙ্গে আসে যে নাকি টাকা আর দেনায় মাল পাবার জন্য সুন্দরী বউকে মহাজনের নাকের সামনে নাচায় — পাঁচ-সাত ভাবে না।

ভাববে কী, দেনার দায়। সেখানে তো হিন্দু-মোসলমান সবাই সমান। চোখ মুছে এখন মরণ জেনেই যেন জলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সারকথা বলে বসে চিন্তামণি। বলে, এবার আমি বুঝেছি সতীশদার কথায়। মহাজনের নৌকোয় নীল রঙের শাড়ি পরা একটা মেয়েমানুষও ছিল। একবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে যেন আমাদের ডাকতে গেছিল। মহাজন নড়া ধরে হিঁচিয়ে বসিয়ে দেয়। সে-মেয়ে হীরেমন পাখি।

আকবর এবার বলে, তবে কি মহাজন তার নৌকো লোক দিয়ে সরিয়ে লিল? সে মউ লেবে না?

আসল মধুর কলসী তো সে সরিয়ে নিয়েছে। এতক্ষণ নুলো ডুবিয়ে সে খাচ্ছে কোনও ডেরায় বসে। ডাকাতি করা লুটের মাল নেয় না রহমান মহাজন? না হলে ক'বছরে এত বড়লোক হয় কী করে? চাঁদা দিয়ে সব দিকে হাত করে রেখেছে। তুই আমি তো একটা মশা-মাছি তার কাছে।

হঠাৎ বুক চাপড়াতে থাকে আকবর লস্কর। বলে, আমার হীরেমন পাখিকে কোথায় গেলে পাব! সে যে আমার কোল্‌জে গো।

এই বিয়ে করার জন্য জোয়ান বেটাই তো তোমার শত্রু হয়ে গ্যাছে। তারাই ষড়যন্ত্র করে হয়তো মহাজনের ফন্দিতে সাহায্য করেছে।

ঝড় উঠে এল। দুরন্ত ঘূর্ণিঝড়। জঙ্গল আড়মোড়া খাচ্ছে। সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই অন্ধকার নেমে গিয়েছে। পিছনে বাঘের ভয়। যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ঝড়ের দাপটে গাছপালা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। মার মার শব্দ। জলের উন্মাদ নৃত্য।

তবু সব কিছু বিসর্জন দিয়ে খালি গায়ে তিন জনই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের ঠেলে নিয়ে চলল ঢেউয়ের উদ্দাম গতি। তলিয়ে নিতে লাগল। তিন জনেই হাঁক দিচ্ছিল মাঝে মাঝে মাথা তুলতে পারলেই। জোয়ারের গতি যেন বিশগুণ বেড়ে গিয়েছে। ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে উত্তর দিকে। একটা চড়ায় পা পেয়ে গেল তারা। তীরে উঠে ছুটতে লাগল। জলের উচ্ছ্বাস ওপর পর্যন্ত আছড়ে পড়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোন দিকে তারা যাচ্ছে? আকাশে তারার দিকচিহ্নও নেই। বিদ্যুৎ চমকাতে এক সময় তারা দেখতে পেল বড় আকারের কী যেন ভেসে যাচ্ছে। চাঁচাছোলা বাঁশের

BanglaBook.org

বান্ডিল? নৌকো ভাসি হয়ে চলে এসেছে? তীর ধরে জঙ্গলের কিনারা বেয়ে এগোনোর চেয়ে এই বাঁশির বান্ডিল ধরা নিরাপদ। ডুবে যাবে না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়ে অনেক কসরত করার পর ফাঁপা তল্‌তা বাঁশের বান্ডিলটাকে ধরল তারা তিন জনে। বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। শিল পড়ছে। ঝড়ের বেগ কমে আসতে থাকে। বৃষ্টিও ধরে যায়। কিন্তু ঘন অন্ধকার। বাঁশের বান্ডিলে তিন জন উঠে বসেছে। জোয়ার ঠেলে নিয়ে চলেছে তাদের। কিন্তু তারা কোন নদী দিয়ে কোন জনপদের দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না।

বাঁশের বান্ডিলটা শক্ত করে তিন জায়গায় বাঁধা আছে মোটা প্লাসটিক দড়ি দিয়ে আর তিনটে বাঁধনের মধ্যে যোগাযোগ আছে, তাতে মনে হয় সহজে ছেঁড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। যত্ন করে করাত দিয়ে কাটা সমান মাপের এই বাঁশগুলো কি কোনও কারখানায় যাচ্ছিল? কাগজ কলে?

আরও ঘণ্টা খানেক ভেসে আসার পর তারা নদীর পাড়ের আলোকস্তম্ভ দেখে জায়গা চিনতে পারল। মাতলা নদীর মধ্যেই তারা এসেছে। নেতা ধোপানীর ঘাট।

সতীশ বলল, দে, এবার ছেড়ে দে। তীরে ওঠা যাক।

আকবর বলল, কেন, আরও তো আমাদের যেতে হবে। গরানগাছা তো এখনও সাত-আট মাইল দূরে।

আরে ঘরে যেয়ে কি আমড়া পাবি? নৌকাটি ফেরত দিবি কী করে মহাজনকে? মৌগুলোও তো পড়ে রইল। হয়তো সব ভেসে গেছে।

তো এখানে উঠনু কেন মোরা?

চিন্তামণি বলল, মহাজনের লৈকো, এই পর্যন্তন দ্যাখা গেছ্যালো।

হ্যাঁ! বলল সতীশ আদক। পরনে শুধু লুঙ্গি আর কোমরে বাঁধা গামছা। এখানেই এসে ঘুঘু তা'য়ে (মুরগির ডিম বসানো, বাচ্চা তোলার হাঁড়ি-কড়াই) বসেছে। রহমান মহাজনের চটালিখোলার কারখানা, বাঁশ আর গরান কাঠের উবি'র গোলা আছে না এখানে। শুনেছি আবার দেশের মহৎ কাজের জন্য করাত কল বসাবে। লক্ষ লক্ষ বড় বড় গাছ ফর ফর করে চেরাই করে দেবে। ঝড় আটকাবার মতো বিরিক্ষি আর রাখবে নে। তার জন্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আড়াই লাখ টাকা ঋণও পেয়েছে। তুমি আমি একখানা টাবুরে, পালোয়ার — এমনকী শাল্‌তি ডোঙা চাইলেও পাব না। সরকার তেলা মাথায় তেল দেয়। আমরা তো মূলধনটাও খেয়ে ফেলব।

কানমুতো'র সোজা থালার মতো চাঁদ উঠেছে যখন বরাবর নদীর পাড়ের পথ ধরে হেঁটে এসে ভারত টালির কারখানার মুখে এসে দাঁড়াল তারা। পখমলের মাটি কাটা কোড়াদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল মহাজন এসেছে তার নতুন বউকে নিয়ে। এক জন বলে, মেয়েটার চেহারাখানা যা না মাইরি — চাম্পিয়ান!

আর একটা বুড়ো কোড়া বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বউ লয়, অন্য কারও বউ, ভাগিয়ে লেয়েচে, ট্যাকা থাকলে কী না করা যায়।

তা কারখানার ম্যানেজার নামাজী বুড়ো দীল মহম্মদ বেঁকে বসেছে। আশি বছরের বুড়ো লোক। বলেছে, আমাকে আর টাকার লোভ দেখিও না মহাজন। সাদি পড়াতে আমি পারব না। মেয়ের বাপ-ভাই গার্জেনের হুকুম চাই। আগে বিয়ে হলে তালাক হওয়া চাই। তালাক হলেও তিন মাস তেরো দিন ইদ্দৎ পালন হওয়া চাই। মানে প্যাটে ছাবাল আছে কি না জানা চাই। মহাজন এ-সব কথায় খুব ক্ষেপে গ্যাছে। বলেছে দীল মহম্মদকে তাড়াবে কাল সকালে।

মেয়েটাও শুনতিচি রাজি নেই। তাকে তমালবেড়ের বাপের বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে নাকি মহাজন এনেছ্যালো। সতীন ব্যাটারা দেখতে পারে নে।

BanglaBook.org

হঠাৎ হ্যাসাকের আলোয় মহাজন আবদুর রহমান মাঝি তিন জন মৌলেকে বাঘের রাজ্যের নির্বাসন থেকে ঝড়-বৃষ্টিতে নদী পাড়ি দিয়ে ভূতের মতো ফিরে আসতে দেখে যেন অবাক হল। বলল, বস বস — সব। কী খবর বল। লৌকো কই? মালঝাল সব খুইয়ে এয়েচ তো?

আকবর বলল, আমার হীরেমন কোথা?

হে। হীরেমনের দিকেই মনের টান? লৌকো কই?

সতীশ বলল, ন'হাজার নশো নিরেনব্বই নম্বর খিলে-নৌকোটা এখানের খোলার কারখানায় কি জাদু-মন্তরবলে ভেসে এল দাদা? সবই আল্লার ভোজবাজি নাকি?

হীরেমন এসে দাঁড়ায় অফিস ঘরটার ভেতর থেকে। পুরন্ত গাল। দীঘল চোখ। বাঁশির মতো নাক। চিবুক তিল। সে বলল, তমালবেড়েয় আমাকে পৌঁছে দেবে বলে এনে মহাজন এখানে তুলেছে।

মহাজন খেঁকিয়ে উঠে বলল, কে তোমাকে তমালবেড়ের মাতাল লোকদের বাড়ি বেরিয়ে-যাওয়া-মেয়ের ঝক্কি চাপাতে নিয়ে গিয়ে মার খাবে বলো। এসে তো আমি শুনলাম তোমাকে আকবার আলি ধঞ্চেখালির ইটখোলা থেকে নিয়ে পালিয়েছিল। তোমার স্বামী কদম সেখ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। থানায় মিসিং কেস দিয়ে রেখেছে। এই বস সব মাথা ঠাণ্ডা করো। এই খেতে দে এদের তিন জনকে।

তিন জনেই ভাত খেল পেট ভরে। মহাজন এলেই ভালো রান্না হয়।

সতীশ তবু বলে, মহাজন, তুমি ইমানদার মানুষ, নৌকোটা আমাদের খসিয়ে আনলে কেন ভাই?

জানি না আমি, আল্লার কসম! কার কী মতলব জানি না। হতে পারে ভুল নম্বর। ডবল নম্বর হয়ে গ্যাছে।

সতীশ হাসল। শুতে যেতে চাইল সে আকবরকে ডেকে নিয়ে নদীর পাড়ের শিবমন্দিরের চাতালে। চিন্তামণি আগেই চলে গিয়েছিল।

আকবর যেতে চাইল না। তার বউ যেখানে সে-ও সেখানে থাকবে নাকি?

মহাজন চোখ রাঙাল। আবদার নাকি! মেয়ে নিয়ে বাইরে ফুর্তি মারবে ছোটলোকের মতো? সে রাত্তিতে অফিস ঘরে থাকবে। কাল ভোরের জোয়ারে আমার সঙ্গে সবাই বাড়ি যাবে।

আকবর বন্ধ ঘরের বারান্দায় মশায় পড়ে রইল। পাশেই কুকুর শুয়ে আছে।

মহাজন পাশের ঘরে আছে ভালো বিছানায়। মোল্লা দীল মহম্মদ কেরায়া চড়ে কাছেই আজ বাড়ি গিয়েছে।

ভোর হতে জোয়ার ওঠার খবর এল। মহাজন উঠে অজু করার পর ফজরের নমাজ পড়ল। তারপর নৌকোয় উঠল ক'জনে।

অন্ধকার তখনও ভালো হয়ে কাটেনি। মহাজন দেখল ৯৯৯৯ নম্বর লেখা নৌকোটা। বলল, এই সতীশ, নৌকো নিয়ে মালঝালগুলো কুড়িয়ে আনতে যাবি নাকি? আকবর তো বউ ছেড়ে যাবে না।

সে-সব মাল কি আর আছে দাদা? নদীতে ভেসে গেছে ... কিন্তু নৌকো কে আনল তা তো জানালে না। আমাদের মেরে দিতে চেয়েছিলে? সতীশের চোখে যেন আগুন জ্বলে।

মহাজন চোখ ফিরিয়ে নেয়। হাতে তার 'তস্‌বিহ' দানা (জপমালা) ঘুরছে। শুধু বলল, সব কিছু আল্লাহ জানে। সুন্দরী মেয়ের পেছনে শয়তানের শত রকমের ফন্দি থাকে। হতে পারে আমাদের কোনও মাল্লা-মাঝি ওই নৌকোটা করে হীরেমন পাখিকে আবার কোথাও উড়িয়ে নিয়ে পালাবার মতলব করে রেখেছিল। তা সাকসেসফুল হল না।

আকবর হাল ধরে ঢেউ কাটাতে ঝিঁকি মারছে। সতীশ আর চিন্তামণি দাঁড় বাইছে। পালতোলা নৌকো দখিনে হাওয়ায় যেন উড়ে চলেছে।

BanglaBook.org

আকবর আলি গায়ের জোরে হাল কষে আর ভাবে, আমাদের বাঘে খেয়ে নেবে আর সোনার হীরেমন পাখিকে শতেক কথায় ভুলিয়ে নিকে করে নেওয়ার ধান্ধা ছিল আধবুড়ো টাকার কুমীর মহাজনের। যা হয় হবে, আজ ওর নিস্তার নেই। হেঁতাল ডাণ্ডার ছুঁচোলো মাথা হাত খানেক মুখের হাঁয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সে একাই একটা বাঘ মেরেছিল না?

মাঝ-দরিয়ায় আসার পর চারদিকের তীর তখনও আবছা ধোঁয়াটে আঁধার আর ঊষার আলোয় যেন পরম রহস্যময়।

হীরেমন মাথার চুল এলো করে পড়ে আছে নৌকোর পাটাতনের ওপর। যেন আগুনের একটা হাল্‌কা। কোমরটা কত সরু। কিন্তু পাছাটা অনেক উঁচু আর চওড়া। মায়াময় ওর চোখ দুটোর দিকে তাকালে যেন সম্মোহিত হয়ে যেতে হয়।

হঠাৎ হাল ছেড়ে হীরেমনকে আড়াআড়ি টপকে এল আকবর আলি। তপবিহ্ জপতে থাকা মহাজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতো। টুঁটি কামড়ে ধরল। মহাজন লেথোতে ঘুঁষোতে লাগল। হীরেমন উঠে বসল। চুলের নোটন পাকাতে গিয়ে তুঙ্গমোহিনী বুকের চুড়ো দুটো মুক্ত হয়ে গেল। সতীশ আর চিন্তামণিকে এখন হাতে রাখার জন্য প্রলুব্ধ করা দরকার।

সতীশ বলল, তুমি শুয়ে পড়ো মেয়ে।

আকবরের মুখময় রক্ত। সে আবদুর রহ্‌মান মহাজনের বুকে বসে থেকে লাশটাকে ঠাণ্ডা হতে দিল। তারপর কোমরের হন্দর বেঁধে টেনে টেনে নামিয়ে দিল নদীর বুকে। জলে পড়ার শব্দ হল।

ডুবে তলিয়ে গেল মহাজন।

লোকটা অনেক দিন নমাজ পড়ছিল। হয়তো যে-সুখের খোঁজে পাগল হয়ছিল তা আল্লার ইচ্ছায় বেহেশ্‌তে গিয়ে পাবে। সেখানে অনিন্দ্যসুন্দরী হুর আছে।

আগুনের গোলাটা তখন উঠে এসেছে পুবের আকাশে। বালিহাঁস, জলপিপি, পানপায়রার দল নদীর জলে নেমে ভেসে চলেছে অসংখ্য।

হীরেমন বসে থাকে সে-দিকে তাকিয়ে।

সারা রাত মহাজন তাকে জ্বালাতন করেছে — ঘুম হয়নি। সে হাই ভাঙল। আবার ছইয়ের তলায় পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ল। বাপের বাড়ি যাওয়া হল না তার। আরে গিয়েই-বা কী লাভ।

রক্ত ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলে গ্রামের ঘাটে ফিরে তিন জনে নৌকো বেঁধে রেখে বাড়ি ফিরল।

হীরেমন এখন সহজ হয়েছে। তার মুখে-চোখে স্বাভাবিক হাসি আর কথা খেলা করছে।

কেননা আকবর আলিকে তার বেটারা ভয় করে। যতক্ষণ সে পাশে আছে তার আর কাউকে জানে না হীরেমন। আকবর আলি মানুষ নয়, পাথর।

মহাজনের সুখের স্বপ্ন বানভাসি হয় গেল। আকবর আলি শক্ত হাতে ধরে আছে হীরেমনের বাঁ-হাতটা। আর হাত ছাড়াতে মন নেই হীরেমনের।

মাঠের পথে হু-হু হাওয়ায় কাপড়-চোপড় উড়িয়ে দিচ্ছে। হাত ছাড়িয়ে লজ্জা ঢাকে হীরেমন।

কী ভাবছ হীরেমন?

কিচ্ছু না। এখন তোমার বুকের ওপর মাথা রেখে একটু নিদ্ যেতে পারলে বাঁচি।

কাতুকুতু দেওয়া হনোমানের মতো দাঁত বের করে হাসল আকবর আলি। সে যেন বোঝাতে চায়, গরিবের ভাগ্যে সে-সুখ কি আছে হীরেমন পাখি? তোমাকে এখন এই আগুনভরা বুকের খাঁচায় কেমন করে ধরে রাখি?

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org